

উনিশ শতকের বাংলা নাটক ও বিধবা প্রসঙ্গ

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচ.ডি (বাংলা) উপাধির জন্য
প্রদত্ত গবেষণা অভিসন্দর্ভ

গবেষক
দেবশ্রী সাহা

Registration No. Ph.D/Beng. (1089) /3472/R-2017

তত্ত্বাবধায়ক
ড. মঞ্জুলা বেরা
প্রফেসর, বাংলা বিভাগ
উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলা বিভাগ
উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

২০১৯

ঘোষণা

আমি “উনিশ শতকের বাংলা নাটক ও বিধবা প্রসঙ্গ” শিরোনামে একটি গবেষণা অভিসন্দর্ভ রচনা করেছি। এই গবেষণা অভিসন্দর্ভটি অধ্যাপক (ড.) মঞ্জুলা বেরা মহাশয়ার তত্ত্বাবধানে রচিত হয়েছে। গবেষণাপত্রের কোন অংশই অন্য কোনো উপাধির জন্য দাখিল করা হয়নি। এই অভিসন্দর্ভটি আমার স্বরচিত এবং মৌলিক রচনা।

তারিখ : ৩০.৪.১৯

দেবপ্রী-সাহা

(দেবপ্রী সাহা)

গবেষক

বাংলা বিভাগ, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

রাজা রামমোহনপুর, দার্জিলিং, সূচক-৭৩৪০১৩



রেফারেন্স নম্বর

তারিখ

Certificate

I certify that Smt. Debashree Saha has prepared the thesis entitled “উনিশ শতকের বাংলা নাটক ও বিধবা প্রসঙ্গ” for the award of Ph.D degree of the University of North Bengal, under my guidance. She has carried out the work at the Department of Bengali, University of North Bengal.

Date : 30.4.19


(DR. MANJULA BERA)
Professor of Bengali
Department of Bengali
University of North Bengal

Professor
Department of Bengali
University of North Bengal

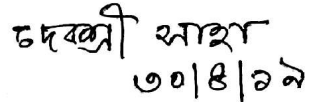
কুণ্ডিলকব্ধি প্রতিরোধী শংসাপত্র

আমি শ্রীমতী দেবপ্রী সাহা, (Registration No. Ph.D/ Beng . (1089)/3472/ R-2017, date 22/12/2017) উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ থেকে “উনিশ শতকের বাংলা নাটক ও বিধবা প্রসঙ্গ” শিরোনামে পিএইচ. ডি গবেষণাকর্ম সম্পন্ন করেছি। আমার সর্বোত্তম জ্ঞান ও ধারণা অনুযায়ী জ্ঞাপন করছি যে, আমি গবেষণাকর্মে কোনোরূপ কুণ্ডিলকব্ধির আশ্রয় গ্রহণ করিনি।


(প্রফেসর ড. মঞ্জুলা বেরা)

তত্ত্বাবধায়ক ও প্রফেসর
বাংলা বিভাগ, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়
রাজা রামমোহনপুর, দার্জিলিং,
সূচক-৭৩৪০১৩

Professor
Department of Bengali
University of North Bengal


(দেবপ্রী সাহা)

গবেষক, বাংলা বিভাগ বাংলা বিভাগ
উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়
রাজা রামমোহনপুর, দার্জিলিং,
সূচক-৭৩৪০১৩

গবেষণা
অভিসন্দর্ভের
সারসংক্ষেপ
(Abstract)

উনিশ শতকের বাংলা নাটক ও বিধবা প্রসঙ্গ

ভূমিকা :

রামমোহন রায়ের (১৭৭২-১৮৩৩) প্রচেষ্টায় ‘সতীদাহ প্রথা রদ’ (১৮২৯) আইন প্রচলনের পর কার্যকারণসূত্রে, অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে হিন্দু বিধবার পুনর্বিবাহের প্রসঙ্গটি। ‘সতীপ্রথা’ রদ হবার পর সমাজে বাল্যবিধবার সংখ্যা বেড়ে যায়। নিরুপায় বিধবা রমণীদের জীবন হয়ে ওঠে অসুরক্ষিত। এই বিধবাদের একাংশ জড়িয়ে পড়ে সমাজ কলঙ্কে। কেউকেউ কলকাতার বাবুদের রক্ষিতা হয়ে জীবন কাটান। আবার কেউ কেউ আশ্রয়হীন হয়ে পতিতাবৃত্তি গ্রহণ করেন। সমাজে ভ্রণহত্যার মত অপরাধমূলক কাজ ঘটতে থাকে। এইরকম সমাজ অবক্ষয়ের সামনে দাঁড়িয়ে সমাজ হিতৈষীরা এই সংকট থেকে পরিত্রাণের উপায় খোঁজেন। পরাধীন ভারতবর্ষের আচার সর্বস্ব সমাজ পরিবেশে দাঁড়িয়ে বিধবা-সমস্যা সংকট মোচনে কলম ধরলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১)। তিনি বিধবা রমণীদের পুনর্বিবাহ দানে উদ্যোগী হলেন। অসহায় বিধবা রমণীদের পরিত্রাণ ও সমাজকে কলুষমুক্ত করতে, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ‘বিধবা বিবাহ’ আইন প্রণয়নে সচেষ্ট হন। বিধবাবিবাহের পক্ষে সওয়াল করে বিদ্যাসাগর লেখেন, —‘বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব’ (১৮৫৫, ১ম ও ২য় খণ্ড)। দীর্ঘ সামাজিক আলোড়নের পর নানান ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে বাধা বিপত্তি কাটিয়ে বিদ্যাসাগরের প্রচেষ্টায় ‘বিধবাবিবাহ’ শেষ পর্যন্ত আইনে পরিণত হয় ১৮৫৬ সালের ২৩শে জুলাই। ‘বিধবাবিবাহ’ আইনত স্বীকৃতি পাওয়ার পর, সমাজের নানান স্তরে, বিশেষত শিক্ষিত মহলে, সাহিত্য চিন্তায়, কবিতা, নাটক, গল্প, উপন্যাসে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে উঠে আসে—‘বিধবা’ প্রসঙ্গ এবং ‘বিধবা বিবাহ’ প্রসঙ্গটি। উনিশ শতকের বাংলা নাটকে নাট্যকারেরা সামাজিক প্রেক্ষিতে বিধবা চরিত্রদের তুলে ধরেছেন। ভিন্ন বয়সের বিধবাদের ভিন্ন সমস্যা ও দুঃখ কথাকে স্থান দিয়েছেন নাটকে। যা হয়ে উঠেছে সমাজের বহু অসহায় বিধবাদের প্রতিচ্ছবি। প্রসঙ্গত, উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের দীর্ঘ সময়কালে রচিত বাংলা নাটকে উঠে আসা বিধবা প্রসঙ্গ ও তাদের সামাজিক সংকট-সমস্যাকে আমি আমার গবেষণা অভিসন্দর্ভে তুলে ধরেছি। আমি আমার গবেষণা সমগ্র গবেষণা কর্মটিকে চারটি অধ্যায়ে বিভাজন করেছি,—

প্রথম অধ্যায় : উনিশ শতকের সমাজ জীবন, বিধবার সমস্যা ও বিধবা আন্দোলন প্রসঙ্গ।

দ্বিতীয় অধ্যায় : উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্যে বিধবা প্রসঙ্গ।

তৃতীয় অধ্যায় : উনিশ শতকের বাংলা নাটক : বিষয় ভাবনায় বিধবা প্রসঙ্গ।

চতুর্থ অধ্যায় : উনিশ শতকের বাংলা নাটকে বিধবা নারীর সংকট।

প্রথম অধ্যায় : উনিশ শতকের সমাজ জীবন, বিধবার সমস্যা ও বিধবা আন্দোলন প্রসঙ্গ।

উনিশ শতকে রক্ষণশীল বর্ণহিন্দুর দল বিধবা বিবাহকে সুনজরে দেখেননি। আধুনিক ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত ব্রাহ্মরা উদার মানসিকতায় ‘বিধবা বিবাহে’র বিষয়টি সমবেদনার সঙ্গে দেখেছিলেন। ব্রাহ্ম সমাজের সমকালীন বিশিষ্ট নেতৃবর্গ কেশবচন্দ্র সেন, প্যারীচরণ সরকার, শিবনাথ শাস্ত্রী প্রমুখ, বিধবা বিবাহের সমর্থনে, সোচ্চার হয়েছিলেন। অন্যদিকে, গোবিন্দচন্দ্র শর্মা, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, প্রসন্নকুমার শর্মা, শ্যামাপদ ন্যায়ভূষণ, যদুনাথ চট্টোপাধ্যায়, গঙ্গাধর দে, প্রমুখ পন্ডিতেরা বিধবা বিবাহকে পরিবার-সমাজ অবক্ষয়ের সূচক হিসাবে দেখেছিলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায় : উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্যে বিধবা প্রসঙ্গ।

১৮৫৬ সালে বিধবা বিবাহ আইনত স্বীকৃতি পেলে, শিক্ষিত মহলের সাহিত্য চিন্তায়— পক্ষে এবং বিপক্ষে বিধবা বিবাহ এই সামাজিক বিষয়টি কাহিনীর মোড়কে স্থান পেল সাহিত্যে। উনিশ শতকে বিধবার বিবাহকে কেন্দ্র করে রচিত সাহিত্যের তালিকা বিশাল। সমগ্র উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ জুড়ে রচিত বাংলা সাহিত্যের সিংহভাগ দখল করে রয়েছে বিধবা বিবাহ এই সামাজিক আন্দোলন জাত নানা ঘাত-সংঘাত ও সামাজিক মিথস্ক্রিয়ার বিষয়টি। একদিকে সংবেদনশীলতা অন্যদিকে কটাক্ষ ও মুখোরোচক প্রণয়কাহিনীর কেন্দ্রীয় বৃত্তে বিধবা চরিত্ররা ঘুরে ফিরে এসেছে। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সৃষ্ট—‘কৃষ্ণকান্তের উইল’ উপন্যাসের বিধবা যৌবনাবতী রোহিনী, ‘বিষবৃক্ষ’ উপন্যাসের রূপসী বিধবা ‘কুন্দনন্দিনী’ চরিত্রে দেখা গেছে বৈধব্যের কামনাসত্ত্ব রূপ আবার একাধিক নাটকে দেখা গেছে বিধবা নারীর অসহায়তার করুণ বৈধব্য জীবনাচার একাদশী পালনের চিত্র।

তৃতীয় অধ্যায় : উনিশ শতকের বাংলা নাটক : বিষয় ভাবনায় বিধবা প্রসঙ্গ।

১৮৫৬ সালে আইনত বিধবা বিবাহ স্বীকৃতি পাবার পর, বিধবার পুনর্বিবাহের বিষয়টি সবচেয়ে প্রভাব বিস্তার করে নাট্য সাহিত্যে। সমালোচক অশোককুমার মিশ্র লিখেছেন, — “বিধবা বিষয়ক বাদ-প্রতিবাদের সুর সবচেয়ে বেশি উচ্চকিত হয়েছিল বাংলা নাট্য শ্রেণীতে।”

(বাংলা প্রহসনের ইতিহাস, ১৯৮৮) নাটক যেহেতু মিশ্রশিল্প, সেহেতু এখানে যেমন চরিত্রের সংলাপ আছে তেমনি রয়েছে সংগীত। ফলে বাংলা নাটকের সংলাপ নির্ভরতায় নাট্যকারেরা সরাসরি উক্তি-প্রত্যুক্তির মধ্য দিয়ে, কখনও সংগীতের মধ্য দিয়ে বিধবা বিবাহের সমর্থনে, বিরোধিতায় কিংবা মনোরঞ্জন রঙ্গ-তামাসা করেছেন।

আমাদের প্রাথমিক অনুসন্ধানে লক্ষ্য করেছি উনিশ শতকে রচিত প্রায় তিরিশটির বেশি নাটকে বিধবা বিবাহ প্রসঙ্গ ও বিধবা নারীর জীবনাচারের চিত্র উপস্থাপিত হয়েছে। ১৮৫৬ সালের ২৩ শে জুলাই বিধবা বিবাহ আইনত পাশ হবার পর পরই ওই বছরেরই প্রকাশিত হয় তিনটি নাটক, উমেশচন্দ্র মিত্রের ‘বিধবা বিবাহ নাটক’ (১৮৫৬), রাধামাধব মিত্রের ‘বিধবা মনোরঞ্জন’ নাটক (১৮৫৬) ও উমাচরণ চট্টোপাধ্যায়ের ‘বিধবাবাহ’ নাটক (১৮৫৬, সংবাদ ভাস্কর)। সমকালে বিধবা বিবাহের সমর্থনে রচিত উমেশচন্দ্র মিত্রের ‘বিধবা বিবাহ’ নাটকটি একাধিকবার সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চায়িত হয় ও জনসমাদর লাভ করে বিপুলভাবে। নাট্যসমালোচক হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত তাঁর ‘ভারতীয় নাট্যমঞ্চ গ্রন্থে’ লিখেছেন,—“কলিকাতার সিঁদুরিয়া পাটতে গোপাললাল মল্লিকের বাড়িতে মেট্রোপলিটান থিয়েটারে কেশব সেন মহাশয়ের উদ্যোগে ও প্রযোজনায় উমেশচন্দ্র মিত্র রচিত বিধবা বিবাহ’ নাটক অভিনীত হয়। অভিনয়ের তারিখ ১৮৫৯, ২৩ শে এপ্রিল।” নাটকটি সমকালের মঞ্চাভিনয় বাংলা নাট্যাভিনয়ের ইতিহাসকে ও নাটক রচনার ইতিহাসকে সমৃদ্ধ করেছিল। এই নাটকের অভিনয়ে বিদ্যাসাগর ও কেশবচন্দ্র সেন স্বয়ং দর্শক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন।

চতুর্থ অধ্যায় : উনিশ শতকের বাংলা নাটকে বিধবা নারীর সংকট।

বিধবা বিবাহের সমর্থনে লেখা যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায়ের ‘চপলাচিন্তাপল্য’ (১৮৫৭) নাটকে দেখানো হয়েছে,—বাল্যবিধবার একাদশী পালনের নিষ্ঠুরতার চিত্র। যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায়ের ‘চপলাচিন্তাপল্য’ (১৮৫৭) নাটকে বিধবা বিনোদা আক্ষেপের সঙ্গে জানিয়েছে,—‘ছেলেবেলা শুধু ত, মেয়ে বলে মা-বাবা দূরছাই করেচেন। আমি কুলীনের মেয়ে, মা কি বাপ কখনো একটি কথা বলেননি।... বাপ তো জুতিয়ে বের করে আনলেন, আমি ‘ওট্টু ছুঁড়ি তোর বে’ বে ত হল তারপর মাসখানেক পরেই এম্মি হয়েছে। ভাতারের সঙ্গে আলাপ ও হয়নি, পরচেও হয়নি। সেই শুভদৃষ্টির যা দেখা, আর সুতো খুলতে যা ছোঁয়া, সকল হলো পরে পরে, গুটিকতক মস্তুর পড়ে এই একাদশী লাভ হলো।’ হিন্দুধর্ম সংস্কার বশত অনেক হিন্দু বিধবা বৈধব্য জীবনের

আচারের মধ্যেই নিজেকে সীমাবদ্ধ রেখেছিল। উনিশ শতকের সমকালে বিধবার পুনর্বিবাহে —অনেক বিধবা নারীর সমর্থন ছিল না। এই ধর্মভীরুতা লক্ষ্য করা যায়, অঘোর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘বিধবা সংকট’ (১৮৯০) নাটকে। এ নাটকে দেখানো হয়েছে, ইংরেজি শিক্ষিত নায়ক রামচন্দ্র এক ব্রাহ্ম বন্ধুর অনুরোধে নিজ বিধবা শ্যালিকার পুনর্বিবাহের উদ্যোগ গ্রহণ করলে, বিধবাটি পুনর্বিবাহে সম্মত না হয়ে বাপের বাড়ি পালিয়ে গেছে।

আবার, লক্ষ্য করা যায়, বৈধব্যের দুর্ভোগ যন্ত্রণা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য কোনো কোনো হিন্দু বিধবা সমকালে বিধর্মী হয়েছিলেন। অভয়ানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘অগত্যাঙ্গীকার প্রকরণ’ (১৮৬১) নাটকে দেখা যায়, নায়ক মন্থ বিধবা যুবতী রাসবিহারীকে বিয়ে করার উদ্দেশ্যে ধর্মান্তর করার জন্য এক খৃষ্টান ধর্মগুরুর শরণাপন্ন হয়। অজ্ঞাতনামা রচিত ‘বিধবাবঙ্গবালী’ (১৮৭৫) নাটকে অনুরূপভাবে একজন ব্রাহ্মণ বিধবাকে প্রলুব্ধ করে ধর্ম নষ্ট করার চিত্র উপস্থাপিত হয়েছে।

উপসংহার :

বস্তুত ‘উনিশ শতকের বাংলা নাটক ও বিধবা প্রসঙ্গ’ শিরোনামের গবেষণা কাজে আমরা অনুসন্ধান করতে চেয়েছি নাট্যসংলাপে বিধবাদের হৃদয় যন্ত্রণা, অসহায়তা, পুনর্বিবাহ উত্তর জীবনের সমস্যা সংকট ও মিলনের প্রতিচ্ছবি। প্রতিপক্ষের সমালোচনা, রঙ্গতামাসা, মুখোরোচক গল্প, বিরোধিতা, বৈধব্য আচার ও পরিবার জীবনের সংকট, সমাজ অনুশাসন কীভাবে নাটকের চরিত্রে রূপায়িত হয়েছে সমগ্র উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের নাট্যসাহিত্যে তাঁর অন্বেষণ আমাদের লক্ষ্য। বিধবাদের জীবন রক্ষার তাগিদে কিভাবে বেশ্যাবৃত্তিতে গমন —তার নাট্য কাহিনী সংলাপ পরম্পরায় আমরা বুঝে নিতে চাই মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে, চরিত্রের স্বগত কথনে। নাটকীয় একোক্তি ও চরিত্রের আক্ষেপ উক্তির মধ্যে বৈধব্যের জ্বালা, আশা-নিরাশা, স্বপ্ন ও স্বপ্ন ভঙ্গের বাস্তব সত্যই শতাব্দীকাল দূরে দাঁড়িয়ে আমরা অনুসন্ধান করতে চাই সমাজতাত্ত্বিক, ঐতিহাসিক ও মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে।

সূচিপত্র

পৃষ্ঠা

প্রাক্কথন

ক-খ

ভূমিকা

১-৩

প্রথম অধ্যায় :

উনিশ শতকের সমাজ জীবন, বিধবার সমস্যা ও বিধবা আন্দোলন প্রসঙ্গ। ৪-২৪

দ্বিতীয় অধ্যায় :

উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্যে বিধবা প্রসঙ্গ। ২৫-৬১

তৃতীয় অধ্যায় :

উনিশ শতকের বাংলা নাটক : বিষয় ভাবনায় বিধবা প্রসঙ্গ ৬২-১৭১

চতুর্থ অধ্যায় :

উনিশ শতকের বাংলা নাটকে বিধবা নারীর সংকট। ১৭২-২৩০

উপসংহার :

২৩১-২৩২

গ্রন্থপঞ্জি :

২৩৩-২৫৬

পরিশিষ্ট :

২৫৭-২৭৪

নির্ঘণ্ট :

২৭৫-২৭৯

প্রাক্কথন

এম.এ ক্লাসে অধ্যাপিকা মঞ্জুলা বেরা মহাশয়ার কাছে শিবনাথ শাস্ত্রীর ‘রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ’ নিবিড় ভাবে পড়ার সূত্রে, প্রাথমিক ভাবে উনিশ শতকের সাহিত্য নিয়ে গবেষণা করার চিন্তা-ভাবনা মনের মধ্যে অঙ্কুরিত হয়। আমার শিক্ষক মহাশয়দের সঙ্গে অনেক ভাবনা চিন্তা আদান প্রদান ও আলোচনার পর অবশেষে, পিএইচ.ডি গবেষণার বিষয় হিসাবে ‘উনিশ শতকের বাংলা নাটক ও বিধবা প্রসঙ্গ’ শিরোনাম হিসাবে নির্ধারিত হয়।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের (১৮২০-১৮৯১) প্রচেষ্টায় ‘বিধবা বিবাহ আইন’ পাশ হয় ১৮৫৬ সালের ২৬শে জুলাই। ১৮৫৬-১৯০০ এই দীর্ঘ ছেচল্লিশ বছরের সময়কালে রচিত বাংলা নাটকের কাহিনী বৃত্তে কিভাবে বিধবা বিবাহ প্রসঙ্গ ও বিধবা চরিত্রা জায়গা করে নিয়েছে তা অনুপুঙ্খ ভাবে আলোচনার চেষ্টা করেছি। সেই সঙ্গে নাটকগুলি মঞ্চাভিনয়ের সংক্ষিপ্ত পরিচয় লিপিবদ্ধ করারও চেষ্টা করেছি। একদল নাট্যকার উনিশ শতকের সামাজিক অবক্ষয়ের যুগে দাঁড়িয়ে আবেগমাখা সমবেদনা, করুণা ও পরদুঃখকাতরতায় বিধবা বিবাহের প্রসঙ্গটি দেখেছেন। আর একদল নাট্যকার ‘বিধবা বিবাহ’ বিষয়টিকে মুখরোচক কাহিনী হিসাবে তাঁদের নাটকে পরিবেশন করেছেন।

চল্লিশটির অধিক দুষ্প্রাপ্য নাটক আলোচনার মধ্য দিয়ে আমরা ‘উনিশ শতকের বাংলা নাটক ও বিধবা প্রসঙ্গ’ তুলে ধরবার প্রয়াস করেছি। বর্তমান সময় থেকে দেড়শ বছর পূর্বে কাঠ ও সীসার ব্লকে ছাপা বাংলা দুষ্প্রাপ্য নাটকগুলির বেশ কিছু ছবি সন্নিবেশিত করেছি আমার অভিসন্দর্ভের পরিশিষ্ট অংশে। যা দেখে বুঝে নিতে সুবিধা হবে ‘বিধবা বিবাহ’ আইনত চালু হবার পর বাংলা নাটক রচনার কাহিনীবৃত্তে ও শিরোনামে বিধবা প্রসঙ্গ কীভাবে স্থান করে নিয়েছিল।

একুশ শতকে দাঁড়িয়ে, উনিশ শতকের যুগ প্রেক্ষাপটের ভিত্তিতে সেকালের ‘বিধবা বিবাহ’ সমাজ আন্দোলন ও বিধবা বিবাহ বিষয়ক বাংলা নাটক রচনার অভিমুখ বিচার বিশ্লেষণ

করা এক দুরূহ কাজ। ‘উনিশ শতকের বাংলা নাটক ও বিধবা প্রসঙ্গ’ গবেষণা কাজ সম্পন্ন করার জন্য উনিশ শতক বিষয়ক পুরনো গ্রন্থরাজি ও পত্র-পত্রিকার সন্ধানে ঘুরে বেড়াতে হয়েছে পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগারগুলিতে। কলকাতা ‘ন্যাশানাল লাইব্রেরি’, ‘বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ’ গ্রন্থাগার, ‘চেতন্য লাইব্রেরি’, ‘কোচবিহার রাজদরবার লাইব্রেরি’, উত্তরপাড়া ‘জয়কৃষ্ণ লাইব্রেরি’, মহাজাতি সদন ‘বিধান লাইব্রেরি’, ‘যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরি’, ‘উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরি’ ব্যবহারকালে যে সমস্ত শিক্ষাবন্ধু কর্মীর সহায়তা পেয়েছি তাঁদেরকে জানাই কৃতজ্ঞতা ও অভিনন্দন।

আমার চিন্তা-চেতনার অনেকখানি অংশ জুড়ে আছেন আমার গুরু মহাশয়দের শিক্ষাচিন্তা। গবেষণা অভিসন্দর্ভ রচনাকালে আমার গুরুমহাশয়দের প্রণয়ণ করা গ্রন্থ ও চিন্তাভাবনার দ্বারা আলোকপ্রাপ্ত হয়েছে। অধ্যাপক মীর রেজাউল করিম, অধ্যাপক অক্ষুশ ভট্ট, অধ্যাপক সুবোধ যশ, অধ্যাপক নিখিলেশ রায়, অধ্যাপক দীপক রায়, অধ্যাপক উৎপল মন্ডল, অধ্যাপক তপন মন্ডল প্রমুখকে এই অবসরে জানাই সশ্রদ্ধ প্রণাম। নানান প্রতিকূলতার মধ্যে—মনোযোগী থেকেছি গবেষণা কর্মের বিষয় নিয়ে। যেকোনো সমস্যায় দিশারীর মত পথ দেখিয়েছেন, আমার শিক্ষয়িত্রী ও আমার তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপক ড. মঞ্জুলা বেরা মহাশয়া। তাঁকে জানাই সশ্রদ্ধ প্রণাম।

আমার বাবা শ্রী কার্তিক চন্দ্র সাহা ও শ্বশুর মহাশয় শ্রী মহিমচন্দ্র সাঁফুই আমার গবেষণা কর্ম দ্রুত সম্পন্ন করার জন্য প্রতিনিয়ত মনোবল যুগিয়েছেন। তাঁদের আমি আশীর্বাদ ধন্য। এই অবসরে তাঁদেরকে জানাই প্রণাম। আমার বন্ধু অধ্যাপিকা শর্মিষ্ঠা পাল আমার গবেষণা কর্ম সম্পাদন কালে খুঁটিনাটি নানান বিষয়ে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। তাঁকে জানাই কৃতজ্ঞতা ও অভিনন্দন। গবেষণা পত্র রচনাকালে আমার দেড় বছরের কন্যাসন্তান আদিত্রী একটুও বিরক্তি উৎপাদন করেনি বরং মাতৃত্বের আদরে আমায় ভরিয়ে দিয়েছে। তাঁকে অনেক আশীর্বাদ।

শিলিগুড়ি

এপ্রিল, ২০১৯

গবেষক

দেবশ্রী সাহা

ভূমিকা

রামমোহন রায়ের প্রচেষ্টায় ১৮২৯ সতীদাহ প্রথা রদ হয়। এর পরেই প্রয়োজন ছিল বিধবার পুনর্বিবাহের। সতী প্রথা চালুর সময়কালে যুবতী বিধবার সমস্যা বড় হয়ে দেখা দেয়নি। কারণ স্বামীর মরণের সঙ্গে সঙ্গে বিধবা নারীকে চিতার যুপকাঠে পুড়িয়ে মারা হত। এই ঘৃণ্য প্রথা যখন রামমোহনের প্রচেষ্টায় বন্ধ হল তখন সমাজে যুবতী হিন্দু বিধবার সংখ্যা দিনদিন বেড়ে গেল। যুবতী বিধবা রমণী যৌবন ক্ষুধার তাড়নায় ও প্রবল দুর্বীর রিপু বাসনা চরিতার্থ করার জন্য বাধ্য হল গোপনে যৌন মিলনে। সমাজে দেখা দিল ভ্রূণ হত্যার একাধিক অব্যাহত ঘটনা। দেখা দিল নাবালিকা বিধবার সম্পত্তি হাতিয়ে নেবার নানান ষড়যন্ত্র। বিধবা কিশোরীকে উপবাস আর অর্ধহার, সাদা থান পরিধান করে যৌবনে যোগিনী হতে বাধ্য করা হল। সমাজে দেখা দিল নানান ক্রাইম। মহামারীর রূপ নিয়ে সমাজে দেখা দিল ভ্রূণ হত্যা, অবৈধ গর্ভপাত, অবৈধ প্রণয়, বেশ্যাবৃত্তি। গ্রামের বঞ্চিত যুবতী বিধবারা জীবন বাঁচানোর তাগিদে নতুন গড়ে ওঠা শহর কলকাতার রাজপথে দেহব্যবসায়িনী পণ্যজীবী হয়ে দাঁড়াতে বাধ্য হয়েছিল। বাধ্য হয়েছিল বাবুদের রক্ষিতা হয়ে জীবন কাটাতে। বিধবা নারীর এই সংকটাপন্ন রূপ সেকালের নাট্যকারেরা তাঁদের সাহিত্যে তুলে ধরলেন মরমী দৃষ্টিকোণ থেকে।

বিধবা সমস্যাকে কেন্দ্র করে রচিত বাংলা সাহিত্য নিয়ে সমকালে ও উত্তরকালে টুকরোভাবে ও ছড়িয়ে-ছিটিয়ে নানান আলোচনা হয়েছে। বস্তুত সে সব গবেষণার মূল প্রবণতা লক্ষ্য করা গেছে প্রবন্ধ সাহিত্য ও কাব্যসাহিত্যকে ঘিরে। বিষয়ের গভীরে প্রবেশ ও বিশেষ একটি সাহিত্যশাখা নির্বাচনের মধ্য দিয়ে আমরা বিধবাদের সংকট-দোলাচলতা ও স্বরূপ উদ্ঘাটনে প্রয়াসী হবার লক্ষ্যে উনিশ শতকের নাট্যসাহিত্যকে নির্বাচন করেছি।

আমাদের গবেষণার কেন্দ্রে রয়েছে ‘উনিশ শতকের বাংলা নাটক ও বিধবা প্রসঙ্গ’। নাটক ও নাট্যকলা এক স্বতন্ত্র মিশ্রশিল্প। নাটক শুধু পড়ার নয়, দেখারও। নাটকের সংলাপে সরাসরি চরিত্ররা তাদের মনের কথা ব্যক্ত করে। নাট্যশিল্পের এই প্রত্যক্ষতার কারণে নাটক অনেক বেশী জনমানসে প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম। উনিশ শতকে ‘বিধবা বিবাহ’ আইন

প্রণয়নের (১৮৫৬) পর-পরই বাংলা ভাষায় বিশেষত সামাজিক নাটকে ও প্রহসনে বিধবা প্রসঙ্গটি উঠে আসে বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে।

উনিশ শতকে বিধবা বিবাহ আন্দোলন সবচেয়ে সমাজ আলোড়নকারী ঘটনা। বিধবা বিবাহ আন্দোলনে বিদ্যাসাগরকে একাধিক বাধার মুখে পড়তে হয়। সমাজপতিদের চক্ষুশাসন উপেক্ষা করে বিদ্যাসাগর ১৮৫৫ সালে ‘বিধবা বিবাহে’র সপক্ষে সওয়াল করে লেখেন- ‘বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব’। এই গ্রন্থ প্রকাশের পর এর বিরুদ্ধাচারণ করে লেখা হয় একাধিক গ্রন্থ— নাটক, প্রবন্ধ ও কবিতার বই। হিন্দুশাস্ত্রের তথাকথিত পণ্ডিতবর্গ তর্কালঙ্কার, ন্যায়রত্ন, কবিরত্ন, তর্কসিদ্ধান্ত প্রমুখ বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহ আন্দোলনকে ব্যঙ্গ করেছেন এবং বিদ্যাসাগরের মতকে খণ্ডন করতে চেয়েছেন। সমকালে বঙ্কিমচন্দ্রের মত পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত মানুষ বিধবার পুনর্বিবাহ বিষয়টি ভালো চোখে দেখেননি। তাঁর ‘বিষবৃক্ষ’, ‘কৃষ্ণকান্তের উইল’, উপন্যাসে বিধবার পুনর্বিবাহের কুফল চিত্রিত করেছেন এবং বিধবা বিবাহের কঠোর সমালোচনা করেছেন।

অর্থে লোভে অনেকে বিধবা বিবাহে সম্মত হয়েছিলেন। অর্থ লাভ করার পর অনেকেই বিধবা নারীর সঙ্গ ত্যাগ করেছিলেন। বিদ্যাসাগর বিধবা বিবাহকারীদের প্রবঞ্চনা দূর করবার হেতু একটি আলাদা চুক্তি পত্র লিখিয়ে নিতেন। যাতে এধরনের প্রবঞ্চনা রোধ করা যায়। ১৮৫৬ সালে ‘বিধবাবিবাহ আইন’ পাশ, ১৮৫৭ ‘সিপাহী বিদ্রোহ’ ১৮৬৭ সালে ‘হিন্দুমেলা’, ১৮৭২ এ ‘সিভিল বিবাহ’ এসব ঘটনা উনিশ শতকের নাটকের কাহিনীবৃত্তে ঘুরে ফিরে এসেছে বিধবার সংকট চিত্রণের অনুষঙ্গে।

মূলত উনিশ শতকের বাংলা নাটকে বিধবার পুনর্বিবাহ পরবর্তী জীবনে দেখা গেছে দু ধরনের চিত্র—দাম্পত্য মিলনের সুখচ্ছবি ও পুনর্বাস সাংসারিক পীড়নে কাশীবাসী হবার উদ্যোগ চিত্র। হিন্দুধর্ম সংস্কারবশত অনেক হিন্দু বিধবা বৈধব্য আচারের মধ্যেই নিজেকে সীমাবদ্ধ রেখেছিলেন। উনিশ শতকের সমকালে অনেক বিধবার পুনর্বিবাহে — সমর্থন ছিল না। এই ধর্মভীরুতা লক্ষ্য গেছে একাধিক বাংলা নাটকের কাহিনীতে।

ভিন্ন বয়সের বিধবার ভিন্ন সমস্যা। ভিন্ন সংকটের টানাপোড়েনে বিপর্যস্ত বিধবা নারীর দুঃখকথাকে প্রকাশ্যে আনলেন নাট্যকারেরা। অভিনীত হল রঙ্গমঞ্চে। প্রকাশ্যে এই সামাজিক সংকটের অভিনয়, সেকালের রক্ষণশীল ব্যক্তিদেরও নমনীয় হতে বাধ্য করেছিল। মূলত বাংলা সামাজিক নাটকে বিধবার সংকট চিহ্নিত হয়েছে তিন ভাবে,—পিত্রালয়ে ও স্বশুরালয়ে বিধবা

নারীর সংকট, পদস্থলিত বিধবা নারীর সংকট, বিধবা নারীর পুনর্বিবাহ জনিত সংকট রূপে।

বিধবা সমস্যা কেন্দ্রিক উনিশ শতকের সামাজিক নাটকে পুনর্বিবাহ পরবর্তী জীবনাচারের চিত্র সেভাবে উপস্থাপিত হয়নি। কারণ নাট্যকারদের প্রধান বলবার বিষয় ছিল, বিধবা বিবাহের প্রাসঙ্গিকতা সমাজে কতটা জরুরী বা জরুরী নয়। বিধবার বিয়ে দিয়ে, নতুন করে সংকট কিংবা বিধবার জীবনের সচ্ছলতা দেখানো নাট্যকারদের প্রাথমিক উদ্দেশ্য ছিল না। বিধবা বিবাহ সমর্থন ও বিরোধিতা প্রধান আলোচ্য বিষয় হিসাবে নাটকে এসেছে। সেইসঙ্গে উঠে এসেছে সমকালীন যুগ পরিবেশে বিধবাদের অসহায়তা, লাঞ্ছনা, পতিতা বৃত্তি গ্রহণ, গৃহত্যাগ, গর্ভপাত ঘটানো তথা ভ্রূণ হত্যা, ধর্মান্তর প্রভৃতি বিষয় ও কাশীবাসের উদ্যোগ চিত্র।

প্রসঙ্গত ১৮৫৬ হতে ১৯০০ এই দীর্ঘ সময়কালে রচিত বাংলা নাটকে কিভাবে বিধবা চরিত্র চিত্রিত হয়েছে, তাদের সংকট সমস্যা কিভাবে সমাজকে দোলায়িত করেছে সেই অভিসন্দর্ভ রচনাই আমাদের উদ্দেশ্য। এক শতাব্দীকাল দূরে দাঁড়িয়ে উনিশ শতকের প্রায় চল্লিশটির অধিক দুঃপ্রাপ্য নাটক আলোচনার মধ্য দিয়ে এবং নাটক অভিনয় সম্পর্কে তৎকালীন দর্শকের প্রতিক্রিয়ার রূপ তুলে ধরে আমরা উনিশ শতকের যুগগত প্রেক্ষাপটে বিধবা চরিত্রদের মানসলোক অনুসন্ধান করে বিধবাদের সমস্যা ও সংকট চিত্রকে আমার গবেষণা অভিসন্দর্ভে রূপদান করেছি।

— — —

প্রথম অধ্যায়

উনিশ শতকের সমাজ জীবন, বিধবার সমস্যা ও বিধবা আন্দোলন প্রসঙ্গ

ভারতবর্ষে উনিশ শতক হল নবজাগরণের যুগ। ইংরেজ জাতির সংস্পর্শে ও তাদের সাহিত্য-বিজ্ঞানের সংস্পর্শে নির্মিত হয় ভারতবাসীর নতুন চিন্তা চেতনার জগৎ। নতুন যুগে দাঁড়িয়ে রামমোহন রায় (১৭৭৪-১৮৩৩), দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৭-১৯০৫), ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১), মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-১৮৭৩), রাজনারায়ণ বসু (১৮২৬- ১৮৯৯), অক্ষয়কুমার দত্ত (১৮২০-১৮৬৬), ভূদেব মুখোপাধ্যায় (১৮২৭-১৮৯৪), কালীপ্রসন্ন সিংহ (১৮৩১- ১৯০৮), কেশবচন্দ্র সেন (১৮৩৮- ১৮৮৪), বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮- ১৮৯৪), যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর (১৮৪০-১৮৭০) প্রমুখ মনীষীর প্রচেষ্টায় শুরু হয় ধর্ম, সাহিত্য ও সমাজ বদলের পটচিত্র। রামমোহন রায়ের ‘আত্মীয়সভা’, ডিরোজিও’র ছাত্রবৃন্দের (ইয়ংবেঙ্গল গোষ্ঠীর) প্রগতিশীলতা, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের তত্ত্ববোধিনী সভা, ব্রাহ্মসমাজ প্রভৃতি গোষ্ঠীর শ্রেণীবদ্ধ ক্রিয়াকলাপ বঙ্গসমাজের সর্বস্তরে আলোড়ন তোলে।

আধুনিকতার প্রধান শর্তই হল—পুরোনো অমানবিক বিষয়কে প্রত্যাখ্যান। এবং ক্রমে ধীরে ধীরে তর্ক-বিতর্ক আলোচনার মধ্য দিয়ে নতুনকে বরণ করে নেওয়া। সংঘাত বাঁধে পুরোনোপন্থী ও নতুনপন্থীদের সংঘাত, তর্ক-বিতর্ক। সমাজস্তরে চলতে থাকে পালাবদলের মহড়া। ক্রমে আধুনিকতার জয় হয়, পুরোনো চিন্তা ভাবনা পরিত্যক্ত হয়। এভাবেই সমাজের নিরন্তর ভাঙা-গড়া চলে। উনিশ শতকের সামাজিক আন্দোলন গুলির ক্ষেত্রে এমনটাই ঘটেছিল। একদল রক্ষণশীল মানুষ যেমন আধুনিকতাকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, তেমনি একদল প্রগতিশীল মানুষ নতুন যুগকে সাদরে বরণ করে নিয়েছিলেন।

উনিশ শতকের প্রথম পর্বে সবচেয়ে বড় সমাজ আন্দোলন ‘সতীদাহ প্রথা নিবারণ’। এই আন্দোলনকে নেতৃত্ব দেন রাজা রামমোহন রায়। ১৮১৫ সালে রামমোহন রায় কলকাতায়

আসেন। রামমোহন কলকাতায় আসার পর বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতিতে সূচিত হয় পালাবদল। বহুদিন ধরে চলে আসা হিন্দুদের ‘সতীদাহ প্রথা’ তথা ‘সহমরণ প্রথা’র ভিত্তিমূলে তিনি আঘাত হানেন। রামমোহন রায় অনুভব করেন, হিন্দুর সতীদাহ প্রথা আসলে—‘জ্ঞানপূর্বক স্ত্রী হত্যা।’ রামমোহন প্রায় একক ভাবে ‘সতীদাহ প্রথা’ বন্ধের জন্য শুরু করেন লেখালিখি ও আইনী তৎপরতা। মানুষ পুড়িয়ে মারার ঘৃণ্য প্রথাকে ইংরেজ শাসকেরা কোনোকালেই ভালো চোখে দেখেননি। ধর্মীয় ব্যাপার বলেই ও সামাজিক অসন্তোষের কথা ভেবে ইংরেজ সরকার এই ঘৃণ্যপ্রথা সম্পর্কে তীব্র বিরাগ থাকলেও নীরব ছিল। কিন্তু রামমোহনের আইনী আবেদনে সাড়া দিয়ে ইংরেজ সরকার ‘সহমরণ প্রথা’র কুফল বিবেচনা করে ১৮২৯ সালে আইন করে ‘সতীদাহ প্রথা’ বন্ধ করে দেন। শুধু হয় আধুনিকতার নতুন যুগ।

উনিশ শতকে বাংলা সমাজে চলে আসা, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ ও কৌলিন্য প্রথার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হিসাবে দেখা দেয় অকাল বৈধব্যের যন্ত্রণা। হিন্দু সমাজে একটি প্রবাদ চালু আছে,—‘পতিই নারীর গতি।’ ভারতীয় সমাজব্যবস্থায় পতির মৃত্যুর পর নারী ‘বিধবা’ বলে পরিচিত হয়। ‘বিধবা’ নারীর ব্রহ্মচর্য জীবন যাপনই হল শাস্ত্রীয় বিধান। স্বামীর মৃত্যুর পর রাতারাতি একটি সধবা নারী বিধবাতে পরিণত হয়। রঙিন কাপড় পরা, সিঁদুর পরা, গন্ধদ্রব্য ব্যবহার, পান খাওয়া, চুলের যত্ন নেওয়া, অলঙ্কার পরা, কোমল বিছানায় শোওয়া, দুবেলা অন্ন নেওয়া, এমনকি, প্রিয়জনের শুভ উৎসব অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়া—এসবই তার জীবন থেকে অপসৃত হয়। নব্য বিধবার জীবনই শুরু হয় নিরামিষ একাহার, গঙ্গাজল পান, আভরণহীন সাদা থান, ও উপোষকে সঙ্গী করে। পূজো-অর্চনা, ব্রতকথা, ভাগবত পাঠ শ্রবণ আর কৃচ্ছসাধনের মধ্য দিয়ে জীবনকে অতিবাহিত করতে হয়। বিসর্জন দিতে হয় মনের সব কামনা বাসনা। বস্তুত হিন্দুসমাজ বিধবার কামনা-বাসনা যৌনাকাঙ্ক্ষাকে শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধের দোহাই দিয়ে অবদমনের মধ্য দিয়ে অস্বীকার করতে চেয়েছে।

রামমোহন রায়ের প্রচেষ্টায় ১৮২৯ সালে বিধবা নারীর সহমরণ যাত্রা তথা ‘সতীদাহপ্রথা’ বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর কার্যকারণ সূত্রে অবশম্ভাবী হয়ে পড়ে হিন্দু বিধবার পুনর্বিবাহের প্রসঙ্গটি। ‘সতীপ্রথা’ রদ হবার কয়েক বছরের মধ্যেই সমাজে দ্রুত সংখ্যায় বেড়ে যায় বাল বিধবার সংখ্যা। কুলীন ব্রাহ্মণের একাধিক বিধবা স্ত্রীর ‘সহমরণ’ না হওয়ার কারণে সমাজে নতুন বিপত্তি দেখা দিল। অল্পবয়স্কা কিংবা নাবালিকা বিধবার উত্তরাধিকার নিয়ে দেখা দেয় নানা সংকট। অসহায় বিধবাদের না ঠাঁই হয় শ্বশুর বাড়িতে, না ঠাঁই হয় বাপের বাড়িতে। ফলত তাঁদের ব্যক্তিজীবন

হয়ে ওঠে নিরুপায় ও আশ্রয়হীন। এই বিধবাদের একটা বড় অংশ সমাজ কলঙ্কে জড়িয়ে পড়ে। কেউ কেউ জীবন বাঁচানোর তাগিদে কলকাতার নব্যবাবুদের বাগানবাড়িতে রক্ষিতা হয়ে যায়। কেউ কেউ আশ্রয়হীন হয়ে, হুগলী তীরে গড়ে ওঠা নতুন নগর কলকাতার কালীঘাট সংলগ্ন পতিতালয়ে আশ্রয় নিতে বাধ্য হলেন। সমাজে ঘটতে থাকে অবৈধ গর্ভপাতের ঘটনা। নবীন বিধবাদের পরিচয় হয় ‘রাঁড়’। এভাবেই ১৮২৯ পরবর্তী কলকাতার তিন দশক সমাজে নানান গোলযোগ ও সংকট তৈরি হয়। ফলে প্রগতিশীল সমাজ হিতৈষিরা ভাবতে শুরু করেন এই সংকট হতে পরিত্রাণের উপায় কী।

বিদ্যাসাগরের বিধবা আন্দোলনের পূর্বে বিধবাবিবাহের একটা প্রাক্ ইতিহাস আছে। বিধবার পুনর্বিবাহের বিষয়টি শুধুমাত্র বিদ্যাসাগর ভেবেছিলেন তা নয়। বিদ্যাসাগরের বহুপূর্বে এদেশের বিদ্যাজ্ঞান এ নিয়ে সরব হয়েছিলেন। উপযুক্ত যুক্তি প্রমাণ, সমাজ প্রতিবেশ-প্রতিকূলতা বিধবা বিবাহের পক্ষে অন্তরায় হয়ে উঠেছিল। ‘বিধবা বিবাহ’-এ আইন পাশ হওয়ার পিছনে ছিল বহুদিনের এবং বহুজনের বিচ্ছিন্ন ও সংঘবদ্ধ সংগ্রাম। বিদ্যাসাগরের নেতৃত্বই শেষ পর্যন্ত জয়ী হয়।

১৮৫৬ সালে বিদ্যাসাগরের প্রচেষ্টায় ‘বিধবা বিবাহ’ আইন চালু হবার পূর্বে, বাংলায় বিধবা বিবাহের উদ্যোগ বা প্রচেষ্টা দেখা যায়। রাজা রাজবল্লভ (১৬৯৮-১৭৬৩) তাঁর তরুণ বিধবা কন্যার শাস্ত্রীয় মতে বিধবাবিবাহ দেবার চেষ্টা করেছিলেন। এ চেষ্টা সফল হয়নি। কৃষ্ণনগরের রাজা শ্রীশচন্দ্র উপটোকন ও পুরস্কারের লোভ দেখিয়ে নবদ্বীপের কিছু পণ্ডিতের কাছ থেকে বিধবা বিবাহের শাস্ত্রীয় বিধান চেয়েছিলেন এবং বিধবা বিবাহের শাস্ত্রীয় সমর্থন পাওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। সেখানেও কোন সুরাহা হয়নি। সমকালীন সমাজ মানসিকতা ও লোকভয় সম্পর্কে কার্তিকেয়চন্দ্র লিখেছেন,—“মনু, স্মৃতি, ভগবদগীতা, উপনিষদ, ইত্যাদি গ্রন্থ পাঠে [রাজা শ্রীশচন্দ্র] প্রবৃত্ত হন, তদনন্তর, নবদ্বীপ ও ভাটপাড়া প্রভৃতি নানা স্থানের বৈদান্তিক, নৈয়ায়িক ও স্মার্ত পণ্ডিতগণের সহিত বেদবিহিত বিষয়ের বিচার করেন। বুদ্ধিমান ও বিদ্বান পণ্ডিত গণের মধ্যে যাঁহারা সরলচিত্ত, তাঁহারা মহারাজের অভিপ্রায় শাস্ত্র-সম্মত ও সর্ব-জন-হিত বলিয়া স্বীকার করিলেন, কিন্তু দেশাচার ভয়ে, জন সমাজে আপনাদের মত প্রকাশ করিতে বা তদনুযায়ী ব্যবস্থা দিতে, সাহস করিতে পারিলেন না। তাঁহাদের প্রধান ভয় এই হইল যে, তাঁহারা এই মত ব্যক্ত করিলে, সাধারণে, তাঁহাদিগকে নাস্তিক বলিয়া, তাঁহাদের নিমন্ত্ৰণ রহিত করিবেন।” ১৮৫৬ সালে বিদ্যাসাগরের প্রচেষ্টায় চালু হওয়া ‘বিধবাবিবাহ আইন প্রণয়ন’ এর

প্রায় একশ বছর আগে এ ঘটনা ঘটেছিল।

১৮১৫ সালে রামমোহন রায় প্রতিষ্ঠা করেন ‘আত্মীয় সভা’। এই আত্মীয় সভায় ১৮১৯ সালের একটি বৈঠকে বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ ও বাল্যবৈধব্যের সমস্যামুক্তির কথা আলোচিত হয়েছিল। হিন্দুর বালবিধবার পক্ষে যে ব্রহ্মচর্য পালন কতটা কষ্টের ও অসহনীয় তা এই আত্মীয় সভার বৈঠকে আলোচিত হয়। ১৮৩৭ সালে হিন্দু বিধবার পুনর্বিবাহ নিয়ে একটি সভা করবার কথা ভেবেছিলেন সেকালের বিদ্যৎসমাজ। উদ্যোক্তা ছিলেন ‘কতিপয় ধনি লোক’।^৯ কিন্তু রক্ষণশীল হিন্দুনেতাদের ভয়ে শেষ পর্যন্ত তা সফল হয়নি। উদ্যোক্তাদের মধ্যে মতিলাল শীল ও হলধর মল্লিক ছিলেন প্রধান। ১৮৩৭ সালে গঠিত হয় ‘ইণ্ডিয়ান ল কমিশন’। গ্র্যান্ট সাহেব ছিলেন এর সেক্রেটারী। এই কমিশন বুঝেছিল, বঙ্গদেশে বিধবা বিবাহ প্রচলিত না থাকার কারণে সমাজে দারুণ রকম ব্যভিচার বেড়ে গেছে ; ফলে সমাজে শিশু হত্যা ও গর্ভপাতের ঘটনা বেড়ে চলেছে। এই ‘ল কমিশনের চেষ্টা’য় বিধবাদের পুনর্বিবাহ ব্যবস্থার উদ্যোগ নেওয়া হয়। কলকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ, এলাহাবাদ প্রভৃতি রাজ্যের হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতিরা বিধবা বিবাহ আইন প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তাকে অনুভব করেন। যদিও, প্রশাসনিক বিশৃঙ্খলা হবার আশঙ্কায় কমিশন অগ্রসর হননি প্রথম দিকে। সমাজে যখন বিধবা বিবাহ আন্দোলনের তরঙ্গ উঠল তখন তাঁরা বিষয়টি নিয়ে বিবেচনা শুরু করে দেন।

১৮১৭ সালে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। বঙ্গদেশে বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহ আন্দোলনের পূর্বে, সোচ্চারভাবে ও সংগঠিত ভাবে আন্দোলন করেছিল ইয়ংবেঙ্গল গোষ্ঠী। ১৮২৮-১৮২৯ — এই সময়কালে ইয়ংবেঙ্গল গোষ্ঠীর সংগঠন ‘অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন’ এর নানা সভায় ‘বিধবা বিবাহ’ এই সামাজিক সমস্যা নিয়ে আলোচিত হয়। ‘ইয়ংবেঙ্গল গোষ্ঠী’র মধ্যে ছিলেন—রামগোপাল ঘোষ, তারাচাঁদ চক্রবর্তী, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, প্যারীচাঁদ মিত্র, রাখানাথ শিকদার প্রমুখ। ডিরোজিও’র শিষ্যবর্গ চেয়েছিলেন সংস্কারে আচ্ছন্ন হিন্দু সমাজকে আমূল বদলে দিতে। ফলে তাঁদের কাছে খুব জরুরী বলে মনে হয়েছিল বিধবা বিবাহের প্রসঙ্গটি। ‘জ্ঞানান্বেষণ’, ‘বেঙ্গল স্পেক্টেটর’ প্রভৃতি পত্রিকায় প্রাক্ বিদ্যাসাগর যুগের বিধবা বিবাহ আন্দোলনের অনেক সংবাদ পাওয়া যায়। ইয়ংবেঙ্গল গোষ্ঠীর মুখপত্র ‘বেঙ্গল স্পেক্টেটর’ পত্রিকায় ১৮৪২ সালে জনৈক ব্যক্তি একটি পত্রে লেখেন,—“যে সকল বিষয়ের সাধারণে সর্বদা আন্দোলন হয় তন্মধ্যে হিন্দু জাতীয় বিধবার পুনর্বিবাহেরও বাদানুবাদ হইয়া থাকে বোধ হয় যে উক্ত বিবাহের প্রতিবন্ধক যে সকল শাস্ত্র আছে তাহা অত্যন্ত যুক্তিবিরুদ্ধ, কারণ পুরুষ যদি স্ত্রীর মরণান্তর পুনর্বিবাহ

করিতে পারে তবে স্ত্রী কেন স্বীয় স্বামীর পরলোক হইলে বিবাহ করণে সক্ষম না হয়...।”^{৩০}

উনিশ শতকের তিনের দশকে ‘জ্ঞানান্বেষণ’ ও ‘সমাচার দর্পণ’ পত্রিকায় বিধবা বিবাহ নিয়ে আলাপ আলোচনা প্রকাশিত হতে থাকে। পরবর্তী দশকে ঈশ্বরগুপ্ত সম্পাদিত ‘সংবাদ প্রভাকর’, ‘বেঙ্গল স্পেক্টেটর’ প্রভৃতি পত্রিকায় বিধবা বিয়ে বাগবিতণ্ডা চরমে পৌঁছয়। ১৮৪৫ সালে ‘ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান সোসাইটি’ বিধবা নারীর পুনর্বিবাহ বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করে। বিভিন্ন সংগঠনের তরফে সরকারের কাছে বিধবা বিবাহের জন্য আবেদন জানানো হয়। ১৯৪৫ সালে বিধবাবিবাহের ঘোরতর বিরোধিতা করে গোবিন্দচন্দ্র শর্মা নামে এক ব্যক্তি ‘বিধবা বিবাহ নিষেধ বিষয়কব্যবস্থা’ নামে তিরিশ পৃষ্ঠার এক পুস্তিকা রচনা ও প্রকাশ করেন। বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহ আন্দোলনের পূর্বে বঙ্গদেশে বোধহয় প্রথম এই গ্রন্থটিই বোধ হয় বিধবা বিবাহের বিরোধিতা মূলক প্রথম গ্রন্থ। ‘বিধবা বিবাহ নিষেধ বিষয়কব্যবস্থা’ গ্রন্থের ভূমিকায় লেখা হয়, —“বিধবার পুনর্ব্বার বিবাহ হইবার শাস্ত্র প্রচার করিয়া কোনো পাণ্ডিত্যভিমानी এক ব্যবস্থা পত্র প্রস্তুত করত ব্রিটিশ ইন্ডিয়া সোসাইটি নামক সমাজে প্রেরণ করিয়াছিলেন অভিপ্রায় তদ্বারা তাহা গবর্ণমেন্টে প্রদত্ত হয় কিন্তু ঐ সমাজের সম্পাদক শ্রীযুত উলিয়ম থিওবোল্ড সাহেব ঐ ব্যবস্থার যাথার্থ্যাযাথার্থ্য নিশ্চয় করণার্থ স্বীয়াভিপ্রায়ক লিপি সম্বলিত ঐ ব্যবস্থা পত্র ধর্মসভায় প্রেরণ করেন অনন্তর ধর্মসভাধ্যক্ষ পণ্ডিতগণ কর্তৃক তদুত্তর ব্যবস্থাপত্র প্রস্তুত হইয়া উক্ত সম্পাদকের নিকট পাঠান গিয়াছে তাহার মর্ম্মার্থ সর্ব্বসাধারণ গোচরার্থ তদবিকল সংস্কৃত এবং তদীয় ভাবার্থ সমাজের অনুজ্ঞানুসারে প্রকাশ করা গেল যদ্যপিও বিশিষ্ট শিষ্ট ধর্ম্মিষ্ঠগণের বিলক্ষণ বিজ্ঞান আছে যে বিধবার পুনর্ব্বার বিবাহ হইবার শাস্ত্র নাই তথাপি অজ্ঞ অনভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের পূর্ব্বোক্ত বিরুদ্ধ ব্যবস্থাভাসে মনশ্চঞ্চল্য না জন্মে তজ্জন্য এই প্রাড়ম্বর সুতরাং করিতে হইল ইতি—।”^{৩১}

বস্তুত এ গ্রন্থের ভূমিকায় উঠে এসেছে ‘ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন’ এর ও ‘ধর্মসভা’র বিধবা বিবাহ আলোচনা প্রসঙ্গ। তদুপরি ইংরেজ সরকারের সহায়তায় বিধবা বিবাহ আইনে পরিণত হওয়ার আশঙ্কাও জেগেছে প্রাবন্ধিকের মনে। এভাবেই চলেছে বিধবা বিবাহের পক্ষে ও বিপক্ষের সওয়াল-জবাব পর্ব।

বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহ আন্দোলনের দশ বছর আগে কলকাতার বহুবাজার অঞ্চলের বাসিন্দা নীলকমল বন্দ্যোপাধ্যায় কয়েকজন অবস্থাপন্ন লোককে সঙ্গে নিয়ে দলবদ্ধ হয়ে একটি বিধবা বিবাহ দেবার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু সমাজ অনুশাসনের কাছে তাদেরও হার মানতে হয়। এ প্রসঙ্গে বিদ্যাসাগরের ভ্রাতা শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন তাঁর ‘বিদ্যাসাগর জীবনচরিত’ গ্রন্থে

লিখেছেন—“অগ্রজের উক্ত প্রস্তাবের দশ বৎসর পূর্বে বহুবাজার নিবাসী বাবু নীলকমল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় স্বীয় ভবনে কতকগুলি আত্মীয় লোককে ঐক্য করিয়া বিধবাবিবাহ দিব্য ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। এরূপ অপরাপর দেশে অনেকেই বালবিধবা দেখিয়া দুঃখানুভব করিয়া বিধবা বিবাহ দিতে সম্মত ছিলেন। কিন্তু সমাজের ভয়ে অগ্রে প্রবৃত্ত হইতে কাহারও সাহস হয় নাই।...অগ্রজ মহাশয়ের বিধবা বিবাহের পুস্তক মুদ্রিত হইবার কিছুদিন পূর্বে কলিকাতার অন্তঃপাতি পটলডাঙ্গানিবাসী বাবু শ্যামাচরণ দাস কস্মিকার, স্বীয় দুহিতার বৈধব্য দর্শনে দুঃখিত হইয়া মনে মনে সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, যদি ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা ব্যবস্থা দেন পুনর্ব্বার কন্যার বিবাহ দিব। তদনুসারে তিনি সচেষ্টিত হইয়া বিধবাবিবাহের শাস্ত্রীয়তা প্রতিপাদক এক ব্যবস্থা পত্র সংগ্রহ করেন। উহাতে ঐকশীনাথ তর্কালঙ্কার, ভবশঙ্কর বিদ্যারত্ন, রামতনু তর্কসিদ্ধান্ত, ঠাকুরদাস চূড়ামণি, হরিনারায়ণ তর্কসিদ্ধান্ত, মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ প্রভৃতি কতকগুলি ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের স্বাক্ষর আছে। ইহাঁরাই এতদ্দেশের স্মার্ত ছিলেন। ইহাঁরা সকলেই ঐ ব্যবস্থায় স্ব স্ব নাম স্বাক্ষর করিয়াছিলেন, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই, কিছু দিন পরে তাঁহারই আবার বিধবাবিবাহের বিষয় বিদ্রোহী হইয়া উঠেন।”^৬ রামমোহন রায় ঠিক যে জায়গায় তাঁর ‘সতীদাহ’ নিরারণ আন্দোলন শেষ করেছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ঠিক সেই জায়গা হতে সমাজ গঠনের নতুন আন্দোলন শুরু করলেন।

পরাধীন ভারতবর্ষের আচার সর্বস্ব সমাজ প্রতিবেশে দাঁড়িয়ে আবেগমাখা সমবেদনা, করুণা, পরদুঃখকাতরতায় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ‘বিধবার পুনর্বিবাহে’র^৭ প্রসঙ্গটিকে মানবিক দৃষ্টিতে দেখলেন, বিচার বিশ্লেষণ করলেন এবং বিধবা সমস্যা সংকট মোচনে কলম ধরলেন। ভারতীয় হিন্দু সমাজে নিম্নবর্ণের লোকেদের মধ্যে বিধবার পুনর্বিবাহ চালু ছিল। বিদ্যাসাগর উচ্চবর্ণের বিধবাদের পুনর্বিবাহের জন্য সচেষ্টিত হলেন। ‘বিধবা বিবাহে’র পক্ষে সওয়াল করে বিদ্যাসাগর ১৭৭৬ (১৮৫৪) শকাব্দের ফাল্গুন মাসে ‘তত্ত্ববোধিনী’ পত্রিকায় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ‘বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব’ এই শিরোনামে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এর এক বছর পর ১৮৫৫ সালের জানুয়ারি মাসে ‘বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব’ এই শিরোনামে তাঁর প্রবন্ধ গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। সমালোচক বিনয় ঘোষ জানিয়েছেন,—‘এই বছর অক্টোবর মাসে তিনি বিধবাবিবাহ বিধিবদ্ধ করার জন্য ভারত সরকারের কাছে আবেদনপত্র পাঠান।’^৮ ‘বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব’ (১ম খণ্ড) এই গ্রন্থে বিদ্যাসাগর ‘পরশর সংহিতা’ থেকে উদাহরণ দিয়ে দেখালেন

‘বিধবা বিবাহে’র শাস্ত্রসম্মত যৌক্তিকতা। ‘পরশর সংহিতা’র শ্লোক তুলে বিদ্যাসাগর লিখলেন,
— “নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ।

পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং পতিরন্য বিধীয়তে।”^{১৮}

অর্থাৎ হল,—স্বামী যদি দীর্ঘদিন নিরুদ্দেশ হন, মারা যান, প্রব্রজ্য অবলম্বন করেন, ক্লীব, অথর্ব বা পতিত হয়,—তাহলে এই পাঁচপ্রকার আপদকালীন পরিস্থিতিতে নারী পুনর্ব্বার বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারেন, সেখানে কোনো শাস্ত্রীয় বাধা নেই।

বিদ্যাসাগরের ‘বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয় প্রস্তাব’ গ্রন্থের জনপ্রিয়তা ও আন্দোলনের উদ্দীপনা সম্পর্কে রাজনারায়ণ বসু লিখেছেন,—“১৮৫৬ সালে বিধবা-বিবাহের আন্দোলন উঠে। শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় “বিধবাবিবাহ উচিত কিনা” একটি ক্ষুদ্র চর্চা [পুস্তিকা] প্রকাশ করাতে এই আন্দোলনের উৎপত্তি হয়। হিন্দুসমাজরূপ বিস্তীর্ণ হৃদ স্থির ছিল; এ চর্চা [পুস্তিকা] বাহির হওয়াতে মহাবাত্যান্দোলিত সমুদ্রের ন্যায় অত্যন্ত অস্থির হইয়া উঠে ও ভয়ানক তরঙ্গ উঠাইতে থাকে। যাঁহারা এই আন্দোলন স্বচক্ষে দেখিয়াছেন তাঁহরাই উহার প্রকৃতি বুঝিতে পারিবেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এই বিষয়ক দ্বিতীয় প্রস্তাব প্রকাশিত হওয়াতে আন্দোলন আরও চতুর্গুণ বৃদ্ধি হইল। বিশেষতঃ ঐ পুস্তকের বাগদান অধ্যায় লইয়া বিশেষ আন্দোলন হয়। যেরূপে বিদ্যাসাগর মহাশয় আপনার পুস্তকে এ বিষয়ের মীমাংসা করিয়াছেন তাহা অতীব সন্তোষজনক।”^{১৯} হিন্দু নারীর পুনর্ব্বিবাহ নিয়ে সমাজ তোলপাড় হয়ে উঠল বিদ্যাসাগরের এই বক্তব্যে। বিদ্যাসাগরের প্রথম পুস্তক প্রকাশিত হবার পর একাধিক পণ্ডিত বিদ্যাসাগরের বিরোধিতায় অবতীর্ণ হন। বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহ আন্দোলনের প্রবল বিরুদ্ধে ছিলেন^{২০},—ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন, ভবশঙ্কর বিদ্যারত্ন, কাশীনাথ তর্কালঙ্কার, রামতনু তর্কসিদ্ধান্ত, গঙ্গাধর কবিরাজ, মহেশচন্দ্র চূড়ামণি, দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন, জানকীজীবন ন্যায়রত্ন, শ্রীরাম তর্কালঙ্কার, ঈশানচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ, গোবিন্দকান্ত বিদ্যাভূষণ, জগদীশ্বর বিদ্যারত্ন, রামদাস তর্কসিদ্ধান্ত, প্রসন্নকুমার মুখোপাধ্যায়, নন্দকুমার কবিরত্ন, আনন্দচন্দ্র শিরোমণি, হারাধন কবিরাজ, রামদয়াল তর্করত্ন ও রামধন বিদ্যাবাগীশ প্রমুখ। এদের আক্রমণে শাস্ত্রীয় যুক্তি অপেক্ষা কটুক্তি ব্যঙ্গ ও উপহাস ধ্বনিত হয়েছে।

বিধবা বিবাহের বিরোধিতা করে ওঠে নানা বিপরীতমুখী প্রশ্ন। বিধবা বিবাহের যাঁরা বিপক্ষে ছিলেন তাঁদের প্রধান বক্তব্যগুলি এই রকম^{২১},—

ক) আমাদের সমাজব্যবস্থায় বিধবাবিবাহ আইন খাপ খায় না। যা ইংরেজদের

সমাজব্যবস্থায় সম্প্রতপূর্ণ তা আমাদের সমাজব্যবস্থায় নয়।

খ) বিধবা বিবাহ শাস্ত্রবিরুদ্ধ, আচার বিরুদ্ধ। যজুবেদ, মনু, মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থে কোথাও বিধবা বিবাহের সমর্থন নেই।

গ) বিধবা বিবাহ আইন হলে হিন্দু পরিবারের উত্তরাধিকার হবার যে শাস্ত্রীয় নিয়ম প্রচলিত আছে তাতে গোলযোগ তৈরি হবে। তাছাড়া বিধবার বিবাহ হলে তার গর্ভজাত পুত্র এদেশের শাস্ত্র অনুযায়ী জারজ বা বেশ্যাপুত্র রূপে গণ্য হবে।

ঘ) বিধবা বিবাহ বিষয়ক আইন করে বিধবার গর্ভজাত পুত্রকে উত্তরাধিকার হিসাবে গণ্য করলে এদেশে অনেকের বংশলোপের সম্ভাবনা আছে। কারণ এদেশে অপুত্রক ব্যক্তি দণ্ডক নিয়ে বংশ রক্ষা করে থাকে। ফলে বংশলোপের সম্ভাবনা প্রবল আকারে দেখা দেবে।

ঙ) বিধবা বিবাহের আইন হলে, অনেক স্ত্রীর স্বধর্মে মতি স্বত্বেও অর্থলোভী ষড়যন্ত্র করতে পারে।

চ) বিধবা বিবাহ আইন প্রণয়ন সমাজ হিত নয় বরং সমাজ অহিতের আইন। আইন পাশ করে জনসমাজের ধ্যান-ধারণা, আচার ব্যবহার ও মতামত পরিবর্তন করা যায় না, বরং জোর করে তা করতে গেলে তার ফল বিপরীত হয়। বস্তুত, বিরুদ্ধবাদীরা বোঝাতে চাইলেন, বিধবা পুনর্বিবাহ মানে, ইহ জীবনে হয় প্রতিপন্ন হওয়া, এবং পরজীবনে (মরজীবনে) স্বর্গবাস থেকে বঞ্চিত হওয়া। বিধবার পুনর্বিবাহ হলে যে শুধু শাস্ত্রীয় অনুশাসন লঙ্ঘন করা হবে তাই নয়, যে পরিবারের বিধবারা তা করবে তারা সমাজের চোখে হয় প্রতিপন্ন হতে হবে।

১৮৫৬ সালে প্রকাশিত হয়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ‘বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক দ্বিতীয় প্রস্তাব’। প্রথম গ্রন্থে ছিল শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা। দ্বিতীয় গ্রন্থে বিদ্যাসাগর শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা অপেক্ষা মানবিক ভাবে জনসাধারণের কাছে আবেদন করলেন, বিধবা বিবাহে এগিয়ে আসার জন্য। দ্বিতীয় গ্রন্থে, সমাজে বিধবা বিবাহ নিয়ে যে প্রশ্ন উঠেছে তার সদুত্তর দেবার চেষ্টা করলেন। দেশের সাধারণ মানুষ শাস্ত্রজ্ঞ নন, তাই তাদের পক্ষে শাস্ত্রীয় তত্ত্বকথা অনুধাবন করা সহজ নয়। তাই তিনি শাস্ত্রীয় তত্ত্বের সহজ ব্যাখ্যা করলেন এবং মানবিক আবেদন করলেন। বিধবাবিবাহ বিষয়ক দ্বিতীয় গ্রন্থ প্রকাশের পর বিদ্যাসাগরের বিরুদ্ধাচরণ, করে লেখালিখির স্রোত কিছুটা কম হয়ে যায়। ‘বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক দ্বিতীয় প্রস্তাব’ গ্রন্থের শেষ অংশে বিদ্যাসাগর দেশবাসীর কাছে মানবিক ভাবে আবেদন করে লিখলেন,—“হা ভারতবর্ষীয় মানবগণ! আর কতকাল তোমরা, মোহনিদ্রায় অভিভূত হইয়া প্রমাদশয্যায় শয়ন

করিয়া থাকিবে! একবার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখ, তোমাদের পুণ্যভূমি ভারতবর্ষ ব্যাভিচার দোষের ও ভ্রংশহত্যা পাপের স্রোতে উচ্ছলিত হইয়া যাইতেছে।...; তোমরা মনে কর, পতিবিয়োগ হইলেই, স্ত্রীজাতির শরীর পাষণ্ডময় হইয়া যায়; দুঃখ আর দুঃখ বলিয়া বোধ হয় না; যন্ত্রণা আর যন্ত্রণা বলিয়া বোধ হয় না; দুর্জয় রিপুবর্গ এক কালে নিস্মূল হইয়া যায়। কিন্তু, তোমাদের এই সিদ্ধান্ত যে নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক, পদে পদে তাহার উদাহরণ প্রাপ্ত হইতেছে। ভাবিয়া দেখ, এই অনবধানদোষে, সংসারতরুর কি বিষময় ফল ভোগ করিতেছ। হয় কি পরিতাপের বিষয়, যে দেশের পুরুষজাতির দয়া নাই, ধর্ম, ন্যায় অন্যায বিচার নাই, হিতাহিত বোধ নাই, সদ-সদ্বিবেচনা নাই, কেবল লৌকিকরক্ষাই প্রধান কর্ম ও পরম ধর্ম; আর যেন সে দেশে হতভাগা অবলাজাতি জন্ম গ্রহণ না করে।

হা অবলাগণ! তোমরা কি পাপে, ভারতবর্ষে আসিয়া, জন্ম গ্রহণ কর, বলিতে পারি না!^{১২}

১৮৬৪ সালে বিদ্যাসাগরের দুটি প্রবন্ধ ‘বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা’ এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব, ১ম খণ্ড ও দ্বিতীয় খণ্ড ইংরেজিতে অনূদিত হয় প্রকাশিত হয় গ্রন্থাকারে ‘Marriage of Hindu widows’ নামে। এ গ্রন্থ প্রকাশে আনন্দমোহন বসু সহায়ক ভূমিকা নিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে সাহেবরাও এর মর্ম উপলব্ধি করতে সক্ষম হন। বিদ্যাসাগরের এই মানবিক আবেদনে সাধারণ বাঙালি সমাজ সাড়া দিলেন। শাস্ত্রচিন্তা ও মানবচিন্তার আশ্চর্য সমন্বয় সাধন করলেন বিদ্যাসাগর। বিদ্যাসাগর অনুধাবন করেছিলেন—শুধুমাত্র আইন করে বিধবাবিবাহ চালু করলে তা কার্যকর বা বাস্তবায়িত হওয়া মুশকিল। কারণ তিনি জানতেন ভারতবাসী ধর্মভীরু। সে কারণে ধর্মীয় শাস্ত্রবিধান অনুযায়ী ‘বিধবা বিবাহ’ এর সমর্থন অনুসন্ধানে নিবিষ্ট হয়েছিলেন। ধর্মগত সমর্থন ও আইনগত সমর্থন এ দুয়ের সমন্বয়ে বিদ্যাসাগর বিধবা বিবাহকে সফল করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন।

বিদ্যাসাগর বিধবার পুনর্বিবাহের সামাজিক প্রয়োজনীয়তাকে সামনে রেখে ‘বিধবাবিবাহ’ আইন প্রণয়নের সমর্থনে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ৯৮৭ জন গণ্যমান্য ব্যক্তির স্বাক্ষরসহ একটি আবেদন পত্র প্রেরণ করেন ইংরেজ সরকারকে। ‘বিধবা বিবাহ’ আইন প্রণয়নের এই সমর্থন পত্রে সই করেছিলেন—কৃষ্ণনগরের মহারাজা শ্রীশচন্দ্র, বর্ধমানের রাজা মহতাবচন্দ্র, দেওয়ান কার্তিকেয়চন্দ্র রায়, উত্তরপাড়ার জমিদার জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, বিচারপতি দ্বারকানাথ মিত্র, হিন্দু থিয়েটারের প্রতিষ্ঠাতা বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর, কালীচরণ লাহিড়ী, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়,

উমেশচন্দ্র শর্মা, দ্বারকানাথ বসু, ব্রজনাথ মুখার্জী, দুর্গাচরণ সেন, শিবচন্দ্র দেব, দিগম্বর মিত্র, রামনারায়ণ তর্করত্ন প্রমুখ গণ্যমান্য ব্যক্তি। বর্দ্ধমানের মহারাজা মহতাবচন্দ্র, কৃষ্ণনগরের রাজা শ্রীশচন্দ্র সেকালে বিধবা বিবাহের পক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন। ফলে বিধবা বিবাহ বিষয়টি সাধারণ মানুষ সমর্থন করেছিলেন। এছাড়া মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, কালীপ্রসন্ন সিংহ প্রমুখ ব্যক্তি বর্গ বিধবা বিবাহের ব্যয়ভার বহন করতে প্রচুর অর্থ প্রদান করেছিলেন।

এছাড়া বিধবা বিবাহ আন্দোলনকে নৈতিকভাবে সমর্থন করেছিলেন হিন্দুকলেজের ইয়ংবেঙ্গল গোষ্ঠীর অনেকেই। যেমন, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, কিশোরীচাঁদ মিত্র, রাধানাথ শিকদার, প্যারীচাঁদ মিত্র প্রমুখ। ইয়ংবেঙ্গল গোষ্ঠীর ব্যক্তিবর্গ যেমন বিধবা বিবাহকে সমর্থন করেছিলেন এর পাশাপাশি তাঁরা বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হবার চুক্তি বা অঙ্গীকার পত্র আইন করার প্রতি জোরদার আন্দোলন শুরু করেন। এই আন্দোলনের ফলে বিবাহ রেজিস্ট্রী আইনের পথকে সুগম করে। পরবর্তী সময়ে ১৮৭২ সালে এই আন্দোলনের প্রভাবে ‘Civil Marriage Act III’ বা ‘তিন আইনের বিবাহ’ চালু হয়।

অন্যদিকে ‘বিধবা বিবাহ আইন’ এর বিরোধিতা করে হিন্দু সমাজের প্রধান নেতা রাধাকান্ত দেবের নেতৃত্বে ৩৬, ৭৬৩ জন ব্যক্তির স্বাক্ষর সহ আবেদনপত্র ভারত সরকারের কাছে পাঠানো হয়। শুধু বাংলায় নয় সারা ভারতবর্ষে বিধবা বিবাহ আইন নিয়ে তীব্র বাগবিতণ্ডা শুরু হয়। সমকালীন এই আন্দোলন বিদ্যাসাগরের প্রচেষ্টা ও সরকারকে চিঠি-পত্র প্রদান, তৎকালীন বাল বিধবার পুনর্বিবাহের বিষয়টি ‘ল কমিশনকে’ ভাবতে বাধ্য করে। দীর্ঘ সামাজিক টানাপেড়েনের পর নানা বাধা বিপত্তি কাটিয়ে বিদ্যাসাগরের প্রচেষ্টায় ‘বিধবা বিবাহ’ শেষ পর্যন্ত আইনে পরিণত হয় ১৮৫৬ সালের ২৬শে জুলাই। বিধবা বিবাহের বাদানুবাদ সংকটকালে বিদ্যাসাগরই একমাত্র ব্যক্তি যিনি দৃঢ় চিন্তে বিশৃঙ্খল সমাজ আন্দোলনকে সুনির্দিষ্ট পথে চালিত করেন। তাঁর পাণ্ডিত্য, প্রখর যুক্তিবোধ, অধ্যবসায়, নিষ্ঠীক চিন্তা, চারিত্রিক দৃঢ়তা, অনমণীয় মনোভাব, পরশ্রীকাতর সমবেদনাময় মন বিধবা বিবাহ আন্দোলনকে সম্পূর্ণতা দিতে সক্ষম হয়েছিলেন।

১৮৫৬ সালের ২৬শে জুলাই বিধবাবিবাহ আইন পাশ হয়। ‘বিধবা বিবাহে’র সরকারী আইনে বলা হয়,— “৪৯ বিধবা-বিবাহ এক্ট নং ১৫, সন ১৮৫৬।

ধারা নং ১—হিন্দু বিধবার বিবাহ বৈধ। বিধবার পুনর্বিবাহ হইলে সে পৈতৃক সম্পত্তির অনধিকারিণী হইবে না।

ধারা নং ২— পুনর্বিবাহ হইলে, পূর্ব পতির সম্পত্তির উপর বিধবার কোন অধিকার

থাকিবে না।

ধারা নং ৩— নাবালক সন্তানযুক্ত বিধবা পুনর্বিবাহ করিতে ইচ্ছা করিলে, মৃত পতির মাতা, পিতা, দিদিমা বা দাদামহাশয় নাবালকের উপযুক্ত অভিভাবক নিযুক্ত করার জন্য আদালতে দরখাস্ত করিতে পারেন।

ধারা নং ৪— নিঃসন্তান বিধবা মৃত পতির সম্পত্তিতে স্বত্ববান নহে।

ধারা নং ৫— পুনর্বিবাহের পূর্বে বিধবার নিজের কিছুতে স্বত্ব থাকিলে বিবাহের পরও তাহা থাকিবে।

ধারা নং ৬— কুমারীর বিবাহ সময়ে যে মন্ত্রাদি পড়ান হইয়া থাকে, বিধবার বিবাহেও সেই সব মন্ত্রই পড়াইতে হইবে।

ধারা নং—৭ যাহার পতির সহিত সহবাস হয় নাই, এরূপ নাবালিকা বিধবা অভিভাবকের অনুমতি ভিন্ন পুনর্বিবাহ করিতে পারে না। এই বিধি না মানিলে এক বৎসরের কারাবাস হইতে পারে এবং এই বিবাহ নাকচ হইবে। পতি-পত্নীর সহবাসের পর, সে নাবালিকা থাকিবে না, এবং তাহার নিজ স্বীকৃতি অনুসারে পুনর্বিবাহ হইতে পারে।

ধারা নং—৮ নাবালিকা বিধবা পিতার বিনা অনুমতিতে পিতার অভাবে দাদার, দাদার অভাবে মাতার, মাতার অভাবে অন্য কোন নিকটতম আত্মীয় বা বন্ধুর বিনা অনুমতিতে বিবাহ করিতে পারিবে না। জানিয়া শুনিয়া ইহার বিরুদ্ধে কাজ করিলে দণ্ড জরিমানা ও জেল হইতে পারে। সাবালিকা বিধবা নিজ ইচ্ছানুসারে বিবাহ করিতে পারে।”^{১৩}

আইনত বিধবা বিবাহ পাশ হবার পর প্রয়োজন হয়ে পড়ে বিধবা বিবাহ প্রদানের বাস্তব প্রয়োগ। বিধবা বিবাহ আইন পাশ হলেই যে বিধবা বিবাহ সমাজে হতে থাকবে এমনটা রাতারাতি সম্ভব নয়। বিধবা বিবাহের কথা মুখে বলে কোনো কাজ হবে না তা দিয়ে দেখাতে হবে। ‘বিধবা বিবাহ আইন’ পাশ হবার পর ঈশ্বর গুপ্ত ‘সংবাদ প্রভাকর’ পত্রিকার সম্পাদকীয়তে ব্যঙ্গ করে লেখেন দীর্ঘ ‘বিধবা-বিবাহ আইন’ নামের কবিতা। এ কবিতায় ধরা পড়েছে সমকালীন যুগজীবনের ছবি,—

“হিন্দু বিধবার বিয়া আছে অপ্রচার।

বঙ্কাল হতে যার নাহি ব্যবহার।।

সে বিষয়ে ক্ষতাক্ষত না করি বিশেষ।

করিলেন একেবারে নিয়ম নির্দেশ।।

...কোলে কাঁকে ছেলে ঝোলে, যে সকল রাঁড়ী।

তহারা সধবা হবে, পরে শাঁকা শাড়ী ।।
এ বড় হাসির কথা, শুনে লাগে ডর ।
কেমন কেমন করে, মনের ভিতর ।।
শাস্ত্র নয় যুক্তি নয় হবে কি প্রকারে ।
দেশাচারে ব্যবহারে বাধো বাধো করে ।।
যুক্তি বোলে বিচার, করুন শত শত ।
কোনমতে হইবে না, শাস্ত্রের সম্মত ।।
বিবাহ করিয়া, তারা পুনর্ভবা হবে ।
সতী বলে সম্বোধন, কিসে করি তবে ?
বিধবা গর্ভজাত, যে হয় সন্তান ।
‘বৈধ’ বোলে কিসে তার করিবে প্রমাণ ?
যে বিষয় সর্ব্বাদি-সম্মত না হয় ।
সে বিষয় সিদ্ধ করা, শক্ত অতিশয় ।।
...শ্রীমান ধীমান, নীতি নির্মাণকারক ।
যাঁরা সবে হতে চান, বিধবাতারক ।।
নতভাবে নিবেদন, প্রতি জনে জনে ।
আইন-বৃক্ষের ফল, ফলিবে কেমনে ।।
...গোলে-মাতে হরিবোল, গগুগোল সার ।
নাহি হয় ফলোদয় মিছে হাহাকার ।।
বাক্যের অভাব নাই, বদনভাঙারে ।
যত আসে তত বলে কে দূষিবে কারে ।।
সাহস কোথায় বল প্রতিজ্ঞা কোথায় ?
কিছুই না হতে পারে মুখের কথায় ।।
মিছামিছি অনুষ্ঠানে, মিছে কাল হরা ।
মুখে বলা বলা নয়, কাজে করা করা ।।
সকলেই তুড়ি মারে, বুঝে নাকো কেউ ।
সীমা ছেড়ে নাহি খ্যাতে সাগরের ঢেউ ।।

সাগর যদ্যপি করে সীমার লঙ্ঘন।
 তবে বুঝি হতে পারে, বিবাহ-ঘটন।।
 নচেৎ না দেখি কোন, সম্ভাবনা আর।
 অকারণে হই হই, উপহাস সার।।
 কেহ কিছু নাহি করে, আপনার ঘরে।
 যাবে যাবে যায় শত্রু, যাক্ পরে পরে।।
 তখন এরূপ কবে, হলে ব্যতিক্রম।
 ফাটায় পড়েছে কলা, গোবিন্দায় নম।।...”^{১৪}

অর্থাৎ, মুখে বিধবা বিবাহের কথা নয়, বিধবা বিবাহের আয়োজন করা, তাকে বাস্তবায়িত করা সবচেয়ে বড় প্রয়োজন।

সমাজের সর্বস্তরে বিধবাবিবাহকে কেন্দ্র করে পক্ষে-বিপক্ষে চাপান-উতরে মথিত হয়ে উঠল উনিশ শতকের বঙ্গ সমাজ। এই সময়কালকে শিবনাথ শাস্ত্রী বর্ণনা করেছেন এইভাবে, —“১৮৫৬ সালের অগ্রহায়ণ মাসে বঙ্কু শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় এক বিধবার পাণিগ্রহণ করিলেন। তাহাতে বঙ্গদেশে যে আন্দোলন উঠিল, তাহার অনুরূপ জাতীয় উত্তেজনা আমরা অল্পই দেখিয়াছি। ইতিপূর্বে শাস্ত্রানুসারে বিধবা বিবাহের বৈধতা লইয়া যে বিচার চলিতেছিল তাহা পণ্ডিত ও শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। রাজবিধি প্রণয়নের চেষ্টা আরম্ভ হইলে, সেই আন্দোলন কিঞ্চিৎ পাকিয়া উঠিয়াছিল; কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয় শাস্ত্রীয় বিচারে সন্তুষ্ট না থাকিয়া যখন কার্য্যতঃ বিধবা বিবাহ প্রচলনে প্রবৃত্ত হইলেন, তখন আপামোর সাধারণ সকল লোকে একেবারে জাগিয়া উঠিল। পথে, ঘাটে, হাটে-বাজারে, মহিলা গোষ্ঠীতে এই কথা চলিল। শান্তিপুরের তাঁতীরা, ‘বেঁচে থাক বিদ্যাসাগর চিরজীবী হয়ে’—এই গানাক্ষিত কাপড় বাহির করিল।”^{১৫} প্রথমে শিক্ষিত জন পরে আপামোর জনসাধারণের মধ্যে বিদ্যাসাগরের পরিচয় হয়ে ওঠে ‘বিধবার বে দেওয়া বামুন’। মাঠে, ঘাটে, অফিসে, আদালতে আলাপ-আলোচনায় বৈঠকে-বাজারে, হেঁসেলে-রাস্তাঘাটে সর্বত্র চর্চার প্রধান কেন্দ্রবিন্দুতে চলে আসে বিধবার পূর্ণবিবাহ প্রসঙ্গটি। সমাজে তৈরি হয় নতুন প্রবাদ,—‘রাঁড়ী বেটীর বিয়ের শখ, উনায় রসের কত ঠমক’।

১৮৫৬ সালের জুলাই মাসে ‘বিধবা বিবাহ’ আইন পাশ হবার পর, ছ-মাসের মধ্যে বিদ্যাসাগর উদ্যোগ নিয়ে প্রথম বিধবা বিবাহের ব্যবস্থা করেন। পাত্র, সংস্কৃত কলেজের কৃতি

ছাত্র শ্রীশচন্দ্র। খাটুরা গ্রাম নিবাসী কথক রামধন তর্কবাগীশের পুত্র ছিলেন শ্রীশচন্দ্র। পাত্রী, বর্ধমান জেলার অধিবাসী পটলডাঙা নিবাসী ব্রহ্মানন্দ মুখোপাধ্যায়ের দশ বছরের বিধবা কন্যা। বিবাহের দিন, ৭ই ডিসেম্বর ১৮৫৬ (১২৬৩ সনের, ২৩শে অগ্রহায়ণ)। ‘সংবাদ প্রভাকর’ সূত্রে জানা যায় এই বিবাহের দিন স্থির হয়েছিল, ১৫ই অগ্রহায়ণ কিন্তু নানা বাধা বিপত্তিতে শ্রীশচন্দ্র বিভ্রান্ত হয়ে পড়েন এবং অনেক মানসিক দ্বিধাদ্বন্দ্ব কাটিয়ে ২৩শে অগ্রহায়ণ বিবাহের দিন হিসাবে মনস্থির করেন। ‘তত্ত্ববোধিনী’ পত্রিকার সূত্রে জানা যায়, এই বিবাহের জন্য ৮০০ নিমন্ত্রণপত্র মুদ্রিত হয়েছিল। পাত্রীর মাতা লক্ষ্মীমণি দেবীর নামে নিমন্ত্রণ পত্র বিলি করা হয়। শ্রীশচন্দ্রের বিধবা বিবাহ অনুষ্ঠানে কোনো সাহেবকে নিমন্ত্রণ করা হয়নি। কারণ দেশবাসীর ধারণা হতে পারে, এটা বিধবা বিবাহ নয়, ‘সাহেব বিবাহ’। নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল বিধবা বিবাহের সমর্থনকারী সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপকবর্গ ও সমাজে গণ্যমান্য ব্যক্তিকে। লক্ষ্মীমণিদেবী নিজ বিধবা কন্যার বিবাহ সম্প্রদান করেন। শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর ‘আত্মচরিত’তে লিখেছেন,—“ ১৮৫৬ সালের শেষ ভাগে [৭ই ডিসেম্বর] যেদিন প্রথম বিধবাবিবাহ হয়, সেদিন আমি বাসার লোকের সঙ্গে সে বিবাহ দেখিতে গিয়াছিলাম। সে কি ভিড়! [১২ নং] সুকিয়া স্ট্রীটের রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ীতে ঐ বিবাহ হয়।”^{১৬}

এই বিবাহ অনুষ্ঠানের বিস্তৃত বিবরণ ‘সংবাদ প্রভাকরে’ প্রকাশিত হয়েছিল। প্রচুর লোকসমাগম হলে একরকম পুলিশি নিরাপত্তার ঘোরাটোপে লুকোচুরি করে এই বিধবাবিবাহ সম্পন্ন হয়েছিল। পুরোহিতেরা বিবাহ মন্ত্র পাঠ করে শ্রীশচন্দ্রের বিবাহ সম্পন্ন করেন। বিধবা পাত্রীর মাতা লক্ষ্মীমণি দেবী কন্যা সম্প্রদান করেন। এদেশের বিবাহ রীতি অনুযায়ী, দানসামগ্রী, অলঙ্কার ও স্ত্রী আচার সবই পালিত হয়েছিল। স্ত্রী আচার, উলু ধবনি, বিবাহের রঙ্গরসিকতা—নাকমলা, কানমলা সবই হয়েছিল। এমনকি বিবাহে আগত অতিথিদের আহারের ধুম পড়ে যায়। বিহারীলাল সরকারের ‘বিদ্যাসাগর’ গ্রন্থসূত্রে আরো জানা যায়, প্রায় ছয়শত লোক এই বিধবাবিবাহে উপস্থিত হয়েছিল। ছয় শত কোল মন্ডা-মিঠাই খেয়ে, তোল তোলপাড় করে বিদায় গ্রহণ করে। এই বিবাহ অনুষ্ঠানকে ঘিরে, ‘সংবাদ ভাস্কর’, ‘তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা’, ‘অরুণোদয়’ পত্রিকায় উৎসাহ ও আনন্দ প্রকাশ করা হয়। অন্যদিকে, ‘সংবাদ প্রভাকর’, ‘ইংলিশম্যান’ প্রভৃতি পত্রিকায় রঙ্গতামাসা ও ব্যঙ্গ-বিদ্রোপ করা হয়।^{১৭}

এরপর, ৯ই ডিসেম্বর ১৮৫৬, কলকাতায় আরো একটি বিধবা বিবাহের অনুষ্ঠান সংঘটিত হয়।^{১৮} পানিহাটি গ্রামের কুলীন কায়স্থ বংশের হরকালী ঘোষের ভ্রাতা কৃষ্ণকালী ঘোষের পুত্র

মধুসূদন ঘোষের সঙ্গে, কলকাতার নিমাইচরণ মিত্রের পৌত্র ঈশানচন্দ্রের দ্বাদশবর্ষীয় বিধবা কন্যার বিবাহ হয়। এখানে পিতা কন্যাকে সম্প্রদান করেন।

তৃতীয় ও চতুর্থ বিধবা বিবাহ সংঘটিত হয় মেদিনীপুরে রাজনারায়ণ বসুর দুই জ্যেষ্ঠতুতো ভাই দুর্গানারায়ণ বসু ও মদনমোহন বসুর সঙ্গে। এই বিয়ের ঘটক ছিলেন রাজনারায়ণ বসু। এই বিবাহের কারণে রাজনারায়ণ বসুকে পারিবারিক ও সামাজিক নিগ্রহের স্বীকার হতে হয়। রাজনারায়ণ বসু তাঁর ‘আত্মজীবনীতে’ লিখেছেন,—“তৃতীয় বিধবাবিবাহ ও চতুর্থ বিধবাবিবাহ আমার জ্যেষ্ঠতুতো ভাই দুর্গানারায়ণ বসু ও আমার সহোদর মদনমোহন বসু করেন। এই বিধবাবিবাহ দেওয়াতে আমার খুড়ামহাশয় বোড়াল হইতে আমাকে লেখেন যে তোমার দ্বারা আমরা কায়স্থকুল হইতে বহিস্কৃত হইলাম। দুর্গানারায়ণ বসু যখন বিধবা বিবাহ করিতে যাইতেছিলেন তখন গ্রামের ঈশ্বরচন্দ্র মুখুজে তাঁহার পাক্ষির ভিতর মুখ দিয়া বলিল, “দুর্গা তোর মনে এই ছিল, একেবারে মজালি।”^{১৯} ব্রাহ্মধর্মের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বিধবা বিবাহ নিয়ে দ্বিধাশ্রিত ছিলেন। সম্পাদক হিসাবে ‘তত্ত্ববোধিনী’ পত্রিকায় বিধবা বিবাহের সমর্থনকারী লেখাগুলিকে তিনি যত্ন করে ছেপেছিলেন। অন্যদিকে রক্ষণশীল মনোভাবে রাজনারায়ণ বসুকে পরামর্শ দিয়ে তিনি বলেছেন,—“এই বিধবাবিবাহ হইতে যে গরল উথিত হইবে তাহা তোমার কোমল মনকে অস্থির করিয়া ফেলিবে, কিন্তু সাধু যাহার ইচ্ছা ঈশ্বর তাহার সহায়।”^{২০}

‘বিধবা বিবাহ’ আন্দোলনে ব্রাহ্ম ধর্মোন্দোলনের নেতা কেশবচন্দ্র সেনের ভূমিকা অসামান্য। ১৮৫৬ সালে যে বছর বিধবাবিবাহ চালু হয় সে বছর প্রকাশিত হয় উমেশচন্দ্র মিত্রের ‘বিধবাবিবাহ নাটক’। উক্ত নাটকের অভিনয় হয় ১৮৫৯ সালে কলকাতার সিঁদুরিয়া পট্টির গোপাল মল্লিকের বাড়ি। এই নাটকের অভিনয়ে স্বয়ং কেশবচন্দ্র অভিনয় করেছিলেন। নাটক অভিনয়ের দর্শক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। ১৮৬৪ সালে তাঁরই উদ্যোগে ব্রাহ্মসমাজে সংঘটিত হয় পৌত্তলিকা বর্জন করে প্রথম বিধবাবিবাহ। এছাড়া ১৮৮২ সালে ব্রাহ্মসমাজের উদ্যোগে যে ১৩ টি বিবাহ সম্পন্ন হয়েছিল তার পাঁচটি ছিল ‘বিধবাবিবাহ’। অন্যদিকে বিদ্যাসাগরের বন্ধু হাওড়া স্কুলের শিক্ষক ভূদেব মুখোপাধ্যায় বিদ্যাসাগরের ‘বিধবাবিবাহ’ আন্দোলনকে সমর্থন করেননি। ‘বিধবা বিবাহ’ এর বিরোধিতা করে তিনি লেখেন ‘বৈধব্য ব্রত’ নামক প্রবন্ধ। যেখানে বিধবাকে দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ না করার বিধান দিয়েছেন এবং সংযমী হবার পরামর্শ দিয়েছেন। ‘ভূদেব চরিত’ গ্রন্থে ভূদেব মুখোপাধ্যায় লিখেছেন,—“যখন মদ্যসেবী মাংসাহারী ইউরোপীয়

দিগের কন্যাগণও ধর্মশিক্ষার প্রভাবে চিরকৌমার ব্রতের নিয়ম যথাযথ পালন করিতে পারিতেছে, তখন অত্যাচার সংস্কৃত শাস্ত্রের সাহায্যে আর্যবংশোদ্ভবা বিধবাদিগের ব্রহ্মচর্য পালন না হইবার কথা নিতান্ত অশ্রদ্ধেয়।”^{২১}

বিধবার বিবাহ দেবার জন্য, বিদ্যাসাগরকে সমকালে অনেক তাড়না, লাঞ্ছনা ও গঞ্জনা সহ্য করতে হয়। এমনকি, বিদ্যাসাগরকে প্রাণ নাশের হুমকি সহ্য করতে হয়। সেকালে বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহ আন্দোলনকে যাঁরা সমর্থন করেছিলেন তাঁদের সকলকেই সামাজিক নিগ্রহের শিকার হতে হয়েছিল। বিধবা বিবাহ সংস্পর্শ সেকালে সমাজচ্যুতির ভয় সৃষ্টি করেছিল। সমাজ তো বটেই, এমনকি সমর্থনকারী ব্যক্তির ঘর-পরিবার থেকে নানা নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছিল। দুই ভাই দুর্গানারায়ণ বসু ও মদনমোহন বসুকে বিধবাবিবাহ দেবার জন্য, রাজনারায়ণ বসু গ্রামবাসী ও তাঁর পরিবারের কাছ হতে পেয়েছিলেন নিন্দা-নিগ্রহ। বোড়ালের বাসিন্দা রাজনারায়ণকে শুনতে হয়েছিল,—‘রাজনারায়ণ বসু গ্রামে আসিলে আমরা ইট মারিব।’ রাজনারায়ণ বসু তাঁর ‘আত্মচরিত’ গ্রন্থে লিখেছেন,— “মাতাঠাকুরাণী, তিনি বলিলেন যে “রাজনারায়ণ তোর মনে এই ছিল”; এই বলিয়া অনেক অনুযোগ করিতে লাগিলেন...এই বিধবাবিবাহ সময়ে তিনি মথুরায় ছিলেন। তিনি সেই সময়ে বাটীতে থাকিলে আমার দুই ভাইয়ের বিধবাবিবাহ দিতে পারিতাম না।”^{২২}

ব্রাহ্ম ধর্মান্দোলনের নেতা শিবনাথ শাস্ত্রী নিজেকে ‘বিদ্যাসাগরের চেলা’ বলে পরিচয় দিতেন। বিধবা বিবাহ আন্দোলনের অন্যতম প্রচারক ছিলেন শিবনাথ শাস্ত্রী। ১৮৬৮ সালে শিবনাথ শাস্ত্রী একটি বিধবা বিবাহের ঘটক রূপে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। এই বিধবা বিবাহ প্রদানে সহায়তা করার জন্য পরিবার ও প্রিয়জনদের কাছ হতে তাঁকে নির্যাতন সহ্য করতে হয়। ঈশানচন্দ্র নামে মেডিকেল কলেজের এক ছাত্রের বিধবা বোন মহালক্ষ্মীর সঙ্গে বিপত্নীক বন্ধু যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিধবা বিবাহ দেওয়ার জন্য শিবনাথ শাস্ত্রীকে পরিবারের কাছ থেকে নির্যাতন সহ্য করতে হয়। বিধবা বিবাহকারী পাত্র যোগেন্দ্রকে পরিবার থেকে বিতাড়িত হতে হয়; এমনকি, তাঁর বাড়িতে কাজের লোক হিসাবে চাকর-চাকরাণী পাওয়া দুষ্কর হয়ে ওঠে। শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছেন,—“বিবাহের দিন স্থির করিয়া প্রায় দুই তিনজন ভদ্রলোককে মাত্র নিমন্ত্রণ করিয়া বিবাহ দেওয়া হইল। বিদ্যাসাগর মহাশয় বিবাহের সমুদয় ব্যয় দিলেন, এবং আমার যতদূর স্মরণ হয়, কন্যাকে কিছু কিছু গহনা দিলেন। এই বিবাহের পরেই ভয়ানক নির্যাতন আরম্ভ হইল। যোগেন্দ্রের আত্মীয়স্বজন তাকে পরিত্যাগ করিলেন...তদুপরি চাকর চাকরাণী কেহই থাকে

না, দিন চলা ভার।”^{২৩}

এই ঘটনার কিছুদিন পর শিবনাথ শাস্ত্রী আরো একটি বিধবা বিবাহের সহায়ক রূপে অবতীর্ণ হন। কলকাতার স্বনামধন্য উকিল শ্রীনাথ দাসের পুত্র উপেন্দ্রনাথ দাসের বিধবা বিবাহের উদ্যোগ করেন। উপেন্দ্রনাথ দাস ছিলেন গ্রেট ন্যাশানাল থিয়েটারের অভিনেতা, নাট্যকার, পরিচালক। শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর ‘আত্মচরিত’-এ লিখেছেন,—“হাইকোর্টের উকীল বাবু শ্রীনাথ দাসের জ্যেষ্ঠ পুত্র উপেন্দ্রনাথ দাস তখন কলিকাতার যুবক রিফর্মারদের মধ্যে একজন প্রধান ব্যক্তি।...১৮৬৮ সালের মধ্য ভাগে উপেনের, প্রথমা স্ত্রীর হঠাৎ মৃত্যু হইল।...শোকটো পুরাতন না হইতে না হইতে এক দিন দুপুর বেলা উপেন কতিপয় বন্ধুসহ সংস্কৃত কলেজে আসিয়া আমাকে এল.এ ক্লাস হইতে ডাকিয়া পাঠাইলেন। বলিলেন, “তুমি শুনে সুখী হবে, আমি এক বিধবাকে বিবাহ করিতে যাচ্ছি। মেয়েটি ভবানীপুরে আছে, চুরি করে আনতে হবে। তার মায়ের মত আছে; কিন্তু মামা অভিবাবক, তাঁদের মত নাই।”^{২৪} উপেন্দ্রনাথ দাসের পিতা উকিল শ্রীনাথ দাস ছিলেন বিদ্যাসাগরের বন্ধু। উপেন্দ্রনাথ বিধবাবিবাহ করার জন্য শ্রীনাথ দাস তাকে ত্যাজ্যপুত্র করেন। শেষদিন পর্যন্ত নিজ পুত্রের মুখদর্শন করতেও চাননি। এমনকি, উপেন্দ্রনাথ মৃত্যুশয্যা পিতৃ দর্শনের ইচ্ছা প্রকাশ করলে স্বয়ং বিদ্যাসাগর গিয়ে শ্রীনাথ দাসকে অনুনয় বিনয় করলেও পিতা-পুত্রের মিলন ঘটাতে পারেননি।

বিদ্যাসাগর বিধবার পুনর্বিবাহে তিন প্রকার বিধবার কথা সামনে এনেছিলেন,—১) অক্ষতযোনি বিধবা, ২) ক্ষতযোনি বিধবা, ৩) পৌনর্ভব বিধবা। ‘অক্ষতযোনি’ অর্থে বোঝানো হয়েছে—যে নারীর বিয়ে হয়েছে কিন্তু নাবালিকা হওয়ার কারণে পিতৃগৃহে অবস্থান করেছেন ও বিবাহিত স্বামীর সঙ্গে কখন মিলিত হননি এবং অকাল বৈধব্যের শিকার হয়েছেন। ‘ক্ষতযোনি’ বিধবা অর্থে নাবালিকা বালিকার বিবাহ হয়েছে ও স্বামীর ঘর করেছেন এবং সহবাস করেছেন। ‘পৌনর্ভব’ অর্থে পতির দ্বারা যিনি সন্তান জন্ম দিয়েছেন এবং বিধবা হয়েছেন। —এই তিন শ্রেণীর বিধবাবিবাহের উদ্যোগের কথা বলেছেন ঈশ্বরচন্দ্র।

‘বিধবা বিবাহ’ আইন চালু হবার প্রায় ১৪ বছর পর নিজের সন্তান নারায়ণচন্দ্রকে বিধবার সঙ্গে বিয়ে দিয়ে বিদ্যাসাগর দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। কৃষ্ণনগর, খানাকুলের অধিবাসী শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বিধবা কন্যা ভবসুন্দরীর সঙ্গে বিদ্যাসাগর তাঁর একমাত্র পুত্র নারায়ণচন্দ্রকে বিবাহ দেন। তারিখ ২৭শে শ্রাবণ, ১২৭৭। তাঁর একমাত্র পুত্র নারায়ণচন্দ্র বিধবাকে বিবাহ করুক এমনটা বিদ্যাসাগরের আত্মীয়-স্বজন চান নি। এমনকি, বিদ্যাসাগরের ভাই শম্ভুচন্দ্রেরও ভাইপোর বিধবা

বিবাহে সংকোচ ছিল। এই সংকোচের অন্যতম কারণ ছিল ‘অক্ষতযোনি’র বিধবা প্রসঙ্গ। বিদ্যাসাগর পুত্র নারায়ণচন্দ্র ১৮৭০ সালে যে বিধবা ভবসুন্দরীকে বিবাহ করেছিলেন, তিনি ‘অক্ষতযোনি’র বিধবা নন।

নারায়ণচন্দ্র ‘ক্ষতযোনি’র বিধবাকে বিবাহ করায় সমাজে তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি হয়। বিধবা ভবসুন্দরী অক্ষতযোনি নয় বলে, বিদ্যাসাগরের ভ্রাতা শম্ভুচন্দ্র আপত্তি তুলে বিদ্যাসাগরকে অভিযোগ পত্র লেখেন। এর উত্তরে বিদ্যাসাগর লেখেন,—“ইতিপূর্বে তুমি লিখিয়াছিলে, নারায়ণ বিধবাবিবাহ করিলে আমাদের কুটুম্ব মহাশয়েরা আহার-ব্যবহার পরিত্যাগ করিবেন, অতএব নারায়ণের বিবাহ নিবারণ করা আবশ্যিক। এ বিষয়ে আমার বক্তব্য এই যে,...আমি বিধবাবিবাহের প্রবর্তক; আমরা উদ্যোগ করিয়া অনেকের বিবাহ দিয়াছি, এমন স্থলে আমার পুত্র বিধবাবিবাহ না করিয়া কুমারীবিবাহ করিলে আমি লোকের নিকট মুখ দেখাইতে পারিতাম না। ভদ্রসমাজে নিতান্ত হয় ও অশ্রদ্ধেয় হইতাম।...বিধবাবিবাহ প্রবর্তন আমার জীবনের সর্বপ্রধান সংকল্প। এজন্মে যে ইহা অপেক্ষা অধিকতর আর কোনও সংকল্প করিতে পারিব, তাহার সম্ভাবনা নাই।...কুটুম্বমহাশয়েরা আহার-ব্যবহার পরিত্যাগ করিবেন, এই ভয়ে যদি আমি পুত্রকে তাহার অভিপ্রেত বিধবাবিবাহ হইতে বিরত করিতাম, তাহা হইলে আমি অপেক্ষা নরাধম কেহ হইতাম।...আমি দেশাচারের নিতান্ত দাস নহি; নিজের বা সমাজের মঙ্গলের নিমিত্ত যাহা উচিত বা আবশ্যিক বোধ হইবে, তাহা করিব; লোকের বা কুটুম্বের ভয়ে কদাচ সঙ্কুচিত হইব না।”^{২৫}

১৮৫৫ সালে বাংলায় সংগঠিত হয় ‘সাঁওতাল বিদ্রোহ’, ১৮৫৬ সালে ‘বিধবা বিবাহ’ আইনে পরিণত হয় এবং ১৮৫৭ তে ভারতবর্ষে ঘটে ‘সিপাহী বিদ্রোহ’ এর ঘটনা। ‘বিধবা বিবাহ’ আইন প্রবর্তনের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী বছরে রাজনৈতিক ভাবে উত্তাল হয়ে ওঠে দেশ। ১৮৫৭ সালের ‘সিপাহী বিদ্রোহ’ বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ আন্দোলন কিছুটা পরিমাণে স্তিমিত করে দেয়। দেশপ্রেমের নতুন জোয়ার ও ইংরেজ বিদ্বেষ সমাজে এতটাই প্রবল হয়ে ওঠে যে হিন্দু বিধবার সংকট নিয়ে ভাববার মত সময় করে উঠতে পারেনি বাঙালি জাতি। বিদ্যাসাগরের একক চেষ্টায় সবচেয়ে বেশি বিধবা বিবাহ সংঘটিত হয়েছে। এর জন্য তিনি ঋণগ্রস্থ হয়েছেন, দেশের মানুষের কাছে ঠেকেছেন। বাঙালি মেয়েদের ব্যবহারিক জীবনের উন্নতি হিন্দু সমাজে খুব বেশি অগ্রগতি হয়নি উনিশ শতকে। আর্থিক সুযোগ সুবিধা ও রমণীভোগের প্রলোভনে কেউ কেউ বিধবা বিবাহে অগ্রসর হয়েছিলেন সেকালে। ‘বিধবাবিবাহে’র সুযোগ নিয়ে একদল অসাধু প্রবঞ্চক বহুবিবাহ করে অর্থ রোজগারের উপায় হিসাবে গ্রহণ করেছিল। এই অসাধু

উদ্যোগ রুখতে বিদ্যাসাগর এক টাকার স্ট্যাম্প পেপারে চুক্তি পত্র লিখিয়ে বিধবা বিবাহের উদ্যোগ করতেন। সেখানে সাক্ষী হিসাবে চারজন সম্ভ্রান্ত লোকের সই থাকত।

ডালহৌসির যুগে বিদ্যাসাগর তাঁর সমাজ আন্দোলন করেছিলেন। ডালহৌসির যুগকে বলা হয় ‘ডেভলপমেন্টের’ যুগ। রেলপথ, টেলিগ্রাফ, ডাকব্যবস্থার প্রচলন, নতুন শিক্ষা ব্যবস্থা প্রণয়ন— এ সবই ডালহৌসির যুগে সূচিত হয়েছিল। এই যুগ এক অর্থে গতির যুগ। এই নতুন যুগে দাঁড়িয়ে বিদ্যাসাগর আধুনিক মন নিয়ে বিধবা বিবাহ’ আন্দোলনে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। বিদ্যাসাগর ছিলেন নির্ভীক, লোকনিন্দা বা সমাজচ্যুতির ভয়ে তিনি বিচলিত হন নি। তাঁর প্রচেষ্টায় ‘বিধবা বিবাহ আইন’ প্রণয়নের মধ্য দিয়ে সমাজ প্রগতির নতুন পথ তৈরি হয়। এই আন্দোলন ঘিরে সমাজে যে উদ্দীপনা তৈরি হয়েছিল তার পরিচয় লিপিবদ্ধ আছে উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্যে। ১৮৫৫ সালে ‘বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব’ প্রকাশিত হবার পর পক্ষে-বিপক্ষে প্রায় তিরিশটি প্রবন্ধের বই প্রকাশিত হয়েছিল। এগুলির সাহিত্যিক মূল্য থাক বা না থাক, এর সামাজিক গুরুত্ব অস্বীকার করবার নয়। ‘বিধবা বিবাহ’ আইনত স্বীকৃতি পাওয়ার পর, সমাজের নানান স্তরে, বিশেষত শিক্ষিত মহলে, সাহিত্য চিন্তায় কবিতা, নাটকে, প্রবন্ধে গল্প-উপন্যাসে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে উঠে আসে বিধবার পুনর্বিবাহ প্রসঙ্গ।

উৎস সূত্র ও টীকা:

১. ক্ষিতিশ-বংশাবলি-চরিত, অর্থাৎ নবদ্বীপ রাজবংশের বিবরণ, শ্রীকার্ত্তিকৈয়চন্দ্র রায় কর্তৃক সঙ্কলিত, কলিকাতা, নূতন সংস্কৃত যন্ত্র, সংবৎ ১৯৩২, [ইংরেজি ১৮৭৬] পৃ ২০৩।

২. জ্ঞানাহ্বেষণ, ২১ শে অক্টোবর ১৮৩৭, জনৈক পাঠক, সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজ চিত্র (১৮৪০-১৯০৫), খন্ড-৪, বিনয় ঘোষ, পাঠভবন, জুলাই ১৯৬০, পৃ ৮০৩।

৩. Bengal Spectator, Vol. I, No 1, April 1842., বিদ্যাসাগর ও বাঙালি সমাজ, বিনয় ঘোষ, ওরিয়েন্ট লংম্যান, ভাদ্র ১৩৩৬, পৃ ২৪৪।

৪. বিধবা বিবাহ নিষেধ বিষয়কব্যবস্থা, গোবিন্দচন্দ্র শর্মা, ১৭৬৭ শকাব্দ [১৮৪৫]।

৫. বিদ্যাসাগর-জীবনচরিত, সহোদর শ্রীশম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন প্রণীত ও শ্রীঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বারা সংশোধিত, কলিকাতা ইংরাজী-সংস্কৃত যন্ত্রে শ্রীআশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত, ১২৯৮ সাল, পৃ ১১১-১১৩।

৬. “কেহ কেহ বলেন, বীরসিংহ গ্রামে একবার একটি বালিকার বৈধব্য সংঘটনে ব্যথিত

হইয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জননী শাস্ত্রমতে বিধবাবিবাহ হতে পরে কি, পুত্রকে এ প্রশ্ন করেন।
বিদ্যাসাগর মহাশয় সেই হইতে শাস্ত্রীয় প্রমাণ সংগ্রহ করতে থাকেন।”, “বিদ্যাসাগর, বিহারীলাল
সরকার—৪র্থ সংস্করণ পৃ ৩২৭।

৭. বিদ্যাসাগর ও বাঙালি সমাজ, বিনয় ঘোষ, ওরিয়েন্ট লংম্যান, ভাদ্র ১৩৩৬, পৃ ২৪৫।

৮. ‘বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব’ (১ম খন্ড), ঈশ্বরচন্দ্র
বিদ্যাসাগর, বিদ্যাসাগর রচনাবলী, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যপুস্তক পর্ষদ।

৯. রাজনারায়ণ বসুর আত্মচরিত, রাজনারায়ণ বসু, কুন্তলীন প্রেস, কলিকাতা ১৩১৫,
[ইংরেজি ১৯০৯] পৃ ৯৮-৯৯।

১০. বিদ্যাসাগর। সমালোচনা-সংবলিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জীবনী, বিহারীলাল,
চট্টোপাধ্যায়, শ্রীহরিপদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত, চতুর্থ সংস্করণ, ১৩২৯ সাল, কলিকাতা,
পৃ ২৮৪।

১১. বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ, ঐ, পৃ ২৬০।

১২. বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব’ (২য় খন্ড), কলিকাতা,
সংস্কৃত বিদ্যালয়, ৪ঠা কার্তিক, সংবৎ ১৯১২ [১৮৫৬]। বিদ্যাসাগরের গ্রন্থাবলী, দ্বিতীয় খন্ড,
কলিকাতা, সংস্কৃত যন্ত্র, কলিকাতা লাইব্রেরি হইতে প্রকাশিত, ২৫ নং সুকিয়াস স্ট্রীট, ২রা আশ্বিন
১৩০২, সম্পাদনায় নারায়ণচন্দ্র শর্ম্মা, পৃ ২২০-২২২।

১৩. বিধবা বিবাহ (বিধবা আইন ও ধারা), নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, সারস্বতকুঞ্জ প্রথম সংস্করণ
১লা বৈশাখ, ১৩৩৫, ১৯২৮।

১৪. বিধবা-বিবাহ-আইন, ঈশ্বরগুপ্ত, ঈশ্বর গুপ্তের গ্রন্থাবলী, বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির,
কলিকাতা, গ্রন্থাবলী সিরিজ, পৃ ১২৩।

১৫. রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, শিবনাথ শাস্ত্রী, সম্পাদনা বারিদবরণ ঘোষ,
নিউ এজ পাবলিশার্স, , ২০০৯ সংস্করণ, পৃ ১৪০-১৪১।

১৬. আত্মচরিত, শিবনাথ শাস্ত্রী, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ, প্রথম প্রকাশ ১৯৮২, পৃ ৪৫।

১৭. “১৮৫৬ সালের অগ্রহায়ণ মাসে তাঁহার [বিদ্যাসাগরের] অন্যতম বন্ধু শ্রীশচন্দ্র
বিদ্যারত্ন মহাশয় এক বিধবার পাণীগ্রহণ করিলেন। তাহাতে বঙ্গদেশে যে আন্দোলন উঠিল,
তাহার অনুরূপ জাতীয় উত্তেজনা আমরা অল্পই দেখিয়াছি।” ‘রামতনু লাহিড়ী তৎকালীন বঙ্গসমাজ,
শিবনাথ শাস্ত্রী, ঐ, পৃ ১৪০।

১৮. বিদ্যাসাগর/সমালোচনা-সংবলিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জীবনী, বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়,ঐ, পৃ ২৮৪।
২৯. রাজনারায়ণ বসুর আত্মচরিত, রাজনারায়ণ বসু, কুন্তলীন প্রেস ১৯০৯, কলিকাতা ১৩১৫, পৃ ১০০।
২০. ঐ, পৃ ১০০।
২১. ভূদেবচরিত (প্রথম ভাগ) ,ভূদেব মুখোপাধ্যায়, কুমারদেব চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত, ইন্ডিয়া প্রেস, ১৩২৪ সাল।
২২. রাজনারায়ণ বসুর আত্মচরিত, ঐ, পৃ ১০১।
২৩. রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, শিবনাথ শাস্ত্রী, ঐ পৃ ৯০।
২৪. আত্মচরিত, শিবনাথ শাস্ত্রী, ঐ, পৃ ৯৯।
২৫. বিদ্যাসাগর ও বাঙালি সমাজ, বিনয় ঘোষ, ঐ পৃ ২৩৯।

দ্বিতীয় অধ্যায় উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্যে বিধবা প্রসঙ্গ

বিদ্যাসাগরের প্রচেষ্টায় ১৮৫৬ সালের ২৩শে জুলাই ‘বিধবা বিবাহ’ আইনত স্বীকৃতি পাওয়ার পর, সমাজের নানান স্তরে, বিশেষত শিক্ষিত মহলের, সাহিত্য চিন্তায়—কবিতা, নাটকে, প্রবন্ধে, গল্প-উপন্যাসে—আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে উঠে আসে ‘বিধবার পুনর্বিবাহ’ প্রসঙ্গটি। পক্ষে এবং বিপক্ষে ‘বিধবার বিবাহ’ এই সামাজিক বিষয়টি ঘুরে ফিরে আসে সাহিত্যের কাহিনী সংঘটনে ও চাপান-উতরে। উনিশ শতকে বিধবা বিবাহকে কেন্দ্র করে রচিত সাহিত্যের তালিকা বিশাল। সমগ্র উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ জুড়ে বাংলা সাহিত্যের সিংহভাগ দখল করে রয়েছে ‘বিধবার পুনর্বিবাহ’ এই সামাজিক ঘটনা। একদিকে সংবেদনশীলতা, অন্যদিকে কটাক্ষ ও মুখরোচক প্রণয়-কাহিনীর বৃত্তে বিধবা চরিত্ররা ঘুরে ফিরে এসেছে।

১৮৫৫ সালে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ‘বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদবিষয়ক প্রস্তাব’ (১মখণ্ড) গ্রন্থটি প্রকাশের পর সমাজের সর্বস্তরে আলোড়ন সৃষ্টি হয়। শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন, ‘বিদ্যাসাগর জীবনচরিত’ গ্রন্থে এই বইটির জনপ্রিয়তা সম্পর্কে লিখেছেন, —“বিধবাবিবাহ পুস্তক প্রচারিত হইবামাত্র লোকে এরূপ আগ্রহ প্রদর্শন পূর্বক গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিলেন যে এক সপ্তাহের অনধিক কাল মধ্যেই প্রথম মুদ্রিত দুই সহস্র পুস্তক নিঃশেষ হইয়া গেল। তদর্শনে উৎসাহান্বিত হইয়া অগ্রজ মহাশয় আর তিন সহস্র পুস্তক মুদ্রিত করিয়াছিলেন, তাহাও অনতিবিলম্বে শেষ হইতে দেখিয়া পুনর্ব্বার দশ সহস্র মুদ্রিত করেন।” ‘বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদবিষয়ক প্রস্তাব’ বিষয়ক গ্রন্থে পরাশরসংহিতার শ্লোক তুলে বিদ্যাসাগর লিখলেন,—

‘নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ।

পঞ্চস্বাপংসু নারীণাং পতিরন্যে বিধীয়তে।’”

—পরাশর সংহিতার এই শ্লোকের অর্থ হল,—স্বামী যদি দীর্ঘদিন নিরুদ্দেশ হন, মারা যান, প্রব্রজ্য

অবলম্বন করেন, ক্লীব, অথর্ব বা পতিত হয়,—তাহলে এই পাঁচপ্রকার আপদকালীন পরিস্থিতিতে নারী পুনর্বাহ বিবাহ বন্ধনে শাস্ত্রীয় মতে বিবাহ করতে পারে। বিদ্যাসাগরের প্রথম পুস্তক প্রকাশিত হবার পর একাধিক পণ্ডিত বিদ্যাসাগরের বিরোধিতায় অবতীর্ণ হন এবং লেখনী ধারণ করেন। বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহ আন্দোলনের প্রবল বিরুদ্ধে ছিলেন,—ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন, ভবশঙ্কর বিদ্যারত্ন, কাশীনাথ তর্কালঙ্কার, রামতনু তর্কসিদ্ধান্ত, গঙ্গাধর কবিরাজ, মহেশচন্দ্র চূড়ামণি, দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন, জানকীজীবন ন্যায়রত্ন, শ্রীরাম তর্কালঙ্কার, ঈশানচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ, গোবিন্দকান্ত বিদ্যাভূষণ, জগদীশ্বর বিদ্যারত্ন, রামদাস তর্কসিদ্ধান্ত, প্রসন্নকুমার মুখোপাধ্যায়, নন্দকুমার কবিরত্ন, আনন্দচন্দ্র শিরোমণি, হারাধন কবিরাজ, রামদয়াল তর্করত্ন, রামধন বিদ্যাবাগীশ প্রমুখ^৩। এই পণ্ডিতদের প্রশ্নের জবাব দিতে বিদ্যাসাগর দ্বিতীয় পুস্তক প্রণয়ন করেন ১৮৫৫ সালের অক্টোবর মাসে। বিহারীলাল সরকার লিখেছেন,—“বিধবা-বিবাহ সংক্রান্ত প্রথম পুস্তিকা প্রকাশিত হইবার পর চারিদিকেই নানা পণ্ডিত-সমাজ হইতে ইহার প্রতিবাদ পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছিল। মুরশিদাবাদের বৈদ্য-প্রধান গঙ্গাধর কবিরাজ প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়াছিলেন।”^{৩৪}

বিদ্যাসাগর তাঁর ‘বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব’ (১৮৫৫) ২য় পুস্তকে লিখেছেন—“হা ভারতবর্ষীয় মানবগণ! আর কতকাল তোমরা, মোহনিদ্রায় অভিভূত হইয়া প্রমোদশয্যায় শয়ন করিয়া থাকিবে! একবার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখ, তোমাদের পুণ্যভূমি ভারতবর্ষ ব্যাভিচার দোষের ও ভ্রূণহত্যা পাপের স্রোতে উচ্ছলিত হইয়া যাইতেছে। ...বিধবাদিগের দুরবস্থা দর্শনে, তোমাদের চিরশুষ্ক নীরস হৃদয়ে কারুণ্য রসের সঞ্চার হওয়া কঠিন এবং ব্যাভিচার দোষের ও ভ্রূণহত্যা পাপের প্রবল স্রোতে দেশ উচ্ছলিত হইতে দেখিয়াও, মনে ঘৃণার উদয় হওয়া অসম্ভাবিত। তোমরা প্রাণতুল্য কন্যা প্রভৃতিকে অসহ্য বৈধব্যযন্ত্রণানলে দগ্ধ করিতে সম্মত আছ, তাহারা দুর্নিবাররিপুবশীভূত হইয়া ব্যাভিচার দোষে দূষিত হইলে, তাহার পোষকতা করিতে সম্মত আছ, ধর্মলোপভয়ে জলাঞ্জলি দিয়া, কেবল লোকলজ্জাভয়ে, তাহাদের ভ্রূণহত্যার সহায়তা করিয়া, স্বয়ং সপরিবারে পাপপঙ্কে কলঙ্কিত হইতে সম্মত আছ; কিন্তু কি আশ্চর্য! শাস্ত্রের বিধি অবলম্বনপূর্বক, তাহাদের পুনরায় বিবাহ দিয়া, তাহাদিগকে দুঃসহ বৈধব্য যন্ত্রণা হইতে পরিত্রাণ করিতে এবং আপনাদিগকেও সকল বিপদ হইতে মুক্ত করিতে সম্মত নহ। তোমরা মনে কর, পতিবিয়োগ হইলেই, স্ত্রীজাতির শরীর পাষণময় হইয়া যায়; দুঃখ আর দুঃখ বলিয়া বোধ হয় না; যন্ত্রণা আর যন্ত্রণা বলিয়া বোধ হয় না; দুর্জয় রিপুবর্গ এককালে নিম্নূল হইয়া যায়। কিন্তু, তোমাদের এই সিদ্ধান্ত যে নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক, পদে পদে তাহার উদাহরণ

প্রাপ্ত হইতেছে। ভাবিয়া দেখ, এই অনবধানদোষে সংসারতরুর কি বিষময় ফল ভোগ করিতেছ। হয় কি পরিতাপের বিষয়! যে দেশের পুরুষজাতির দয়া নাই, ধর্ম নাই, ন্যায় অন্যায় বিচার নাই, হিতাহিত বোধ নাই, সদসদ্বিবেচনা নাই, কেবল লৌকিকরক্ষাই প্রধান কর্ম ও পরম ধর্ম, আর যেন সে দেশে হতভাগা অবলাজাতি জন্মগ্রহণ না করে। হা অবলাগণ! তোমরা কি পাপে, ভারতবর্ষে আসিয়া, জন্মগ্রহণ কর, বলিতে পারি না।”^৬

বিধবা বিবাহ বিষয়ক বিদ্যাসাগরের দ্বিতীয় গ্রন্থ প্রকাশিত হবার পর বিদ্যাসাগরের প্রতি বিরুদ্ধ সমালোচনার তীব্রতা কিছুটা কমে আসে। বিদ্যাসাগরের এই একটি গ্রন্থ উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে একাধিক গ্রন্থ রচনার কেন্দ্রভূমিতে থেকেছে। বিদ্যাসাগরের ‘বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয় প্রস্তাব’ গ্রন্থের জনপ্রিয়তা ও বিধবা বিবাহ আন্দোলনের উদ্দীপনা সম্পর্কে রাজনারায়ণ বসু লিখেছেন,—“১৮৫৬ সালে বিধবা-বিবাহের আন্দোলন উঠে। শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় “বিধবা বিবাহ উচিত কিনা” একটি ক্ষুদ্র চর্চা [পুস্তিকা] প্রকাশ করাতে এই আন্দোলনের উৎপত্তি হয়। হিন্দুসমাজরূপ বিস্তীর্ণ হ্রদ স্থির ছিল; এ চর্চা [পুস্তিকা] বাহির হওয়াতে মহাবাত্যান্দোলিত সমুদ্রের ন্যায় অত্যন্ত অস্থির হইয়া উঠে ও ভয়ানক তরঙ্গ উঠাইতে থাকে। যাঁহারা এই আন্দোলন স্বচক্ষে দেখিয়াছেন তাঁহারাই উহার প্রকৃতি বুঝিতে পারিবেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এই বিষয়ক দ্বিতীয় প্রস্তাব প্রকাশিত হওয়াতে আন্দোলন আরও চতুর্গুণ বৃদ্ধি হইল। বিশেষতঃ ঐ পুস্তকের বাগদান অধ্যায় লইয়া বিশেষ আন্দোলন হয়। যেরূপে বিদ্যাসাগর মহাশয় আপনার পুস্তকে এ বিষয়ের মীমাংসা করিয়াছেন তাহা অতীব সন্তোষজনক।”^৭

বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহ আন্দোলনের বহুপূর্বে সমাজের নানান স্তরের বিধবার পুনর্বিবাহের বিষয়টি আলোচিত হয়েছিল। চেষ্টা চলেছিল বাল বিধবার পুনর্বিবাহ দেবার। বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহ আন্দোলন পূর্বকালে বিধবা বিবাহের বিরোধিতা করে বেশ কিছু প্রবন্ধ গ্রন্থ লেখা হয়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল,—গোবিন্দ চন্দ্র শর্ম্মার ‘বিধবা বিবাহ নিষেধ বিষয়কব্যবস্থা’ (১৭৬৭ শকাব্দ, ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দ), রামজয় শর্ম্মার ‘বিধবা-বিবাহ নিষেধ বিষয়ক ব্যবস্থা’ (১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দ)। এ গ্রন্থে বিধবা বিবাহের বিরোধিতা করে গোবিন্দচন্দ্র শর্ম্মা লিখেছেন,—“কলিযুগে মুনিদিগের বাক্যদ্বারা বিধবাদিগের বিবাহ যে বেদমতে নিষিদ্ধ তাহার প্রতি সদাচার প্রমাণও আবশ্যক হয় কেননা মিতাক্ষরাদৃত বচনে কহে লোকে যে কর্মকে দ্বৈষ করে তাহা করিলে স্বর্গ হয় না এজন্য তাহা আচরণ করিবেক না এই নিমিত্ত ঐ বচনে সদাচারেরও প্রামাণ্য কহিতেছেন যে নিবর্তিত কার্যে সাধুরদিগের আচারও বেদের ন্যায় প্রমাণ হয় অতএব বিধবা

বিবাহ নিষেধ।”^৭ আটাশ পৃষ্ঠার এই গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত পরিসরে প্রাবন্ধিক গোবিন্দচন্দ্র শর্মা, সংস্কৃত শ্লোক ও শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা সহযোগে বিধবা বিবাহের বিরোধিতা করেছেন কঠোর ভাবে। তাঁর কাছে বিধবা বিবাহে নারী কুল জাতি পতিত হয় এবং বিধবা হিন্দু নারী ‘বেশ্যা’তে পরিণত হয়। তাই তাঁর অভিমত সাধুরা কখন স্ত্রীদিগের পুনর্বিবাহ অনুমোদন করবেন না।

‘তত্ত্ববোধিনী সভা’ ও ‘তত্ত্ববোধিনী’ পত্রিকা বিধবা বিবাহ আন্দোলনের সপক্ষতায় বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। ১৭৭৬ শকাব্দের ফাল্গুন মাসে ‘তত্ত্ববোধিনী’ পত্রিকায় বিদ্যাসাগরের ‘বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা’—এই শিরোনামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এরপর ১৮৫৫ সালে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রবন্ধ গ্রন্থ ‘বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব’ গ্রন্থ প্রকাশের পর পরই,—সমকালে পক্ষে-বিপক্ষে প্রকাশিত হয় বেশ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ,—শিবনাথ রায়ের ‘বিধবা বিবাহ নিষেধ ব্যবস্থা’ (১৮৫৫), মধুসূদন স্মৃতিরত্নের ‘বিধবাবিবাহ প্রতিবাদ’ (১৮৫৫/১ম পুস্তক), রাখালদাস হালদার রচিত ‘বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া অবশ্য উচিত’ (১০ই মার্চ ১৮৫৫)। বর্ধমানের অধিবাসী শিবনাথ রায় ‘বিধবা বিবাহ নিষেধ ব্যবস্থা’ গ্রন্থে লিখেছেন,—“কলিযুগে বিবাহিত বিধবার গর্ভে স্বয়মুৎপাদিত পুত্রকে পৌনর্ভব বলিয়া গণনা করা কোনক্রমেই পরাশরের অভিপ্রেত বলিয়া প্রতিপন্ন করা যাইতে পারে না তাদৃশ পুত্রের পৌনর্ভব সত্তা পূর্ব পূর্বযুগের ব্যবহার ছিল যদি কলিযুগে সেই পুত্রকে পৌনর্ভব বলা আবশ্যক হইত তবে পরাশর কলিযুগের পুত্র গণনাস্থলে অবশ্যই পৌনর্ভব শব্দই নাই অতএব কলিযুগে বিবাহিতা বিধবার গর্ভে স্বয়মুৎপাদিত পুত্রকে পৌনর্ভব না বলিয়া ঔরস বলিয়া গণনা করিতে হইবেক তাহার সন্দেহ নাই...”^৮

বিদ্যাসাগর পঞ্চ আপদে (নষ্ট, ক্লীব, মৃত, পতিত, উদাসীন) নারীর পুনর্বিবাহের কথা বলেছেন। বিধবা বিবাহের বিরুদ্ধে বিরুদ্ধবাদীদের একটা বড় যুক্তি ছিল,—একবার কন্যাকে সম্প্রদান করলে কন্যার ওপর আর পিতার স্বত্ত্ব থাকে না। অতএব কন্যা বিধবা হলে দ্বিতীয়বার তাকে দান করা শাস্ত্রসম্মত নয়। বিদ্যাসাগর এই বক্তব্যের জবাবে জানিয়েছেন,—‘কন্যাদানস্থলের দান বাচনিক দান মাত্র, ভূমি ধেনু প্রভৃতির ন্যায় স্বত্বমূলক দান নহে।’ যে নারী, পতি কর্তৃক পরিত্যক্তা অথবা বিধবা হইয়া স্বেচ্ছাক্রমে পুনর্ভূ হয়, অর্থাৎ পুনরায় অন্য ব্যক্তিকে বিবাহ করে, এবং তার গর্ভে যে পুত্র জন্মায় তাকে পৌনর্ভব বলে।

বিদ্যাসাগর তাঁর ‘বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব’ গ্রন্থে বলেছেন,—বিধবা বিবাহকে মনু এবং পরাশর কেউই নিষিদ্ধ বলে মনে করেননি। তিনি

মহাভারতের উদাহরণ দিয়ে বলেছেন,—অর্জুন বিধবা নাগকন্যাকে বিবাহ করেছিলেন। অর্জুনের ঐরাবত কন্যা বিবাহের ঘটনা বিধবা বিবাহকেই সমর্থন করে। এই ঘটনাই কলিযুগের বিধবা বিবাহের সবচেয়ে বড় নিদর্শন। সমকালে পণ্ডিতেরা এই মতের খণ্ডন করে বলেছেন, দ্বাপর ও কলিযুগের সন্ধিকালেই পান্ডবদের জন্ম হয়েছিল। বিদ্যাসাগর জানিয়েছেন, বিধবা বিবাহ প্রচলিত না থাকার কারণে, সমাজে দারুণ রকমের ব্যভিচার দেখা দিয়েছে এবং ভ্রূণহত্যা, শিশুহত্যা বেড়ে গেছে। এর পাল্টা যুক্তি দিয়ে বিরুদ্ধবাদীরা জানিয়েছেন, ব্যভিচারে সধবা রমণীরাও লিপ্ত। পরাশর ঔরস, দত্তক ও কৃত্রিম —এই তিন প্রকার পুত্রের কথা বলেছিলেন। বিদ্যাসাগরের বিরোধীদের মূলত একটাই বক্তব্য—‘নষ্টমৃতে’ বচনে মনু বাগদত্তা নারীর পুনর্বিবাহের কথা বলেছেন,—বিধবা নারীর বিবাহের কথা বলেননি।

১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দের পরবর্তীকালে বিধবা বিবাহ বিষয়কে কেন্দ্র করে তর্কমূলক প্রবন্ধ গ্রন্থের সংখ্যা একাধিক। প্রসঙ্গত একটা তালিকা প্রদান করা যেতে পারে—^{১০}

বৈধব্য ধর্মোদয় (১৮৫৬ খ্রীঃ)—নন্দকুমার কবিরত্ন।

হিন্দু মহিলাগণের হীনাবস্থা (১৮৬৩ খ্রীঃ) — কৈলাসবাসিনী দেবী।

কলিযুগে বিধবা বিবাহ নিষেধ (১৮৬৪ খ্রীঃ)—যদুনাথ চট্টোপাধ্যায়।

নারীজাতি বিষয়ক প্রস্তাব (১৮৭০ খ্রীঃ)—কালীপ্রসন্ন ঘোষ।

বিধবা বিবাহ (১৯২৮ সন্থ/ইং ১৮৭২ খ্রীঃ)—নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী।

হিন্দু বিধবা বিবাহ সমালোচনী (১৮৭৫ খ্রীঃ)—যাদব চন্দ্র দাস।

বিধবাবিবাহের নিষেধক (১৮৭৭ খ্রীঃ)—শ্রীশ্যামাপদ ন্যায়ভূষণ প্রণীত।

সাম্য (১৮৭৯ খ্রীঃ)—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

হিন্দুবিবাহ সমালোচন—(১৯৩৫ সন্থ [ইং ১৮৭৯ খ্রীঃ], ২য় খন্ড)—ভুবনেশ্বর মিত্র।

The Law Relating To The Hindu Widow (1881 AD)-Trailokyanath Mitra, Calcutta.

বিধবা (১৮৮২ খ্রীঃ)—শ্রীব্রজনাথ বিশ্বাস।

স্ত্রীর প্রতি স্বামীর উপদেশ (১৮৮৪ খ্রীঃ)—সত্যচরণ মিত্র।

বঙ্গ-মহিলা (১৮৮৪ খ্রীঃ)—শ্রীযোগেন্দ্রনারায়ণ রায়, কলিকাতা।

বঙ্গ বিধবা বিপদভঞ্জন (১৮৮৪ খ্রীঃ)—যাদব চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

বিধবা বিবাহ খণ্ডনং (১৮৮৫ খ্রীঃ)—শ্রীশিবনাথ বিদ্যাবাচস্পতি, শান্তিপুর।

বিধবাবিবাহ বিধায়ক প্রবন্ধ সকলের সমালোচনা (১৮৮৫ খ্রীঃ)- (ছদ্মনাম)

শ্রীগণ্ডুষ জল সঞ্চরি

বিধবাবিবাহ প্রতিবাদ (১৮৮৬ খ্রীঃ)— শ্রীযুক্ত মধুসূদন স্মৃতিরত্ন।

বিধবা বিবাহ শাস্ত্র-বিরুদ্ধ (১৮৮৬ খ্রীঃ)— প্রসন্ন কুমার শর্মা, ময়মনসিংহ।

বিধবা বিবাহের শাস্ত্রীয়তা ও যুক্তিযুক্ততা (১৮৮৬ খ্রীঃ)— দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

বিবাহসংস্কার (১৮৮৮ খ্রীঃ)— দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী।

অবলা-বান্ধব (১৮৮৯ খ্রীঃ)— শ্রীশরচ্চন্দ্র ধর।

বিধবাবিবাহ প্রতিবাদ (১৮৮৯ খ্রীঃ)— শ্রীযোগীন্দ্রনাথ তর্কচূড়ামণি, কলিকাতা।

অধিকাংশ প্রবন্ধ গ্রন্থ বিধবা বিবাহের বিরুদ্ধে লেখা। এছাড়া সমকালে প্রকাশিত বঙ্গদর্শন, আর্যদর্শন, বামাবোধিনী, নবজীবন, ধর্মপ্রচারক প্রভৃতি পত্রিকায় বিধবা বিবাহের সমর্থনে ও বিরোধিতা করে বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়।

নীতিগত ভাবে বঙ্কিমচন্দ্র বিধবা বিবাহকে সমর্থন না জানালেও তাঁর ‘সাম্য’ (১৮৭৯) গ্রন্থে নারী পুরুষের সমানাধিকার প্রসঙ্গে বিধবা বিবাহের সমর্থনে যুক্তি দেখিয়েছেন। ‘সাম্য’ প্রবন্ধের পঞ্চম পরিচ্ছেদে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন,— “মনুষ্যে মনুষ্যে সমানাধিকার বিশিষ্ট—ইহাই সাম্যনীতি। ...যে যে কার্য্যে পুরুষের অধিকার আছে, স্ত্রীগণের সেই সেই কার্য্যে অধিকার থাকা ন্যায়সঙ্গত। ...অসম্মদেশে স্ত্রীপুরুষে যে ভয়ঙ্কর বৈষম্য, তাহা এক্ষণে আমাদের দেশীয়গণের কিছু কিছু হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে, এবং কয়েকটি বিষয়ে বৈষম্য বিনাশ করিবার জন্য সমাজ মধ্যে অনেক আন্দোলন হইতেছে। সে কয়টি বিষয় এই,—

১ম। পুরুষকে বিদ্যাশিক্ষা অবশ্য করিতে হয়; কিন্তু স্ত্রীগণ অশিক্ষিতা থাকে।

২য়। পুরুষের স্ত্রীবিয়োগ হইলে, সে পুনর্ব্বার দারপরিগ্রহ করিতে অধিকারী। কিন্তু স্ত্রীগণ বিধবা হইলে, আর বিবাহ করিতে অধিকারিণী নহে; বরং সর্ব্বভোগসুখ জলাঞ্জলি দিয়া চিরকাল ব্রহ্মচর্যাশ্রমে বাধ্য।

৩য়। পুরুষে যেখানে ইচ্ছা সেখানে যাইতে পারে, কিন্তু স্ত্রীলোক গৃহপ্রাচীর অতিক্রম করিতে পারে না।

৪র্থ। স্ত্রীগণ স্বামীর মৃত্যুর পরেও অন্য স্বামীগ্রহণে অধিকারী নহে, কিন্তু পুরুষগণ স্ত্রী বর্তমানেই, যথেষ্ট বহুবিবাহ করিতে পারেন।

...উপরে যে চারিটি সামাজিক বৈষম্যের উল্লেখ করিয়াছি, তন্মধ্যে দ্বিতীয়টি বিধবাবিবাহ সম্বন্ধীয়।

বিধবাবিবাহ ভাল কি মন্দ, এটি স্বতন্ত্র কথা।... যদি কোন বিধবা, হিন্দুই হউন, আর যে জাতীয়া হউন, পতির লোকান্তর পরে পুনঃপরিণয়ে ইচ্ছাবতী হয়েন, তবে তিনি অবশ্য তাহাতে অধিকারিণী। যদি পুরুষ পত্নীবিয়োগের পর পুনর্ব্বার দারপরিগ্রহে অধিকারী হয়, তবে সাম্যনীতির ফলে স্ত্রী পতিবিয়োগের পর অবশ্য, ইচ্ছা করিলে, পুনর্ব্বার পতিগ্রহণে অধিকারিণী।...পত্নীবিযুক্ত পতি, এবং পতিবিযুক্ত পত্নী ইচ্ছা হইলে পুনঃপরিণয়ে উভয়েই অধিকারী বটে।”^{১১}

‘সাম্য’(১৮৭৯) প্রবন্ধ গ্রন্থে স্ত্রী ও পুরুষের অধিকার প্রশ্নে বঙ্কিমচন্দ্র খুব জোরের সঙ্গেই বিধবা বিবাহকে সমর্থন করেছেন। যে বঙ্কিমচন্দ্রকে আমরা উপন্যাস সাহিত্যে দেখেছি বিধবা বিবাহের বিপক্ষে কাহিনী নির্মাণ করেছেন এবং নীতিগত প্রশ্নে বিধবা বিবাহকে সাংসারিক গোলযোগ ও সমাজ-পরিবার ভাঙন ও অবক্ষয়ের প্রধান কারণ হিসাবে দেখাচ্ছেন। সেই বঙ্কিমচন্দ্র ‘সাম্য’ প্রবন্ধ গ্রন্থে যুক্তি পরম্পরায় বিধবা বিবাহের পক্ষেই সওয়াল করছেন।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ‘সাম্য’ প্রবন্ধে লিখেছেন,—“যাঁহারা ইংরেজি শিক্ষার ফলে, অথবা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বা ব্রাহ্ম ধর্মের অনুরোধে, ইহা স্বীকার করেন, তাঁহারা ইহাকে কার্য্যে পরিণত করেন না। যিনি বিধবাকে বিবাহে অধিকারিণী বলিয়া স্বীকার করেন, তাঁহাদেরই গৃহস্থা বিধবা বিবাহার্থ ব্যাকুলা হইলেও তাঁহারা সে বিবাহে উদ্যোগী হইতে সাহস করেন না। তাহার কারণ, সমাজের ভয়...অনেকে মনে করেন যে, চিরবৈধব্য বন্ধনে, হিন্দু মহিলাদিগের পাতিব্রত্য এরূপ দৃঢ়বদ্ধ যে, তাহার অন্যথা কামনা করা বিধেয় নহে।...কথাটি সত্য বলিয়াই না হয় স্বীকার করিলাম। যদি তাই হয়, তবে নিয়মটি একতরফা রাখ কেন? বিধবার চিরবৈধব্য যদি সমাজের মঙ্গলকর হয়, তবে মৃত ভার্য্যাপুরুষের চিরপত্নীহীনতা বিধান কর না কেন? তুমি মরিলে, তোমার স্ত্রীর আর গতি নাই, এজন্য তোমার স্ত্রী অধিকতর প্রেমশালিনী; সেইরূপ তোমার স্ত্রী মরিলে, তোমারও আর গতি হইবে না, যদি এমন নিয়ম হয়, তবে তুমিও অধিকতর প্রেমশালী হইবে। এবং দাম্পত্য সুখ, গার্হস্থ্য সুখ দ্বিগুণ বৃদ্ধি হইবে। কিন্তু তোমার বেলা সে নিয়ম খাটে না কেন? কেবল অবলা স্ত্রীর বেলা সে নিয়ম কেন?”^{১২}

বস্তুত বঙ্কিমচন্দ্র ‘বিধবাবিবাহের’ অন্তরায় রূপে দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের অবতারণা করেছেন,— এক. পুরুষজাতি সমাজের কর্তা এবং তারাই সমাজনিয়ন্ত্রক। দুই. লোকাচারের অলঙ্ঘনীয় প্রাচীরসম বাধা ও লোকভয়।

১৮৫৬ সালে বিধবা বিবাহ চালু হবার পর উনিশ শতকের বাংলা কবিতায় স্থান করে নেয় বিধবা বিবাহ প্রসঙ্গ। লেখা হয় গান, কাব্য—কবিতা, ছড়া, প্যারোডি। ছড়া কবিতা গান

প্যারোডি প্রভৃতিতে হিন্দু নারীর পুনর্বিবাহের ঘটনায়, হাস্য কৌতুক ও বিদ্রূপের প্লাবন বয়ে যায় নগর কলকাতায়। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ‘বিধবা বিবাহ বিষয়ক এতদবিষয়ক প্রস্তাব’(১৮৫৫) গ্রন্থ প্রকাশিত হবার পর বিধবা বিবাহের সমর্থনে ‘সমাচার সুধাবর্ষণ’ পত্রিকায় ‘বিধবা বিবাহ’ নামক একটি দীর্ঘ কবিতা প্রকাশিত হয়। সম্ভবত বিধবা বিবাহের সমর্থনে প্রকাশিত প্রথম কবিতা এটি। চুয়ান্ন ছত্রের দীর্ঘ এক কবিতায় সমকালীন বিধবা বিবাহের আগাম উন্মাদনার ছবি লক্ষণীয়—

“শুন ২ বিধবারা শুভ সমাচার।

.....

ইইয়াছে যত গ্রন্থ বিবাহ বিপক্ষে।

তিষ্ঠীতে না পারিবেক সাগর সমক্ষে।

...সাজ গো বিধবাগণ ফুটিয়াছে ফুল।

তোমাদের সৌভাগ্য ঈশ্বর সানুকুল।।

... আমরা বলিয়া রাখি বিধবারা সবে।

শঙ্খ শাড়ী পরিয়া প্রস্তুতভাবে রবে।।

পড়িবেন ঈশ্বর এ বিবাহের মন্ত্র।

খাটিবেনা আর কারু তাল মান যন্ত্র।”^{৩০}

বিধবা বিবাহকে সমর্থন করে বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় (কবি ধীরাজ) লেখেন একটি গান, যা সেকালের সাধারণ মানুষের মুখে মুখে ফেরে। এমনকি, শান্তিপুুরের তাঁতিরা কাপড়ের পাড়ে লিখে দেন এই গান,—

“বেঁচে থাক বিদ্যাসাগর চিরজীবী হয়ে,

সদরে করেছে রিপোর্ট বিধবাদের হবে বিয়ে।

কবে হবে এমন দিন, প্রকাশ হবে এ আইন,

দেশে দেশে জেলায় জেলায় বেরোবে হুকুম,

বিধবা রমণীর বিয়ের লেগে যাবে ধুম,

সধবাদের সঙ্গে যাবো, বরণডালা মাথায় লয়ে।

আর কেন ভাবিস লো সই, ঈশ্বর দিয়াছেন সই,

রাধাকান্ত মনোভারান্ত দিলেন নাকো সই,

লোকমুখে শুনে আমরা আছি লোক লাজ ভয়ে।”^{১৪}

বিদ্যাসাগরের ভ্রাতা শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্নের ‘বিদ্যাসাগর জীবন চরিত’ গ্রন্থসূত্রে জানা যায়, শান্তিপুরের তাঁতিদের বোনা এই বহুমূল্য দামের কাপড় পরে সেকালের অনেক অসহায় বিধবা নারী কলকাতায় আসতেন বিদ্যাসাগরকে দেখাবার জন্য। বিদ্যাসাগরের বিরুদ্ধবাদীরা পয়সা দিয়ে বিদ্যাসাগরের বিরুদ্ধে ছড়া কাটিয়ে লিখিয়েছিলেন,—‘শুয়ে থাক বিদ্যাসাগর চিররুগী হয়ে।’ (প্যারাডী)। সেকালের বিশিষ্ট গীতিকার রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় (ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের দাদা) বিধবা বিবাহকে ব্যঙ্গ করে একটি জনপ্রিয় গান লেখেন,—

“বেঁচে গেলুম অলো দিদি একাদশীর দায়ে,
বিদ্যাসাগর দেবে নাকি বিধবা রমণীর বিয়ে,
শাঁখা, খাড়ু, পড়বে হাতে, খেতে পাব মাছে ভাতে,
শাড়ী, সিন্দুর, পরে আবার বেড়াবে লো এয়ো হয়ে।
জামাই আসবেন শ্বশুর বাড়ী, বেশ করিব তাড়াতাড়ি,
গা দুলিয়ে চলব (আবার) হরেক রকম বাহার দিয়ে।”^{১৫}

রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায়ের জীবনীকার হরিমোহন মুখোপাধ্যায় লিখেছেন,—“স্বর্গীয় ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় বিধবা-বিবাহের মত চলিত করিলে রঙ্গলাল বাবু হাস্যোদ্দীপক এই গান বাঁধিয়াছিলেন।...উঁড়কায় [দ্বারকায়] রঙ্গলাল বাবু একটি ধর্মসভা করিয়াছিলেন। সেই সভার জন্য তিনি গান রচনা করেন।”^{১৬}

উনিশ শতকের অন্যতম চিন্তাশীল প্রাবন্ধিক ও কবি ঈশ্বর গুপ্ত (১৮১২-১৮৫৯) সমকালীন বিধবার পুনর্বিবাহের প্রসঙ্গটিকে কবিতার বিষয় হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। বিধবা বিবাহকে ঈশ্বর গুপ্ত তীব্র শ্লেষ ও ব্যঙ্গের শাণিত উচ্চারণে কবিতায় তুলে ধরেছেন। ঈশ্বরগুপ্ত ‘বিধবা বিবাহ’ প্রসঙ্গ অবলম্বনে দুটি কবিতা রচনা করেন—‘বিধবা-বিবাহ’ (৪৪ ছত্রের কবিতা), ‘বিধবা বিবাহ আইন’ (৮২ ছত্রের কবিতা)। ‘বিধবা বিবাহ’ কবিতায় ঈশ্বর গুপ্ত লিখেছেন,—

“বাধিয়াছে দলাদলি লাগিয়াছে গোল।
বিধবার বিয়ে হবে, বাজিয়াছে ঢোল।।
কত বাদী প্রতিবাদী করে কত রব।
ছেলে বুড়া আদি করি, মাতিয়াছে সব।।”^{১৭}

এ কবিতায় কবি সমকালীন বিধবা বিবাহের বিরুদ্ধবাদীদের মতামত ও কলকাতার হুজুগে

বাঙালির ছবি এঁকেছেন। ‘অক্ষতযোনি’র বিধবা ও ‘ক্ষতযোনি’র বিধবা উভয়েরই পুনর্বিবাহকে কটাক্ষ করেছেন গুপ্ত কবি,—

“অনেকেই এইমত লভেছে বিধান।

“অক্ষতযোনির” বটে বিবাহ-বিধান।।

কেহ বলে ক্ষতাক্ষত কেবা আর বাছে?

একেবারে তরে যাক্ যত রাঁড়ী আছে।

.....

বুকে ছেলে কাঁকে ছেলে ছেলে ঝোলে কোলে।

তার বিয়ে বিধি নয় উলু উলু বলে।।

.....

যেখানে সেখানে শুনি এই কলরব।

বালার বিবাহ দিতে রাজি আছে সব।।

সকলেই এইরূপ বলাবলি করে।

ছুঁড়ীর কল্যাণে যেন বুড়ী নাহি তরে।।”^{১৮}

বস্তুত ‘বিধবা বিবাহ’ নিয়ে সমাজের সর্বস্তরে যে কৌতূহল ও উদ্দীপনা লক্ষ্য করা গিয়েছিল তারই এক জীবন্ত ছবি উপস্থিত করেছেন ঈশ্বর গুপ্ত; বাল বিধবার বিবাহ দিতে সবাই উৎসুক। কিন্তু অনেকেই আশঙ্কা করেছেন, বাল বিধবার বিবাহের সুযোগ নিয়ে না প্রৌঢ় বিধবা বৈধব্য আচার ফেলে পুনর্বিবাহের সামিল হয়ে যায়। ১৮৫৬ সালে বিধবা বিবাহ আইনত স্বীকৃতি পেলে ঈশ্বর গুপ্ত লেখেন ‘বিধবা-বিবাহ আইন’ নামক এক দীর্ঘ কবিতা। এ কবিতায় ‘বিধবা বিবাহ আইন’ বিলকে গ্রান্টের ‘কাল বিল’ বলে উল্লেখ করেছেন,—

“গ্রান্ট করি গ্রান্টের সকল অভিলাষ।

কালবিল কাল বিল করিলেন পাস

না হইতে শাস্ত্রমতে বিচারের শেষ।

বল করি করিলেন আইন আদেশ।।”^{১৯}

তিনি আরো জানিয়েছেন,— ইংরেজ রাজা হয়ে পরের ধর্মে হস্তক্ষেপ করা মোটেই উচিত হয়নি। প্রবল বিদ্রোহ করে তিনি লিখেছেন,—

“কোলে কাঁকে ছেলে ঝোলে যে সকল রাঁড়ী।

তাহারা সধবা হবে,পরে শাঁকা শাড়ী।।
এ বড় হাসির কথা, শুনে লাগে ডর।
কেমন কেমন করে মনের ভিতর।।
শাস্ত্র নয়, যুক্তি নয়, হবে কি প্রকারে?
দেশাচারে ব্যবহারে, বাধো বাধো করে।।”^{২০}

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত বলিষ্ঠ ভাবে ‘বিধবার’ পুনর্বিবাহের বিষয়টি নিয়ে শুধু ব্যঙ্গই করেননি, রীতিমত গালমন্দ করেছেন। পরবর্তী কালে আমরা দেখবো পাঁচালীকার দাশুরথি রায় কবি ঈশ্বরগুপ্তকে কটাক্ষ করেছেন, নিন্দা করেছেন।

উনিশ শতকের বিশিষ্ট পাঁচালীকার, ছড়াকার ও লোককবি হলেন দাশুরথি রায় (১৮০৫-১৮৫৭)। তাঁর পাঁচালীতে যেমন উঠে এসেছে পৌরাণিক বিষয়সমূহ তেমনি সমকালীন সমাজ বিষয় তাঁর পাঁচালীর প্রধান অবলম্বন হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র যেমন কবি ঈশ্বরগুপ্তকে বলেছিলেন, —‘খাঁটি বাঙালি কবি’, তেমনি রসিকচন্দ্র রায় লিখেছেন,—‘দাশুরথিই খাঁটি বাঙ্গালীর শেষ কবি।’ দাশুরথি রায় ছিলেন, একাধারে শিক্ষিতজনের কবি ও অশিক্ষিতজনের কবি। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত যেখানে রক্ষণশীল মনোভাব নিয়ে ‘বিধবা বিবাহ’র মত সমাজের প্রগতিশীল বিষয় নিয়ে বিরোধিতা করেছেন, সেখানে দাশুরথি রায় বিধবা বিবাহকে ‘সমাজ মঙ্গল’ হিসাবে দেখেছেন। ১৮৫৬ সালে বিধবা বিবাহ চালু হবার পর তিনি সমকালীন ‘বিধবা বিবাহ’ বিষয়কে সমর্থন করে লেখেন ‘বিধবা বিবাহ’ পাঁচালী পালা। নারীর বয়ানে বিদ্যাসাগরকে দাশুরথি রায় ‘গুণনিধি অবতার’ রূপে বর্ণনা করেছেন,—

“আমাদিগের দিতে নাগর

এলেন গুণের বিদ্যাসাগর,

বিধবা পার করিতে তরির [তরী’র], গুণনিধি।”^{২১}

দাশুরথি রায়ের ‘বিধবা বিবাহ’ পাঁচালীতে পাওয়া যায়,—তর্কে বিতর্কে উত্তাল উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের কলকাতার নাগরিক জীবনের ছবি,—

“বিধবার বিবাহ কথা

কলির প্রধান কলিকাতা,—

নগরে উঠেছে এই রব।

কাটাকাটি হচ্ছে বাণ

ক্রমে দেখছি বলবান

হবার কথা হয়ে উঠেছে সব।”^{২২}

পুনর্বিবাহে দুঃখী বিধবা নারীদের পূর্ব স্বামীসুখের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন কবি দাশরথি রায়,—

“সই লো! তোর মরা মানুষ ফিরেছে।

কিন্তু পচে নাই, কিঞ্চিৎ রসেছে।।

আমি দেখে এলোম [এলেম] রাণাঘাটে,

ভাসতে ভাসতে আসতেছে।।

...শুন ও লো মতি! হবে তোর পতি,

আবার অভিমানে, মনের দুঃখে,

ঘাড় বাঁকায়ে রয়েছে।”^{২৩}

‘বিধবা বিবাহে’র বিরুদ্ধবাদীদের যুক্তিকে নস্যাত করে দিয়ে বিদ্যাসাগরের যুক্তি যে শেষ পর্যন্ত জয়ী হবে এবং বিধবাদের মুখে হাসি ফুটবে, সেই আশাবাদের সুর ধ্বনিত হয়েছে দাশরথি রায়ের ‘বিধবা-বিবাহ’ পাঁচালীতে; এ পালায় তিনি লিখেছেন,—

“বিধবা করে গর্ভ-পাত, অমঙ্গল উৎপাত,

এতে রাজার রাজ্য হতে পারে?

হিন্দু ধর্ম্মে যারা রত, প্রমাণ দিয়ে নানা মত,

হবে না বলে করিতেছেন উক্ত।

ইহাদের যে উত্তর, টিক্বে নাকো উত্তর,

উত্তীর্ণ হওয়া অতি শক্ত।”^{২৪}

বিধবা বিবাহকে সমর্থন করে দাশরথি রায় সওয়াল করেছেন তাঁর পাঁচালীতে। এমনকি বিধবাবিবাহের বিপক্ষে যাঁরা তাঁদেরকে তীক্ষ্ণ বাক্যবাণে বিদ্রপ করেছেন,—

“কতকগুলো অদান্মিকে, বিপক্ষ বিধবার দিকে,

জুটেছে কলিকাতায়, এই কথায়—

তারা বিপক্ষ হয় হয়ে বাদী।

ঈশ্বর গুপ্ত অল্লোয়ে,

নারীর রোগ চেনে না বৈদ্য হয়ে,—

হাতুড়ে বৈদ্যেতে যেন

বিষ দিয়ে দেয় প্রাণে বধি।”^{২৫}

কবিগানের ঢঙে দাশরথি রায় বিধবা বিবাহের বিরোধী পক্ষ এবং জাতিতে বৈদ্য ঈশ্বরগুপ্তকে কটাক্ষ ও কটুক্তি করেছেন। তিনি বলেছেন— হিন্দু নারীর বৈধব্য একটা রোগ। এর প্রতিকার হওয়া দরকার। বিধবা বিবাহ যেন বিধাতার অবিচার। ঈশ্বরের প্রতি কবি প্রশ্ন তুলেছেন,—

“অবিচার বিধাতার দেহে নাই ধর্ম তার

নারী পুরুষ তাঁর দুই সৃষ্টি।

বিধাতা পুরুষদিগকে,

দেখেছে কি সোণার চখে,

রমণীদিগে কেবল বিষদৃষ্টি।।

এত বিধির পক্ষপাত!

রমণীর পক্ষে পক্ষাঘাত,

পুরুষের সঙ্গে গলাগলি ভারি।”^{২৬}

কবি এভাবেই নারীর প্রতি সহমর্মিতায় একাধিক প্রশ্ন তুলেছেন সমকালে অনেকেই মনে করেছেন, হিন্দু বিধবার বিবাহ অসম্ভব। কবি লোক মুখের সেই অসম্ভব গুঞ্জনকে তাঁর এই পাঁচালীতে রূপ দিয়েছেন। এর পাশাপাশি কবি তুলে ধরেছেন প্রৌঢ় রমণীর ‘বিধবা বিবাহ’ না হওয়ার আক্ষেপ। প্রৌঢ়া রমণীর বিধবা বিবাহে আগ্রহ থাকলেও যেহেতু তিনি বিগত যৌবনা তাই তাঁর আক্ষেপের অন্ত্য নেই,—

“প্রবীণে বলে, শুনেছি ভাই!

ছার কথায় আর কাজ নাই,

বেল পাকিলে কাকের কিবা সুখ?

নাক মুখ চক্ষু বুক, বজায় আছে তোদের সুখ,

এসে, ভ্রমর তোদের যৌবন-কমলে বসুক।।

আমার, বয়স প্রায় বাহান্নর,

মনের মতন পাত্তর,

আর তো কেউ যুটিবে না লো ঘরে।”^{২৭}

বিধবা বিবাহ চালু হওয়া এবং প্রৌঢ় বিধবার পুনর্বিবাহ না হওয়ার আক্ষেপ-যন্ত্রণার প্রকাশের মধ্য দিয়ে কবি দাশরথি রায় তাঁর ‘বিধবা বিবাহ’ পাঁচালী কাব্য শেষ করেছেন।

১৮৬১ সালে প্রকাশিত হয় মাইকেল মধুসূদন দত্তের ‘মেঘনাদবধ কাব্য’। এ-কাব্যে বিধবা প্রমীলাকে কবি মহাবীর্যবতী নারী রূপে চিত্রিত করেছেন। ঈন্দ্রজিতের চিতায় আরোহন দৃশ্যে কবি প্রমীলার বৈধব্য বেদনাকে হাহাকারে পরিণত করেছেন কবি,—

“অবগাহি দেহ

মহাতীর্থে সাধবী সতী প্রমীলা সুন্দরী

খুলি রত্ন-আভরণ, বিতরিলা সবে।

.....

পতি বিনা অবলার কি গতি জগতে?

আর কি কহিব, সখি?”^{২৮}

প্রমীলা যদিও সহমরণে গেছে। তাকে বৈধব্যের যন্ত্রণা সহ্য করতে হয়নি। বৈধব্য যন্ত্রণার আর্তি ফিরে এসেছে মধুসূদনের ‘বীরঙ্গনা’ (১৮৬২) পত্রকাব্যের ‘লক্ষ্মণের প্রতি শূর্পগংখা’ পত্রে। রামায়ণ কাহিনী সূত্রে জানা যায়, শূর্পগংখার স্বামী ছিলেন বিদ্যুৎজিহ্ব। রাবণ তাঁকে চিনতে না পেরে তীরবিদ্ধ করে তাঁর মৃত্যু ঘটান। শূর্পগংখা রাবণকে তিরস্কার করেন। লজ্জায় শোকে রাবণ শূর্পগংখাকে কথা দেন, বিধবা বোন শূর্পগংখাকে—দান, মান ও প্রসাদ দ্বারা তিনি পালন করবেন। বিধবা শূর্পগংখা অরণ্যে রামের রূপে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে বিবাহ প্রস্তাব দেন। লক্ষ্মণ শূর্পগংখার প্রেম প্রত্যাখান করেন এবং শূর্পগংখা পীড়াপীড়ি করলে লক্ষ্মণ শূর্পগংখার নাক কেটে দেন। ‘বীরঙ্গনা’ পত্রকাব্যে ‘লক্ষ্মণের প্রতি শূর্পগংখা’ পত্রে মধুসূদন শূর্পগংখার প্রেম ভাবনার রূপ নির্মাণে বিধবার মর্মজ্বালাকে মনস্তাত্ত্বিক ভাবে বুনে দিয়েছেন,—

“মণিযোনি খনি যত, দিব হে তোমারে!

.....

...এস গুণনিধি,

দেখ আসি,—এ মিনতি দাসীর ও পদে!

কায়, মনঃ প্রাণ আমি সাঁপিব তোমারে!

.....

দিব এ যৌবন-ধন প্রেম-কুতূহলে!

প্রেমাধীনা নারীকুল ডরে কি হে দিতে

জলাঞ্জলি, মঞ্জুকেশি, কুল, মান, ধনে,

.....
...কর দয়া কর মোরে।

প্রেম ভিখারিণী আমি তোমার চরণে।”^{২৯}

বিদ্যাসাগর তাঁর ‘বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব’ গ্রন্থে লিখেছেন,
—‘পতিবিয়োগ হইলেই স্ত্রীজাতির...দুর্জয় রিপুবর্গ এককালে নির্মূল হইয়া যায় না।’ শূর্ণখা
সেই রক্তমাংসের মানবী বিধবা কামনা বাসনা বা রিপুকে দমন করতে পারেনি। তার কামনা
প্রেম হিসাবে প্রকাশিত হয়েছে সুদর্শন লক্ষ্মণের কাছে। শূর্ণখার এই প্রেম নিবেদনের মধ্যে
অকাল বৈধব্যের অতৃপ্তিজনিত মর্মজ্বালা ও প্রেমবাসনা ব্যক্ত হয়েছে।

উনিশ শতকে মহাকাব্যের কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর চূর্ণ কবিতায় সমকালীন
বিধবা বিবাহ বিষয়কে অবলম্বন করে কবিতা রচনা করেছেন। তাঁর কবিতায় ধরা পড়েছে বিধবা
রমণীদের প্রতি সহানুভূতি ও সহমর্মিতা। হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ‘কবিতাবলী’ (১৮৭০
১ম খণ্ড) গ্রন্থের ‘বিধবা রমণী’ ও ‘হতাশার আক্ষেপ’ কবিতা দুটিতে বিধবার মর্মজ্বালাকে স্থান
দিয়েছেন। ‘বিধবা রমণী’ কবিতায় হেমচন্দ্র লিখেছেন,—

“ভারতের পতিহীনা নারী বুঝি অই রে!

না হলে এমন দশা নারী আর কইরে;

মলিন বসনখানি অঙ্গে আচ্ছাদন,

আহা দেখ অঙ্গে নাই অঙ্গের ভূষণ!”^{৩০}

বিধবা হওয়ার পর নারীর যে কুসুম চন্দন, কর্পূর তাম্বুল গ্রহণের অধিকার চলে যায় সেকথা
সহমর্মিতার সঙ্গে বলেছেন কবি। বিধবা নারীর মুখে না থাকে হাসি, নয়নে না থাকে জ্যোতি—শুধু
ধরা দেয় মলিন বিষাদ। কবি বাঙালি জাতির পাষণ্ড হৃদয় ও শাস্ত্রের নিষ্ঠুর বিধানকে আঘাত
হেনে বলেছেন,—

“হায় রে নিষ্ঠুর জাতি পাষণ্ড-হৃদয়,

দেখে শুনে এ যন্ত্রণা তবু অন্ধ হয়,

বালিকা যুবতী ভেদ করে না বিচার,

নারী বধ ক’রে তুষ্ঠ করে দেশাচার।

এই যদি এ দেশের শাস্ত্রের লিখন,

এ দেশে রমণী তবে জন্মে কি কারণ?

পুরুষ দুদিন পরে আবার বিবাহ করে

অবলা রমণী ব'লে এতই কি সয় রে?"^{১১}

একাল্লটি ছত্রে ও ছয়টি স্তবকে বিন্যস্ত এই দীর্ঘ কবিতায় কবি বিধবা নারীর আত্মিক সহমর্মিতার সঙ্গে অনুভব করেছেন এবং চিত্রিত করেছেন। হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ‘কবিতাবলী’ (১ম খণ্ড) গ্রন্থের ‘হতাশার আক্ষেপ’ কবিতায় পুনরায় উঠে এসেছে মলিনমুখী বিধবা নারীর করুণ প্রতিচ্ছবি। এ কবিতায় কবি দুই যুবক-যুবতীর ব্যর্থ প্রণয় বৃত্তান্ত ব্যক্ত করেছেন। লোক-লজ্জা মান ভয়ে ও সমাজ অনুশাসনের কারণে পিতামাতা কুলীন ব্রাহ্মণের সঙ্গে বিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছেন। বিয়ের অল্পকাল পরেই নারীটি অকাল বৈধব্যের স্বীকার হয়েছে। এই করুণ পরিণতির জন্য কবি দুষ্ট দেশাচারকে দোষারোপ করেছেন,—

“কত ক্ষণে অকস্মাৎ,

“বিধবা হয়েছি নাথ”

ব'লে প্রিয়তমা ভূমে লুটাইয়া পড়ে রে।

বদন চুম্বন ক'রে

রাখিলাম ক্রোড়ে ধ'রে,

শুনিলাম মৃদু স্বরে ধীরে ধীরে বলে রে—

“ছিলাম তোমারি আমি,

তুমিই আমার স্বামী,

ফিরে জন্মে, প্রাণনাথ, পাই যেন তোমারে।”^{১২}

ত্রিপদী বিন্যাসে পঞ্চাশটি ছত্রে ও এগারটি স্তবকে বিন্যস্ত ‘হতাশার আক্ষেপ’ কবিতায় কবি সমাজ অনুশাসন জনিত কারণে ঘটে চলা ব্যর্থ প্রণয় ও বৈধব্যের অভিষাপ ও মনোজ্বালাকে কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মনস্তাত্ত্বিক ভাবে চিত্রিত করেছেন।

উনিশ শতকের মহাকাব্য রচনাধারার বিশিষ্ট কবি হলেন নবীনচন্দ্র সেন। তাঁর কবিতায় শোনা গেছে নবজাগরণের বাণী। উনিশ শতকের যুগপটে দাঁড়িয়ে সমকালের প্রগতিশীল বিধবা বিবাহ আন্দোলনকে তিনি সমর্থন জানিয়েছেন চূর্ণ কবিতার মধ্য দিয়ে। তাঁর ‘অবকাশরঞ্জিনী’ কাব্যের (১ম খণ্ড ও ২য় খণ্ড ১৮৭১), ‘বিধবা কামিনী’, ‘প্রতিমা বিসর্জন’, ‘বিষণ্ণকমল’, ‘কে তুমি’, ‘অবলাবান্ধব’ প্রভৃতি কবিতায় উঠে এসেছে বিধবা বিবাহ প্রসঙ্গ। ‘বিধবা কামিনী’ কবিতাটি লেখা হয় ১৮৬৪ সালে। কবি নবীনচন্দ্র তখন কলেজের ছাত্র ও তরুণ কবি। ‘বিধবা কামিনী’ ছেচল্লিশটি স্তবকে বিন্যস্ত ১৮৪ পংক্তির দীর্ঘ কবিতা। কবিতা না বলে এটাকে আখ্যানকাব্য বলাই সম্ভব হবে। এই কবিতায় কবি বিধবা নারীর দুর্নিবার রিপূর জ্বালাকে তুলে ধরেছেন,—

“কে জানে মানস-বৃত্তি এত দুর্নিবার,

বুঝাইলে তবু নাহি বুঝে পাপ মন?

গোপনে, অজ্ঞাত, দুষ্ট করে অত্যাচার,

ইচ্ছার বিরুদ্ধে পাপ করে আচরণ?”^{৩৩}

বিধবা নারী মন দহনে কষ্টে আজ অনুজ্জ্বল। জীবনের সব রঙ সব সুখ বৈধব্যের মলিনতায় আজ আচ্ছন্ন। কবি লেখেন,—

“মলিন বদন আহা! মলিন বসন,

মলিন রূপের আভা মলিন বরণ,

চন্দ্রমুখ হইয়াছে কালীর বরণ,

এতই নিষ্ঠুর কি হে বিধাতার মন।”^{৩৪}

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রবর্তিত ‘বিধবা বিবাহ’ আদৌ সমাজের সর্বস্তরে গৃহীত হবে কিনা এই নিয়ে নারীর অন্তর মহলে নানা কুণ্ঠাবোধ ও সংস্কারের অবগুণ্ঠন ছিল। ‘বিধবা বিবাহ’ আইনত ও শাস্ত্রগত ভাবে স্বীকৃতি পেলেও অনেক ক্ষেত্রে পারিবারিক অনুশাসন, রক্ষণশীলতা, গোঁড়ামো বিধবা বিবাহের প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। নবীনচন্দ্র সেন তাঁর ‘প্রতিমা বিসর্জন’ কবিতায় এক বিধবা নারীর আত্মকথনে পুনর্বিবাহের দ্বিধা সংকটকে প্রকাশ করেছেন এইভাবে,—

“ভাঙ্গিয়াছে আশানিদ্রা জানিয়াছি সার,

হবে না, হবে না তুমি, হবে না আমার।

উদ্বাহ-বন্ধনে (কিবা বিধাতার)

হবে না আমার তুমি, হবে না তোমার।”^{৩৫}

কবিতার শেষে কবি জানিয়েছেন, দুঃসহ বেদনার দহে আত্মঘাতী হতে বাধ্য হয়েছে বিধবা নারীটি,—

“শব দেহে সব সবে, বিদায় এখন

.....

নিরাশার কাল ছুরি হানিলাম বুকে,

যায় যায় যাক প্রাণ কায কি এ দুখে।”^{৩৬}

‘বিষম্ব কমল’ কবিতা কবি নবীনচন্দ্র সেন, বাল বিধবার প্রাণোচ্ছল জীবনীশক্তির মধ্যে মলিনতার বৈধব্য আচারকে চিত্রায়িত করেছেন এবং প্রশ্ন করেছেন সমাজের কাছে। দেশাচারকে কটাক্ষ করেছেন কবি,—

“পোড়া দেশাচার এমন রতনে,
অযতনে এত কিসের লাগিয়া;
কিসের লাগিয়া সোণার যৌবনে
বিকচ নলিনী মরে শুকাইয়া?”^{৩৭}

‘বিধবা বিবাহে’র বিরুদ্ধচারীদের প্রতি কবি বিষোদগার করেছেন এ কবিতায়। যাঁরা বিধবা বিবাহের বিরোধী, কবি তাঁদেরকে,—পাষণ হৃদয়, নিরেট, অধম, অসভ্য, দেশের পাপাত্মা, হৃদয়হীন, মরম হীন বলে এক প্রকার গালি দিয়েছেন।

‘কে তুমি’ কবিতায় নবীনচন্দ্র বাঙালির দুর্গোৎসবের আনন্দঘন চিত্র অঙ্কন করেছেন। এই আনন্দঘন মুহূর্তের মাঝে তুলে ধরেছেন এক বঙ্গ বিধবার করুণ প্রতিচ্ছবি। তিনি একাকিনী, সজল নয়না। কেননা তাঁর প্রাণোচ্ছল জীবনের সব রঙ মুছে গেছে, অকাল বৈধব্যের অভিশাপে। শারদ অর্ঘ্যের আনন্দযজ্ঞে সামিল হবার তার অধিকার নেই। বিলাস ব্যাসনে তার অধিকার নেই; নেই সবার মাঝে মিলনের আনন্দধারায় স্নাত হবার অধিকার। তিনি অবজ্ঞার মত একা, ঘৃণার মত একা। বৈধব্যের তুচ্ছ আচারের গণ্ডিতে তিনি আবদ্ধ। কবি লিখেছেন,—

“বসি’ একাকিনী, সজলনয়না
কে তুমি, রমণি? কেন বিশ্বপ্লাবী
আনন্দ-প্রবাহ পশিল না তব
কোমল হৃদয়ে? ভুলিল না তাহে
একটি হিল্লোলে? ...

.....

বিষাদে নিশ্বাসি’
তুলিল বদন বামা; দেখিলাম—
বঙ্গের দুঃখিনী বিধবা রমণী।”^{৩৮}

১৮৬৩ সালে ঢাকা হতে প্রকাশিত হয় হরিশচন্দ্র মিত্রের ‘বিধবা বঙ্গাঙ্গনা’ কাব্য। হরিশচন্দ্র মিত্র (১৮৩৮-১৮৭২) ছিলেন ঢাকা থেকে প্রকাশিত ‘মিত্র প্রকাশ’ পত্রিকার সম্পাদক। ‘বিধবা বঙ্গাঙ্গনা’ কাব্যটিকে কবি উৎসর্গ করেন ‘বিধবা বিবাহ’ আন্দোলনের কাণ্ডারী ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়কে। ‘বিধবা বঙ্গাঙ্গনা’ কাব্যে হরিশচন্দ্র মিত্র একটি বিধবা নারীর আত্মকথনে কঠোর ব্রহ্মচর্য ও বৈধব্য আচার পালনের ছবি এঁকেছেন। বিধবা নারীর স্বামী বিরহের পাশাপাশি, কবি

বিদ্যাসাগরের স্তুতিও করেছেন এ কাব্যে। ‘বিধবা বঙ্গঙ্গনা’ কাব্যের বিজ্ঞাপন অংশে হরিশচন্দ্র মিত্র লিখেছেন,—“বিধবা-বঙ্গঙ্গনা কাব্য প্রচারিত হইল। ইহা কোন বিধবার ঘটনাবিশেষ অবলম্বন করিয়া রচিত হয় নাই। বঙ্গদেশীয় বিধবা অঙ্গনাগণের মনোমধ্যে সময়ঃ যে সকল আক্ষেপ উদ্ভিক্ত হয়, একটী সুশিক্ষিতা বঙ্গদেশীয় বিধবার বিলাপ পরম্পরায় তাহার কথাধ্বন্যমাত্র প্রকাশ করা হইয়াছে। ঐ সকল বিলাপোক্তি কতদূর হৃদয়গ্রাহিণী ও স্বভাবানুযায়িনী হইয়াছে, গ্রন্থকার তাহা ব্যক্ত করিতে অক্ষম, সুখীবর পাঠকবৃন্দের প্রতিই তদ্বিচার-ভার সমর্পিত রহিল।”^{৭৯}

‘বিধবা বঙ্গঙ্গনা’ কাব্যের অধ্যায় বিন্যাসে কবি—লজ্জা, যৌবন, সন্ধ্যা আগমন, বিধাতা, বিরহ, সখীর প্রতি, একান্তে আক্ষেপ, শ্বশুরালয়ের দুই এক কথা, একটী অপূর্ণ শরীর সদ্য প্রসূত শিশু দর্শন করিয়া, হিন্দু সমাজ এবং সামাজিকগণ, দেশাচার, সুশিক্ষিতদের প্রতি প্রভৃতি শিরোনাম ব্যবহার করেছেন। উল্লিখিত শব্দবন্ধে কবি একটি নারীর বিবাহিত পারিবারিক জীবন হতে বৈধব্যের আবেষ্টনীতে আবদ্ধ হওয়ার ক্রমিক কাহিনীর ইতিবৃত্ত প্রকাশিত হয়েছে। করুণ রসের ভাবপ্রবাহে কবি এ কাব্যে নারীসুলভ মানসিকতা, যন্ত্রণা ও আক্ষেপকে প্রকাশ করেছেন। কাব্যের শুরুর ‘মঙ্গলাচরণ’ অংশে কবি লিখেছেন,—

“চির-দুখ-সিন্ধু-নীর-নিমগনা—
যতেক বঙ্গীয়-বিধবা-অঙ্গনা,
তাহাদের দুখ যাবত বর্ণনা
করি, ...”^{৮০}

বৈধব্যের যন্ত্রণাকে কবি চিত্রিত অগ্নিতে প্রজ্জ্বলিত হবার যন্ত্রণার সঙ্গে তুলনা করেছেন। যৌবনবতী নারীর দুর্নিবার যৌবনাবেগকে বৈধব্যের আচার দিয়ে কখনই ঢাকা সম্ভব নয়। কারণ শরীরের যৌন উদ্বেল আবেগ দেশ কাল মানে না, মানে না কোনো বিধি নিষেধ। বৈধব্যের এই অসহায়তাকে কবি এক বিধবা নারীর স্বগত ভাষণে লিখেছেন,—

“সে সময় কত অগ্নিশিখা উদ্দীরয়,
ঋতুস্রাবে কত তার দেশোচ্ছিন্ন হয়।
আমিত অবলানারী, কত সংগোপিতে পারি,
মনোজ যাতনানল চিরভয়ঙ্কর?
যে অনলে জ্বলে সদা মম মনোবন;
হে লজ্জ! সে অগ্নি কিছু নহে সাধারণ!”^{৮১}

১৮২৯ সালের ৪ঠা ডিসেম্বর রামমোহন রায়ের প্রচেষ্টায় ও স্যার উইলিয়াম বেন্টিন্‌ক-এর সহায়তায় ‘সহমৃত্যু প্রথা’, ‘সতীপ্রথা’ তথা ‘সহমরণ প্রথা’ সমাজ থেকে সমূলে উৎপাটিত করার আইন পাশ হয়। ‘সহমরণ প্রথা’ বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর সমাজে বাল্য বিধবার সংখ্যা প্রভূত পরিমাণে বেড়ে যায়। দেখা দেয় বিধবার অবৈধ গর্ভপাতের ঘটনা ও নানা সামাজিক ব্যভিচার। এই সংকটক্ষেত্রে জরুরী হয়ে পড়ে বিধবার পুনর্বিবাহের বিষয়টি। ‘বিধবা বঙ্গাঙ্গনা’ কাব্যে যৌবনাবতী বিধবা নারীটি বৈধব্যের অসহনীয় যন্ত্রণায় কাতর হয়ে,—বিধবার পুনর্বিবাহ দাবী করেছেন। এবং যদি হিন্দু বিধবার পুনর্বিবাহ সম্ভব না হয় তাহলে ফিরিয়ে আনা হোক ‘সহমৃত্যুপ্রথা’ বা ‘সতীদাহ’ প্রথা। কারণ বৈধব্যের যন্ত্রণা অপেক্ষা সহমরণের যন্ত্রণা অনেক সুখের। কবি হরিশ্চন্দ্র মিত্র অত্যন্ত মনস্তাত্ত্বিক ভাবে ও যুক্তি পরম্পরায় বিধবার আত্মকথনে লিখেছেন,—

“সহমৃত্যুপতিসহ, যাওয়া নহে দুঃখাবহ,
বাঁচিয়া বিধবাগণে যত দুঃখসয়,
জ্বলচ্চিতা পশা তত দুঃখময় নয়।

.....

ভালছিল একদিন দহন দাহন, ক্লেশ
সহিত পরাগে,
বহিতে হতনা আর, দারুণ বৈধব্য ভার,
যে বহে এভার, সেই এর দুঃখ জানে।

.....

ওগো ইংলণ্ডেশ্বরী, হয় দেহ দয়া করি,
বিধবাবিবাহপ্রথা বঙ্গে প্রচলিত,
নহে সহমৃত্যুপ্রথা কর প্রবর্তিত!”^{৪২}

১৮৫৬ সালে ‘বিধবা বিবাহ’ আইনত স্বীকৃত হলেও সে ভাবে বিধবা বিবাহের হিড়িক বা উদ্দীপনা সমকালে লক্ষ্য করা যায় নি। বিধবা বিবাহ আইনত চালু হওয়ার আট বছর পর প্রকাশিত ‘বিধবা বঙ্গাঙ্গনা’ (১৮৬৩) কাব্যে বিধবার মর্মজ্বালা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে বিধবা বিবাহের উদ্দীপনা সম্পর্কে নিরাশ হয়েছেন। আলোচ্য কাব্যের অন্তিম অংশে কবি ‘বিধবা বিবাহের’ মঙ্গলময় সমাজ অনুষ্ঠানে যেমন আপ্লুত হয়েছেন, তেমনি অবাধ বিধবা বিবাহের আশা প্রকাশ করেছেন,—

“মারো মারো আজ কাল বিধবার বিয়া হয়,

হেথায় হোথায়,
 শুনে একবারে মন, আল্লাদে হয় মগন,
 আসি কুহকিনী আশা কত না বুঝায়।
 আহা! বঙ্গদেশময় বিধবার পরিণয়
 প্রথা, কতদিনে হবে অবাধে চলিত,
 হে বিধি! এমনদিন হবে উপস্থিত?”^{৪৩}

বিরশি পৃষ্ঠার দীর্ঘ ‘বিধবা বঙ্গাঙ্গনা’ কাব্যের প্রতিটি পৃষ্ঠার প্রতি ছত্রে ছত্রে কবি বিধবা নারীর মনোপীড়াকে মনস্তাত্ত্বিক ভাবে চিত্রায়িত করেছেন। এ কাব্য হয়ে উঠেছে উনিশ শতকের বিশিষ্ট শোককাব্য। ‘হিন্দুহিতৈষিনী’ (১৮৬৫ খ্রীঃ) পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন হরিশচন্দ্র মিত্র। হরিশচন্দ্র প্রথমে বিধবা বিবাহের সপক্ষে ছিলেন, কিন্তু ‘ঢাকা হিন্দু ধর্মরক্ষিণী সভা’র সঙ্গে যুক্ত হবার পর বিধবা বিবাহের বিরুদ্ধে কলম ধরেন হরিশচন্দ্র। ১৮৬৫ সালে ‘সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়’ পত্রিকায় তাঁর সম্পর্কে লেখা হয়,—“হরিশবাবু এত কাল চিরদুঃখিনী বঙ্গবিধবাদিগের সপক্ষে লেখনী সঞ্চালন করিয়া এক্ষণে তাহাদিগের বিপক্ষতাচরণ করিতেছেন, শিক্ষিত অন্তঃকরণে এতাদৃশ পরিবর্তন অসম্ভবনীয়।”^{৪৪}

উনিশ শতকের বিশিষ্ট গীতি কবি দেবেন্দ্রনাথ সেন (১৮৫৮-১৯২০)। তাঁর গীতিকবিতা রচনার বিষয় নির্বাচনে ঘুরে ফিরে এসেছে বিধবা বিবাহ প্রসঙ্গ। ইংরেজিতে লিখেছেন,—‘The Hindu - Child Widow’ নামে কবিতা। ‘আমি কে’, ‘বিধবার আরশি’, ‘তারপর’, ‘সধবা’, ‘বিধবা’ প্রভৃতি কবিতায় উঠে এসেছে বিধবার মানসিক সংকট ও যন্ত্রণাময় জীবন যাপনের ছবি। ‘অশোকগুচ্ছ’ (১৯০০ খ্রীঃ) কাব্যগ্রন্থের ‘আমি কে’ কবিতায় কবি লিখেছেন,—

“ এক যে বিধবা আছে এ দেশের মাঝে,
 তাহারি মুরতি মোর হৃদয়েতে রাজে।
 পাটল অধরে তার,
 চঞ্চল-ধূসর কেশে
 ডুবায়ে তুলিকা ঘন, আঁকি আমি ছবি—”^{৪৫}

‘অশোকগুচ্ছ’ কাব্যগ্রন্থের ‘বিধবার আরশি’ কবিতায় কবি বিধবা নারীর নিরাভরণ জীবন যন্ত্রণার ছবিকে বাঙ্‌ময় করে তুলেছেন। বৈধব্য শুধু যে প্রিয়জনকে কেড়ে নেয়, তা নয়—তার সঙ্গে কেড়ে নেয় নারীর অলঙ্কার সজ্জিত জীবনের সুখ অধিকার। নারীর অলঙ্কারের প্রিয় সঙ্গী ‘আরশি’

বৈধব্যের পর হয়ে পড়ে অপ্রয়োজনীয় এবং সুখস্মৃতির এক উপকরণ মাত্র। ‘বিধবার আরশি’ কবিতায় কবি লেখেন,—

“বিধবার আরশি খানি পড়ে আছে এক পাশে,—

কালি-বুল মাখিয়া শরীরে।

মনে পেয়ে ঘোর ব্যথা, চুপে-চুপে কহে কথা,

মনোদুঃখে গুমরে গুমরে,—”^{৪৬}

‘অশোকগুচ্ছ’ কাব্যগ্রন্থের ‘তারপর’ কবিতায় কবি বিধবা নারীর বিরহ-দুঃসহ সংসার যাত্রা নির্বাহ করে ও অনাথিনী জীবন ত্যাগ করে স্বর্গলোকে মিলনের ছবি এঁকেছেন। কবি লিখেছেন,—

“স্বামী গেল মরি!

—তারপর?

.....

তারপর অতি কষ্টে, করিল অনেক চেষ্টা

দুষ্কর সংসার-যাত্রা করিতে নির্বাহ!

.....

তারপর, একদিন, “হা নাথ যো নাথ” করি

অনাথিনী জীবন ত্যজিল?”^{৪৭}

‘অপূর্ব নৈবেদ্য’ (১৯১২ খ্রীঃ) কাব্যগ্রন্থের ‘সধবা’ কবিতায় কবি ‘বিধবা’ নারীর অন্তর্জ্বালাকে প্রকাশ করেছেন। গিরীন্দ্রমোহিনী দাসীর ‘অশ্রুক্ষণা’ (১৮৮৭ খ্রীঃ) কাব্য পাঠ করার পর কবি ‘সধবা’ কবিতাটি রচনা করেন। এ কবিতায় কবি লিখেছেন,—

“বিধবা সে; আমি তারে ভালো করে চিনি

সবে করে উলুধ্বনি, ছাল্‌না-তলায়, [ছাদ্‌না তলায়]

‘এয়ো’ সবে দীপ হস্তে কৌতুকে দাঁড়ায়;

উৎসব ছাড়িয়া গৃহে চলিল রমণী!”^{৪৮}

বিবাহের আচার শুধুমাত্র সধবাদের দ্বারা সম্পন্ন হয়ে থাকে। সেখানে বিধবা নারীর প্রবেশাধিকার নেই। আর তাই কৌতুক-কৌতুহল থাকা সত্ত্বেও বিধবা নারীকে সধবার স্ত্রী আচারে স্থল ত্যাগ করে নীরবে চলে যেতে হয়। এই সমাজ আচার যে কত অসহনীয় কবি তা এ কবিতায় উদ্ভাসিত করেছেন। ‘অপূর্ব নৈবেদ্য’ (১৯১২ খ্রীঃ) কাব্যগ্রন্থের ‘বিধবা’ কবিতায় বঙ্গের মহিলা কবি

গিরীন্দ্রমোহিনী দাসীর অকালবৈধব্য স্মরণ করে কবি এ কবিতাটি রচনা করেন। কবি লিখেছেন,

— “চিনেছি; চিনাতে আর কবে না তোমায়।
বঙ্গের বিধবা তুমি আজন্ম-দুঃখিনি!
শ্মশান হইতে আনি এক মুষ্টি চিতানল,
জ্বালিয়ে রেখেছ বক্ষে দিবস যামিনী।”^{৪৯}

দশ বছর বয়সে বধু হয়ে গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী (১৮৫৮-১৯৫৪ খ্রীঃ) শ্বশুরবাড়িতে প্রবেশ করেন। মাত্র ষোলো বছর বয়সে স্বামীকে হারিয়ে যৌবনে যোগিনী হতে হয় তাঁকে। তাঁর এই শোকভাষা কাব্যরূপ পেয়েছে ‘কবিতাহার’ (১৮৭২) কাব্যগ্রন্থের ‘সঙ্গিনীর বৈধব্য’ নামক কবিতায়,—

“ভুজঙ্গিনীসম বেণী যার শিরোপরে,
আজি কে বানালে জটা পাষণ অন্তরে।
যে করে করিত শোভা বলয়-কঙ্কণ,
ঝুঁঝু শব্দ শুনি ভ্রমর-গুঞ্জন।
সুকোমল বাহু হতে সুবর্ণ-বলয়,
কে নিল কাড়িয়া মরি প্রাণে নাহি সয়।
হায় রে! নিষ্ঠুর কাল কি কাজ করিলি,
সোনার কমল তুলে বিজনে ফেলিলি।
বৈধব্য-মরুতে পাড়ি সখী স্বর্ণলতা,
শোকরবি-করে কত পাইতেছে ব্যথা।”^{৫০}

‘অশ্রুংকণা’ (১৮৮৭ খ্রীঃ) কাব্যের কবি গিরীন্দ্রমোহিনী দাসীর বৈধব্যপরবর্তী জীবনের রচিত কাব্য ‘অশ্রুংকণা’। বাংলা শোককাব্যের ধারায় গিরীন্দ্রমোহিনী দাসীর ‘অশ্রুংকণা’ এক অমূল্য সম্পদ। ‘অশ্রুংকণা’ (১৮৮৭ খ্রীঃ) কাব্যের ‘উপহার’ কবিতায় কবি লিখেছেন,—

“এ শোকাশ্রু! নিরাশার যাতনা-গরল ঢাকা
এ শোকাশ্রু! বাসনার অনন্ত পিপাসা মাখা।
এ শোকাশ্রু! হৃদয়ের উন্মত্ত আবাহন।
এ শোকাশ্রু! জীবনের জন্মান্ত আলিঙ্গন!”^{৫১}

‘অশ্রুংকণা’ কাব্যের ‘তুমি’, ‘বিরহিণী’, ‘শ্মশান’ প্রভৃতি কবিতা বিধবা নারীর মনোবেদনা সক্রুণ

ভাবে উচ্চারিত হয়েছে। ‘শ্মশান’ কবিতায় কবি লিখেছেন,—

“নিভিয়াছে চিতানল?—নেভে নি, নেভে নি!

যে শিখা জাহ্নবী-তীরে,

জ্বলিয়াছে ধীরে ধীরে,

দেখহ প্রতাপ তার হৃদয়েতে মোর;—

পাইয়া ইন্ধন চির জ্বলিছে কি ঘোর!”^{৫২}

গিরীন্দ্রমোহিনী দাসীর ‘আভাষ’ কাব্যগ্রন্থের ‘অবলা’, ‘নির্মমতা’, ‘বসে বসে’, ‘মরণ’, ‘কামিনীগুচ্ছ’ বা ‘বালিকা বিধবা’ প্রভৃতি কবিতায় উঠে এসেছে বৈধব্যের যন্ত্রণা ও হা-হতাশ। গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী ‘কামিনীগুচ্ছ বা বালিকা বিধবা’ লিখেছেন,—

“ফুলশয্যা নিশি বিজয়া যামিনী,

মুখেতে মেখেছে ভসম-রাশি।

যাও স’রে ধীরে, ছুয়ো না ছুয়ো না,

কর’না যতন আর ও ফুটিবে না!”^{৫৩}

গিরীন্দ্রমোহিনীর ‘শিখা’ (১৮৯৬ খ্রীঃ) কাব্যের, ‘বসন্ত প্রভাতে’, ‘শ্রাবণে’, ‘স্মৃতি’ প্রভৃতি কাব্যে উঠে এসেছে বৈধব্যের মনোবেদনা।

১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের পরবর্তীকালে বিধবা প্রসঙ্গ অবলম্বনে প্রকাশিত হয়েছে, মানকুমারী বসুর ‘কাব্যকুসুমাঞ্জলী’ কাব্য, মীর আল্লাহের ‘বিধবা গঞ্জনা’ কাব্য, ইন্দুমতী দাসীর ‘দুঃখমালা’ কাব্য, শ্রী প্রণীত ‘বিধবা বঙ্গবালা’, জনৈক মহিলা রচিত ‘বিধবা বিলাপ’, কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের ‘বঙ্গবিধবা’ কাব্য, রাধারমণ দাসের,—‘ভারত বিধবা’, সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের ‘মহিলা কাব্য’ প্রভৃতি কাব্য। এছাড়া, ‘সমাচার চন্দ্রিকা’, ‘ভারতী’, ‘নবজীবন’, ‘বামাবোধিনী’, ‘নব্যভারত’ প্রভৃতি পত্রিকায় একাধিক কবিতার বিষয় হিসাবে উঠে এসেছে বিধবার পুনর্বিবাহ সংক্রান্ত বিষয়। উনিশ শতকের গীতি কবিতা রচনার একটা সাধারণ সুর ছিল বিষাদ চেতনা। বিহারীলাল চক্রবর্তী ‘সারদামঙ্গল’ কাব্য সম্পর্কে ‘ত্রিবিধ বিরহ’ এর কথা বলেছিলেন,—মৈত্রী বিরহ, প্রীতি বিরহ ও সরস্বতী বিরহ। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল আবেগ সর্বস্বতা। উনিশ শতকের গীতি কবিতার একটা বড় অংশ জুড়ে উঠে এসেছে বিধবা নারীর বিষাদ যন্ত্রণা।

১৮৫৬ সালে বিধবা বিবাহ আইনত স্বীকৃতি পেলে, শিক্ষিত মহলের সাহিত্য চিন্তায়, পক্ষে এবং বিপক্ষে বিধবা বিবাহ এই সামাজিক বিষয়টি কাহিনীর মোড়কে স্থান পেল সাহিত্যে।

উনিশ শতকে বিধবার বিবাহকে কেন্দ্র করে রচিত সাহিত্যের তালিকা বিশাল। সমগ্র উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ জুড়ে রচিত বাংলা সাহিত্যের সিংহভাগ দখল করে রয়েছে বিধবা বিবাহ—এই সামাজিক আন্দোলন জাত নানা ঘাত-সংঘাত ও সামাজিক মিথস্ক্রিয়ার বিষয়টি। একদিকে সংবেদনশীলতা অন্যদিকে কটাক্ষ ও মুখরোচক প্রণয়কাহিনীর কেন্দ্রীয় বৃত্তে বিধবা চরিত্ররা ঘুরে ফিরে এসেছে। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সৃষ্ট—‘কৃষ্ণকান্তের উইল’ উপন্যাসের বিধবা যৌবনাবতী ‘রোহিনী’, ‘বিষবৃক্ষ’ উপন্যাসের রূপসী বিধবা ‘কুন্দনন্দিনী’ চরিত্রে দেখা গেছে বৈধব্যের কামনাসক্ত রূপ; আবার একাধিক নাটকে দেখা গেছে বিধবা নারীর অসহায়তার করুণ বৈধব্য জীবনাচার একাদশী পালনের যাপন চিত্র। উনিশ শতকে রক্ষণশীল বর্ণহিন্দুর দল বিধবা বিবাহকে সুনজরে দেখেননি। আধুনিক ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত ব্রাহ্মরা উদার মানসিকতায় ‘বিধবা বিবাহ’ এর বিষয়টি সমবেদনার সঙ্গে দেখেছিলেন। ব্রাহ্ম সমাজের সমকালীন বিশিষ্ট নেতৃবর্গ কেশবচন্দ্র সেন, প্যারীচরণ সরকার, শিবনাথ শাস্ত্রী প্রমুখ, বিধবা বিবাহের সমর্থনে সোচ্চার হয়েছিলেন। অন্যদিকে গোবিন্দচন্দ্র শর্মা, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, প্রসন্নকুমার শর্মা, শ্যামাপদ ন্যায়ভূষণ, যদুনাথ চট্টোপাধ্যায়, গঙ্গাধর দে প্রমুখ পণ্ডিতেরা বিধবা বিবাহকে পরিবার-সমাজ অবক্ষয়ের সূচক হিসাবে দেখেছিলেন। এই ঘাত সংঘাত নিয়ে লেখা সাহিত্যগুলির একটি তালিকা প্রদান করা যেতে পারে—

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	—	মৃণালিনী (১৮৬৯)
		বিষবৃক্ষ (১৮৭৩)
		কৃষ্ণকান্তের উইল (১৮৭৮)
পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	—	শৈশব সহচরী (১৮৭৬)
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	—	করুণা (১৮৭৭)
শতদলবাসিনী দেবী	—	বিধবা বঙ্গললনা (১৮৮৪)
দামোদর মুখোপাধ্যায়	—	দুই ভগ্নী (১৮৮৬)
রমেশচন্দ্র দত্ত	—	সংসার (১৮৮৭), সমাজ (১৮৮৮)
চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	—	দুখানি ছবি (১৮৯০) কমলকুমার (১৮৯৭)
স্বর্ণকুমারী দেবী	—	স্নেহলতা (১৮৯২)
শিবনাথ শাস্ত্রী	—	যুগান্তর (১৮৯৫)
দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী	—	মুরলা (১৮৯৭)

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ‘মৃণালিনী’ (১৮৬৯) উপন্যাসের কাহিনী বৃত্তে বিধবা সমস্যার বীজ রোপিত হয়েছে। পশুপতি ও মনোরমার উপকাহিনীতে বিধবার প্রেম সমস্যার আভাস রয়েছে। হেমচন্দ্রের উক্তি বঙ্কিমচন্দ্র বিধবাকে হেয় করেছেন এবং বিধবা মনোরমার প্রেমকে তিরস্কৃত করেছেন,—“স্ত্রীলোকের সতীত্বের অধিক ধর্ম নাই; যে স্ত্রীর সতীত্ব নাই, সে শূকরীর অপেক্ষাও অধম।...তুমি বিধবা, যদি স্বামী ভিন্ন অপরকে মনেও ভাব, তবে তুমি ইহলোকে পরলোকে স্ত্রীজাতির অধম হইয়া থাকিবে। অতএব সাবধান হও। যদি কাহারও প্রতি চিত্ত নিবিষ্ট হইয়া থাকে, তবে তাহাকে বিস্মৃত হও।”^{৬৪} মৃণালিনী উপন্যাসে বিধবা নারীর সহমরণকেই কাম্য রূপে বন্দনা করা হয়েছে।

‘বিষবৃক্ষ’ (১৮৭৩) উপন্যাসে প্রথম লক্ষ্য করা গেল, কুন্দনন্দিণীর বিবাহ এবং নতুন স্বামীসঙ্গলাভ। বিধবা কুন্দনন্দিণী তাঁর প্রিয় পুরুষকে জানিয়েছে,—“আমি মরিব বলিয়াই স্থির করিয়াছিলাম—তবে তোমাকে দেখিলে আমার মরিতে ইচ্ছা করে না।”^{৬৫} কুন্দনন্দিণী প্রাণ দিয়েছে স্বামী-স্ত্রীর ভালোবাসাকে পুনর্বীর জোড়া লাগাতে। কুন্দনন্দিণীর এই নৈতিকতা সধবা নারীর সংসার রক্ষার্থে অর্পিত হয়েছে।

‘কৃষ্ণকান্তের উইল’ (১৮৭৮) উপন্যাসে রোহিণী বালবিধবা। রোহিণী পুনর্বিবাহের জন্য লোলুপ, পুরুষ সঙ্গকামনা তাকে অবৈধ জীবন যাপনের পক্ষকুণ্ডে নিমজ্জিত করে। গোবিন্দলালের কামনার শিখায় রোহিণীর আগমন, এবং বিনা অপরাধে ভ্রমরের দাম্পত্য সুখ নষ্ট হয়ে যায়। প্রসাদপুর কুঠিতে রোহিণী, জমিদার গোবিন্দলালের উপপত্নী ও রক্ষিতার মত জীবন কাটিয়েছে। হিন্দু সমাজের নৈতিকতার আদর্শ রক্ষা করতে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র রোহিণীকে বন্দুকের গুলিতে হত্যা করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সৃষ্ট—‘কৃষ্ণকান্তের উইল’ উপন্যাসের বিধবা যৌবনবতী রোহিণী, বিষবৃক্ষ উপন্যাসের রূপসী বিধবা ‘কুন্দনন্দিণী’ চরিত্রে দেখা গেছে বৈধব্যের কামনাসত্ত্ব রূপ। কুন্দনন্দিণী বালবিধবা, রোহিণী ও তাই। বিধবা কুন্দনন্দিণীর দ্বিতীয় বিবাহ তিনি স্বীকার করতে পারেননি, তাই তাকে বিষপানে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছে।

১৮৭৬ সালে ‘বঙ্গদর্শন’ পত্রিকায় পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ‘শৈশব সহচরী’ উপন্যাসটি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। ৪১ টি পরিচ্ছেদে বিভক্ত এই উপন্যাসে একটি বিধবা নারীর প্রেম, বিবাহকথা বর্ণনা করেছেন ঔপন্যাসিক। উপন্যাসে সরস রসিকতার সঙ্গে পূর্ণচন্দ্র বিধবা নারীর যৌনাচারের চিত্র অঙ্কন করেছেন। শরৎকুমার ও কুমুদিনীর মধ্যে প্রেমের ফলুধারা বইয়ে

দিয়েছেন ঔপন্যাসিক। একটি ত্রিভূজ রচিত হয়েছে রজনীকান্ত, শরৎকুমার ও কুমুদিনীর মধ্যে। দুজন পুরুষ এক বিধবা নারীর প্রতি প্রেমজ টানে দুর্নিবার আকর্ষণ অনুভব করেছে। শরৎকুমার ও রজনীকান্তের উভমুখী প্রেমে কুমুদিনী বিচলিত হয়েছে। শেষ পর্যন্ত রজনীকান্তকে বেছে নিয়েছেন। বিধবা নারীর প্রেম, বিবাহ, স্বামী নির্বাচন ও যৌনতাবোধকে স্বীকৃতি দিয়েছেন। এ উপন্যাসে আরো একটি বিধবা নারী আছে—বিধু। কুমুদিনীর সহচরী বিধু লোভ রিপুতে আক্রান্ত।

১৮৭৭ সালে ‘ভারতী’ পত্রিকায়, আশ্বিন ১২৮৪ থেকে ১২৮৫ ভাদ্র পর্যন্ত ধারাবাহিক ভাবে রবীন্দ্রনাথের ‘করুণা’ উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়। একটি কিশোরীর জীবন কথাকে এ উপন্যাসে রূপ দিয়েছেন। এই কাহিনী বৃত্তে উঠে এসেছে বিধবার কথাসূত্র।

১৮৮১ সালে প্রকাশিত হয়, দামোদর মুখোপাধ্যায়ের (‘জ্ঞানাকুর’ পত্রিকার সম্পাদক) ‘দুই ভগ্নী’ উপন্যাস। ‘দুই ভগ্নী’ উপন্যাসের কাহিনী বৃত্তে রয়েছে যোগেন্দ্র-বিনোদিনীর সুখী দাম্পত্য জীবনে বিধবা কমলিনীর প্রণয়-আসক্ত আগমন। বিনোদিনীর সহোদরা ভগিনী কমলিনী বালবিধবা। কমলিনীর আট বছর বয়সে বিবাহ হয় এবং দশ বছর বয়সে অকাল বৈধব্যের শিকার হয়। কমলিনী যোগেন্দ্রের প্রতি আসক্ত। কমলিনী যোগেন্দ্র-বিনোদিনীর দাম্পত্য পরিবার জীবনে প্রণয় প্রতিদ্বন্দ্বী রূপে আবির্ভূত হয়েছে। কমলিনীর যৌবনাবেগ ও হৃদয়াবেগের ছবি উপন্যাসে পাওয়া যায়।

ঔপন্যাসিক দামোদর মুখোপাধ্যায় বিধবা কমলিনীর মনের গোপন যৌবনাবেগের মনস্তাত্ত্বিক বর্ণনায় লিখেছেন,—“কমলিনী যোগেন্দ্রের মস্তকে হস্ত মদন করিতে করিতে অতৃপ্ত নয়নে তাহার বদনশ্রী সন্দর্শন করিতে লাগিলেন। ভাবিতে লাগিলেন,—‘শরীর রক্ত মাংসে গঠিত। হৃদয় মানব-হৃদয়ের হীন বৃত্তিসমূহে পূর্ণ। তবে কেমন করিয়া আমি এ লোভ সংবরণ করিব? জগতে কোন্ রমণী এ লোভ দমন করিতে পারিয়াছে? যদি কেহ পারিয়া থাকে, সে দেবী। কিন্তু আমি সে দেবত্ব প্রার্থনা করি না। আমি এ অদম্য আকাঙ্ক্ষা কখন নিবারণ করিতে পারিব না। লোকে ইচ্ছা হয় আমাকে পিষাচী বলুক যদি এ পাপে অনন্ত কাল আমায় নরক ভোগ করিতে হয় তাহাও স্বীকার, তথাপি এ লোভ ত্যাগ করা আমার অসাধ্য। বিনোদিনীর সর্বনাশ হইবে। তাহাতে কি? এ জগতে কে কবে পরের সর্বনাশ না করিয়া আত্মসুখ সংস্থান করিয়াছে?... কত বাদশাহ, কত নরপতি, পিতৃহত্যা, ভাতৃহত্যা, পুত্রহত্যা করিয়া রাজপদ লাভ করিয়াছেন। তাঁহারা যদি সামান্য রাজপদ লোভে সেই সকল দুষ্কর্ম করিতে পারিয়া থাকেন, তবে আমি এই অতুলনীয় সম্পদ হইতে আমার ভগ্নীকে কেন বঞ্চিত করিতে পারিব না?’”^{৫৬} বিধবা কমলিনী

যোগেন্দ্রর প্রতি তাঁর মনোবাসনা পূর্ণ করার জন্য দাসীর সহায়তায় চক্রান্তের পর চক্রান্ত করেছে। যোগেন্দ্রের চিঠিগুলি সরিয়ে ফেলে সহোদরা বিনোদিনীকে বুঝিয়েছে যোগেন্দ্রের অপ্রেমের কথা। যোগেন্দ্রের হৃদয়ে বিধবা কমলিনীর প্রতি কোনো দুর্বলতা দেখা যায়নি। অসুস্থ যোগেন্দ্রের রোগশয্যার পাশে বিধবা কমলিনী উপস্থিত হয়ে তাকে বোঝাতে চেয়েছে, বিনোদিনীর গর্ভে অন্যের সন্তান। উপন্যাসের পরিসমাপ্তিতে দেখা যায়—বিনোদিনী বিষপান করে, দাসী জলে ডুবে আত্মহত্যা করে এবং কমলিনী উন্মাদ হয়ে যায়। বস্তুত ঔপন্যাসিক দামোদর মুখোপাধ্যায় ‘দুই ভগ্নী’ উপন্যাসে বিধবা চরিত্র ও বিধবার প্রণয়কে পরিবার ভাঙন ও সংকটের বহিঃশিখা রূপে উপস্থাপিত করেছেন।

রমেশচন্দ্র দত্ত তাঁর ‘সংসার’^{৫৭} (১৮৮৬), ‘সমাজ’^{৫৮} (১৮৯৪) দুটি সামাজিক উপন্যাসে বিধবার সংকট সমস্যা ও প্রণয়কে চিত্রিত করেছেন। রমেশচন্দ্র কুসংস্কারমুক্ত উদার মন নিয়ে বিধবাবিবাহ ও অসবর্ণ বিবাহকে যুক্তি-তর্কসহ স্বীকৃতি দিয়েছেন। রমেশচন্দ্র বিধবা বিবাহের সমর্থনে ‘সংসার’ উপন্যাসটি রচনা করেন। ‘সংসার’ উপন্যাসে রাঢ়ের পল্লীচিত্রে, দুই ভগিনী—বিন্দু ও সুধার কাহিনী পরিবেশিত হয়েছে। বালবিধবা সুধার পুনর্বিবাহ এই উপন্যাসের কেন্দ্রীয় বিষয়। শিক্ষিত যুবক শরৎ বালবিধবা সুধাকে পুনর্বিবাহ করতে চায়। তাই নিয়ে গ্রামে ও কলকাতায় নানা সমস্যার সৃষ্টি হয়। কলকাতার নাগরিক সমাজ, বিধবাবিবাহ সংক্রান্ত আলাপ-আলোচনা, তর্কবিতর্ক ধরা পড়েছে। বিধবাবিবাহ যে পারিবারিক জীবনকে অশান্তিতে বিদীর্ণ করতে পারে না, সে কথাই ঔপন্যাসিক অত্যন্ত সহৃদয়তার সঙ্গে বর্ণনা করেছেন। ঔপন্যাসিক তাঁর উপন্যাসে বিধবা বিবাহের বৈধতা ও যৌক্তিকতা দেখিয়েছেন। শরৎ-সুধা ও হেমচন্দ্র-বিন্দুর প্রেম এ উপন্যাসের ভিত্তি। বিধবা বিবাহের প্রশ্নে চারপাশে নিন্দা, কুৎসা ও প্রতিবাদ, রঙ্গতামাশা, কটুভক্তি প্রবল হলেও শরৎ সামাজিক বাধাকে অতিক্রম করেছে। সংসার উপন্যাসে বালবিধবা সুধা এবং শিক্ষিত যুবক শরৎচন্দ্রের বিবাহ গ্রাম্য ও নাগরিক সমাজে তার প্রতিকূল প্রতিক্রিয়া বর্ণিত হয়েছে।

রমেশচন্দ্র দত্তের ‘সমাজ’ উদ্দেশ্যমূলক উপন্যাস। এই উপন্যাসে ব্রাহ্মণ-কায়স্থ অসবর্ণ বিবাহের পক্ষে কাহিনী নির্মাণ করেছেন। ‘সমাজ’ উপন্যাসে ঔপন্যাসিক, বিধবা বিবাহ, অসবর্ণ বিবাহ, বিবাহিত পত্নীর উপর পীড়ন, বাঈজী ও রক্ষিতা পোষণ—প্রভৃতি বিষয়কে তুলে ধরেছেন।

শিবনাথ শাস্ত্রী ছিলেন উনিশ শতকের বিশিষ্ট সমাজ সংস্কারক ও বিধবা বিবাহ আন্দোলনের অন্যতম প্রচারক। তাঁর ‘যুগান্তর’ (১৮৯৫), ‘নয়নতারা’ (১৮৯৯) ‘বিধবার ছেলে’ (১৯১৬) প্রভৃতি উপন্যাসের কাহিনীতে উঠে এসেছে বিধবা অনুষঙ্গ।

‘বঙ্গদর্শন’ পত্রিকায় ১২৮০ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশিত হয় বঙ্কিম অনুজ পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ‘মধুমতী’ নামের গল্প। যদিও ‘মধুমতী’ কে উপন্যাস হিসাবে ছাপা হয়েছে ‘বঙ্গদর্শন’ পত্রিকায়। এ গল্পে আগাগোড়া মধুমতী নামক এক বিধবার কথা পরিবেশিত হয়েছে। স্মৃতিভ্রষ্ট এক বিধবা নারীর গল্প ‘মধুমতী’। পুতুলের প্রতি বালিকার প্রেমের ন্যায় মধুমতীর প্রেম। পঁচিশ বর্ষীয় যুবক করালীপ্রসন্ন ও মধুমতীর মন দেওয়া নেওয়ার গল্প ‘মধুমতী’। ‘মধুমতী’ গল্পে গল্পকার লিখছেন,—“করালীপ্রসন্ন জিজ্ঞাসা করিলেন, “মধুমতী, তুমি সধবা না বিধবা?” তাহা কিছু তোমার মনে পড়ে? এবার মধুমতী কথা কহিল। বলিল, “বিয়ের কথা কিছু মনে পড়ে না। বোধ হয় বিধবা।”...

“বিধবার বিয়ে হয়, জান?”

ম। “তোমারই মুখে শুনিয়াছি।”

ক। “তুমি আবার বিবাহ করিবে?”

ম। “করিব না কেন!”

ক। “কাকে বিয়ে করবে?”

ম। “তুমি যাকে বল।”

ক। “আমাকে?”

মধুমতী তখন লজ্জায় মুখ নত করিয়া মৃদু মৃদু স্বরে কহিল, “করিব”।”^{৫৯}

উনিশ শতকের যুগ পরিবেশে দাঁড়িয়ে তরুণ রবীন্দ্রনাথ বিধবা বিবাহ সমস্যাকে এড়িয়ে যেতে পারেননি। তাঁর গল্পের কাহিনী গ্রন্থনায় বিধবা প্রসঙ্গ ঘুরে ফিরে এসেছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ফাল্গুন ১২৯৯ বঙ্গাব্দে লেখেন, ‘মহামায়া’ নামে ছোট গল্প। ‘মহামায়া’ গল্পটি বিধবার প্রেম নিয়েই রচিত। মহামায়া নামক এক বিধবার বুভুক্ষু হৃদয় রহস্যের গল্প ‘মহামায়া’। এ গল্পে অসামাজিক প্রেমের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। বিধবা হওয়ার পর মহামায়ার হাত পা বেঁধে চিতায় সহমরণের জন্য সমর্পণ করা হয়। প্রবল ঝড়-বৃষ্টিতে শ্মশান-যাত্রীরা নিরাপদ জায়গায় আশ্রয় নিলে চিতা থেকে উঠে মহামায়া পালিয়ে প্রাণ রক্ষা করে এবং ঘোমটা টেনে রাজীবের কাছে আশ্রয় নেয়। রাজীবের বিবাহিতা স্ত্রী না হয়েও বিধবা মহামায়া রাজীবের সঙ্গে একত্রে বাস করে বহুদিন। চিতার আগুনে ঝলসে যাওয়া বিধবা মহামায়ার মুখশ্রী দেখে চমকে উঠেছে রাজীব। অবশেষে মহামায়া নিরুদ্দেশের পথে পা বাড়িয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের ‘প্রতিবেশিনী’ গল্পকাহিনীতে বিধবার প্রণয় গুরুত্ব পেয়েছে। এই গল্পে দেখা যায়, দুই বন্ধু একই বিধবার প্রেমে পড়ে। এই বিধবার প্রেমকে ঘিরে দুই বন্ধুর মধ্যে তৈরি

হয় সংকট। গল্পের দুটি পুরুষ চরিত্র,—কথক ও নবীন। এ গল্পের কথক তত্ত্বগত ভাবে বিধবা বিবাহে বিশ্বাসী। প্রতিবেশিনী বিধবাটিকে সে ভালোবাসার পরিবর্তে পূজা করেছে মনে মনে। ফলে কোনদিনই সে ওই বিধবাকে বিয়ে করার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করেনি। কথকের মধ্যে বিধবার প্রতি এক প্রকারের প্রশান্ত মুগ্ধতা তৈরি হয়েছে। কথক জানিয়েছে,—“জ্যোতির্বিদ যেমন নক্ষত্রোদয়ের অপেক্ষায় আকাশের দিকে তাকাইয়া থাকে আমিও যে তেমনি মাঝে মাঝে আমাদের পাশের বাড়ির বাতায়নের দিকে চাহিয়া দেখিতাম,...সেই কর্মযোগনিরতা ব্রহ্মচারিণীর সৌম মুখশ্রী হইতে শান্তমুগ্ধ জ্যোতি প্রতিবিম্বিত হইয়া মুহূর্তের মধ্যে আমার সমস্ত চিত্তবিক্ষোভ দমন করিয়া দিত।”^{১০} অন্যদিকে বন্ধু নবীনের বিধবা বিবাহ নিয়ে কোনো শুচিবায়ুগ্রস্ততা নেই। সে কোনো প্রকার সূক্ষ্ম চিন্তার ধার ধারে না। বিধবা বিবাহের বাস্তব অসুবিধাগুলির কথাই সে ভাবে। সে এই বাস্তব অসুবিধাগুলি অতিক্রম করে বিধবা বিবাহ করে।

১৮৬৭ সালে বটতলা থেকে প্রকাশিত হয়, শ্রীজগচ্ছন্দ্র গুহের নকশা জাতীয় গ্রন্থ ‘রাড়ের বিয়ে ডিসমিস্’। এ গ্রন্থে বিধবা বিবাহের বিরুদ্ধাচরণ করা হয়েছে। ‘রাড়ের বিয়ে ডিসমিস্’ বাদ-প্রতিবাদ মূলক গ্রন্থ। এ গ্রন্থের বিজ্ঞাপন অংশে শ্রীজগচ্ছন্দ্র গুহ লিখেছেন,—“প্রায় তিন বৎসর হইল ঢাকা জেলার বিক্রমপুর নিবাসী শ্রীযুত বাবু গোবিন্দচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় নামক কোন এক ব্যক্তি “কৌতুক প্রবাহ” নামক একখানা পুস্তক এক অলৌকিক গল্প ছলে বিধবা বিবাহ যুক্তি সঙ্গত বলিয়া উল্লেখ করত প্রকটিত করিয়াছেন। তদ্বিরুদ্ধে কতিপয় পংক্তি লেখাই আমার এই ক্ষুদ্র মত পুস্তকের উদ্দেশ্য।”^{১১}

এই গ্রন্থে জগচ্ছন্দ্র কাহিনীকারে জানিয়েছেন—ব্রহ্মা, বিষ্ণু পৃথিবীর নানা দেশ পরিভ্রমণের পর ঢাকায় উপস্থিত হন। এবং এই দিন পৃথিবীর কার্য্যাকার্য্য, ধর্ম্মাধর্ম্ম, শুভাশুভ অনেক বিষয়ের পর্যালোচনা হয়। উক্ত সভায় বিধবার পুনর্বিবাহ নিয়ে আলোচিত হয়। উক্তসভায় বাদী-বিবাদী দুইপক্ষের বিধবা বিবাহ বিষয়ক মতামত আলোচিত হয়। কোর্টরুমে বিচার প্রক্রিয়ার মত ব্রহ্মা-বিষ্ণুর সামনে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও তাঁর বিরুদ্ধ পক্ষদের হাজির করা হয়েছে। জগচ্ছন্দ্র বিধবা বিবাহের বিরুদ্ধে সওয়াল করে জানিয়েছেন,—“পূর্ব্বকালে আমাদের হিন্দু সমাজের জন্যে যে সকল আইন প্রচলিত ছিল, ইতিপূর্ব্ব যখন অধিকার সময় তাহার অনেকাংশ অব্যবহৃত হইয়া গিয়াছে। প্রথমতঃ সেই সকল নিয়ম প্রচলিত না হইয়া যদিপি বিধবা বিবাহ প্রচলিত হয়, তাহা হইলে অনেক অমঙ্গল ঘটিবার সম্ভাবনা। অর্থাৎ বিধবা বিবাহ প্রচলিত হয়, তাহা হইলে অনেক অমঙ্গল ঘটিবার সম্ভাবনা।...বর্ত্তমান কালে যে বেশ্যা বৃত্তি অবলম্বনের একটি

উপায় আছে, তাহাতেই কত শত ভদ্র মহিলারা স্বীয় পতি বিনষ্ট করত গণিকা শ্রেণীর দলপুষ্টি করিতেছে, এমতাবস্থায় পূর্বের সয়ম্বর প্রথা প্রচলিত না হইয়া বিধবা বিবাহ চলিত হইলে কত অমঙ্গল ঘটিবার সম্ভাবনা, তাহা সহজেই উপলব্ধি হইতে পারে।”^{১২} বস্তুত এভাবেই উনিশ শতকের গদ্য কাহিনীর ঘটনা বৃত্তে বিধবার পুনর্বিবাহ নিয়ে চাপান-উতোর লক্ষ্য করা গেছে।

১৮৫৬ সালে বিধবা বিবাহ আইনত স্বীকৃতি পাওয়ার পর বাংলা নাটকে সবচেয়ে বেশি বিধবা বিবাহের বিষয়টি প্রত্যক্ষভাবে উঠে আসে। ১৮৫৬ সাল পরবর্তী কয়েক দশকের বাংলা সামাজিক নাটকের ইতিহাস লক্ষ্য করলে দেখা যাবে ‘বিধবা’ প্রসঙ্গ সামাজিক নাটকের কাহিনীবৃত্তে উঁকি দিয়েছে সবচেয়ে বেশি,—কখন সমাজ সমস্যা হিসাবে, কখন বা হাস্যরসের খোরাক হিসাবে কখন বা নারীর মর্মপীড়ার আলেখ্য হিসাবে। প্রসঙ্গত দেখে নেওয়া যেতে পারে—১৮৫৬ থেকে ১৮৬৬ এই দীর্ঘ দশ বছরের সামাজিক নাটক রচনার ইতিবৃত্তে কীভাবে উঠে এসেছে বিধবা বিবাহ প্রসঙ্গ^{১৩},—

“ ১৮৫৬

বিধবা বিবাহ	—	উমেশচন্দ্র মিত্র।
বিধবোদ্ধাহ	—	উমাচরণ চট্টোপাধ্যায়।
বিধবা মনোরঞ্জন	—	রাধামাধব মিত্র।

১৮৫৭

বিধবা পরিণয়োৎসব	—	বিহারীলাল নন্দী।
বিধবা বিষম বিপদ	—	অজ্ঞাত।
চপলা চিত্তচাপল্য	—	যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায়।

১৮৫৮

সপত্নী নাটক	—	তারকচন্দ্র চূড়ামণি।
বিধবা বিবাহ বিষম দায়	—	গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন।
কলি-কৌতুক	—	নারায়ণ চট্টরাজ গুণনিধি।
চার ইয়ারের তীর্থযাত্রা	—	মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

১৮৫৯

বাসরকৌতুক	—	শ্যামাচরণ দে।
-----------	---	---------------

১৮৬০

নীলদর্পন নাটক	—	দীনবন্ধু মিত্র।
বিধবা বিরহ নাটক	—	শিমুয়েল পিরবকস্।
বাল্যোদ্ধাহ নাটক	—	শ্যামাচরণ শ্রীমানি।
বেশ্যাসক্তি নিবর্তক নাটক	—	প্রসন্নকুমার পাল।
একেই কি বলে সভ্যতা	—	মাইকেল মধুসূদন দত্ত।
বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ	—	„ ।

১৮৬১

দলভঞ্জন নাটক	—	হারাণচন্দ্র (শর্মা) মুখোপাধ্যায়।
লম্পট চৈতন্যদয়	—	যদুনাথ চৌধুরী।
কুলীন কায়স্থ	—	অম্বিকাচরণ বসু।

১৮৬২

আইন সংযুক্ত কাদম্বিনী নাটক	—	১ম/২য় খণ্ড) কুশদেব পাল।
পুনর্বিবাহ নাটক	—	গুরুপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়।
শুভ্র শীঘ্রং	—	হরিশচন্দ্র মিত্র।
ম্যাও ধরবে কে?	—	„ ।
গুলি হাড়কালি নাটক	—	ভুবনেশ্বর মুখোপাধ্যায়।
অশুভ পরিহারক	—	গৌরমোহন বসাক।
শ্রেয়াংসি বহু বিদ্বানি	—	ভুবন মোহন চক্রবর্তী।
পাড়া গাঞ্য একি দায়?	—	রামনাথ ঘোষ।
শ্যামকিশোরী	—	হরিশচন্দ্র বসাক।
কি মজার গুড ফ্রাইডে	—	অজ্ঞাত।

১৮৬৩

হুড়কো বৌয়ের বিষম জ্বালা	—	রামকৃষ্ণ সেন।
একেই বলে বাবুগিরি	—	কালচাঁদ শর্মা ও বিপ্রদাস মুখোপাধ্যায়।
কন্যা বিক্রয়	—	নফরচন্দ্র পাল।
না বিইয়ে কানাইয়ের মা	—	অজ্ঞাত।
পরের ধনে বরের বাপ	—	ব্রজমাধব শীল।

কনের মা কাঁদে আর টাকার পুঁটলি বাঁধে— ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়।

ঘর থাক্তে বাবুই ভেজে — ব্যোমকেশ বাঙ্গাল।

বেশ্যানুরক্তি বিষম বিপত্তি— রাধামাধব হালদার।

অশুভস্য কালহরণ — গোবিন্দ চন্দ্র চক্রবর্তী।

কাশীতে হয় ভূমিকম্প, নারীদের একি দন্ত—মুনশী নামদার।

স্বর্ণশৃঙ্খল — দুর্গাদাস কর।

প্রাণেশ্বর — প্রাণনাথ দত্ত।

নবীন তপস্বিনী — দীনবন্ধু মিত্র।

১৮৬৪

বিধবা বিলাস নাটক — যদুনাথ চট্টোপাধ্যায়।

মুঘলং কুল নাশনং — দ্বারকানাথ মিত্র।

চোর বিদ্যা বড় বিদ্যা — বিশ্বস্তর দত্ত।

ওঠ ছুঁড়ি তোর বে — হরিমোহন কর্মকার।

মুঘলং কুলনাশনং — দ্বারকানাথ মিত্র।

১৮৬৫

যেমন কর্ম তেমনি ফল — রামনারায়ণ তর্করত্ন।

১৮৬৬

নবনাটক — রামনারায়ণ তর্করত্ন।

সধবার একাদশী — দীনবন্ধু মিত্র।

বিয়ে পাগলা বুড়ো — „ ।

বুঝলে কিনা — নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

উল্লিখিত দশ বছরের সামাজিক নাটক রচনার তালিকায় একথা স্পষ্ট যে, উনিশ শতকে বিধবার পুনর্বিবাহ এই সামাজিক সমস্যা ছিল এক বছ চর্চিত ও তর্কের বিষয়। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের পরবর্তী দশকগুলির সামাজিক নাটকের চালচিত্র বিচার করলে দেখা যাবে— বিধবার সংকট, সমস্যা ও উত্তরণের ছবি বাংলা নাটকে ঘুরে ফিরে এসেছে। ১৮৭৬ সালে ‘নাট্য নিয়ন্ত্রণ আইন’ চালু হবার পর সামাজিক প্ররোচনা ও উস্কানিমূলক নাটক রচনার প্রবাহ কমে আসে। বাংলা নাটক পৌরাণিক কাহিনীর ইতিবৃত্তে অধিক মাত্রায় ঘোরা-ফেরা করে। সামাজিক যে সব

নাটক লেখা হয়, সেগুলি শালীনতা বজায় রেখে রচিত হয়। কারণ নাট্য নিয়ন্ত্রণ আইন চালু হবার ফলে সামাজিক নাটক রচনার পর লালবাজারের পুলিশ হেডকোয়ার্টারে অনুমোদন নিয়ে তবে ছাপতে হত এবং অভিনয়ের অনুমোদন নিতে হত। সে কারণে ১৮৭৬ পরবর্তীকালে যেসব সামাজিক নাটক রচিত হয়েছে সেখানে বিধবা বিবাহ বিষয় কেন্দ্রিক নাটকগুলিতে ব্যঙ্গ-বিদ্রোপ গালিগালাজ অপেক্ষা সমর্থন ও সহানুভূতি প্রকাশিত হয়েছে। এমনকি, বিধবা বিবাহ বিষয়কে অবলম্বন করে লেখা নাটক সাফল্যের সঙ্গে পেশাদার রঙ্গমঞ্চে বহু রজনী অভিনীত হয়েছে। বাঙালি দর্শকমণ্ডলী সে নাটক সাদরে গ্রহণ করেছে।

উৎস সূত্র ও টীকা:

১. বিদ্যাসাগর-জীবনচরিত, সহোদর শ্রীশঙ্কুচন্দ্র বিদ্যারত্ন প্রণীত ও শ্রীঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বারা সংশোধিত, কলিকাতা ইংরাজী-সংস্কৃত যন্ত্রে শ্রীআশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত, ১২৯৮ বঙ্গাব্দ, পৃ ২৪৭।

২. বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব ১ম খণ্ড, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, জানুয়ারি, ১৮৫৬।

৩. বিদ্যাসাগর ও বাঙালি সমাজ, বিনয় ঘোষ, ওরিয়েন্ট লংম্যান, পৃ ২৪৯।

৪. বিদ্যাসাগর, বিহারীলাল সরকার। শ্রীহরিপদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত, চতুর্থ সংস্করণ, ১৩২৯ বঙ্গাব্দ, কলিকাতা, পৃষ্ঠা ২৮৪।

৫. বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব' (২য় খণ্ড), কলিকাতা, সংস্কৃত বিদ্যালয়, ৪ঠা কার্তিক, সংবৎ ১৯১২ [১৮৫৬]। বিদ্যাসাগরের গ্রন্থাবলী, দ্বিতীয় খন্ড, কলিকাতা, সংস্কৃত যন্ত্র, কলিকাতা লাইব্রেরি হইতে প্রকাশিত, ২৫ নং সুকিয়াস স্ট্রীট, ২রা আশ্বিন ১৩০২, সম্পাদনায় নারায়ণচন্দ্র শর্মা, পৃ ২২০-২২২।

৬. রাজনারায়ণ বসুর আত্মচরিত, রাজনারায়ণ বসু, কুন্তলীন প্রেস ১৯০৯, কলিকাতা ১৩১৫, পৃ ৯৮-৯৯।

৭. বিধবা বিবাহ নিষেধ বিষয়ক ব্যবস্থা, গোবিন্দ চন্দ্র শর্মা, ১৭৬৭ শকাব্দ, পৃষ্ঠা ২২।

৮. দেশ পত্রিকায় পশুপতি শাসমল এই গ্রন্থটির কথা উল্লেখ করেছেন, ১৫ই বৈশাখ ১৩৭৪ দেশ পত্রিকা।

৯. বিধবা বিবাহ নিষেধ ব্যবস্থা, শিবনাথ রায়, কলিকাতা, ভাস্কর যন্ত্রালয়ে মুদ্রিত,

ইং১৮৫৫, পৃষ্ঠা ২৬।

১০. বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ গ্রন্থাগার, রামমোহন লাইব্রেরী, জাতীয় গ্রন্থাগার, চৈতন্য লাইব্রেরী'র ক্যাটালগ সূত্রে প্রাপ্ত তথ্য।

১১. সাম্য (১৮৭৯), বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। বঙ্কিম রচনাবলী, ২য় খন্ড, রিফ্লেক্ট পাবলিকেশন, সম্পাদনা কাঞ্চন বসু, জানুয়ারি ১৯৯৯, পৃ ৩৫০।

১২. সাম্য, ঐ, পৃ ৩৫১।

১৩. সমাচার সুধাবর্ষণ, ১২ নভেম্বর ১৮৫৫, ৪৪৮ সংখ্যা, বিদ্যাসাগর ও বাঙালি সমাজ, বিনয় ঘোষ, ওরিয়েন্ট লংম্যান, পৃ ২৪৮।

১৪. বিদ্যাসাগর ও বাঙালি সমাজ, বিনয় ঘোষ, ঐ, পৃ ২৫২।

১৫. বঙ্গভাষার লেখক, হরিমোহন মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা, ভবানীচরণ দত্তের ষ্ট্রিট, বঙ্গবাসী ইলেক্ট্রো মেসিন্ যন্ত্রে, শ্রীযুক্ত নুটবিহারী দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত, পৃ ৭২৭।

১৬. ঐ, পৃ ৭২৭।

১৭. বিধবা-বিবাহ, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গ্রন্থাবলী, শ্রীকালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন সম্পাদিত, বসুমতী কার্যালয় হইতে প্রকাশিত, শ্রীপূর্ণচন্দ্র দ্বারা মুখোপাধ্যায় মুদ্রিত, ১৩১৭, পৃ ১১১।

১৮. বিধবা বিবাহ, ঈশ্বরগুপ্ত ঐ, পৃষ্ঠা ১১১।

১৯. বিধবা-বিবাহ আইন, ঐ, পৃ ১১২।

২০. বিধবা-বিধবা-আইন, ঐ, পৃ ১১২।

২১. দাশুরায়ের পাঁচালী, হরিমোহন মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত ও সংকলিত ১৯১০ পৃষ্ঠা ৬২৬।

২২. দাশুরায়ের পাঁচালী, ঐ, পৃ ৬২৭।

২৩. দাশুরায়ের পাঁচালী, ঐ, পৃ ৬২৭।

২৪. দাশুরায়ের পাঁচালী, ঐ, পৃ ৬২৫।

২৫. দাশুরায়ের পাঁচালী, ঐ, পৃ ৬২৮।

২৬. দাশুরায়ের পাঁচালী, ঐ, পৃ ৬২৯।

২৭. দাশুরায়ের পাঁচালী, ঐ, পৃ ৬২৯।

২৮. মেঘনাদবধ কাব্য, (নবম সর্গ), মধুসূদন দত্ত, হেরম্বচন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত, এস ব্যানার্জী এণ্ড কোং, ১৯৬৭, পৃ ১১৫।

২৯. বীরঙ্গনা কাব্য, মধুসূদন দত্ত, ভবানীগোপাল সান্যাল সম্পাদিত, মডার্ন বুক এজেন্সী

প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৯১, পৃ ২৭-২৮।

৩০. *বিধবা রমণী*, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ‘কবিতাবলী’ (১৮৭০ ১ম খন্ড), হেমচন্দ্র গ্রন্থাবলী, প্রথম খন্ড, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, জ্যৈষ্ঠ, প্রথম সংস্করণ, ১৩৬১, সম্পাদক সজনীকান্ত দাস, পৃ ২৬।

৩১. *বিধবা রমণী*, ঐ, পৃ ২৬-২৭।

৩২. *হতাশার আক্ষেপ*, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, কবিতাবলী, খন্ড-১, পৃ ১২১।

৩৩. *বিধবা কামিনী*, ‘অবকাশরঞ্জিনী’, নবীনচন্দ্র সেন, (১ম, ২য় খন্ড ১৮৭১), কলিকাতা ক্যানিং লাইব্রেরি, শ্রীযোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত, মাঘ ১২৮৫ সাল, পৃ ৬৬।

৩৪. *বিধবা কামিনী*, ঐ, পৃ ৬৬।

৩৫. *প্রতিমা বিসর্জন*, নবীনচন্দ্র সেন, অবকাশরঞ্জিনী ১ম খন্ড, পৃ ৯৯।

৩৬. *প্রতিমা বিসর্জন*, ঐ, পৃ ১০১।

৩৭. *বিষন্ন কমল*, নবীনচন্দ্র সেন, (অবকাশরঞ্জিনী ১ম খন্ড, পৃ ১৬৭।

৩৮. *কে তুমি*, নবীনচন্দ্র সেন, অবকাশরঞ্জিনী ২য় খন্ড, শ্রীযোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ৫৫ নং কলেজ স্ট্রীট, ক্যানিং লাইব্রেরী হইতে প্রকাশিত, তৃতীয় সংস্করণ, ১২৯১ বঙ্গাব্দ।
পৃ ১৩৭-১৩৮।

৩৯. *বিধবা বঙ্গঙ্গনা*, বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা, হরিশ্চন্দ্র মিত্র, ঢাকা সুলভ প্রেস, ৩০শে বৈশাখ ১২৭০।

৪০. *বিধবা বঙ্গঙ্গনা*, হরিশ্চন্দ্র মিত্র, ঐ, পৃষ্ঠা ৩-৪।

৪১. *বিধবা বঙ্গঙ্গনা*, ঐ, পৃষ্ঠা ৬।

৪২. *বিধবা বঙ্গঙ্গনা*, ঐ, পৃষ্ঠা ৮১।

৪৩. *বিধবা বঙ্গঙ্গনা*, ঐ, পৃষ্ঠা ৮১।

৪৪. *ঊনবিংশ শতাব্দীর সভাসমিতি ও বাংলা সাহিত্য*, অরুণকুমার চট্টোপাধ্যায়, পরিবেশক দে বুক স্টোর, চৈত্র ১৩৬৬, পৃ ৬৪।

৪৫. *আমি কে, ‘অশোকগুচ্ছ’* (১৯০০), দেবেন্দ্রনাথ সেনের শ্রেষ্ঠ কবিতা, গোরা সিংহ রায়, সম্পাদিত জানুয়ারি ২০০২, ভারবি, পৃ ৪৪।

৪৬. *বিধবার আরশি, ‘অশোকগুচ্ছ’* (১৯০০), দেবেন্দ্রনাথ সেনের শ্রেষ্ঠ কবিতা, ঐ পৃ ৪৯।

৪৭. তারপর, দেবেন্দ্রনাথ সেনের শ্রেষ্ঠ কবিতা,ঐ পৃ ৫২।
৪৮. সধবা, ‘অপূর্ব নৈবেদ্য’, দেবেন্দ্রনাথ সেন প্রণীত ও প্রকাশিত, গোয়াবাগান স্ট্রীট কলিকাতা, সন ১৩১৯ সাল, পৃ৬।
৪৯. বিধবা, ‘অপূর্ব নৈবেদ্য’, ঐ, পৃ৮।
৫০. ‘সঙ্গিনীর বৈধব্য’ (কবিতাহার), গিরীন্দ্রমোহিনী দাসীর শ্রেষ্ঠ কবিতা, ড. বারিদবরণ ঘোষ সম্পাদিত, ভারবি, সেপ্টেম্বর ২০০১, পৃ ৩০।
৫১. উপহার (অশ্রুংকণা), গিরীন্দ্রমোহিনী দাসীর শ্রেষ্ঠ কবিতা, ঐ, পৃষ্ঠা ৬৭।
৫২. শ্মশান (অশ্রুংকণা), গিরীন্দ্রমোহিনী দাসীর শ্রেষ্ঠ কবিতা, ৭২, পৃষ্ঠা।
৫৩. কামিনীগুচ্ছ বা বালিকা বিধবা (আভাষ), গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী, বহুবাজার কলিকাতা, সন ১২৯৭, পৃ ১০০।
৫৪. মৃণালিনী’ (১৮৬৯) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিম রচনাসংগ্রহ (উপন্যাস খণ্ড) সভাপতি শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ সেন, প্রধান সম্পাদক শ্রীগোপাল হালদার, সাক্ষরতা প্রকাশন, পশ্চিমবঙ্গ নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতি, প্রথম প্রকাশ, ১লা জানুয়ারি ১৯৭৪, পৃ ১৯৬।
৫৫. ‘বিষবৃক্ষ’ (১৮৭৩) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ঐ, পৃ ২২৫।
৫৬. দুই ভগ্নী, দামোদর মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা, পঞ্চম সংস্করণ, ১৩০৯ পৃ ৫৮।
৫৭. সংসার, রমেশচন্দ্র দত্ত, চৈত্র সংক্রান্তি, ১২৮২ বঙ্গাব্দ, বসুমতী সাহিত্যমন্দির।
৫৮. সমাজ, রমেশচন্দ্র দত্ত, চৈত্র সংক্রান্তি, ১৩০০ বঙ্গাব্দ, বসুমতী সাহিত্যমন্দির।
৫৯. মধুমতী, পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বঙ্গদর্শন, জ্যৈষ্ঠ, ১২৮০, পৃষ্ঠা ৭০।
৬০. প্রতিবেশিনী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গল্পগুচ্ছ, অখন্ড, সরস্বতী লাইব্রেরী, পৃষ্ঠা ৩৬৯।
৬১. রাড়ের বিয়ে ডিস্মিস্, শ্রীজগচ্চন্দ্র গুহ, কলিকাতা, চিৎপুর রোড, বটতলা ১০০-১০১/৩ নং, সন ১২৭৪ সাল ৭ই শ্রাবণ, বটতলার বই ২য় খণ্ড, অদ্রীশ বিশ্বাস সম্পাদিত, গাঙচিল, জানুয়ারি ২০০০, পৃ ১০৮।
৬২. রাড়ের বিয়ে ডিস্মিস্, শ্রীজগচ্চন্দ্র গুহ, ঐ, পৃষ্ঠা ১১১।
৬৩. সমাজচিত্রে ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা প্রহসন, জয়ন্ত গোস্বামী, সাহিত্যশ্রী, ১৩৮১।
- বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস, আশুতোষ ভট্টাচার্য, (১ম খন্ড) (১৭৯৫-১৯০০) এ, মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রাঃ লিঃ তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৬৮। বাংলা নাটক-দেবকুমার বসু (১৮৫২-১৯৫৭) গ্রন্থ অবলম্বনে এই তালিকা নির্মিত।

তৃতীয় অধ্যায়

উনিশ শতকের বাংলা নাটক : বিষয় ভাবনায় বিধবা প্রসঙ্গ

উনিশ শতকে বাল্যবিবাহ, অসম বিবাহ ও বহুবিবাহের কারণে আমাদের সমাজে বিধবা নারীর সংখ্যাধিক্য প্রভূত পরিমাণ হয়েছিল। সমাজে দেখা দিয়েছিল-নারীর প্রণয় ঘটিত নানা ব্যভিচার। সমাজ কলুষতার তীব্রতায় পৌঁছে গিয়েছিল। দেখা দিয়েছিল ভ্রূণ হত্যা, অবৈধ গর্ভপাত, অবৈধ প্রণয়, বেশ্যাবৃত্তি। গ্রামের বঞ্চিত যুবতী বিধবারা জীবন বাঁচানোর তাগিদে নতুন গড়ে ওঠা শহর কলকাতার রাজপথে দাঁড়াতে বাধ্য হয়েছিল। বাধ্য হয়েছিল, নব্য বাবুদের রক্ষিতা হয়ে জীবন কাটাতে। এই সমাজ সংকটে খুব জরুরী হয়ে পড়েছিল বিধবার পুনর্বিবাহের।

উনিশ শতকের যুগ পরিবেশে হিন্দু বিধবারা আচার সর্বস্বতার যুপকাঠে বলি হতে হতে কুপথে পা বাড়াতে একরকম প্রায় বাধ্য হয়েছিল। তার উপর বিধবার সম্পত্তি দখল, জীবনাচারের হাজার বিধিনিষেধের বেড়াজালে জীবন-যৌবন রূপ, রস, গন্ধহীন হয়ে উঠেছিল। নারীর বৈধব্য-আচার পালনের এই কঠোরতা বিপত্নীক পুরুষের ক্ষেত্রে নেই। স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন ওঠে, পুরুষ যদি স্ত্রীর মরণোত্তর পুনর্বিবাহ করতে পারে তবে স্ত্রীলোক কেন স্বামীর মৃত্যুর পর পুনর্বিবাহ করতে পারবেন না। ‘নব্যভারত’ পত্রিকায় গঙ্গেশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় বিবাহ ও সমাজ’ প্রবন্ধে লিখেছেন,—“বিধবাদিগের বিবাহ যেমন শাস্ত্র নিষিদ্ধ, বিপত্নীক পুরুষদিগের পুনর্বিবাহের সেইরূপ নিষেধ করিলে নীতিগত সাম্যলাভ হয়, সে বিষয়ে সন্দেহ করি না, বরং তাহা হইলে, পুরুষদিগের কতকটা প্রায়শ্চিত্ত হয়। শাস্ত্র প্রণয়নের ক্ষমতা হাতে ছিল বলিয়া বিধবাদিগকে থলিতে পুরিয়াছ, আজ যদি স্ব ইচ্ছায় সেই থালিতে উঠিতে পার, তাহা হইলে স্বীকার করি তুমি প্রকৃত বীর।...শতকরা দুই একটা বাদে কোন কোন বিধবা চরিত্র রক্ষা করিয়া থাকেন বলিয়া আমার বিশ্বাস নাই, কখনও করিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না? পিঞ্জর-বদ্ধা বিধবা সহায় সম্পত্তি শূন্য হইয়াও যখন শাস্ত্রের গভীর অনুজ্ঞায় পদাঘাত করে, তখন সর্ববন্ধন-মুক্ত সহায়-সম্পন্ন পুরুষ বিপত্নীক থাকিয়া যে পত্নী দেবীর অনুধ্যানে জীবনাবাহিত করিবেন, ইহা বিশ্বাস করা যায়

না, সুতরাং ও কঠিন ব্যবস্থায় চরম ফল এই দাঁড়াইবে যে গুপ্ত প্রণয়ের ক্ষেত্র আরও প্রচারিত হইবে এবং ভ্রূণ হত্যার পাপ এক হইতে শতগুণে বৃদ্ধি পাইবে।”^১

বিধবা বিবাহ আমাদের সমাজে অসঙ্গত আচরণ বলে গৃহীত হয়েছে। বিধবা বিবাহকে কেন্দ্র করে তৈরি হয়েছে প্রবাদ,—

“রাঁড়ী বেটীর বিয়ের সখ

উনায় রসের কত ঠমক।”^২

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর হিন্দু বিধবা নারীর অসহায়তাকে দরদ দিয়ে উপলব্ধি করলেন এবং এর মুক্তির উপায় খোঁজার চেষ্টা করলেন। তাঁরই উদ্যোগে ১৮৫৬ সালে বিধবা বিবাহ আইনত স্বীকৃতি পেলে, পক্ষে-বিপক্ষে লেখা হল একাধিক বাংলা নাটক। বদলে গেল বাংলা সামাজিক নাটকের চেহারা। ১৮৫৬ পরবর্তীকালে বিধবার পুনর্বিবাহের বিষয়টি সবচেয়ে প্রভাব বিস্তার করে নাট্য সাহিত্যে। সমালোচক অশোককুমার মিশ্র লিখেছেন,—“বিধবা বিষয়ক বাদ-প্রতিবাদের সুর সবচেয়ে বেশি উচ্চকিত হয়েছিল বাংলা নাট্য শ্রেণীতে।”^৩ ১৮৫৬ সাল পরবর্তী সময়কালের বাংলা নাটক রচনার ইতিহাস লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, বাংলা সামাজিক নাটকের কাহিনীবৃত্তে বিষয় হিসাবে ঘুরে ফিরে এসেছে বিধবার পুনর্বিবাহ প্রসঙ্গ। কখনও সহানুভূতিতে, কখন উপহাসে- বিদ্রোপে, কখন মুখরোচক ব্যঙ্গের বলকানিতে।

নাটক যেহেতু মিশ্রশিল্প, তাই এখানে যেমন চরিত্রের সংলাপ আছে তেমনি রয়েছে সংগীত। নাটক যখন নাট্যে উপনীত হল তখন যুক্ত হল শারীরিক ও বাচিক অভিনয়। ফলে বাংলা নাটকের সংলাপ নির্ভরতায় নাট্যকারেরা সরাসরি উক্তি-প্রত্যুক্তির মধ্য দিয়ে, কখনও সংগীতের মধ্য দিয়ে বিধবা বিবাহের সমর্থনে, বিরোধিতায় কিংবা মনোরঞ্জন রঙ্গ-তামাসা করেছেন।

আমাদের অনুসন্धानে উঠে এসেছে উনিশ শতকে রচিত প্রায় চল্লিশটির বেশি নাটকে বিধবা বিবাহ প্রসঙ্গ ও বিধবা নারীর জীবনাচারের চিত্র। পত্র-পত্রিকা, ও বাংলা নাটকে বিধবা বিবাহ প্রসঙ্গ ও বিদ্যাসাগরকে কৌতুকের সঙ্গে উপস্থিত করা হয়েছে। একাধিক প্রহসনে বিদ্যাসাগরের নাম জড়িয়ে বিধবা বিবাহ নিয়ে কৌতুক রসের অবতারণা করা হয়েছে। ‘সাগর’ ও ‘রাঁড়ের বে’ এই জাতীয় শব্দবন্ধ সহযোগে বিধবা বিবাহের মত গভীর ও গভীর বিষয়কে হাস্যরসের খোরাক করে তোলা হয়েছে। যে সমস্ত নাটকে বিধবা প্রসঙ্গ রয়েছে সেগুলি হল,—

কুলীন কুলসর্বস্ব (১৮৫৪) : রামনারায়ণ তর্করত্ন।

বিধবোদ্ধাহ(১৮৫৬)	:	উমাচরণ চট্টোপাধ্যায়।
বিধবা বিবাহ নাটক(১৮৫৬)	:	উমেশচন্দ্র মিত্র।
বিধবা মনোরঞ্জন(১৮৫৬)	:	রাধামাধব মিত্র।
বিধবা বিষম বিপদ(১৮৫৬)	:	অজ্ঞাতনামা।
চপলাচিন্তাপল্যা(১৮৫৭)	:	যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায়।
বিধবা পরিণয়োৎসব(১৮৫৭)	:	বিহারীলাল নন্দী।
রামনবমী(১৮৫৭)	:	গুণাভিরাম শর্মা
সপত্নী নাটক(১৮৫৮)	:	তারকচন্দ্র চূড়ামণি।
বিধবা বিবাহ বিষম দায়(১৮৫৮):	:	গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন।
নীলদর্পণ(১৮৬০)	:	দীনবন্ধু মিত্র।
বিধবা বিরহ নাটক(১৮৬০)	:	শ্রীশিমুয়েল পিরবক্স।
বাল্যোদ্ধাহ নাটক(১৮৬০)	:	শ্যামাচরণ শ্রীমানি।
দলভঞ্জন নাটক (১৮৬১)	:	হারাণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (শর্মা)।
অজ্ঞাতনামা (১৮৬২)	:	বিধবা সুখের দশা
শুভ্র শীঘ্রং(১৮৬১)	:	হরিশচন্দ্র মিত্র।
ম্যাও ধরবে কে?(১৮৬২)	:	হরিশচন্দ্র মিত্র
আইন সংযুক্ত কাদম্বিনী নাটক(১৮৬২, ১ম ও ২য়)	:	কুশদেব পাল।
অশুভ পরিহারক(১৮৬২)	:	গৌরমোহন বসাক
পুনর্বিবাহ নাটক (১৮৬২)	:	গুরুপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়।
অশুভস্যকালহরণং(১৮৬৩)	:	গোবিন্দচন্দ্র চক্রবর্তী।
বিধবা বিলাস নাটক(১৮৬৪)	:	যদুনাথ চট্টোপাধ্যায়।
নবনাটক(১৮৬৬)	:	রামনারায়ণ তর্করত্ন।
বিয়ে পাগলা বুড়ো(১৮৬৬)	:	দীনবন্ধু মিত্র।
মেঘনাদবধ নাটক(১৮৬৭)	:	ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়।
বঙ্গকামিনী নাটক(১৮৬৮)	:	হারাণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।
হিন্দু মহিলা নাটক (১৮৬৮)	:	বিপিনমোহন সেনগুপ্ত।
সাক্ষাৎ দর্পণ(১৮৭১)	:	অজ্ঞাতনামা।

বিধবার দাঁতে মিশি(১৮৭৪)	:	গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।
শরৎ সরোজিনী(১৮৭৪)	:	উপেন্দ্রনাথ দাস।
বিধবা বঙ্গবালা(১৮৭৫)	:	অঞ্জাতনামা।
সন্তাপিনী নাটক(১৮৭৬)	:	জনৈক ভদ্রমহিলা
বিধবা(১৮৭৭)	:	নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য।
সরোজা(১৮৭৭)	:	রাধারমণ কর :
এমন কর্ম্ম আর করব না(১৮৭৭):	:	জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।
বঙ্গবিধবা(১৮৮২)	:	বিরজামোহন চৌধুরী।
বিধবা সঙ্কট নাটক(১৮৯০)	:	অঞ্জাতনামা।
তরুবালা(১৮৯০)	:	অমৃতলাল বসু।
বিলাপ! বা বিদ্যাসাগরের স্বর্গে আবাহন(১৮৯১):	:	অমৃতলাল বসু।
বিধবা কলেজ(১৮৯২)	:	অতুলকৃষ্ণ মিত্র।
বাবু(১৮৯৪)	:	অমৃতলাল বসু।

উক্ত নাটকগুলির কাহিনী পরিচয় থেকে বিধবা নারীদের অবস্থানগত দিকগুলি জেনে নেওয়া প্রয়োজন। আমরা একে একে নাটকগুলির কাহিনী পরিচয় তুলে ধরব।

১৮৫৪ সাল নাগাদ যখন বিধবা বিবাহ সংক্রান্ত সচেতনতা সমাজে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে এই সময়কালে রামনারায়ণ তর্করত্নের ‘কুলীন কুলসর্বস্ব’(১৮৫৪) নাটক রচিত ও প্রকাশিত হয়। ‘কুলীন কুলসর্বস্ব’ নাটক রচনার একটা ইতিহাস আছে। রংপুর কুণ্ডী পরগণার বিদ্যোৎসাহী জমিদার কালীচন্দ্র রায়চৌধুরী ‘সম্বাদ ভাস্কর’ পত্রিকায় পুরস্কার ঘোষণা করে একটি বিজ্ঞাপন প্রচার করেন। ১৮৫৩ সালের ৮ই নভেম্বর ‘রঙ্গপুর বার্তাবহ’ পত্রে বিজ্ঞাপনটি প্রকাশিত হয়,—

“বিজ্ঞাপন।

৫০ টাকা পারিতোষিক

এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা সর্বসাধারণ কৃতবিদ্য মহোদয়গণকে বিজ্ঞাত করা যাইতেছে, যিনি সুললিত গৌড়ীয় ভাষায় ছয় মাস মধ্যে ‘কুলীন কুলসর্বস্ব’ নামক একখানি মনোহর নাটক রচনা করিয়া রচকগণ মধ্যে সর্বোৎকৃষ্টতা দর্শাইতে পারিবেন তাঁহাকে সঙ্কল্পিত ৫০ টাকা পারিতোষিক প্রদান করা যাইবেক।

রঙ্গপুর পং কুণ্ডী শ্রীকালীচরণ রায় চৌধুরী

এই বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হবার তিন মাসের মাথায় ১৮৫৪ সালের ১০ই মার্চ তারিখে ‘কুলীন কুলসর্বস্ব’ নাটকের পাণ্ডুলিপি ও একটি চিঠিসহ পাঠিয়ে দেন জমিদার শ্রীকালীচরণ রায়চৌধুরীর কাছে।^৫ ‘কুলীন কুলসর্বস্ব’ নাটকটি রচনা করার জন্য রামনারায়ণ রঙপুরের জমিদার কালীচন্দ্র চৌধুরীর কাছ হতে ৫০ টাকা পুরস্কার লাভ করেন। ১৮৫৪ সালের শেষভাগে এ নাটক প্রকাশিত হয়। সমকালে, রাজেন্দ্রলাল মিত্র সম্পাদিত ‘বিবিধার্থ-সংগ্রহ’ পত্রিকার ৩৫তম খণ্ডে ‘কুলীন কুলসর্বস্ব’ নাটকের সমালোচনা প্রকাশিত হয়। ‘বিবিধার্থ সংগ্রহ’ পত্রিকায় ‘কুলীনকুলসর্বস্ব’ নাটকের সমালোচনায় লেখা হয়,—“বল্লালসেনীয় কৌলিন্য প্রথা প্রচলিত থাকায় কুলীন-কামিনীগণের এক্ষণে যে রূপ দৃষ্টদর্শা ঘটিতেছে’ অভিনয়দ্বারা স্বদেশীয় মহোদয়গণের মনে তাহা সমুদিত করিয়া দেওয়াই প্রস্তাবিত নাটকের মুখ্যকল্প।”^৬ ১৮৫৭ সালের মার্চ মাসে চড়কডাঙ্গার জয়রাম বসাকের বাড়ির ‘ওরিয়েন্টাল থিয়েটারে’ রামনারায়ণ তর্করত্নের ‘কুলীন কুলসর্বস্ব’ নাটকের অভিনয় হয়।

কৌলিন্য প্রথার কুফল দেখিয়ে ছয় অঙ্কে রচিত হয় ‘কুলীন কুলসর্বস্ব’ নাটক। এ নাটকের মূল লক্ষ্য, কৌলিন্য ও বহুবিবাহ রীতির সমালোচনা হলেও—সমকালীন সমাজ সমস্যাকে বিদ্রূপ করতে গিয়ে নাট্যকার প্রাসঙ্গিক ভাবে বিধবার সমস্যা, সংকট ও বিধবা বিবাহের প্রসঙ্গকে উত্থাপন করেছেন। রামনারায়ণ কলকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক ছিলেন এবং বিদ্যাসাগরের পরম সুহৃদ ছিলেন। ১৮৫৬ সালে বিধবা বিবাহের সপক্ষে বিদ্যাসাগরের প্রেরিত আবেদনপত্রে রামনারায়ণ সম্মতি স্বাক্ষর করেছিলেন। বিধবা বিবাহ সম্পর্কে রামনারায়ণের পূর্ণ সমর্থন ছিল। ‘কুলীন কুলসর্বস্ব’ ছাড়াও রামনারায়ণের ‘নবনাটকে’ (১৮৬৬) উঠে এসেছে বিধবার পুনর্বিবাহ প্রসঙ্গ।

‘কুলীন কুলসর্বস্ব’ নাটকের বিষয়বস্তু সম্পর্কে বিজ্ঞাপনে নাট্যকার লিখেছেন,—“কৃত্রিম কৌলিন্য প্রথায় বঙ্গ দেশের যে দূরাবস্থা ঘটিয়াছে তাহা সম্যক অবগত হওয়া যাইতে পারে।”^৭ ‘কুলীন কুলসর্বস্ব’ নাটকের কাহিনীতে রয়েছে, কুলীন কুলপালক বন্দ্যোপাধ্যায় চার কন্যার বিবাহ নিয়ে চিন্তিত। অন্তাচার্য ও শুভাচার্য দুই ঘটককে পাত্র সন্ধানের কাজে নিযুক্ত করলেও কোনো সুরাহা হয়নি। অবশেষে ষাট বছরের একপ্রবীণ পাত্রের সন্ধান মেলে। কপট ঘটক অন্তাচার্য একশটাকার লোভে বৃদ্ধ এক কুলীন পাত্রের সঙ্গে চার কন্যার বিয়ের ব্যবস্থা করেছেন। কুলপালক কন্যাদায় হতে মুক্ত হতে বিবাহ প্রস্তাবে সম্মতি জানায়। কুলপালক, তাঁর চার মেয়েকে বিয়ের

কথা জানালে বয়স অনুযায়ী তাঁদের মধ্যে নানা প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। বড় কন্যা জাহ্নবী বিষাদে নিমজ্জমান হয়েছে, মধ্যম কন্যা শান্তবী আশ্চর্য্যাব্বিতা হয়েছে, কামিনী যৌবন জ্বালায় পীড়িত ভাবের উপশমের স্বপ্ন দেখেছে এবং কনিষ্ঠ কন্যা কিশোরী উৎসুক হয়ে উঠেছে বিয়ের জন্য। এই বিয়ের অন্তরালে রয়েছে বেদনা ও করুণার প্রকাশ। কুলপালকের জ্যেষ্ঠ কন্যা জাহ্নবী তাঁর বোধবুদ্ধি দিয়ে বুঝেছে এমন বরকে বিবাহ করা মানে বৈধব্যের নামান্তর। আক্ষেপের সঙ্গে জাহ্নবী জানিয়েছে,—“এ বিয়া হইলে মাত্র একাদশী ফল।”

এর পাশাপাশি চিত্রিত হয়েছে, কুলীন বিবাহ বণিকের বিবাহ নির্ভর জীবীকাপালনের চিত্র। বিবাহবণিক মুখোপাধ্যায়ের অর্থ জড় করার জন্য ফর্দ খুলে দেখে নিয়েছে স্থানীয় অঞ্চলে কোথাও বিবাহ করেছেন কিনা! পথে উত্তম নামক এক যুবকের কাছে শ্বশুর গৃহের সন্ধান করতে গিয়ে বিবাহবণিক জানতে পারেন, উত্তম তাঁরই পুত্র। বিমলপুর গ্রামে যে স্ত্রীর কাছে তিনি যাচ্ছেন, উত্তম সেই স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্র। দীর্ঘদিন স্বামীর অনুপস্থিতিতে, লোক পরম্পরায় বিবাহবণিকের মৃত্যু সংবাদ পেয়ে উত্তমের মা বৈধব্য বেশ ধারণ করে বৈধব্য জীবন অতিবাহিত করেছে।

রামনারায়ণ তর্করত্ন ছিলেন, দাক্ষিণাত্য বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ এবং সংস্কৃত শাস্ত্রে সুপণ্ডিত। দক্ষিণ ২৪ পরগণার হরিণাভীতে বসবাস করতেন। নিজে স্বধর্মে ব্রাহ্মণ হয়েও ব্রাহ্মণ শ্রেণীর কুলীন আচারের অসারতাকে ব্যঙ্গ বিদ্রোপ করেছেন। নাট্যকার এ নাটকে নারীর অসহায়তার বিচিত্র রূপ তুলে ধরেছেন।

উমাচরণ চট্টোপাধ্যায়ের ‘বিধবোদ্ধাহ’ (১৮৫৬) নাটক প্রকাশের সংবাদ প্রকাশিত হয় ১৮ সেপ্টেম্বর তারিখে ‘সম্বাদ ভাস্কর’ পত্রিকার ৬৯ সংখ্যার সম্পাদকীয় অংশে। সম্পাদকীয় অংশে লেখা হয়,—“বিধবোদ্ধাহ নাটক উক্ত নামে এক নবীন গ্রন্থ প্রকাশ হইয়াছে কোন ভদ্র সন্তান এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, আমরা পাঠ করিয়া পুলক পরিপূর্ণ হইলাম, পূর্ব্বে বঙ্গদেশে বঙ্গ ভাষার এতাদৃশ নাটক প্রকাশ হয় নাই। পূর্ব্বে কালীন লোকেরা নাটক প্রকাশ করণীয় রীতি বড়ই জানিতেন না, তিন বৎসরের অধিক হইল প্রাপ্ত বাবু তারাচরণ শীকদার যিনি আমারদিগের যন্ত্রালয়ে বঙ্গভাষার ইংরাজীর অনুবাদ করিতেন তিনি “ভদ্রাজ্জুন” নামে এক নাটক প্রকাশ করেন তাহা যদিও শুদ্ধ হইয়াছিল তত্রাচ সর্ব্ব রস পরিপূর্ণ হয় নাই, পরে শ্রীযুক্ত রামনারায়ণ তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয়ের যত্নে “কুলীন কুল সর্ব্বস্ব” নামে এক নাটক প্রকাশ হয় এবং তিনিই বঙ্গভাষায় বেণীসংহার নাটকের অনুবাদ করিয়াছেন, কয়েক দিবস গত হইল “বিধবা বিষম বিপদ” নামে প্রকাশিত আর একখানি ক্ষুদ্র নাটক দেখিয়াছি তাহাও বিধবা বিবাহোপলক্ষে লিখিত হইয়াছে

এবং বঙ্গভাষায় অভিজ্ঞান শকুন্তলার যে অনুবাদ প্রকাশ পাইয়াছে তাহাও দেখিয়াছি, কোন নাটক এ নাটকের তুল্য হয় নাই, সৎপাত্র কুলীন পুত্র মহাশয় এতদগ্রহে যে সকল আশয় বিন্যাস করিয়াছেন তাহাতে পৃথিবীর সকল রস একত্র হইয়াছে, আমরা গ্রন্থ পাঠ কালীন তাহা দুই হস্তে সমানভাবে রাখিয়াছিলাম, পাছে অপূর্ব রস টস্ ২ করিয়া পড়িয়া যায় এই কারণ কোন দিগ নিম্নভাগে রাখি নাই যদি গ্রন্থপতি দ্রুতগতি না হইতেন আর নাটক বিজ্ঞ কোন যোগ্য ব্যক্তিকে দেখাইয়া মুদ্রাঙ্কিত করাইতেন তবে আমরা সাহসে বলিতে পারিতাম এই নাটক দোষ রহিত সর্ব রস পরিপূর্ণ হইয়াছে, কিন্তু মধ্যে ২ ভাব স্থির রাখিতে পারেন নাই, এদেশের স্ত্রী-পুরুষেরা কথোপকথনে যে সকল ভাষা ব্যবহার করেন না স্ত্রী পুরুষদিগের উক্তি স্থলে সেই সকল বাক্য ব্যবহার করিয়াছেন ইহাতে পাঠকেরা পাঠ মাত্রই জানিতে পারিবেন ঐ সকল উক্তি স্ত্রীপুরুষ-দিগের উক্তি নয়, গ্রন্থ কর্ত্তা স্ত্রী পুরুষের উক্তি বলিয়া আপনি লিখিয়াছেন। এতদেশীয়া বনিতারা কি কথায় কথায় কবিতা করিতে পারেন। নাপিনীরা কি বিদ্যাভ্যাস করিয়াছে কথায় ২ কবিতা করিতে পারে? ভদ্র জাতীয় পুরুষেরা কি বাক্যালাপ-কালীন স্ত্রী ভাষা অর্থাৎ মেয়েলী ভাষা বলেন? বিধবোদ্ধাহ নাটকের কোন ২ স্থলে এই প্রকার ভাষা ব্যবহার হইয়াছে যদিও এ দোষ সামান্য দোষ বটে তত্রাচ সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী চার্ব্বঙ্গীদিগের গালভালে বিন্দুমাত্র স্থিতি থাকিলে যেমন সুধাসিদ্ধ বদনকেও ইন্দু বলা যায় না এই উৎকৃষ্ট গ্রন্থও সেইরূপ হইয়াছে।”^৯

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, ১৮৫৭ সালের ২১মে তারিখে ‘বেঙ্গল হরকরা’য় একজন সংবাদদাতা লেখেন,—“নাট্যাভিনয়ের প্রতি অনুরাগের ফলে বহু হিন্দু যুবক দেশীয় পাড়ায় অস্থায়ী নাট্যশালা প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য উৎসাহিত হইয়াছে। কিছুদিন পূর্বে স্বর্গীয় আশুতোষ দেবের বাড়ীতে ‘শকুন্তলা’ এবং তাহার পর সিংহ-বাবুদের বাড়ীতে ‘বেণীসংহার’ অভিনীত হয়। সম্প্রতি আমরা শুনিতে পাইতেছি যে, কয়েকজন সম্ভ্রান্ত হিন্দু যুবক শীঘ্রই ‘বিধবোদ্ধাহ’ ও ‘প্রবোধচন্দ্রোদয়’ নাটকের অভিনয় প্রদর্শন করিবেন। প্রথমোক্ত নাটকটির অভিনয় কাঁশারিপাড়া-নিবাসী মুৎসুদ্দী বাবু মহীন্দ্রলাল বসুর বাড়ীতে হইবে। ইহা দেশের পক্ষে খুব মঙ্গলের লক্ষণ এবং দেশীয় লোকদের মধ্যে নাটক সম্বন্ধে উৎসাহ বৃদ্ধি দেখিয়া তাঁহাদের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিমাট্রেই আনন্দিত হইবেন।”^{১০} ‘প্রবোধচন্দ্রোদয়’ ও ‘বিধবোদ্ধাহ’ নাটক অভিনয় আয়োজনের কথা বলা হলেও শেষ পর্যন্ত অভিনীত হয়েছিল উমেশচন্দ্র মিত্রের ‘বিধবা বিবাহ’ নাটক। অনেক অনুসন্ধানও নাটকটি দেখার সৌভাগ্য আমাদের হয়নি।

১৮৫৬ সালের ২৩ শে জুলাই বিধবা বিবাহ আইন পাশ হবার পর পরই — এই বছরেই

প্রকাশিত হয় তিনটি নাটক, উমাচরণ চট্টোপাধ্যায়ের ‘বিধবোদ্ধাহ’ নাটক (১৮৫৬, সংবাদ ভাস্কর), উমেশচন্দ্র মিত্রের ‘বিধবা বিবাহ নাটক’ (১৮৫৬), রাখামাধব মিত্রের ‘বিধবা মনোরঞ্জন’ নাটক (১৮৫৬)।

‘বিধবা বিবাহ নাটকে’ (১৮৫৬) বিধবাদের ইচ্ছা ও মানসিকতার নানান প্রতিচ্ছবি তুলে ধরেছেন নাট্যকার। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রচেষ্টায় বিধবা বিবাহ আইন পাশ করার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে বিধবাদের যন্ত্রণার অবসান হয় খানিক পরিমাণে। তৎকালীন সময়ে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের এই আইনের বিরোধিতা করতে শুরু করেন। দ্বিধাবিভক্ত সমাজের কিছু কিছু বিধবা মহিলাও এর প্রতিবাদ করতে শুরু করেন। বিধবা বিবাহ শাস্ত্রসম্মত জেনেও কুসংস্কার আচ্ছন্ন মন নিয়ে পাপের অংশীদারিত্বের কথা ভেবে বিধবারা দ্বিতীয় বিবাহে সম্মতি জানায়নি। উমেশচন্দ্র মিত্রের ‘বিধবা বিবাহ নাটক’টির মধ্যে সমাজের এই জটিল মানসিকতার ছবি তুলে ধরা হয়েছে। বিধবারাই বিধবা বিবাহের প্রধান প্রতিপক্ষ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

উমেশচন্দ্র মিত্রের ‘বিধবা বিবাহ নাটকে’র কাহিনী গড়ে উঠেছে সুলোচনা নামক এক কিশোরী বিধবার করুণ কাহিনী অবলম্বনে। ‘বিধবা বিবাহ নাটক’ (১৮৫৬) চার অঙ্কে বিন্যস্ত। কীর্তিরাম ঘোষ ও পদ্মাবতীর কন্যাশ্রয়—সুলোচনা, রেবতী ও রাইকিশোরী বাল্যবিধবা। পুত্রবধূ সুখময়ীও ভাগ্য বিড়ম্বনায় বৈধব্য যন্ত্রণার শিকার। বিদ্যুল্লতা ও সুখময়ী—দুই বোনের কথোপকথন দিয়ে নাটকের শুরু। সুখময়ী বিধবা (রাঁড়) আর, বিদ্যুল্লতা সধবা মেয়েমানুষ।

বাল্যবিধবা সুখময়ীর খাওয়া পরার কোনো অভাব নেই। কিন্তু তার জীবনের সবচেয়ে বড় দুঃখ তার স্বামী নেই। সুখময়ীর সবকিছু থাকা সত্ত্বেও সে নিঃস্ব। বসন্ত এলে তার প্রাণে নিঃসঙ্গতা জাগে। সুলোচনার কাছে বৈধব্যের জ্বালা অসহনীয় হয়ে উঠেছে। বৈধব্য জ্বালা দূর করতে সে পুনর্বিবাহ করার জন্য উন্মুখ হয়ে উঠেছে। তাই সে অকপটে তার মনের অসুখের কথা মায়ের কাছে ব্যক্ত করেছে।

সুলোচনার পিতা কীর্তিরাম বিধবা বিবাহের বিপক্ষে। তার অকাট্য যুক্তি বিধবা বিবাহ শাস্ত্র বিরুদ্ধ। কীর্তিরাম রক্ষণশীল, সেকেলে ধ্যান ধারণায় বিশ্বাসী। স্বভাবতই তিনি বিধবার পুনর্বিবাহ মেনে নিতে রাজি হননি। তিনি মনে করেন, লুকিয়ে চুরিয়ে বিধবা বিবাহ অন্যায় হলেও সেটা কোনো ব্যাপার নয়, কিন্তু প্রকাশ্যে বিধবা বিবাহ বিষয়টাই অন্যায় ব্যাপার। তাঁর কাছে গোপনে ভ্রূণহত্যা, ব্যভিচার দোষ ইত্যাদি ভালো। তবু দ্বিতীয়বার বিবাহ ভালো নয়। তিনি দ্বিতীয় বিবাহকে কোনমতেই শাস্ত্রসম্মত বলতে রাজী নন। বন্ধু শ্যামাচরণ, কীর্তিরামকে

বিধবার পুনর্বিবাহের সুফল বোঝাতে চেয়েছেন। কিন্তু কীর্তিরামবাবু তাতে ক্ষুব্ধ হয়েছেন এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে ‘কলি অবতার’ বলে ব্যঙ্গ বিদ্রোপ করেছেন।

কীর্তিরাম ঘোষের স্ত্রী পদ্মাবতী তাঁর বিধবা কন্যাদের বিধবা বিবাহে যে আগ্রহ রয়েছে সেকথা জানায়। বিধবা মেয়েরা যে পুনর্বিবাহে উৎসাহী সেটা জানার পর কীর্তিরাম অসন্তুষ্ট হয়েছেন। বিধবা সুলোচনা, রেবতী ও রাইকিশোরীর মনের ইচ্ছায় কীর্তিরাম ক্রমাগত প্রলাপ বকেছেন। ঘটনাক্রমে দেখা যায়, বিধবা সুলোচনা রামকান্ত বোসের ছেলের প্রতি প্রেমে অনুরক্ত হয়। ক্রমে একে অপরের প্রেমে পড়ে। রামকান্ত বোসের ছেলেকে দেখে সুলোচনার মধ্যে চিত্তচাঞ্চল্যতা তৈরি হয়। সুলোচনা তাঁর প্রেমাবেগ গোপন করতে পারে না। প্রিয় পুরুষের খোঁজ নিতে বিধবা সুলোচনা নাপেতানী রসবতীকে কাজে লাগায়। শুরু হয় সুলোচনার বিরহময় প্রেমজীবন। বিধবা সুলোচনা একক শয্যায় শুধু তাঁর প্রিয় পুরুষটিকেই কল্পনা করে। সুলোচনার বৈধব্য জীবনে নতুন পুলক সঞ্চার হয়। ক্রমশই তা পূর্বরাগ থেকে অনুরাগে পরিণত হয়। নিদ্রাহীন রাত্রী, বিনিদ্রায় পরিণত হয়। ক্রমশ সুলোচনা পুরুষের সান্নিধ্য কামনায় অধীর হয়ে পড়ে। স্বপ্নে সহবাস করার চিন্তায় আচ্ছন্ন হয়। সুলোচনা এবং রসবতীর কথোপকথনের মধ্য দিয়ে উঠে এসেছে তাঁর চিত্ত ব্যাকুলতার ছবি।

অন্যদিকে রসবতী নাপেতানী সেও বালবিধবা। তার জীবনে প্রেম সম্ভোগ উপভোগ করা হয়নি। তার মনেও সুপ্ত কাম বাসনা রয়েছে কিন্তু বয়সাদিক্যে তা গোপনীয় থেকে গেছে। বিধবারা যে সমাজ অনুশাসনের দ্বারা দলিত তা নাপেতানীর বক্তব্যে সুস্পষ্ট। বিধবারা যেন অদৃষ্টকেও বিশ্বাস করতে চায় না। রসবতী নাপেতানীর সাহায্যে মন্মথ ও সুলোচনা একান্তে মিলিত হয়। সুলোচনা আর কলঙ্কের ভয় পায় না। বিধবা হওয়া সত্ত্বেও সুলোচনা মন্মথকে প্রেম নিবেদন স্বরূপ নিজেকে সমর্পণ করার কথা ভাবে। হৃদয়ে যে দাবানল সুলোচনার লেগেছে তা একমাত্র মন্মথর সঙ্গে সঙ্গমেই নিভতে পারে। বৈধব্য যন্ত্রণা এবং যৌবন পিপাসা সুলোচনাকে পদস্থলিত করতে বাধ্য করে। সুলোচনা জানিয়েছে,—

“কূলে দেহ ছাই, মানে কাজ নাই, যদি ওলো পাই
 ও মুখ চাঁদে।
আমি হবো তার, যে হবে আমার, প্রণয় কি আর
 কলঙ্কে বাদে।”^{১১}

সুলোচনা বিয়ের পর এবং বিধবা হবার পর প্রথম মন্মথকে ভালোবাসে। ভালোবাসা কাকে

বলে তা জানতে পারে। যৌবনের কালপ্রবাহ সুলোচনাকে দখল করে। মন্মথ সুলোচনার কাছে বিবাহ প্রস্তাব রাখে কিন্তু সুলোচনা তাতে রাজী হয় না। কারণ সে জানে যে তার পিতা বিধবা বিবাহ বিরোধী। তিনি প্রাণ দেবেন কিন্তু বিধবা কন্যার বিবাহ দেবেন না। সুলোচনা তার অদৃষ্টকেও বিশ্বাস করে না। পাছে তার এই সাক্ষাৎটুকুও বন্ধ হয়ে যায়। বিধবা হয়েও যে প্রেমের অঙ্কুর তার মধ্যে সজীবতা এনেছে তা যদি শেষ হয়ে যায়—এই আশঙ্কায় সুলোচনা ভীত হয়ে বিবাহে অস্বীকার করে। মন্মথ ও সুলোচনা পরস্পর অঙ্গুরী বিনিময় করে গান্ধর্ব মতে বিবাহ করে। এতদিন সুলোচনা নিজ বেশভূষার প্রতি লক্ষ্য রাখেনি। কিন্তু মন্মথের আগমন বার্তা পেয়ে পুণরায় সুলোচনার সাজবার ইচ্ছা জাগে। সুলোচনা আপন মনে নানান চিন্তা করেছে। পূর্বরাগ, অনুরাগের পর মিলনের সময় এসেছে। সুলোচনার মনে প্রেম ভীতি আনন্দ মিলে মিশে একাকার। সে তার প্রণয়ীকে অতি কাছ থেকে হৃদয়াঙ্গম করবে। বিবাহ হওয়ার পর সে যা পায়নি, বিধবা হবার পর যে সামাজিক শৃঙ্খলে যে বদ্ধ, সে আজ গোপন প্রণয়িণী। গোপনে সে প্রণয়াকাজক্ষীকে পাবে। সেই সঙ্গে তার মনে ভয়ও বিদ্যমান। সে মান-মর্যাদার কথা ক্ষণিকের জন্য ভাবে। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে তা বিস্মৃত হয়ে শুধুমাত্র অপরিাপ্ত আনন্দের জন্য প্রতীক্ষা করে। অধীর আগ্রহের সঙ্গে মন্মথকে আহ্বান জানায় তার কক্ষে। বিস্তর প্রেমালাপের পর, দুজনের বিরহী মন শান্ত হবার পর উভয়েই নিদ্রা যায়।

কিছুদিন পর মন্মথ সুলোচনার কথায় জানতে পারে সুলোচনা গর্ভবতী। সুলোচনা এর বিন্দুমাত্রও বুঝতে পারে না। গর্ভধারণ তাঁর কাছে শুধুমাত্র শারিরীক অস্বস্তি ছাড়া আর কিছু নয়। নাপেতানী রসবতী ও মন্মথ সুলোচনার গর্ভবতী হয়ে পড়ায় চিন্তিত হয়ে পড়েন। মন্মথ আত্মগ্লানিতে ভুগতে থাকে। সুলোচনার গর্ভধারণ হয়ে যাওয়ার ফলে মন্মথ ও সুলোচনা দুজনেই আশঙ্কিত হয় লোক জানাজানির ভয়ে।

ক্রমে বৌদি সুখময়ী, সুলোচনার গর্ভধারণ সম্পর্কে জানতে পারে। সুখময়ী তাঁর বিধবা ননদের এই অবস্থার কথা শাশুড়ী পদ্মাবতীকে জানায়। ফলে পদ্মাবতীর মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে। পারিবারিক সম্মান হানি ঘটবে—এসবের চিন্তায় পদ্মাবতী নিজের মৃত্যু কামনা করে। পদ্মাবতী সুলোচনার গর্ভধারণের কথা কীর্তিরামবাবুকে জানায়। কীর্তিরামবাবু এই কথা শোনারাত্র তাঁর বিধবা কন্যার মৃত্যু চেয়েছেন।

বিধবা গর্ভবতী সুলোচনা, আত্মদংশনে প্রাণ বিসর্জন দেওয়ার সংকল্প করে। কলঙ্কভারে নিজের জীবনকে বিসর্জন দেওয়ার কথা ভাবে। বৈধব্য যন্ত্রণা সহ্য করার চেয়ে নিদারুণ কষ্ট এই

কলঙ্ক দাগে। ফলে সুলোচনা মৃত্যুকেই সুখকর বলে মনে করে। সুলোচনার হাতে মন্মথ প্রদত্ত হীরার আংটিটির বিষপানে সুলোচনা আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়। সুলোচনার প্রাণ ওষ্ঠাগত হওয়ায়, তার পিপাসা বাড়ে। সে জল খেতে চায়। পদ্মাবতী নিজ কন্যার প্রাণ রক্ষা করতে চিকিৎসার প্রয়োজন অনুভব করেন। কিন্তু সুলোচনা শুধুমাত্র জলের জন্য কাতর হয়ে পড়ে। সুলোচনার জন্য জল আনা হলে সুলোচনা জলের দিকে হাত বাড়ায়। কিন্তু সুলোচনার বিধবা বৌদি সুখময়ী তাকে জল খেতে দেয় না। কারণ একাদশীর দিন বিধবা মহিলাদের নির্জলা উপোস চলে। মুখে যদি জল দেওয়া হয়, তবে ইহকালের সঙ্গে পরকালটাও লোপ পাবে। পাপের ভাগী হবে সুলোচনা। সুলোচনার কুকর্মে ইহকাল নষ্ট হয়েছে, শেষে একাদশীর নিয়ম ভাঙলে পরকালটাও খোয়াবে সে। মৃত্যু অবধারিত জেনেও সুলোচনার শেষ ইচ্ছাটা পূর্ণ করা যাবে না শুধুমাত্র একাদশীর জন্য।

বিধবা সুলোচনা সামাজিক বিধিনিষেধের কাছে পরাজিত হয়ে মাতাপিতার আশ্রয়ে শান্তিতে মৃত্যু কামনা করেছে। কিন্তু সুলোচনার পিতা কন্যাকে ক্ষমা করতে চাননা। মৃত্যুপথযাত্রী সুলোচনার জন্য ব্যকুল মাতা স্বামীকে বিধবা বিবাহের কারণে ভৎসনা করলে কীর্তীরাম জানিয়েছে এটা তাঁর কন্যার কৃতকর্মের ফল। কন্যার মৃত্যুর জন্য দুঃখ প্রকাশ বোকামির কাজ বলে কীর্তীরাম মনে করেছেন। বিষ জর্জরিত প্রবল তৃষ্ণায় সুলোচনা প্রাণ ত্যাগ করেছে। সমাজের অনুশাসন তাকে বাঁচতে দেয়নি।

সুলোচনার সাদাকালো জীবন রঙিন হয়ে ওঠার ফলস্বরূপ তাকে পিপাসার্ত ভাবে আত্মহননের পথ বেছে নিতে হয়েছে। একাদশীর ব্রতের ফলে পিপাসাও লাঘব করতেও পারেনি সে। একফোঁটা জলে তার পরকালটাও গোল্লায় যাবে, এইভাবে পরিবারবর্গ তার গলায় জলবিন্দু পর্যন্ত ঠেকাতে পারেনি। জীবনের এই ভয়ঙ্কর পরিণতি সুলোচনার মত সমাজের বহু বিধবা নারীর জীবন বিপন্ন করেছে। সমাজের রক্তচক্ষু তাদের শাসিয়েছে। ফলে তারা জীবন থেকে বিদায় নেবার জন্য শেষপর্যন্ত আত্মহননের পথ বেছে নিয়েছে।

উমেশচন্দ্র মিত্রের ‘বিধবা বিবাহ’ নাটকটি সমকালের নাট্যাভিনয়ের ইতিহাস ও নাটক রচনার ইতিহাসকে সমৃদ্ধ করেছিল। ‘বিধবা বিবাহ’ নাটকটি একাধিকবার সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চায়িত হয় ও জনসমাদর লাভ করে বিপুলভাবে। ‘বিধবা বিবাহ নাটক টি (১৮৫৬) ১৮৫৭ সালের মে মাসে শোভাবাজার নাট্যশালায় আশুতোষ দেবের উদ্যোগে প্রথম মঞ্চস্থ হয়। পরে এ নাটক ১৮৫৯ সালের বৈশাখ মাসে (ইংরেজি ২৩শে এপ্রিল) সিঁদুরিয়া পট্টিতে রামগোপাল মল্লিকের

প্রাসাদে প্রতিষ্ঠিত ‘মেট্রোপলিটান থিয়েটারে’ অভিনীত হয়। নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করেন খ্যাতিমান অভিনেতা বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়। অভিনেতা নাট্যকার বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় নায়িকা সুলোচনার চরিত্রে অভিনয়ের মধ্য দিয়েই প্রথম মঞ্চাভিনয় শুরু করেন। ব্রাহ্ম ধর্মান্দোলনের নেতা শ্রীকেশবচন্দ্র সেন এই নাটকটির প্রযোজনার সঙ্গে জড়িত ছিলেন। নাট্যসমালোচক হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত তাঁর ‘ভারতীয় নাট্যমঞ্চ গ্রন্থে’ লিখেছেন,—“কলিকাতার সিঁদুরিয়া পট্টিতে গোপাললাল মল্লিকের বাড়িতে মেট্রোপলিটান থিয়েটারে কেশব সেন মহাশয়ের উদ্যোগে ও প্রযোজনায় উমেশচন্দ্র মিত্র রচিত বিধবা বিবাহ’ নাটক অভিনীত হয়। অভিনয়ের তারিখ ১৮৫৯, ২৩ শে এপ্রিল।”^{১২}

প্রাচ্যবিদ্যার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু তাঁর ‘বিশ্বকোষ’ গ্রন্থের ১৬তম খণ্ডের অন্তর্গত ‘রঙ্গালয়’ প্রবন্ধে উমেশচন্দ্র মিত্রের ‘বিধবা বিবাহ নাটক’ অভিনয়ের বিস্তৃত বর্ণনা দিয়েছেন,—“যে সময়ে শর্মিষ্ঠার অভিনয় চলিতেছিল, সেই সময়ে ঃকেশবচন্দ্র সেনের যত্নে ও চেষ্টায় সিঁদুরিয়াপট্টিতে “বিধবা বিবাহ নাটকের” অভিনয় করিবার অনুষ্ঠান হইয়াছিল ও আখড়াই চলিতেছিল। সিঁদুরিয়াপট্টির ঃগোপাল মল্লিকের বাড়িতে ইহার স্থান হইয়াছিল। কেশব বাবুই এখানকার শিক্ষক। ১২৬৭ সালের বৈশাখ মাসে [১৮৫৯, ২৩শে এপ্রিল] ইহার প্রথম অভিনয় হয়। অভিনেতৃগণের নাম—

কৃতিরাম ঘোষ	মহেন্দ্রনাথ সেন।
মন্মথ	প্রতাপচন্দ্র মজুমদার।
রামকান্ত	কৃষ্ণবিহারী সেন।
গুরুমহাশয়	হারাণচন্দ্র মজুমদার।
রামদেব তর্কালঙ্কার	অক্ষয়চন্দ্র মজুমদার।
বর	যাদবচন্দ্র রায়।
বিধবাবিবাহের পক্ষীয় ব্যক্তি	ভোলানাথ চক্রবর্তী।
সুলোচনা	বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়।
পদ্মাবতী	গোপালচন্দ্র সেন।
সুখময়ীর পুত্রবধু	নরেন্দ্রনাথ সেন।
রসবতী নাপেতানী	রাখালচন্দ্র সেন।

এই অভিনয়ে তিনজন প্রসিদ্ধ গায়ক গান করিয়াছিলেন—উমেশচন্দ্র ভদ্র, রাধিকাপ্রসাদ দত্ত,

ক্ষেত্রমোহন বসু, এবং নিম্নলিখিত প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণ বিভিন্ন যন্ত্রের বাদক ছিলেন,—পঞ্চানন মিত্র, গদাধর মিত্র, রসিকচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও বেণী মাধব সোম। বেলগাছিয়ার অভিনয়ের ন্যায় এই অভিনয়ও অতি উৎকৃষ্ট হইয়াছিল।”^{১৩}

‘বিধবা বিবাহ নাটক’ অভিনয়ের দৃশ্যপট অঙ্কন করেছিলেন ইংরেজ শিল্পী হলবাইন। ব্রাহ্ম ধর্মান্দোলনের নেতা কেশবচন্দ্র সেন ‘বিধবা বিবাহ নাটক’ অভিনয়ের নির্দেশনার তথা ‘stage management’ এর দায়িত্ব নিয়েছিলেন। অনেক সমালোচক বলেছেন ‘বিধবা বিবাহ’ নাটকে কেশবচন্দ্র অভিনয়ে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। এ তথ্য সম্পূর্ণ ভুল। ‘বিধবা বিবাহ নাটক’র অন্যতম অভিনেতা ও কেশবচন্দ্র সেনের জীবনীকার প্রতাপচন্দ্র মজুমদার লিখেছেন,—“It was a dramatic club to put on the stage Bidhava Bibaha Natak (widow-marriage drama), written with the object of reforming the cruel custom of the forced celibacy of young Hindu widows. (By repeated representations of Hamlet, and other Performances half musical, half dramatic, **Keshub had developed such a talent for stage management**, that the public in the beginning of 1859, and produced a sensation in Calcutta, which those who witnessed it, can never forget. The pioneer and father of the widow marriage movement Pundit Ishwara Chandra Vidyasagar came more than once, and tender-hearted as he is, was moved to floods of tears. In fact there was scarcely a dry eye in the great audience.. Undoubtedly the most wholesome effect was produced. Keshub, as stage-manager, was warmly complimented on his energy and intelligence, and we, his friends, as amateur actors who had done our best, also received our humble share of praise. Though this dramatic success brought Keshub a good deal before the public,...some of the parts played were undoubtedly harmful in their moral tendency; there was in evitable dissipation, frivolity, and a dangerous love of public applause.”^{১৪}

‘বিধবা বিবাহ নাটক’ অভিনয়ের দর্শক ছিলেন সেকালের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি। প্রতাপচন্দ্র মজুমদার বলেছেন,—‘great audience’। বোঝা যায় দর্শকেরা ছিলেন অভিজাত ও শিক্ষিত শ্রেণীর। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, উমেশচন্দ্র দত্ত, কেশবচন্দ্র সেন প্রমুখ এই নাটকের প্রতিটি অভিনয় রজনীতে উপস্থিত ছিলেন। এ নাটকে সুলোচনার করুণ পরিণতি বিহারীলালের অভিনয়ে এতটাই

সত্যরূপে প্রতিভাত হয়েছিল, অভিনয় মুগ্ধ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর অশ্রু সংবরণ করতে পারেননি। মধুসূদনের চিঠিপত্র সূত্রে জানা যায়, ‘বিধবা বিবাহ নাটক’ এর অভিনয় দেখে ইংরেজিতে তিনি নাটকটি অনুবাদের কথা ভেবেছিলেন। বস্তুত বাংলা নাটক রচনা ও নাট্যাভিনয়ের ইতিহাসে ‘বিধবা বিবাহ নাটকে’র গুরুত্ব অপরিসীম।

১৮৫৬ সালে প্রকাশিত হয় রাধামাধব মিত্রের ‘বিধবা মনোরঞ্জন’ নাটক।^{১৫} ‘বিধবা মনোরঞ্জন’ নাটকটির দুটি ভাগ। নাটকটির প্রথম ভাগ প্রকাশিত হয়, ১২৬৩ [ইং ১৮৫৬] সালের ৮ই পৌষ এবং দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশিত হয় ১৭৭৯ [ইং ১৮৫৭] শকাব্দে কলিকাতা হতে। এ নাটকে অঙ্ক বিভাগ, গর্ভাঙ্ক কিংবা দৃশ্যবিভাগ কোনোকিছুর উল্লেখ নেই।

বঙ্গদেশে প্রথম বিধবাবিবাহের পটভূমিকায় শ্রীরাধামাধব মিত্র, ‘বিধবা মনোরঞ্জন’ নাটকটি রচনা করেন। ‘বিধবাবিবাহ আইন’ পাস হওয়ার কারণে নাটকের মঙ্গলাচরণ অংশে জগদীশ্বরের জয়গান গাওয়ার পর ‘শ্রীঈশ্বরোজয়তি’ ঈশ্বরকে অর্থাৎ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছেন নাট্যকার,—

“মুখে জয় জয় রব, নবীন বিধবা সব,

ঈশ্বরে দিতেছে ধন্যবাদ।”^{১৬}

বিধবা রমণীরা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে বলেছেন,—‘বিধবাতারণ’। বিধবা বিবাহ আইন পাস হয় ১৮৫৬ সালের ২৬শে জুলাই। আর প্রথম বিধবাবিবাহ সংঘটিত হয় ১৮৫৬ সালের ৭ই ডিসেম্বর। ‘বিধবা বিবাহ’ আইন পাশ হবার, ছ-মাসের মধ্যে বিদ্যাসাগর উদ্যোগ নিয়ে প্রথম বিধবাবিবাহের ব্যবস্থা করেন। পাত্র, সংস্কৃত কলেজের কৃতি ছাত্র শ্রীশচন্দ্র। পাত্রী, বর্ধমান জেলার অধিবাসী পটলডাঙা নিবাসী ব্রহ্মানন্দ মুখোপাধ্যায়ের দশ বছরের বিধবা কন্যা। বিবাহের দিন, ৭ই ডিসেম্বর ১৮৫৬ (১২৬৩ সনের, ২৩শে অগ্রহায়ণ)। ‘সংবাদ প্রভাকর’ সূত্রে জানা যায় এই বিবাহের দিন স্থির হয়েছিল, ১৫ই অগ্রহায়ণ কিন্তু নানা বাধা বিপত্তিতে শ্রীশচন্দ্র বিভ্রান্ত হয়ে পড়েন এবং অনেক মানসিক দ্বিধাদ্বন্দ্ব কাটিয়ে ২৩শে অগ্রহায়ণ বিবাহের দিন হিসাবে মনস্থির করেন। ‘তত্ত্ববোধিনী’ পত্রিকার সূত্রে জানা যায়, এই বিবাহের জন্য ৮০০ নিমন্ত্রণ পত্র মুদ্রিত হয়েছিল। প্রচুর লোকসমাগম হলে একরকম পুলিশি নিরাপত্তার ঘোরাটোপে লুকোচুরি করে এই বিধবাবিবাহ সম্পন্ন হয়েছিল। পুরোহিতেরা বিবাহ মন্ত্র পাঠ করে শ্রীশচন্দ্রের বিবাহ সম্পন্ন করেন। পাত্রীর মাতা লক্ষ্মীমণি দেবী কন্যা সম্প্রদান করেন। এদেশের হিন্দু বিবাহ রীতি অনুযায়ী, দানসামগ্রী, অলঙ্কার ও স্ত্রী আচার সবই পালিত হয়েছিল। স্ত্রী আচার, উলু ধ্বনি,

বিবাহের রঙ্গরসিকতা—নাকমলা, কানমলা সবই হয়েছিল। এই বিধবা বিবাহে কিছু বিপত্তিও ঘটেছিল। লোকশ্রুতি আছে মনক্ষুণ্ণ হয়ে বিদ্যাসাগর কলকাতা ত্যাগ করেছিলেন। এরকম লোক অপবাদ রটেছিল সেকালে। ‘বিধবা মনোরঞ্জন’ নাটকে এই বাস্তব ঘটনার অনুসৃতি ঘটেছে।

নাটকটির কাহিনীর দুটি ভাগ। প্রথম ভাগের কাহিনীতে আছে,—রামনিধি ন্যায়রত্নের বিধবা কন্যা কুমুদিনী। ও অন্যদিকে রয়েছে, দুঃখহর ঘোষের বিধবা ভগিনী বিনোদিনী। বিনোদিনী যৌবন জ্বালায় অস্থির। বিধবা বিবাহ প্রচলিত না হওয়ায় বিনোদিনী বিবাহ করতে পারছে না। কুমুদিনীর পিতা কলকাতায় সদ্য অনুষ্ঠিত প্রথম বিধবা বিবাহের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেন। সেখান থেকে দান নিয়ে বাড়ি ফিরে এসে নিজ বিধবা কন্যার পুনর্বিবাহ দিতে উৎসাহী হন। বিধবাবিবাহ আইন পাস হবার আগের ঘটনা ও পরের ঘটনা ‘বিধবা মনোরঞ্জন’ নাটকের কাহিনীতে ধৃত হয়েছে। প্রথম ভাগে বিধবা কুমুদিনীর বিধবাবিবাহ উদ্যোগ কাহিনী পরিবেশিত হয়েছে। দ্বিতীয় ভাগে কুমুদিনীর বিবাহ প্রদানের কাহিনী পরিবেশিত হয়েছে। প্রথম ভাগের মূল কাহিনীর সমান্তরালে, একটি উপকাহিনী পরিবেশিত হয়েছে। পৌরাণিক নাটকের লক্ষণ অনুসারে ও স্বভাব বৈশিষ্ট্য অনুসারে, চরিত্রের নামকরণ করেছেন নাট্যকার,—বিশ্বনিন্দক মিশ্রি, মিশ্রিদমন, বিশ্বঠক, বিশ্বজয়ী, মহালোভ, পরদেবী, নশ্বস্বভাব প্রভৃতি।

নাট্যকার শ্রীরাধামাধব মিত্র, দেখিয়েছেন,—ন্যায়রত্ন প্রথম বিধবাবিবাহের আমন্ত্রণ অনুষ্ঠান থেকে কলকাতায় ফিরে এসে নিজ বিধবা কন্যার বিবাহ দিতে উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। বিলাসিনী নামে এক বৈষ্ণবী বিধবা বিবাহে ঘটকীর কাজ করেছেন। পাত্র নিশ্চিতপুরের রামেশ্বর তর্কবাগীশের পুত্র চন্দ্রকান্ত। পাত্র রামনিধি ন্যায়রত্নের মনোমত হওয়ায় নির্দিষ্ট দিনে কুমুদিনীর সঙ্গে চন্দ্রকান্তের বিবাহের অপেক্ষায় থেকেছে।

অন্যদিকে, নীলরতন মুখোপাধ্যায় তাঁর দুই বিধবা কন্যার বিবাহ দিতে ইচ্ছুক। কিন্তু তাঁর খুল্লতাত বিধবা বিবাহের বিরোধী। নীলরতন মুখোপাধ্যায় রামনিধি ন্যায়রত্নের বিধবা বিবাহ উদ্যোগকে সমর্থন করেছেন এবং বিদ্যাসাগরের প্রতিপক্ষকে হেয় করেছেন। নীলরতন মুখোপাধ্যায় শাস্ত্রীয় যুক্তি ও মানবিক ভাবে বলেছেন,—আশ্চর্যের বিষয় এই যে, যুবতী বিধবা কন্যা যৌবন জ্বালায় অবৈধ প্রণয়ে লিপ্ত হয়ে গর্ভবতী হবে—ঋণহত্যা করবে কিংবা কুলত্যাগিনী হবে—এতদ্ সত্ত্বেও বিধবা বিবাহ দেবে না। বিধবা নবৌ বিপত্নীক দুঃখহরকে বিধবা বিবাহ করার প্রস্তাব দিলেও উচ্চ হিন্দু রক্ষণশীল সমাজের অনুশাসনে তা সম্ভবপর হয়ে ওঠেনি।

এ নাটকে অসবর্ণ বিবাহের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। রামনিধি ন্যায়রত্ন বিলাসিনী ঘটকীকে

বলেছে,—“বলে রাড়ের বে তার আর জেতের বিচার কি?...যে জেতে ইচ্ছে সেই জেতে বে হবে সেদিন এখনো হয়নি, ওটা যদি আপাতত চলিত থাকতো তাতেই বা কি হানি ছিল?”^{১৭} অসবর্ণ বিবাহ, কৌলিন্য বিবাহ ও সমাজ অনুশাসনের কারণে ব্রাহ্মণ কন্যা—অকালে বিধবা হয়ে সংসার হতে লাঞ্চিত হয়ে, সম্পত্তি হতে বঞ্চিত হয়ে, জীবন নির্বাহের জন্য বারবণিতায় পরিণত হয়। কখনও বা দুমুঠো অন্নের জন্য বৈষ্ণবের সেবাদাসীতে পরিণত হয়। যৌবনে যোগিনী হয়ে যান। সেখান থেকে পরিত্যক্ত হলে, ভিক্ষা হয়ে ওঠে তাঁদের জীবন নির্বাহের পথ।

পাত্র দেখতে গিয়ে কানাইলাল পাত্রের বিদ্যা ও পাণ্ডিত্য পরীক্ষা করতে গিয়ে দুলাইন ইংরেজি কবিতা বলে পাত্রকে বাংলায় তার পদ্যানুবাদ করতে বলেছেন,—

“Who takes a widow for his wife.

Will lead a very happy life”^{১৮}

এর উত্তরে পাত্র জানিয়েছে,— “বিধবা নারীকে জায়া করেন যে জন।

করিবেন সুখে তিনি জীবন যাপন।।”^{১৯}

নাট্যকারের এ ধরনের উদ্দেশ্যমূলক শ্লোগানধর্মী সংলাপ রচনা ও প্রয়োগের মধ্য দিয়ে বিধবা বিবাহের সমর্থনের মনোভাবটি স্পষ্ট রূপে প্রতিভাত হয়েছে।

মহালোভ ভট্টাচার্য এবং পরদেবী গঙ্গোপাধ্যায় বিধবা বিবাহের বিরুদ্ধাচরণের চেষ্টা করেছেন। বোঝা যায়, নাট্যকার সমকালের এক কুসংস্কারাচ্ছন্ন উচ্চ ব্রাহ্মণ্য শ্রেণীর রক্ষণশীল মানসিকতাকে কটাক্ষ করে, নাম নির্বাচনে ‘মহালোভ’ ও ‘পরদেবী’ শব্দবন্ধকে সচেতন ভাবে প্রয়োগ করেছেন। এছাড়া নাট্য কাহিনীতে দেখা যায়, ‘বিশ্বঠক’ ও ‘বিশ্বজয়ী’ নামক দুই চরিত্রের আগমন, যা ভাবব্যঞ্জনায় ও বক্তব্যপ্রকাশের বিশেষ ইঙ্গিতবাহী।

রামনিধি ন্যায়রত্ন, মহালোভ ভট্টাচার্য ও পরদেবী গঙ্গোপাধ্যায় বিধবা বিবাহের বিরুদ্ধাচরণকে আমল না দিয়ে ‘বিধবা বিবাহ’ অনুষ্ঠানের কাজে অগ্রসর হয়েছেন। রামনিধি ন্যায়রত্ন তাঁর ভাগ্নেকে দিয়ে মহালোভ ভট্টাচার্যকে কুড়ি টাকা উপটোকন দিলে, মহালোভ ভট্টাচার্য বিধবা বিবাহের পক্ষে অগ্রসর হন। বিধবাবিবাহ ও রামনিধি ন্যায়রত্নের প্রতি মহালোভ ভট্টাচার্যের বিরূপ মনোভাব ছিল প্রথম থেকে। কিন্তু কুড়ি টাকা পাওয়ার পর মহালোভ ভট্টাচার্যের এই মত পরিবর্তনকে তিরস্কার করেছেন এবং নিজ জাতধর্ম-কৌলিন্য ধর্ম- নিয়ে গর্ব প্রকাশ করেছেন,

— “ফলারে নিপুণ, ফলারে বামুন,
হেথা বোসে কেন আর।

নিলে যার ধন, ত্বরায় এখন,

গিয়া গাও যশ তার।।”^{২০}

পরদ্বেষী গঙ্গোপাধ্যায় নিজের জাতকৌলিন্য নিয়ে গর্ব করলে মহালোভ জানিয়েছে,—“তার রাঁড় মেয়ের বে দেবে শুনে চমকে উট্টো, তোমাদের মেয়েদের কি হয়, তা জাননা বুজি? কারো রোজ রোজ যে বে হয়...?”^{২১} এর প্রতি উত্তরে মহালোভ ভট্টাচার্য কুলীনদের কুলের কথা, অনাচারের কথা বলেছেন। উনিশ শতকের যুগ পরিবেশে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের অর্থলোভ কি প্রকার ছিল নাট্যকার তা ব্যক্ত করেছেন মহালোভ ও পরদ্বেষী চরিত্র চিত্রণের মধ্য দিয়ে।

‘বিধবা মনোরঞ্জন’ নাটকে নাট্যকার বিধবা বিবাহকে —হিন্দুর নব বিবাহের মতই চিত্রিত করেছেন। উনিশ শতকে বিধবাবিবাহ আইন চালু হলে, প্রত্যক্ষত বিধবাবিবাহ সম্পন্ন হত লুকিয়ে চুরিয়ে গোপনে এবং বেশ কিছু বিবাহ আচারকে পরিত্যাগ করে সংক্ষেপে বিবাহ অনুষ্ঠান সম্পন্ন করা হত। নাট্যকার আলোচ্য নাটকে বিধবার পুনর্বিবাহকে, প্রথম নব বিবাহের মতই নাট্যকাহিনীতে উপস্থিত করেছেন। আর সেকারণে, দেখা যায় বিধবার এই পুনর্বিবাহের অনুষ্ঠানে বিধবা নারীদের অংশগ্রহণ করতে দেওয়া হয়নি। হিন্দু বিবাহ অনুষ্ঠানে বিধবাদের অংশ গ্রহণ করতে দেওয়া হয় না। পাছে কন্যা বিধবা হয়। এই আশংকায় বিধবাদের বিবাহ আচার থেকে দূরে রাখা হয়। নাট্যকাহিনীতে দেখা যায়, পদ্মিনী শুদ্ধ বরণডালা আনতে আনতে পড়ে গেলে বরণ ডালা বিগড়ে যায়, বড় গিল্লিকে তা সোজা করতে বলায় সে বিধবা হওয়ার কারণে আপত্তি জানায়। বিশ্বনন্দক মিশ্রি নামে জনৈক বরযাত্রী এবং মিশ্রিদমন নামে জনৈক কন্যাপক্ষের বিবাদও সামাজিক বিষয় হিসাবে উঠে এসেছে এ নাটকে। বাসরঘরে বড় গিল্লি, রসিকা, পদ্মিনী, হেমলতা প্রমুখের স্ত্রীআচার ও রসিকতার মধ্য দিয়ে নাট্যকার সেকালের এক বিশেষ সমাজচিত্রকে উপস্থাপিত করেছেন। ‘বিধবা মনোরঞ্জন’ নাটকের উপকাহিনীতে দুঃখহরের বোন বিনোদিনী ও বিধবা নবৌয়ের বিবাহের উদ্যোগের উপস্থাপনা করেছেন নাট্যকার।

দ্বিতীয় ভাগে দেখা যায় বিধবা নবৌকে, বিপত্নীক দুঃখহর বিবাহ করতে অস্বীকার করলে নবৌ হতাশ হয়ে পড়ে এবং জীবন সঙ্গীর অপেক্ষায় দিনাতিপাত করে। নাটকের দ্বিতীয় ভাগে, দেখা যায়, দুঃখহরের বিধবা বোন বিনোদিনী—নবৌ ও বিপত্নীক ভ্রাতা দুঃখহর-এর পারস্পরিক অনুরাগ নিয়ে যে রসিকতা করেছে তা নীতিবিরুদ্ধ ও অশ্লীল মনে হতে পারে। উনিশ শতকে মেয়েলি অন্তঃ পুরে এ ধরনের রসিকতা শোনা যায়। বিশ্বজয়ী ও বিশ্বঠক নামে দুই ঘটকের ভণ্ডামি ও কলহে সেকালের ঘটকদের কীর্তিকলাপ ধরা পড়েছে।

বিলাসিনীর দ্বারা কুমুদিনী ও চন্দ্রকান্তের পত্র বিনিময়ের মধ্য দিয়ে তাদের পরস্পরের প্রতি অনুরাগ, প্রেম ও সবশেষে বিধবা বিবাহ দেওয়া হয়েছে। নাট্যকার বিধবা বিবাহ সফল করার পূর্বে রোমান্টিক প্রেমের আয়োজন ঘটিয়ে মূল উদ্দেশ্য নির্বাহ করেছেন। কুমুদিনীকে শিক্ষিত প্রতিপন্ন করেছেন নাট্যকার। তাঁকে দিয়ে নাট্যকার পত্র লিখিয়েছেন। বিলাসিনীকে দিয়ে সে চিঠি চন্দ্রকান্তকে পাঠানো হয়েছে। প্রথম বিধবা বিবাহের নিমন্ত্রণ পত্রের নমুনা এ নাটকে ব্যবহৃত হলেও বর, কন্য প্রমুখের নাম গোপন করে অন্যভাবে বলা হয়েছে।

‘বিধবা মনোরঞ্জন’ নাটক রচনায় নাট্যকার নাট্যগ্রন্থনায় সংস্কৃত নাট্যরীতি ও প্রাচীন যাত্রানাট্য রচনার কৌশল অবলম্বন করেছেন। মঙ্গলাচরণ, গদ্যসংলাপ ও পদ্যসংলাপ বিপরীত ক্রমে ব্যবহার করেছেন নাট্যকার। নাটকে গর্ভাঙ্ক বা দৃশ্যের উল্লেখ না করলেও কাহিনীর ঘটনাস্থল নির্দেশ করেছেন নাট্যকার। নাট্যকার কাহিনীর ঘটনাস্থল সম্পর্কে লিখেছেন,—‘কলকাতার সন্নিকটস্থ কোন পল্লীগ্রাম’, ‘রামনিধি ন্যায়রত্নের বাটি’, ‘অন্য পাড়ার ঘোষেদের বাটি’, ‘নিশ্চিন্তপুরে রামেশ্বর তর্কবাগীশের বাটি সংযোগস্থল’ প্রভৃতি। নাট্যকার কাহিনী পরম্পরায় স্থানগত ঐক্যকে মান্য করেছেন।

রাধামাধব মিত্র নাট্যকার হলেও ছিলেন সেকালের বিশিষ্ট কবি। তাঁর পাঁচ খণ্ডে রচিত ‘কবিতাবলী’^{২২} প্রকাশিত হয় ১৮৭৩ সালে। তাঁর কবি মানসিকতার অভ্রান্ত প্রকাশ ঘটেছে ‘বিধবা মনোরঞ্জন’ নাটকে। এ নাটকের সংলাপ গদ্য-পদ্য মিশ্রিত। গদ্য সংলাপে চলিত ভাষা এবং পদ্য সংলাপে পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দ ব্যবহার করেছেন তিনি। ন্যায়রত্ন, নীলরতন, কুমুদিনী, বিনোদিনী, পদ্মমুখী, নবৌ, দুঃখহর, চন্দ্রকান্ত প্রভৃতি সংলাপ,— গদ্য ও পদ্য সংলাপ ও সাধু-চলিতের মিশ্রণ লক্ষ্য করা যায়। মহালোভের কোন কোন সংলাপে আলাংকারিক ভাষার প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়।

‘বিধবা মনোরঞ্জন’ নাটকের নায়িকা কুমুদিনী এবং নায়ক চন্দ্রকান্ত। তবে, কুমুদিনীকে যতটা সক্রিয় ভাবে নাট্যকার অঙ্কন করেছেন, চন্দ্রকান্তকে ঠিক ততটাই উপেক্ষা করেছেন। নাটকে তাঁকে রোমান্টিক নায়করূপে চিত্রিত করা হয়েছে। নবৌ, বিনোদিনী, ব্রাহ্মণী, বিলাসিনী, বড়গিন্নি প্রভৃতি পার্শ্ব চরিত্রগুলি নাট্যকাহিনীকে সম্পূর্ণতা দিয়েছে। মণি দাসী, ভৃত্য রামধন, কানাইলাল, বনমালী, বিশ্বজয়ী, রসিকা, হেমলতা, নলিনী, পদ্মিনী, মহালোভ, পরদেবী, নম্রস্বভাব, বিশ্বনিন্দক মিশ্রি, মিশ্রিদমন, নরসুন্দর, সুচতুর জনতা চরিত্রের মতই নাটকের কাহিনীকে পরিপূর্ণতা দিয়েছে। কুমুদিনী আনন্দে চন্দ্রলোকের ন্যায় প্রস্ফুটিত হয়েছে। নায়িকা কুমুদিনীও

চন্দ্রকান্তের সঙ্গে মিলিত হয়ে সুখী হোক এই কামনা করেছেন নাট্যকার। বিধবা কুমুদিনীর মনোরঞ্জনের প্রতি লক্ষ্য রেখেই নাট্যকার ‘বিধবা মনোরঞ্জন’ নামকরণ করেছেন। বিধবা নবৌ এবং বিধবা বিনোদিনীর বিবাহ প্রদান না করতে পারলেও নাট্যকাহিনী বিশেষ মনোরঞ্জক। সেদিক থেকে নাটকের নামকরণ ‘বিধবা মনোরঞ্জন’ সার্থক।

১৮৫৬ সালের ২০ শে আগস্ট প্রকাশিত হয় অজ্ঞাতনামা রচিত ‘বিধবা বিষম বিপদ’ নাটক। অজ্ঞাতনামা রচিত ‘বিধবা বিষম বিপদ’ নাটকটি প্রকাশের সংবাদ ‘সংবাদ ভাষ্কর’ পত্রিকায় প্রকাশিত হয় ১৮৫৬ সালে,—“...কয়েকদিবস গত হইল, “বিধবা বিষম বিপদ” নামে প্রকাশিত আর একখানি ক্ষুদ্র নাটক দেখিয়াছি, তাহাও বিধবা বিবাহোপলক্ষে লিখিত হইয়াছে...”^{২০} বিধবা বিবাহ আইন পাস হবার পরবর্তী ‘বিধবা বিবাহ বিষয়ক’ নাটকগুলি র মধ্যে ‘বিধবা বিষম বিপদ’ নাটকটিকে প্রথম বলে মনে করেছেন নাট্য সমালোচক বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়।

‘বিধবা বিষম বিপদ’ নাটকে মুখোপাধ্যায় ও চট্টোপাধ্যায়—এই দুই কুলীন ব্রাহ্মণের বিধবা বিবাহ নিয়ে ভিন্ন মনোভাব প্রকাশিত হয়েছে। চট্টোপাধ্যায় ব্রাহ্মণ কুলীন পাত্রের সঙ্গে তাঁর তিন কন্যার বিবাহ দিলে, বছর ঘুরতে না ঘুরতেই পাত্রের মৃত্যু হয় এবং তিন কন্যা বিধবা হয়। বিধবা বিবাহ শাস্ত্র সম্মত হওয়ায়, চট্টোপাধ্যায় তাঁর বিধবা কন্যাদের পুনর্বিবাহ দিতে চান। অন্যদিকে মুখোপাধ্যায় ব্রাহ্মণের দুই কন্যাও বিধবা। কিন্তু তিনি বিধবা বিবাহের ঘোরতর বিরোধী। তাঁর এক কন্যা প্রসন্নময়ী অবৈধ প্রণয়ে পুরুষের সঙ্গে মেলামেশায় গর্ভবতী হয়ে পড়ে। ফলে মুখোপাধ্যায় ব্রাহ্মণের সামাজিক সম্মান ধুলিসাৎ হয়ে যায়। মুখোপাধ্যায় তাঁর যুবতী কন্যা বিধবা প্রসন্নের গর্ভনাশ ও জাতির ভয়ে পাপ ঢাকতে ভদ্রাসন খোয়াতে বাধ্য হয়।

‘বিধবা বিষম বিপদ’ নাটকে মুখোপাধ্যায়ের বিধবা কন্যা প্রসন্ন, পাড়ার চৌকিদারের সঙ্গে গোপন প্রণয়ে লিপ্ত হয়। গর্ভবতী হয়ে পড়লে তাঁর পিতা-মাতা অস্তঃপুরে এক স্ত্রীলোকের সাহায্যে গর্ভপাত ঘটায়। এ ঘটনা জমাদারের কাছে প্রকাশ পায়। ক্রমে লোক জানাজানি হয়ে যায়। জমাদারকে ষাট টাকা ঘুষ দিয়ে এবং বন্দ্যোপাধ্যায়, গাঙ্গুলি, ঘোষাল প্রমুখ সমাজপতিদের কাছে ক্ষমা চেয়ে কোনো ক্রমে পরিত্রাণ পায়। কিন্তু জমাদারের উৎকোচ প্রদান সমাজপতিদের ভোজের আয়োজন করতে নিজ বসতবাটি বন্ধ রাখতে বাধ্য হন। বস্তুত নাট্যকার দেখাতে চেয়েছেন, যুবতী বিধবা ঘরে থাকলে ব্যভিচার ও অবৈধ গর্ভপাত ঘটে পারে। ‘বিধবা বিষম বিপদ’^{২১} নাটকে পাঠককে নাট্যকার বিধবা বিবাহের প্রয়োজনীয়তাকে অনুভব করাতে চেয়েছেন। নাট্যকার আরও জানিয়েছেন, বিধবা কন্যা বাড়িতে থাকলে নীচ জাতির সঙ্গে ব্যভিচারে লিপ্ত

হয়ে সমগ্র পরিবারকে লাঞ্ছনার মুখে ঠেলে দিতে পারে। অতএব বিধবা নারীর পুনর্বিবাহ দেওয়া উচিত।

পূর্ববর্তী উমেশচন্দ্র মিত্রের ‘বিধবা বিবাহ নাটকে’ (১৮৫৬) দেখা গিয়েছে কায়স্থ পরিবারের বিধবা নারীর সংকটময় ছবি। পদবী হিসাবে কায়স্থকুলের ঘোষ, বসু, মিত্র পরিবারের ছবি অঙ্কন করেছেন নাট্যকার উমেশচন্দ্র মিত্র। ‘বিধবা বিষম বিপদ’ নাটকে (১৮৫৬) নাট্যকার একধাপ অগ্রসর হয়ে সমাজের প্রধান প্রতিপক্ষ রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ পরিবার চট্টোপাধ্যায় ও মুখোপাধ্যায় পরিবারের বিধবার সংকটময় ছবিকে তুলে ধরেছেন। বস্তুত নাট্যকার ‘বিধবা বিষম বিপদ নাটকে’ কুলীন ব্রাহ্মণের পরিবারকে কেন্দ্রে রেখে নাট্যকাহিনীকে বিন্যস্ত করেছেন প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গিতে।

‘পদ্যপাঠ’ গ্রন্থের বিশিষ্ট কবি হিসাবে সেকালে জনপ্রিয় হয়েছিলেন যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায়। ১৮৫৭ সালে প্রকাশিত হয় যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায়ের ‘চপলাচিন্তাপল্য’ নাটক। বিধবা বিবাহের সমর্থনে উদ্দেশ্যমূলক ভাবে এ নাটক রচিত। ‘চপলাচিন্তাপল্য’ ছয় অঙ্কে বিন্যস্ত স্ত্রীচরিত্র প্রধান নাটক। নাটকের পাত্র-পাত্রীর মধ্যে আটজন পুরুষ ও এগারোজন স্ত্রী চরিত্রের অবতারণা রয়েছে। বিধবা চপলার চিন্তের অস্থিরতা ও চপলমতিত্ব এ নাটকের বিষয়। বৈধব্য জীবনের দুঃখ অপেক্ষা এ নাটকে বিধবা চপলার অনুরাগ বর্ণিত হয়েছে কাব্যিক ভঙ্গিমায়। ‘চপলাচিন্তাপল্য’ নাটকের ভূমিকায় নাট্যকার লিখেছেন,—“বিধবা বিবাহ নির্বাহ ইহবার পূর্বেই ইহার লেখা শেষ হইয়াছিল, কিন্তু কোন অনুল্লঙ্ঘনীয় প্রতিবন্ধকতাবশতঃ একাল পর্যন্ত মুদ্রিত হয় নাই। যদিও এখন ইহার সমুদয় ভাগ অসংলগ্ন হইয়া পড়িয়াছে, তথাপি কিছু পরিবর্তন না করিয়া প্রথমে যেরূপ লেখা ছিল সেইরূপ প্রকাশিত হইল।...এমত অবস্থাও (অসংলগ্ন অবস্থা) ইহার যা উদ্দেশ্য বোধহয় তাহা সাধন করিতে পারিবে, এক্ষণে অনুগ্রহপূর্বক সকলে এক একবার পাঠ করিলে আমার মানস সফল হইবে।”^{২৫}

জমিদার বাসব রায়ের কন্যা চপলার বৈধব্যের সংবাদ পরিবেশনের মধ্য দিয়ে নাট্যকাহিনীর শুরু। আলোচ্য নাটকের কাহিনীতে রয়েছে,—জমিদার বাসব রায়ের বালিকা কন্যা চপলার স্বামীর মৃত্যু সংবাদ আসে। সদ্য বাল বিধবা চপলার পুনর্জন্মের সুখী দাম্পত্যের কথা ভেবে তর্কালঙ্কার পরামর্শ দেন জমিদার বাসব রায়কে,—এখন ব্রতাদি সংকল্প দ্বারা চপলার পুণ্যসঞ্চয় করান, যাতে সে পুনর্জন্মে সুখী এবং দীর্ঘকাল সধবা থাকতে পারে। বাসবের স্ত্রী মা হয়ে মেয়ের একাদশী পালনের কথা ভেবে শিহরিত হয়েছেন। তাঁর মনে হয়েছে, চপলা একাদশী করবে,

একসঙ্গে আলোচাল খাবে আর তিনি কেমন করে সব ভালো খাবার খাবেন,— “পোড়া শাস্ত্র ত এমন নয় যে কিছুকাল একাদশী না কল্লে রোত পাবে।”^{২৬} চপলার মা চিন্তিত হয়েছেন স্বামী বাসবের জন্য। কারণ,— “সত্যি বাল-বিধবার পিতাকে অসুখী থাকতে হয়। কারণ বয়ঃদোষে কলঙ্কের নিশান তারা তুলে ধরতে পারে।”^{২৭} চপলাকে প্রথম কিছুদিন বিধবা হওয়ার খবর জানানো হয়নি। প্রতিবেশীদের মুখ চেয়ে অবশেষে তাঁকে বৈধব্যের সংবাদ জানানো হয়েছে।

বিধবার বৈধব্য আচার ও ব্রহ্মচর্য পালনের যে শাস্ত্রীয় নির্দেশ তা ভিত্তিহীন। এই শাস্ত্রীয় নির্দেশ পালনে অল্পবয়সী বিধবার কোনো আন্তরিক প্রেরণা থাকে না। বিধবা বিনোদার কঠে ধ্বনিত হয়েছে সে অশ্রদ্ধার কথা,— “সত্তি বলতে কি, এখন আমাদের পূজো করবার বয়েস হয়নি, মনই স্থির থাকে না, কতদিকে যায়। তবে না কল্লে লোকে নিন্দে কব্বে, আর গুরুপুরুত দেখা হলেই, আশীর্ব্বাদ করেন। “ধর্ম্মে মতি হোক” তাই বোন্ ধর্ম্ম করি।”^{২৮} বোঝা যায় অকাল বৈধব্য ও তার ধর্ম্মাচরণ কি প্রকার অন্তঃসারশূন্য।

ঘটনাক্রমে কৃষ্ণকথা শুনতে এসে চারু—চপলাকে দেখে প্রেমে পড়ে ও পূর্বরাগে আকৃষ্ট হয়। চপলার মধ্যে দেখা দিয়েছে চিত্ত চাঞ্চল্য। মালিনী দুটো পয়সার লোভে চারু ও চপলার মেলামেশার সুযোগ করে দিয়েছে। বিয়ের তিন দিন আগে জমিদার বাসব দেওয়ান, রাঘব মজুমদার ও পুরোহিত তর্কালঙ্কার মহাশয়কে নিজ কন্যার বিধবা বিবাহের কথা উত্থাপন করেন। তর্কালঙ্কার অবাক হয়ে গেছেন এই কথা শুনে। তর্কালঙ্কার জানিয়েছেন—বাসব ও ভূদেব দুজনেই পণ্ডিত, হিন্দুধর্মের লোক এবং সু-ব্রাহ্মণ—তবু কেন তাদের এ দুর্মতি হল! বাধ্য হয়ে তাঁরা বিবাহের পত্র বিলির জন্য উদ্যোগী হয়েছেন। বিয়ের দিন চারুকে বর হিসাবে দেখে চপলা অবাক হয়ে গেছে। সখী কামিনীর কাছে চপলা তার পূর্বরাগের ইতিহাস ব্যক্ত করেছে।

চারিদিকে যখন বিধবা বিবাহ নিয়ে নানা চর্চা শুরু হয়েছে, বিধবা কন্যার পিতা হিসাবে জমিদার বাসব রায় অনুভব করেছেন বিধবা বিবাহের প্রয়োজনীয়তা। জমিদার বাসব রায় তাঁর বিধবা কন্যার একাদশী পালনকে যেমন সহজ সাধ্য করে দিয়েছেন, তেমনি কন্যার পুনর্বিবাহ দিয়ে বৈধব্য যন্ত্রণা দূর করার জন্য সংকল্প নিয়েছেন। ব্রাহ্মণ্য সমাজের গোঁড়ামীর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে তিনি চপলার মনোনীত পাত্রের সঙ্গে কন্যার বিয়ে দিয়েছেন। যদিও বাসব রায় গোপনে তাঁর কন্যার বিধবা বিবাহের আয়োজন করেছেন।

নাট্যকার যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায়, এ নাটকে বর্ণকৌলিন্য ও অর্থকৌলিন্যের সমান্তরাল ছবি নির্মাণ করেছেন। অর্থকৌলিন্যে গরীয়ান ঘরের বিধবার জন্য একাদশীর উপবাস অনেক

শিথিল। অন্যদিকে দরিদ্র ঘরের বিধবার বৈধব্য আচার অনেক কঠোর, অনেক হৃদয়হীন। এ নাটকে দেখা যায়, অর্থকৌলিন্যের গরবে গরবিনী হয়ে জমিদার-কন্যা চপলা বিধবা হয়েও রাঙাপাড় শাড়ী পরেছে, গয়না পরেছে। অন্যদিকে চপলার সমবয়সী অন্যান্য বিধবারা সাধারণ বৈধব্য সংস্কারের ব্রত যত্নে ও আচার সর্বস্বতায় দন্ধে মরেছে।

জমিদার বাসবের দেখাদেখি, প্রতিবেশী সুদেব, সুবর্ণ প্রমুখ ব্যক্তিবর্গও বিধবা বিবাহের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছেন। সুদেব চপলার পুনর্বিবাহের পাত্র হিসাবে ভূদেববাবুর পুত্র চারু প্রস্তাব দিয়েছেন। কথাবার্তায় ভূদেবও রাজী হয়েছেন পুত্রের বিয়ে দিতে। ভূদেবের মত—গাঁয়ের লোক জমিদার বাসবকে যদি সমাজ একঘরে না করতে পারে, তাহলে তাকেও পারবে না। এভাবেই বিধবা বিবাহের মধ্য দিয়ে নাট্যকার কাহিনীর ইতি টেনেছেন।

বিদ্যাসাগর তাঁর ‘বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব’ ২য় পুস্তকে লিখেছেন—“হা ভারতবর্ষীয় মানবগণ! আর কতকাল তোমরা, মোহনিদ্রায় অভিভূত হইয়া প্রমোদশয্যায় শয়ন করিয়া থাকিবে! একবার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখ, তোমাদের পুণ্যভূমি ভারতবর্ষ ব্যভিচার দোষের ও ভ্রূণহত্যা পাপের স্রোতে উচ্ছলিত হইয়া যাইতেছে।...বিধবাদিগের দুরবস্থা দর্শনে, তোমাদের চিরশুষ্ক নীরস হৃদয়ে কারুণ্য রসের সঞ্চার হওয়া কঠিন এবং ব্যভিচার দোষের ও ভ্রূণহত্যা পাপের প্রবল স্রোতে দেশ উচ্ছলিত হইতে দেখিয়াও, মনে ঘৃণার উদয় হওয়া অসম্ভাবিত। তোমরা প্রাণতুল্য কন্যা প্রভৃতিকে অসহ্য বৈধব্যযন্ত্রণানলে দগ্ধ করিতে সম্মত আছ, তাহারা দুর্নিবাররিপুবশীভূত হইয়া ব্যভিচার দোষে দূষিত হইলে, তাহার পোষকতা করিতে সম্মত আছ, ধর্মলোপভয়ে জলাঞ্জলি দিয়া, কেবল লোকলজ্জাভয়ে, তাহাদের ভ্রূণহত্যার সহায়তা করিয়া, স্বয়ং সপরিবারে পাপপঙ্কে কলঙ্কিত হইতে সম্মত আছ; কিন্তু কি আশ্চর্য! শাস্ত্রের বিধি অবলম্বনপূর্বক, তাহাদের পুনরায় বিবাহ দিয়া, তাহাদিগকে দুঃসহ বৈধব্য যন্ত্রণা হইতে পরিত্রাণ করিতে এবং আপনাদিগকেও সকল বিপদ হইতে মুক্ত করিতে সম্মত নহ। তোমরা মনে কর, পতিবিরোগ হইলেই, স্ত্রীজাতির শরীর পাষণ্ডময় হইয়া যায়; দুঃখ আর দুঃখ বলিয়া বোধ হয় না; যন্ত্রণা আর যন্ত্রণা বলিয়া বোধ হয় না; দুর্জয় রিপুবর্গ এককালে নিস্কূল হইয়া যায়। কিন্তু, তোমাদের এই সিদ্ধান্ত যে নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক, পদে পদে তাহার উদাহরণ প্রাপ্ত হইতেছে। ভাবিয়া দেখ, এই অনবধানদোষে সংসারতরুর কি বিষময় ফল ভোগ করিতেছ। হায় কি পরিতাপের বিষয়! যে দেশের পুরুষজাতির দয় নাই, ধর্ম নাই, ন্যায় অন্যায় বিচার নাই, হিতাহিত বোধ নাই, সদসদ্বিবেচনা নাই, কেবল লৌকিকরক্ষাই

প্রধান কর্ম ও পরম ধর্ম, আর যেন সে দেশে হতভাগা অবলাজাতি জন্মগ্রহণ না করে। হা অবলাগণ! তোমরা কি পাপে, ভারতবর্ষে আসিয়া, জন্মগ্রহণ কর, বলিতে পারি না।”^{২৯}

‘চপলাচিন্তাপল্য’ নাটকটির প্রশংসা করে সমালোচক অজিতকুমার ঘোষ ‘বাংলা নাটকের ইতিহাস’ গ্রন্থে লিখেছেন,—“‘বিধবা বিবাহ নাটক’ করুণরসে সমাজের পাষণ-হৃদয় গলাইতে চাহিল। ‘চপলাচিন্তাপল্য’র মধ্যে লেখক যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায় বিধবার বিবাহ দিয়া সমস্যার উপর একেবারে যবনিকা টানিয়া দিয়াছেন। দুঃসাহস বটে, পঁচাত্তর বৎসর পরে শরৎচন্দ্রও এতখানি সাহস দেখাইতে পারেন নাই।”^{৩০}

আবার সত্যজীবন মুখোপাধ্যায় তাঁর ‘দৃশ্যকাব্য পরিচয়’ গ্রন্থে এ নাটকের গঠনগত বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করে সমালোচনায় লিখেছেন,—“‘চপলাচিন্তাপল্য’ নামেমাত্র নাটক, পদ্যরচয়িতার হাতে পড়িয়া ইহার নাট্যশক্তি ক্ষুদ্র হইয়াছে। নাট্যকার ভূমিকায় স্বয়ং বলিয়াছেন যে, ‘ইহার সমুদয় ভাগ অসংলগ্ন’। নাটকের দৃশ্যগুলি পরম্পরাপেক্ষা না হইয়া পৃথক পৃথক চিত্রের ন্যায় দেখাইয়াছিল। ইহা নাটক রচনার রীতি নহে, এবং স্থানে অস্থানে পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দের কবিতার প্রয়োগে নাটকটি ভারাক্রান্ত হইয়া চলচ্ছক্তিহীন হইয়া পড়িয়া ছিল। ইহার অভিনয়ের কোন খবর আসে নাই।”^{৩১} ‘চপলাচিন্তাপল্য’ নাটকের স্ত্রী চরিত্রগুলির গ্রাম্যতা ও অশ্লীলতা স্থূলতা তৎকালীন অন্তঃপুরের নারীদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকে জীবন্ত ভাবে প্রকাশ করেছে নাট্যকার। বস্তুত উনিশ শতকের বিশিষ্ট সমাজ চিত্র এ নাটকে পাওয়া যায়।

১৮৫৭ সালে প্রকাশিত হয় বিহারীলাল নন্দীর ‘বিধবা পরিণয়োৎসব’ ও গুণাভিরাম শর্মার ‘রামনবমী’ নাটক। বিধবা বিবাহের সমর্থনে ‘বিধবা পরিণয়োৎসব’ নাটকটি রচিত হয়। সমালোচক প্রদ্যোৎ সেনগুপ্ত লিখেছেন,—“‘বিধবা বিবাহ বিষয়ক আরও কয়েকখানি প্রহসন নাটকের নাম উল্লেখযোগ্য—রাধারমণ মিত্রের ‘বিধবা মনোরঞ্জন’, বিহারীলাল নন্দীর ‘বিধবা পরিণয়োৎসব’, যদুনাথ চট্টোপাধ্যায়ের ‘বিধবাবিলাস’ উল্লেখযোগ্য।”^{৩২} ‘বিধবা পরিণয়োৎসব’ নাটকের নাম শুনে বোঝা যায়, বিধবা নারীর পুনর্বিবাহ পরবর্তীকালীন উৎসবমুখর সুখচ্ছবির ইঙ্গিত আছে। অনেক অনুসন্ধান করেও এ নাটকটি আমাদের হাতে আসেনি।

অসমীয়া লেখক গুণাভিরাম শর্মা ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের পরম স্নেহভাজন। বিধবা বিবাহ আন্দোলনের সমর্থক ছিলেন তিনি। গুণাভিরাম শর্মা কলকাতায় পড়াশুনা করা অবস্থায় ১৮৫৭ সালে বিধবা বিবাহের সমর্থনে ‘রামনবমী’ নাটকটি রচনা করেন। সমকালে নাটকটি ‘অরুণোদয়’ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এরপর চাকরিসূত্রে ১৮৬৭ সালে গুণাভিরাম

আসামের নগাঁও এ চলে আসেন। তাঁর স্ত্রী ব্রজসুন্দরী দেবীর ইচ্ছা ছিল ‘রামনবমী’ নাটকটি অসমীয়া ভাষায় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হোক। কিছুকাল পর তাঁর স্ত্রীর প্রয়াণ ঘটে। এরপর অল্প কিছু অদলবদল করে ‘অরুণোদয়’ পত্রিকায় প্রকাশিত ‘রামনবমী’ নাটকটিকে গোয়ালপাড়া আসাম থেকে অসমীয়া ভাষায় প্রকাশ করেন। ‘রামনবমী’ নাটকের ভূমিকায় গুণাভিরাম শৰ্ম্মা লিখেছেন,—“ইংরাজী ১৮৫৭ সনত মঘ যেতিয়া, কলিকাতার পরা আপোন মাতৃ ভূমিলৈ আহোঁ বাটত এই রামনবমী নাটক খানি রচনা কৰিছিলো। পাছত সময়ে সময়ে অরুণোদয় সম্বাদ পত্ৰতই মুদ্রিত হইছিল।”^{৩৩} ‘রামনবমী’ পঞ্চাঙ্ক নাটক। এ নাটকের কাহিনী বৃত্তান্তে উঠে এসেছে বিধবা বিবাহের অনুসঙ্গ। কামদেব ও রামচন্দ্র সমাজে হিন্দু বিধবা নারীর গোপন সহবাস নিয়ে চিন্তিত হয়েছেন। তাঁদের কথাবার্তায় উঠে এসেছে বিধবা নারীর গোপন সহবাস যাপনের চিত্র,—

“রাম ।। দেশাচার! ইঃ দেশাচার!...বিশেষ বিধবা বিলাকে তলে তলে ছল লই লই বহু পুরুষে সইতে সহবাস করা, ভ্রূণ হত্যা করা কেনে পাপ। তাতকৈ এজনর যেনে ভাবে পাণীগ্রহণ বর আবশ্যক আরু তার পরা বহু উপকার আছে। পাপ নীচেই নাই।

কাম ।। তেনে হনে ভাৰ্য্যা স্বামীৰ স্নেহ কমিব।

রাম ।। ...এতেকে বিধবার বিবাহ হলে সেই সকলোরো দুয়ারত হেঙ্গার বান্ধা হয়। বিধবা বিলাকর দুঃখর কথা স্মরণ করিলে আরু দেখিলে শুনিলে হৃদয় বিদীর্ণ হয়।”^{৩৪}

মূলত নবমী নামক এক যুবতী বিধবার অবৈধ প্রণয় বৃত্তান্ত ও বিধবা সংকটের ছবি উঠে এসেছে ‘রামনবমী’ নাটকে। অবৈধ ভাবে মেলামেশায় নবমী গর্ভবতী হয়ে পড়ে। সমাজ কলঙ্কের ভয়ে নবমী বিচলিত ও দ্বিধাগ্রস্ত হয়েছে। অবৈধ প্রণয়ে লিপ্ত নবমী তাঁর গর্ভস্থ সন্তানের প্রতি উদ্দেশ্য করে স্বগতোক্তি জ্ঞানে জানিয়েছে,—“ (একাকিনী)...প্রথমে যাত বিয়া দিছিল তেঁওর মৃত্যুর জন্য মোর যি ক্লেশ তার কষ্ট, স্বভাবর সক্তি অতিক্রমণ করিব নোয়ারি ময় করা কস্মর কষ্ট, লোকত লজ্জা ভয় আরু অপমান।...আহা! মোর বৈধব্য দশা। ময়েই যদি বিধবা নহম এনে হব কিম? নয়তো এই প্রাণ সাথে সইতে সংঘটন হবর পরা বিধবা নহঁও।...(গর্ভস্থ সন্তানর প্রতি) হে জিব! তুমি মোর উদরত উৎপত্তি হই সংসার নেদেখিলাই? কিমান মানুহে সন্তানর জন্য যাগ যজ্ঞ তপ জপ করিছে, ময় সেই সন্তান ধর্ম্মতঃ আরু ন্যায় পক্ষে পাইও নষ্ট করিব লগিয়া হলোঁ। আহা! দেশাচারর কেনে দারুণ শাসন। হে গর্ভস্থ সন্তান!”^{৩৫}

‘রামনবমী’ নাটকের অন্তিমে পুরোহিতের উক্তি জ্ঞানে বিধবা বিবাহের যৌক্তিকতাকে সমর্থন করে নাট্যকার এক দীর্ঘ কবিতা সংযোজন করেছেন। যেখানে নাট্যকারের বিধবা বিবাহ

সমর্থনের মনোভাব প্রকাশিত হয়েছে,—

“বিধবা নারীর পতি সঙ্গ, ঈশ্বরর ইচ্ছা মোহে যদি,
কামভাব তার নথাকিত অঙ্গ ভরি।।

যি কারণে সিতো মোহে নাশ, স্বভাবর গতি অপ্রয়াস,
সুযোগত হয় প্রকাশ অজস্র মতে।

কলি শাস্ত্র কর্তা পরাশরে, কহিছে স্মৃতিত উচ্চৈঃস্বরে।।

বিধবা নারীর পতিরন্যো বিধিয়তে।

হেনয় শাস্ত্রক পরিহরি, মিছা আচারক সত্য করি,

কিনো অযুগুত আচরিছা দৃঢ় করি।

দেশাচার যাক ভাবি আছা, তার পরিবর্ত জানা সঁছা,

তথাপি তো তাক স্থির বুলি আছা ধরি।।

ভ্রূণহত্যা ব্যভিচার দোষ, গুপ্ত প্রেমর অসন্তোষ,

আরু নানা পাপ সকলো হইব নিঃশেষ।”^{৩৬}

উনিশ শতকে বিধবা বিবাহের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক ছিলেন পাথুরিয়াঘাটা ঠাকুরবাড়ির রাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ও তাঁর বন্ধু উত্তরপাড়ার জমিদার জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়। জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় বিদ্যাসাগরকে সমীহ করতেন। জয়কৃষ্ণ ছিলেন, বিধবা বিবাহ আন্দোলনের অন্যতম প্রচারক ও পৃষ্ঠপোষক। জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের পৃষ্ঠপোষকতায় তারকচন্দ্র চূড়ামণি ‘সপত্নী’ (১৮৫৮) নাটক রচনা করেন। ‘সপত্নী’ নাটকের ভূমিকায় তারকচন্দ্র চূড়ামণি লিখেছেন,—“‘সপত্নী’ নাটক, প্রথম ভাগ, জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহোদয়ের আদেশে, তারকচন্দ্র চূড়ামণি প্রণীত, কলিকাতা, ভাস্কর যন্ত্রে শ্রীগগনচন্দ্র চক্রবর্তী দ্বারা মুদ্রিত, সংবৎ ১৯১৪।”^{৩৭} বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহের সমালোচনা করেই ‘সপত্নী’ নাটক রচিত। ‘সপত্নী’ নাটকের ভূমিকায় নাট্যকার সেকথা উল্লেখ করেছেন,—“বর্তমানকালে, বাঙ্গালাদেশ যে সকল কদাচার কুব্যবহার চলিতেছে, বিশেষতঃ বহুবিবাহ সংক্রান্ত যে সকল অত্যাচার ঘটিতেছে নাট্যচ্ছলে সেই সমস্ত প্রকাশিত করাই, এই সপত্নী নাটকের মূলোদ্দেশ্য।”^{৩৮}

নাট্যকার তারকনাথ চূড়ামণি ‘সপত্নী’ নাটকে দেখিয়েছেন, ভূধর-সৌদামিনী ও ব্রজবিলাস-মোহিনীর নিতান্ত বাল্য বয়সে বিবাহ হয়। বাল্যবিবাহের কারণেই তারা অসুখী। বাল্যকালে বিবাহ করা স্ত্রীকে যৌবনে আর ভালো না লাগায় ব্রজবিলাস ও ভূধরের দ্বিতীয়

বিবাহের কথা উঠে এসেছে। সপত্নী নাটকে রামব্রহ্ম একশত বিয়ে করেছেন। আবার, সপত্নী নাটকে বহুবিবাহকারী অসচ্ছল কুলীনের সাক্ষাৎ পওয়া যায়, কাদম্বিনী, নিতম্বিনী ও চঞ্চলা এই তিন বোনের স্বামী ৪৯টি বিবাহ করেছেন কিন্তু অর্থনৈতিক ভাবে অসচ্ছল। অর্থসংকটে পড়ে কুলীন ব্রাহ্মণ ডাকাত দলে যোগ দেয়, ধরা পড়ে, জেলে যায়। স্বামী বিরহিণী তিন যুবতী বোন কাদম্বিনী, নিতম্বিনী ও চঞ্চলা, জৈবিক তাড়নায় আত্মসংযমে অক্ষম হয়ে তাদের বাড়িতে আশ্রিত কামদেব নামক এক যুবকের সঙ্গে সম্মিলিত ভাবে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়। এই তিন কন্যার মা হরমোহিনী এবং পিতা রামাকান্ত এই ব্যভিচার সম্পর্কে সব জেওে বাধা দিতে পারেনি। এসব কুলীন ব্যভিচারনী স্ত্রীর সন্তান হত না। বোঝা যায়, ভ্রূণহত্যা ছিল তাদের পথ।

বহুবিবাহের কুফল নিয়ে নাটক রচনা করতে গিয়ে নাট্যকার প্রসঙ্গক্রমে সমকালীন সমাজ আন্দোলন ‘বিধবার পুনর্বিবাহ’ প্রসঙ্গটিকে এড়িয়ে যেতে পারেননি। কৌলিন্য প্রথা ও বহুবিবাহের ফলেই সমাজে দেখা দিয়েছিল বিধবার সংকট ও সমস্যা। আর সে কারণেই নাট্যকার বহুবিবাহের কুফল নিয়ে বলতে গিয়ে বিধবা সংকট ও বিদ্যাসাগরের সমাজ আন্দোলনকে নাট্যদৃশ্যে তুলে ধরেছেন। ‘সপত্নী’ (১৮৫৮) নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কে সূর্য্যকান্ত ও রামগতির তর্কাতর্কি সংলাপে উঠে এসেছে ১৮৫৬ পরবর্তীকালীন সময়ের বিধবা বিবাহ আইন পাস হওয়ার প্রসঙ্গ ও বিধবা নারীর পুনর্বিবাহের বিষয়। সমকালীন সমাজ ইতিহাসের ছবিও তুলে ধরেছেন নাট্যকার,—

“সূর্য্যকান্ত ॥ ...দেশে আর কি বিচার আছে? না, আচার আছে? দেশটা এককালে
খ্রিষ্টান হইয়া উঠিল বৈ তো নয়?

রামগতি ॥ (হাসিতে হাসিতে) কেন মহাশয়? দেশ খ্রীষ্টীয়ান কিসে হইল?

সূর্য্যকান্ত (সদন্তে) ॥ আবার জিজ্ঞেস করিতেছ হে? রাঁড়ের বিবাহ হইতে চলিল?

যাহা কর্ণেও শুনি নাই। বেদে নেই; পুরাণে নেই; কোরাণেও

খুঁজিয়া পাওয়া যায় কি না? আরও কি দেশে মানুষ আছে বল?

রামগতি ॥ কেন মহাশয়! এই যে বিদ্যাসাগর মহা--।

সূর্য্যকান্ত । (রামগতির কথা শেষ না হইতে হইতেই সক্রোধে) আঃ যাও যাও!

ওটার আর নাম করিও না। শুনিলে রাগ জন্মে।

রামগতি ॥ সে কি মহাশয়। এ কি বলেন? বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রাতঃস্মরণীয় লোক,

তাঁহার নাম শুনিলে আবার আপনকার রাগ হয়? সর্ব্বাঙ্গ পুলকিত হয়

না? আর দেশে লোক নাই বলেন কি? তিনি যখন বিধবা বিবাহ বিষয়ে
প্রথম ব্যবস্থা বাহির করেন, তখন নবদ্বীপ প্রভৃতি যাবতীয় সমাজের
ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মহাশয়েরা তাঁহার বিপক্ষ হইয়া ছিলেন এবং কত শত
আপত্তি উপস্থিত করিয়াছিলেন একথা সত্য কি না?

সূর্য্যকান্ত।। হাঁ হাঁ! তা সত্য বটে!...

রামগতি।। ...এক্ষণে বলুন দেখি আপনি যাঁহাদিগকে মানুষ ও হিন্দু স্থির করিয়াছেন,
ইহাদের প্রতি আপনকার বিলক্ষণ শ্রদ্ধা আছে কি না?

সূর্য্যকান্ত।। (দন্তে, প্রফুল্ল বদনে)। হাঁ আন্তরিক আস্থা আছে বৈ কি?

রামগতি।। আচ্ছা, মহাশয়! এখন বলুন দেখি, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রকাশিত প্রথম
ব্যবস্থাপত্রে ইঁহারা যে দোষোল্লাস করিয়াছিলেন, দ্বিতীয় ব্যবস্থা পত্র দ্বারা তিনি তাহা
তন্ন তন্ন রূপে খণ্ডন করিয়া দিলে তাহাতে আর কি কেউ কোন উত্তর করিতে
পারিয়াছিলেন।

সূর্য্যকান্ত।। (বিরাগে) যাও যাও। আর তোমাদের ও সকল খিষ্টানী কথা শুনিতে চাই
না।^{১৩৯}

বস্তুত নাট্যকার সমকালীন সমাজ মানসিকতার গোটা চিত্রটাই এখানে তুলে ধরেছেন। এছাড়া
নাট্যকার আরও দেখিয়েছেন, বহুবিবাহ হোক আর বিধবা বিবাহ হোক—পুনর্বিবাহের অনুষ্ঠানে
থাকত কামিনী বিলাস ও অশ্লীলতার ছড়াছড়ি। বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ ও পুনর্বিবাহ অনুষ্ঠানের
সামাজিক কদাচারকে নাট্যকার তুলে ধরেছেন তাঁর ‘সপত্নী’ নাটকে।

১৮৫৮ সালে প্রকাশিত হয় গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্নের ‘বিধবা বিবাহ বিষম দায়’ নাটক।
গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন (১৮২২-১৯০৩) দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার রাজপুর হরিণাভীতে বাস করতেন।
তিনি পণ্ডিত রামনারায়ণ তর্করত্নের প্রতিবেশী ছিলেন। ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সহপাঠী।
১৮৪৫ থেকে ১৮৫১ এই সময়কালে তিনি সংস্কৃত কলেজের গ্রন্থাধ্যক্ষ ছিলেন। ১৮৫১ থেকে
১৮৮২ এই সময়পর্বে তিনি সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপনা করেন। বিধবা বিবাহ আন্দোলনের উৎসাহী
সমর্থক ছিলেন। ছিলেন জাতিভেদ বিরোধী, উদারমনস্ক মানুষ। ‘সংস্কৃত যন্ত্র’ প্রেস স্থাপনে
বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রধান সহযোগী ছিলেন। তিনি পরবর্তীকালে ‘বিদ্যারত্ন যন্ত্র’,
‘গিরিশবিদ্যারত্ন যন্ত্র’, ‘গিরিশ যন্ত্র’ প্রভৃতি প্রেস স্থাপন করেন হরিণাভীতে।^{১৪০} তৎকালীন সামাজিক
অন্যায়ের বিরোধিতা করে এবং বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহ আন্দোলনকে সমর্থন করে গিরিশচন্দ্র

বিদ্যারত্ন ‘বিধবা বিবাহ বিষম দায়’ (১৮৫৮) নাটক রচনা করেন। এ নাটক রচনার জন্য সেকালে তাঁকে নানান সামাজিক নিগ্রহ সহ্য করতে হয়। ‘বিধবা বিবাহ বিষম দায়’ অধুনা দুষ্প্রাপ্য হওয়ায় এ নাটকের কাহিনী সম্পর্কে কিছু জানা সম্ভব হয়নি।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের সবচেয়ে শক্তিশালী ও মঞ্চসফল নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র। বাংলা সামাজিক নাটক রচনায় দীনবন্ধু মিত্র পথিকৃৎ। ১৮৬০ সালে প্রকাশিত হয় দীনবন্ধু মিত্রের ‘নীলদর্পণ’ নাটক। ‘নীলদর্পণ’ নাটকে নীলকরদের অত্যাচার বর্ণনার পাশাপাশি, প্রসঙ্গক্রমে উঠে এসেছে বিধবার পুনর্বিবাহের প্রসঙ্গ। আদুরী ‘নীলদর্পণ’ নাটকের বিধবা চরিত্র। বসু পরিবারের দীর্ঘদিনের পুরাতন ঝি। আদুরীর স্বভাব পরিহাসপ্রিয়তা। তার হাস্য পরিহাসময় রঙ্গ রসরসিকতার মধ্যে উঠে এসেছে বিধবার পুনর্বিবাহ প্রদানের প্রসঙ্গ। বিধবা বিবাহ প্রবর্তনকারী ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সম্পর্কে আদুরীর মনে জেগেছে এক অপার কৌতূহল। সৈরিন্ধীর কাছে বিদ্যাসাগরের নাম শুনে আদুরী জানিয়েছে,—

“সৈরিন্ধী ॥ মরণ আর কি! (গাত্রোখান কর্যে) ছোট বউ বসিস্, আমি আস্চি, বিদ্যা
সাগরের বেতাল শুনবো। (সৈরিন্ধীর প্রবেশ)

আদুরী ॥ সেই সাগর, নাড়ের বিয়ে দেয়, ছা—নাকি দুটোদল হয়েছে, মুই আজাদের
দলে।

সরলতা ॥ হ্যাঁ আদুরী, তোর ভাতার তোরে ভাল বাস্ তো?

আদুরী ॥ ছোট হালদাণি, সে খ্যাদের কথা আর তুলিস্ নে। মিনসের মুখখান মনে পড়লি
আজো মোর পরাণডা ডুকরে কাঁদে ওটে। মোরে বড্ডি ভাল বাস্ তো। মোরে
বাউ দিতি চেয়েলো। পুঁইচে কি এত ভারি রে প্রাণ, পুঁইচে কি এত ভারি। মনের
মত হলি পরে বাউ পরাতি পারি। দেখাদিনি খাটে কি না, মোরে ঘুমুতি দিত না,
ঝিমুলি বলতো, “ও পরাণ, ঘুমুলে।”

সরলতা ॥ তুই ভাতারের নাম ধরে ডাকতিস!

আদুরী ॥ ছি, ছি, ছি, ভাতার যে গুরুনোক, নাম ধতি আছে?

সরলতা ॥ তবে তুই কি বল্যে ডাকতিস্?

আদুরী ॥ মুই বল্‌তাম, হাদে ওয়ো শোনচো...’^{১৪১}

—আদুরীর এই উক্তি-প্রত্যুক্তির মধ্য দিয়ে তার অতৃপ্ত জীবন তৃষ্ণাই প্রকাশিত হয়েছে। সুখের দাম্পত্য জীবনে সে একদিন অধিষ্ঠিত ছিল। সে সুখ তার ভাগ্যে বেশিদিন টেকেনি। প্রাণের

সাধ-আহ্লাদ না মিটেই সে স্বামীহারা হয়। ফলে তার সুখ গেছে, কিন্তু মনে রয়েছে সুখের স্মৃতি ও বাসনা। বর্তমান জীবনের নীরসতা দূর করবার জন্য আদুরী মাঝে মাঝেই আকুল আগ্রহে অতীতের মধুর স্মৃতি রোমন্থন করেছে। পূর্ব দাম্পত্য জীবনের এই স্মৃতি বিভোরতা আপাতভাবে স্বামীপ্রেমের নিদর্শন বলে মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে আদুরীর অসম্পূর্ণ দাম্পত্য বাসনার প্রকাশ। স্বামীর মুখ মনে পড়লে তার প্রাণ ডুকরে কেঁদে ওঠে। বিবাহিত জীবনের সুখ স্মৃতিকে সযত্নে আদুরী লালন করে অন্তরে অন্তরে। বৈধব্য সংস্কারের প্রতি আদুরীর মনোভাব ব্যক্ত হয়েছে তার সংলাপে ও কথাবার্তায়। তবু বিদ্যাসাগরের ‘বিধবা বিবাহে’র প্রচলন তাহার বঞ্চিত জীবনেও কিছু আশার সঞ্চার করেছে। বিদ্যাসাগরের প্রতিপক্ষ রাজা রাধাকান্তদেবের দলকেই সমর্থন জানালেও তার মন বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহ আন্দোলনের সাফল্যে উচ্ছ্বসিত হয়েছে। তার মনের মধ্যে বৈধব্য সংস্কার ও ভোগ বাসনার দ্বিধা-দ্বন্দ্ব প্রকাশিত।

১৮৬০ সালে প্রকাশিত হয় শিমুয়েল পিরবক্স এর ‘বিধবা বিরহ নাটক’। কলকাতা ‘বাপটিষ্ট মিশন প্রেস’ থেকে নাটকটি মুদ্রিত হয়। নাটকটির নাম পত্রে বলা হয়েছে,—যদি এই গ্রন্থ কারো কিনতে ইচ্ছে হয়, তবে কলকাতা মোকামের ইটালী কামার ডাঙ্গায় ভি.ও. আর চিহ্নিত বাটীতে লোক পাঠালে পাওয়া যাবে। নাট্যকার শিমুয়েল পিরবক্স ছিলেন ধর্মে মুসলমান। তিনি ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে খ্রীষ্টান ধর্ম গ্রহণ করেন। বিধবা বিবাহের সমর্থনে তিনি ‘বিধবা বিরহ’ নাটক (১৮৬০) রচনা করেন। ‘বিধবা বিরহ’ নাটকের ভূমিকায় নাট্যকার লিখেছেন,—“কয়েকদিন পূর্বে পরলোকগত এক ব্রাহ্মণের আদেশে এই পুস্তক রচনা। তাঁহার সেই আদেশানুসারে সেই বিষয়ে যে যে বিষয়ে আদিষ্ট) এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ সাধারণ ভাষায় এতদ্দেশীয় সামান্য ও ভদ্র স্ত্রীলোকেরা পরস্পর কথোপকথন করিয়া থাকেন, রচনা করিয়া ইহার নাম বিধবাবিরহ নাটক রাখিলাম।”^{৪২}

‘বিধবা বিরহ নাটক’ ছয় অঙ্কে রচিত। অঙ্কগুলি গভাঙ্কে বিন্যস্ত। প্রথম অঙ্কে দুটি, দ্বিতীয় অঙ্কে দুটি, তৃতীয় অঙ্কে দুটি, চতুর্থ অঙ্কে দুটি, পঞ্চম অঙ্কে তিনটি ও ষষ্ঠ অঙ্কে তিনটি করে গভাঙ্ক রয়েছে। ‘বিধবা বিরহ নাটকে’ দেখানো হয়েছে ভদ্র ঘরের বিধবা কন্যা, পিতার ব্যভিচারে ক্ষুব্ধ হয়ে, পিতৃগৃহ পরিত্যাগ করে। গৃহত্যাগের পূর্বে সে অপরাধ পরায়ণায় যুক্ত হয়ে পড়ে। দুর্নীতিগ্রস্ত ঝি-এর সহযোগিতায় নঙ্গরা নামক এক নীচ দুশ্চরিত্র যুবকের প্রলোভনে ভুলে গহনাপত্র চুরি করে ঘর ছাড়ে। বাস্তব সমাজ সমস্যার এক নগ্ন নির্মম রূপ অঙ্কন করা হয়েছে এ নাটকে।

শ্রীশিমূয়েল পিরবক্স রচিত ‘বিধবাবিরহ’ নাটকটি স্ত্রী চরিত্র নির্ভর নাটক। এ নাটকে, মনোমোহিনী, তাঁর মাতা, চাঁপা দাসী, পদি, মনোমোহিনীর দাসী, তাঁর আই সুখদা, মনোহারী, বামা, নন্দরা প্রভৃতি চরিত্র বিন্যাসের মধ্য দিয়ে নাট্যকার কাহিনী নির্মাণ করেছেন। নাটকের শুরুতে অর্থাৎ প্রথমাক্ষে দেখা যায় মনোমোহিনী তার মায়ের কাছে মাসীর বাড়ি যাবার জন্য বায়না ধরে। মায়ের সামান্য অনিচ্ছা সত্ত্বেও মেয়ের আবদারে রাজী হয়। মনোমোহিনী শাড়ী, গয়নায় সেজে ওঠে। মনোমোহিনীর মা চাঁপা দাসীকে বলে পালকির ব্যবস্থা করতে জানায়।

চাঁপা দাসী পালকির ব্যবস্থা করতে পঞ্চদশের বাড়ি যায়। পঞ্চদশ চাঁপার দিকে লক্ষ্য করে, চাঁপার অন্তঃস্বভা হবার প্রতি সন্দেহ প্রশ্ন করে। চাঁপা রাগান্বিত হয়ে জানায় যে, সে অবিবাহিত তাই তার সন্তান আসার সম্ভাবনা নেই। পালকি বাহক পঞ্চদশ, চাঁপাকে তার মৃত সন্তানের প্রসঙ্গে জানতে চাইলে চাঁপা যন্ত্রণাবোধ করে। চাঁপা জানায়, তার মনিব মনোমোহিনীর পিতাই তার মৃত সন্তানের পিতা। এখানে লক্ষ্য করা যায় যে মনিবের সঙ্গে দাসদাসীদের এক অবৈধ সম্পর্ক।

দ্বিতীয়াঙ্কে, মনোমোহিনীকে তার মাসীর বাড়িতে দেখা যায়। মনোমোহিনীর মাসী পদ্মাবতীর মা অসুস্থ। পদ্মাবতী নিজের সন্তানাদি ও অসুস্থ মাতাকে নিয়ে অসহায়। পদ্মাবতীর কন্যা মনোহারী ও সুখদা। মনোহারী বিধবা। মনোমোহিনীও বিধবা। অবিবাহিত সুখদা নিতান্তই বালিকা। সুখদা ‘রাঁড়’ এর মানে জিজ্ঞাসা করে তার মাকে। স্বামী শব্দের অর্থটিও সে জানে না। সুখদা তার মাকে জিজ্ঞাসা করে যে, মনোমোহিনী আরেকবার বিবাহ কেন করে না। উত্তরে সুখদার মা বলে,—“দূর ২ পোড়ামুখী, একবার স্বামী মলে আরকি বিয়ে কত্তে আছে।”^{৪০} কিন্তু সুখদা তার বাবার মুখে শুনেছিল যে যদি বিধবাদের পুনরায় বিবাহ দেওয়া প্রথা চালু হয় তাহলে তিনি পুনর্বীর বিধবা মনোহারীকে বিবাহ দেবেন। কিন্তু বাস্তবে তা হয়নি। বিধবা মনোহারীকে তার বাবা পুনর্বিবাহ দিতে পারেননি।

দ্বিতীয় অঙ্কের, দ্বিতীয় গর্ভাক্ষে মনোহারী ও মনোমোহিনী—দুই বোনের গল্প কথায় উঠে এসেছে বিধবা মনোমোহিনীর মানসিক কষ্ট—

“কামে কম্পাশ্বিত দেহ করি হায় হায়।

পতির বিচ্ছেদে বুঝি মম প্রাণ যায়।।

বিরহ অনল মম সদা জ্বলে মনে।

বিধবা হইয়া আর বাঁচিবে কেমনে।।”^{৪১}

যৌবনকালে উপনীত মনোমোহিনীর দেহ কামে জর্জরিত হয়েছে। কিন্তু বিধবা মনোমোহিনীর

তনুমন শাস্ত করার উপায় নেই,—

“তনু মম জীর্ণ হল মদনের বাণে।

নাগর বিহনে ঘরে থাকিব কেমনে।”^{৪৬}

মনোমোহিনী দীর্ঘ বারো-চোদ্দ বছর যাবৎ বিধবা। শৈশব কালে পতির বিহনে বুঝতেই পারেনি পতিসঙ্গ সুখ কি জিনিস। শুধুমাত্র উপবাস, ব্রতপালন, আতপচাল খেয়ে দিন কাটিয়েছে। বিধবা হওয়া অবধি কোনো পুরুষ মানুষের মুখও দেখেনি সে। মনোমোহিনীর পিতা ধনাঢ্য ব্যক্তি। ভালো খাওয়া, পরায় মনোমোহিনী কোনদিনও অভাববোধ করেনি। কিন্তু সে ভালো নেই। মনোমোহিনী কামপীড়ায় দগ্ধ। অন্যদিকে মনোহরী বিধবা হয়েও অনেক সংযত। মনোহরী সাত বছর বয়সে (বিধবা) রাঁড় হয়ে বাপের বাড়িতে চলে আসে। অভাব তার নিত্য সঙ্গী। তবুও মনোহরীর মনে দুঃখ নেই। মনোহরী জানিয়েছে,—“...তথাপি দুঃখ করিনে কেননা যখন স্বামী নাই তখন আর কোন সুখের প্রয়োজন নাই...”^{৪৭} কিন্তু মনোমোহিনী বিধবা বিবাহের প্রয়োজনীয়তা বুঝতে পারে। কারণ বিধবাদের বিবাহ না হবার কারণে সমাজে বহু কুৎসা ছড়িয়ে পড়ে। মনোমোহিনী, মুক্তকেশীর পদস্থলন দেখেছে। মুক্তকেশী সাত আট বছরে বিয়ে হয়ে দশ এগারো বছরে রাঁড় হয়। মুক্তকেশী জৈব তাড়নাকে সংযত করতে না পেরে নিমে তাঁতীর সঙ্গে পালিয়ে যায়। চার পাঁচটি ছেলেপুলের মা মুক্তকেশীর পদস্থলনের দুঃখ ও বিড়ম্বনা বিধবা মনোমোহিনীকে আঘাত করে।

মনোহরী বিধবা বিবাহের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছে। মনোহরী জানে, বিদ্যাসাগর মহাশয় বিধবাদের পুনর্বিবাহ নিয়ে আন্দোলন করেছেন। কয়েক ঘরের বিধবা রমণীদের বিবাহও হয়েছে। কিন্তু বিধবা বিবাহ আইনসম্মত হলেও তৎকালীন সমাজে এর প্রভাব আশানুরূপ নয়। মনোহরী বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মহত্বকে অনুভব করেছে। অন্যদিকে মনোমোহিনী ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহকে স্বাগত জানালেও বিদ্যাসাগর মহাশয়কে অবহেলা করেছে। কারণ মনোমোহিনীর মনে হয়েছে বিদ্যাসাগর মহাশয় বিধবাদের বিবাহের আশা দেখিয়ে পরক্ষণে তা ভঙ্গ করছেন। বিধবা মনোমোহিনীর প্রবল ইচ্ছা পুনর্বীর বিবাহের। কিন্তু তা না হওয়ার ফলে তার মনে বিদ্যাসাগরের বিরুদ্ধে ক্ষোভ জমেছে। কিন্তু মনোহরী জানে বিধবাবিবাহের বিপক্ষে প্রতিবাদ কতটা জোরালো। তাই সে বিপক্ষের মানুষদের সহ্য করতে পারে না। বিধবাদের সুখ হলে তাতে আর পাঁচটা মানুষের অসুবিধের কারণটা মনোহরী বুঝতে পারে না।

তৃতীয় অঙ্কে, দেখা যায় মনোমোহিনী মাসির বাড়ী থেকে ফিরে এলে, তার মাতা

কুশল সংবাদ নেয়। মনোমোহিনীদের বাড়ীর দাসী বামা পাড়াপড়শীর খবর নিয়ে আসে। বামার কথায়, বিধবা রমণীদের দুর্দশার চরম প্রতিচ্ছবি পাওয়া যায়। প্রাণনাথ চাটুয্যের বড় ছেলে মাধব চাটুয্যের বড় মেয়েটি বাল্য বিধবা হয়। কিন্তু যৌবনে উত্তীর্ণ হয়ে জৈবিক চাহিদার কাছে আত্মসমর্পণ করে পদস্থলিত হয়, গর্ভবতী হয়ে পড়ে। মাধব চাটুয্যের বিধবা কন্যার ভ্রূণ হত্যার কারণে, সমাজের চোখে হয়ে ওঠে দুঃশ্চরিত্রা ও পাপী।

চতুর্থাঙ্কে, চণ্ডীমণ্ডপে জনতাদৃশ্য উপস্থাপনের মধ্যদিয়ে নাট্যকার বিধবা নারীর পুনর্বিবাহ নিয়ে সমাজপতিদের চিন্তাধারা ও সমাজ মানসিকতার ছবি তুলে ধরেছেন। চাটুয্যে বাড়ীর দুর্ঘটনাকে কেন্দ্র করে চলেছে বাদানুবাদ। রামগোপাল তর্কালঙ্কার, বেনো, বাড়ুয্যে, ভট্টাচার্য, বৈরাগী, কানাই, আচার্য্য পরস্পরের মধ্যে তর্ক চলেছে বিধবা নারীর গর্ভপাত ঘটানোর বিষয় নিয়ে। বিধবা রমণীদের দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থায় তাদের দুঃখ ঘোচানোর প্রয়াস স্বরূপ পক্ষে-বিপক্ষে নানান চাপান উত্তোর চলেছে চণ্ডীমণ্ডপ সভায়। তাদের এই আলোচনায় উঠেছে এসেছে, বিধবার পদস্থলনের নানা সমস্যার কথা। প্রায় প্রত্যেক বাড়ীতেই বিধবারা পদস্থলিত হয়েছে। অল্প বয়সে বিধবা হয়ে নারীরা যৌবনে উত্তীর্ণ হয়ে নানা প্রলোভনের শিকার হয়ে সতীত্ব হারিয়েছে, কেউ বা আবার গর্ভবতী হয়ে পড়েছে। সমাজের কাছে লজ্জা নিবারণের স্বার্থে গোপনে ভ্রূণহত্যা চলেছে। সম্মানহানি হবার ভয়ে, লোকসমক্ষে নিজেদের ছোট হবার ভয়ে অনেক অল্পবয়সী বিধবা নারী আত্মহত্যার পথ বেছে নিতে বাধ্য হয়েছে। এই দুরবস্থা দূর করার জন্য বিধবা নারীদের পুনর্বিবাহ দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছেন সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তির। চতুর্থ অঙ্কের, প্রথম গর্ভাঙ্কে তর্কালঙ্কার মহাশয়ের বক্তব্যে তা স্পষ্ট,—“বটে ২ আচার্য্য মহাশয় যাহা বলেছেন তাহা সত্য বটে; ভদ্রলোকের ঘরের কথা বাহির করাতে কেবল লজ্জার বৃদ্ধি হয় অতএব এই মন্দতা নিবারণ করণার্থে চেষ্টা করাই আমাদের কর্তব্য বটে, এই মন্দতা কেবল বিধবাদিগের পুনর্বিবাহ দেওয়াতে বিনাশ হইতে পারে, নতুবা এমন আর কোনো উপায় নাই যাতে কোরে এই রূপ মন্দ কর্ম নিবারণ হয়।”^{৪৭} কিন্তু সমাজের গোঁড়া হিন্দুরা মনু সৃষ্ট নিয়মকে লঙ্ঘন করার ঘোর বিরোধী। তাঁদের ধারণা বিধবা বিবাহ হওয়া মানে খ্রীষ্টানদের সমতুল্য হওয়া। ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের মধ্য দিয়ে নাট্যকার উনিশ শতকের লোকমানসকে তুলে ধরেছেন এইভাবে,—“কি বলেন কি তর্কালঙ্কার মহাশয়, বিধবা বিবাহ দিয়া এই মন্দতা নিবারণ করতে হবে? বেশত একেত হিন্দু ধর্ম দিনে ২ লোপ পাইতেছে তাতে আবার বিধবা বিবাহ দিতে চাহিতেছে, এই কর্মটি করলেই হিন্দু ধর্ম জলাঞ্জলি দেও আর কি? (উপহাস) এত উৎপাত করে কাজকি

একিবারে খ্রীষ্টীয়ান হয়ে যাওনা কেন তাহা হলে কিছু ঝানঝাটি থাকবে না”^{৪৮}

চতুর্থাক্ষের দ্বিতীয় গর্ভাক্ষে, তর্করত্ন, ভট্টাচার্য্য, আচার্য্য, বাডুজ্যে মহাশয়ের মধ্যে বিধবা বিবাহের যৌক্তিকতা ও প্রামাণ্যতা বিষয়ক তর্কবিতর্কের অবতারণার করেছেন নাট্যকার। তর্কালঙ্কার বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিধবা বিবাহ আন্দোলনের গুরুত্ব বোঝানোর চেষ্টা করেছেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় বিধবা বিবাহ বিষয়ক যে সকল গ্রন্থ রচনা করেছেন তাতে বিধবা বিবাহের শাস্ত্রীয় যৌক্তিকতা দেখিয়েছেন। ভট্টাচার্য্য ও তর্কালঙ্কারের কথোপকথনে নাট্যকার বিধবা বিবাহের সপক্ষে সওয়াল করেছেন। ভট্টাচার্য্যকে বিধবা বিবাহের বিপক্ষে এবং তর্কালঙ্কারকে বিধবা বিবাহের সপক্ষে,—যুক্তি পরস্পরায় সংলাপে ‘পরশর সংহিতা’র প্রসঙ্গকে নাট্যকার উত্থাপন করেছেন। তর্কালঙ্কার যেন স্বয়ং বিদ্যাসাগরের প্রতিভূ। তর্কালঙ্কারের সংলাপে বিদ্যাসাগরের ‘বিধবা বিবাহ হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব’-এর অনুরূপ প্রতিধ্বনি লক্ষ্য করা যায়। তর্কালঙ্কার পরশর সংহিতার সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধৃতি দিয়ে তার ব্যাখ্যা করেছেন এইভাবে,—

“নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ
পঞ্চস্বাপংসু নারীণাং পতিরণ্যো বিধীয়তে ॥
অষ্টৌ বর্ষাণ্যপেক্ষেত ব্রাহ্মণীং প্রোষিতং পতিম্।
অপ্রসূতা তু চত্বারি পরতোহনং সমাশ্রয়েৎ ॥
ক্ষত্রিয়া ষট্ সমাভিস্তেদপ্রসূতা সমাশ্রয়ম্।
জীবতি শ্রয়মানে তু স্যাদেষ দ্বিগুণো বিধিঃ ॥
অপ্রবৃত্তৌ ত্ব ভূতানং দৃষ্টিরেষা প্রজাপতেঃ।
অতোহ ন্যগমনে স্ত্রীণামের দোষো ন বিদ্যতে ॥

—ইহাতে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে স্বামী অনুদ্দেশ হইলে, মরিলে, ক্লীব হইলে, সংসার ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিলে অথবা পতিত হইলে স্ত্রীদিগের পূর্ণবর্ষার বিবাহ করা শাস্ত্র বিহিত। স্বামী অনুদ্দেশ হইলে ব্রাহ্মণ জাতীয়া স্ত্রী আট বৎসর প্রতীক্ষা করিবেক, যদি সন্তান না হইয়া থাকে চারি বৎসর নতুবা দুই বৎসর। শূদ্র জাতীয়া স্ত্রীর প্রতীক্ষার কালনিয়ম নাই। অনুদ্দেশ হইলেও যদি জীবিত আছে বলিয়া শুনিতে পাওয়া যায় তাহা হইলে পূর্বোক্ত কালের দ্বিগুণ কাল প্রতীক্ষা করিবেক। কোন সংবাদ না পাইলে পূর্বোক্ত কাল নিয়ম। প্রজাপতি ব্রহ্মার এই মত। অতএব এমত স্থলে স্ত্রীদিগের পূর্ণবর্ষার বিবাহ করা দোষবহু নহে। যদি এই বিধি বাগদত্তা কন্যার প্রতি হইত তবে সন্তান হইবার উল্লেখ থাকিত না। যখন সন্তানের উল্লেখ রহিয়াছে তখন এই বিধি যে বিবাহিতা

বিধবাদিগের প্রতি আছে ইহার কোন সন্দেহ নাই।’^{১৪৯}

তর্কালঙ্কার মহাশয়, বিদ্যাসাগর মহাশয় উল্লিখিত পরাশরসংহিতার শ্লোকগুলির বিশ্লেষণ করেছেন, ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন। শাস্ত্রের বচন অনুযায়ী স্বামী মারা গেলে, ক্লীব হলে, সংসার ধর্ম পরিত্যাগ করলে, পতিত হলে সেই স্ত্রী পুনর্বার বিবাহ করতে পারে। কিন্তু তথাপি ভট্টাচার্য্য মহাশয় মানতে নারাজ। কিন্তু তর্কালঙ্কার মহাশয় আরোও বহু উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়েছেন— কলিযুগের বিধবাদের জন্যই এ নিয়ম। তথাপি বাড়ুয়ে মহাশয় প্রশ্ন তোলেন যে, বিধবাদের পুনর্বিবাহ হলে কেনো গোত্র উল্লেখ করা হবে। সেক্ষেত্রে, বিধবা রমণীরা তার পিতার গোত্রই নিজেদের পরিচয় দেবে—এইরকম বিধান ‘পরাশর সংহিতা’য় রয়েছে বলে জানান তর্কালঙ্কার। আর তাই বিধবা বিবাহের যৌক্তিকতা অবশ্য স্বীকার্য।

পঞ্চমাস্ত্রে মনোমোহিনীর উদ্বিগ্ন প্রকাশিত হয়। মনোমোহিনী, দাসীর কাছে জানিয়েছে, —তাঁর ব্যাকুল মন বাঁশীর সুরে দোল খায়। তাই সে বামাকে সেই বাঁশিওয়ালার খোঁজ নিতে পাঠায়। দাসী বামা, মনোমোহিনী এবং প্রেমিক পুরুষ নঙ্গরা গোপন আলাপচারিতায় ব্যস্ত থেকেছে। দাসী বামা, মনোমোহিনীকে, তাঁর প্রেমিক পুরুষ নঙ্গরার সঙ্গে মিলিত হবার জন্য অভিসারের পথ প্রশস্ত করে দেয় ও নঙ্গরাকে মনোমোহিনীর কক্ষে প্রবেশ করার পথ বলে দেয়। উতলা মনোমোহিনী পুরুষ সঙ্গমে মিলিত হবার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে।

ষষ্ঠাস্ত্রে মনোমোহিনী ও নঙ্গরার মিলন ঘটে। তারা পরস্পরের ঘনিষ্ঠ হয়। মনোমোহিনীর মান হলে নঙ্গরা পায়ে ধরে তার মান ভাঙায়,—

“শুন ২ সুবদনি ধরি তব পায়।

কর ক্ষমা অপরাধ মম প্রাণ যায়।।

.....

বদন কোমল তুমি মিলাও বদনে

শীতল করহ প্রাণ বারি দাও মনে।’^{১৫০}

ক্রমে মনোমোহিনীর মানভঞ্জন হয়। বিধবা মনোমোহিনী ও নঙ্গরা যৌবন প্রেমে ডুব দেয়। কিছুদিন পর মনোমোহিনীর গর্ভাবস্থার লক্ষণ দেখা যায়। মনোমোহিনীকে জিজ্ঞাসা করলে সে অস্বীকার করে। বিধবা মনোমোহিনী দেহসুখের উন্মাদনায় সমাজভয়কে উপেক্ষা করে নঙ্গরার সঙ্গে গৃহত্যাগ করে। বিধবা কন্যার গৃহত্যাগে, সমাজ কলঙ্ক ভয়ে কুলীন বাড়ুয়ে মহাশয় স্ত্রীপুত্রসহ দেশত্যাগী হয়। দেশত্যাগী হওয়ার সময় তিনি অনুভব করেন বিধবা বিবাহের প্রয়োজনীয়তা।

বিধবাদের পুনর্বিবাহ না হলে ঘরে ঘরে এমনই বিপর্যয় নেমে আসতে বাধ্য। বাড়ুয়ে মহাশয় ঘর ছাড়ার সময় একটি একটি চিঠি রেখে। তাতে লেখা ছিল,—“হে দেব বংশ হিন্দু লোকেরা তোমরা আমার স্বজাতীয় লোক এই জন্য তোমাদের নিকটে আমার নিবেদন এই যদি কুলশীল জাতি মান রক্ষা করিতে ইচ্ছা কর তবে শীঘ্র যাহাতে বিধবাদিগের পুনর্বিবাহ হয় এমন চেষ্টা কর।”^{৫১} বাড়ুয়ের এই শেষ সংলাপে যেন নাট্যকারের অভিষ্ট বক্তব্য প্রকাশিত হয়েছে। নাট্যকার বলতে চেয়েছেন বিধবার পুনর্বিবাহকে অস্বীকার করলে, সমাজে ব্যাভিচার দোষ ঘটতেই থাকবে। পরিত্রাণের একমাত্র পথ বিধবার পুনর্বিবাহ প্রদান।

শিমুয়েল পিরবক্স এর ‘বিধবা বিরহ নাটকে’ স্ত্রীপক্ষীয় সমস্যার ইঙ্গিত রয়েছে। বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহ আন্দোলন অনেক বিধবার সুপ্ত যৌন বুভুক্ষাকে জাগিয়ে তুলেছিল। বৈধব্য সংস্কার ও প্রবৃত্তির দ্বন্দ্ব ক্ষত-বিক্ষত অনেক বালবিধবা জ্বালা ভোগ করেছেন। বিধবা বিবাহ আন্দোলন সমস্যা সমাধান করেছে না ক্ষতি করেছে, সেই প্রশ্নই উত্থাপিত হয়েছে। ‘বিধবা বিবাহ’ আন্দোলন হিন্দু সংস্করের প্রতিষ্ঠাকে শিথিল করে, বিধবা নারীদের ব্যাভিচারের পথে প্রলুদ্ধ করেছে,—এমনটা অনেক বিধবার বিশ্বাস। ‘বিধবা বিরহ নাটকে’ নাট্যকার শিমুয়েল পিরবক্স লিখেছেন,—“এখন সেই সাগরের (=বিদ্যাসাগরের) ঐরূপ তেজ ও কল্লোল কিছুই নাই—এখন কেউ তাঁর রবও শুভে পায় না, একিবারে শুষ্ক হইয়া গিয়াছেন, বিধবাদিগের বিরহ আগুণে বারিপ্রদান না করে ঘৃত ঢেলে দিয়াছেন, কিনা যে কন্মোতে হাত দিলেন তাহা শেষ কর্তে পাললেন না।”^{৫২}

অকাল বৈধব্য থেকে সমাজে যে ব্যাভিচার সৃষ্টি হয়, এই বক্তব্য প্রচারের উদ্দেশ্যে ‘বিধবা বিরহ নাটক’টি রচিত। বিধবা বিবাহ আন্দোলনের সমর্থনে এ নাটক রচিত। ১৮৫৬ সালে বিধবা বিবাহ আইনে পরিণত হয়, আর ১৮৫৭ সালে বঙ্গদেশে ইংরেজের বিরুদ্ধে সংঘটিত হয় সিপাহী বিদ্রোহ। সিপাহী বিদ্রোহের ডামাডোল বিধবা বিবাহ আন্দোলনকে খানিকটা স্তিমিত করে দেয়। ‘বিধবা বিরহ’ নাটকে মনোহরীর উক্তিতে সমকালীন অস্থির সময়ের ছবি ধরা পড়েছে। মনোহরী জানিয়েছে,—“সাগর মহাশয়ের ইহাতে কিছুমাত্র ত্রুটি নাই, তিনি যৎপরোনাস্তি সাধ্য পর্যন্ত চেষ্টা করেছেন, কেবল যে তিনি একা তা নয়, তাঁহার স্বপক্ষ বর্ধমানের মহারাজা ও কলিকাতার অনেক ২ রাজা আর বাবুগণ ছিলেন। ইহারা কি না করতে পারেন তবে এটা যে সিদ্ধ হল না সে কেবল আমরা যে অবলা বিধবা আমাদেরই ভাগ্য দোষ বলতে হয়। কেননা, যখন এই বিধবাবিবাহের উদ্যোগ হতেছিল, প্রায় সেই সময় দুষ্ট নিমকহারাম সিপাইগণ যাহারা এতবছর

অবধি সন্তান সন্ততির ন্যায় রাজ্যেতে প্রতিপালিত হইল, একেবারে রাজ্য নিবার আশায় রাজবিদ্রোহী হয়ে উঠল।...এমন চিরদুঃখিনী বিধবা যে আমরা আমাদের কর্তব্য এই যে আমরা সতত ভগবানচন্দ্রের নিকট এই প্রার্থনা করি যেন তিনি আমাদের মহারাণীকে জয়ী করেন আর দুঃষ্ট সিপাইগণকে নিপাত করিয়া দেশে কুশল দেন।”^{৬০} বস্তুত আকস্মিক সিপাহী বিদ্রোহের বিশৃঙ্খলায় বিধবা বিবাহ আন্দোলন স্থিমিত হয়ে গিয়েছিল। নাট্যকার সেই সমকালীন যুগসময়কে দক্ষতার সঙ্গে তুলে ধরতে চেয়েছেন।

১৮৬০ সালে প্রকাশিত হয়, শ্যামাচরণ শ্রীমানি রচিত ‘বাল্যোদ্ধাহ’ নাটক। ‘বাল্যোদ্ধাহ’ নাটকটি চারটি অঙ্কে বিন্যস্ত। বাল্যবিবাহের করুণ পরিণতির কথা বলতে গিয়ে নাট্যকার বিধবা সংকটের কথা উপস্থাপিত করেছেন। ‘বাল্যোদ্ধাহ নাটকে’র প্রস্তাবনায় নাট্যকার নট-নটীর মধ্য দিয়ে বাল্যবিবাহের করুণ পরিণতির কথা বলেছেন। ‘বাল্যোদ্ধাহ নাটক’ এর প্রথম অঙ্কের কাহিনীতে দেখা যায়, বলহীন নামক ধনাঢ্য ব্যক্তির স্ত্রী মায়াবতী তাঁর নবমবর্ষীয় পুত্র গোপালের বিয়ে দিতে উৎসুক। পুত্রের জন্য উপযুক্ত পাত্রী চাই নইলে লোকসমাজে লজ্জিত হতে হবে—এই চিন্তায় মায়াবতীর চোখের ঘুম চলে গেছে। পুত্রের জন্য মায়াবতীর উৎকর্ষার ফলে ধনাঢ্য বলহীন পুত্র গোপালের বিবাহের জন্য ঘটককে আহ্বান জানান। মায়াবতী পুত্র গোপালকে জন্ম দেন এগারো বছর বয়সে। সেই গোপাল নয় বছর বয়সে উপনীত হয়েছে। নবম বর্ষীয় গোপালের বিবাহ নিয়ে মায়াবতী সর্বদাই চিন্তিত। বলহীন নিজ পুত্র গোপালের বিবাহ দিতে চাইলে, সমাজ প্রথা, ধর্ম সামনে এসে দাঁড়ায়,—“সন্তানটীর তো ত্বরায় বিবাহ না দেওয়া অযৌক্তিক বোধ হোচে যে হেতুক মমাপেক্ষা বহুগুণে ধনহীন ব্যক্তিরও স্বঃ সন্তান সন্ততিগণের সাতিশয় অল্প বয়সেই পরিণত সংস্কার সম্পন্ন করিতে যত্নবান হয়, অপর এই দেশের এই প্রথা, দেশাচারানুযায়িক কার্য্য করিলে ধর্ম্ম বৃদ্ধি হয়, ইহাতো প্রসিদ্ধই আছে...”^{৬১}

ধনাঢ্য বলহীনের প্রতিবেশী ধনহীন বাল্যবিবাহে অসম্মত। ধনহীন গোপালকে আরোও বিদ্যার্জনের প্রেরণা দেয়। কিন্তু বলহীন অল্পবয়সে বিবাহ দিতে সম্মত। বালক গোপাল যক্ষা আক্রান্ত তবুও বলহীন মারণরোগকে তাচ্ছিল্য করে তার পুত্রকে বিবাহদানে আগ্রহী হয়। বলহীন ঘটকের কাছে দাবী করে যে,—“তবে কিনা কিঞ্চিৎ সম্পন্ন ব্যক্তির কন্যা হয়, আর দেখতে শুনতেও কিছু ভালো হয়।”^{৬২} ঘটককে গোপালের অসুস্থতার কথা জানালে স্বার্থপর লোভী ঘটক শুধুমাত্র নিজ উপার্জনের স্বার্থে অসুস্থ গোপালের জন্য পাত্রী নির্বাচন করে।

বলহীনের বাল্যবিবাহ উদ্যোগকে তার প্রতিবেশী ধনহীন কোনভাবেই সমর্থন করেন

না। কারণ সে নিজে বাল্যবিবাহে অসুখী,—“...আমি অজ্ঞান অবস্থায় পরিণয়সূত্রে বদ্ধ হোয়ে কি ক্লেশই না অনুভব করিতেছি?—সংসার ভরণ পোষণার্থে দিবানিশি কেবল অন্নচিন্তায় যাপন করিতেছি, লোকালয়ে বিবিধ কারণ বশত অবমানিত হইতেছি, ক্ষুধার্ত সন্তাগণের চিত্তভেদী রব সকল প্রতিক্ষণ কর্ণগোচর করিয়া অপনাকে শতঃ ধিক্কার দিতেছি, ভাৰ্য্যার ল্লান বদন দণ্ডে অবলোকন করিয়া অন্তঃকরণকে প্রজ্জ্বলিত অনল শিখায় নিষ্ক্ষেপ করিতেছি এবং অপক্ক বীৰ্য্যে সন্তান উৎপাদন করিয়া পুত্রশোকে হৃদয়কে বিদীর্ণ করিতেছি। আহা! হা! কি যন্ত্রণা হয়!...”^{৫৬}

দ্বিতীয় অঙ্কে, গোপালের বিবাহের জন্য ঘটক পাত্রী নির্বাচন করে। বলহীনের বাড়ীতে বুদ্ধিহীন মতিচ্ছন্ন ও ঘটক উপস্থিত হয়। ঘটকের কথা অনুযায়ী, বুদ্ধিহীন-ধনে মানে কুলেশীলে সর্বগুণে গুণাকর, নিষ্কলঙ্ক, তেজবান কুলীন সন্তান। তার কন্যাটিও অতি সুলক্ষণা। বুদ্ধিহীন তার অষ্টম বর্ষীয়া কন্যাটির সঙ্গে নবমবর্ষীয়া গোপালের বিবাহ ঠিক করে। স্বার্থপর ঘটক মৃতপ্রায় বালকটির সঙ্গে ছোট্ট বালিকাটির সম্বন্ধ স্থাপন করে নিজ অভিপ্রায় সিদ্ধ করে,—“...হঁ! কেমন “ঝোপ বুঝে কোপ” মেরেছি; বলহীনের ছেলেটা তো মৃত বোল্যেই হয়, ওঁর আবার বিবাহ! তা আমাদের কি?”^{৫৭}

তৃতীয় অঙ্কে, বলহীনের পুত্র গোপালের বিবাহ উপলক্ষ্যে সুধীর ও ভট্টাচার্য মহাশয়ের কথোপকথনে উঠে আসে বাল্যবিবাহের পক্ষে ও বিপক্ষে নানান অভিমত। ভট্টাচার্য মহাশয় বাল্য বিবাহ সমর্থন করেন। সুধীর নামক বিচক্ষণ ব্যক্তিটি ভট্টাচার্য মহাশয়কে প্রশ্ন করলে ভট্টাচার্য মহাশয় রাগান্বিত হয়। সুধীর জানায়, নিতান্ত কিশোরী বয়সে বিবাহ কোনমতেই গ্রহণযোগ্য নয়। ভট্টাচার্য মহাশয় শাস্ত্রের দোহাই টেনে বলে যে, রজস্বংলা কন্যা কোনভাবেই অবিবাহিতা থাকবে না। যদি থাকে তবে সে বংশ নরকগামী হবে,—“দশ বৎসরের উর্দ্ধ হোলেই কন্যাকে রজস্বংলা বলে আর কন্যা রজস্বংলা হোলে কি মহাপাতক হয় জানিস?...তোর মতে রজস্বংলা কন্যাকে অবিবাহিতা রেখে বংশকে নরকগামী কর্যো?”^{৫৮}

বিদ্বান সুধীর, ভট্টাচার্য মহাশয়ের যুক্তি খণ্ডন করলে ভট্টাচার্য মহাশয় তাকে তিরস্কার করে। আসলে, ব্রাহ্মণ্যকুল নিজেরা সমাজের উচ্চ আসনে বসিয়ে শুধুমাত্র লাভের আশায়, স্বার্থ সিদ্ধির আশায় ভিন্ন নিয়মের বেড়াজাল সৃষ্টি করেছিল যুগযুগ ধরে। যার ফলস্বরূপ—সমাজে অকাল বৈধব্যের শিকার হয়েছে বহু বঙ্গনারী। সুধীরের বক্তব্যের মধ্য দিয়ে নাট্যকার অসামান্য ভাবে তৎকালীন সমাজের একটি খণ্ডচিত্র তুলে ধরেছেন,—“সামান্য লাভের প্রত্যাশায় মানবগণ কি কুকর্মই না কোর্তে প্রবর্ত হয়?...বলহীনকে কি বোলবো,—স্বয়ং ব্যাধিযুক্ত হয়েও স্বল্প বয়সে

বিবাহ করেছিলেন এবং তার ফল স্বরূপ তাহার পরিণেতা একটি গর্ভশ্রাব প্রসব করেছে; আহা! হা বিধাতঃ আবার সেই দুর্বল রোগী সন্তানের নিমিত্ত, একটি অবলা জ্ঞানহীনা কুমারীর চিরবৈধব্য কল্পনা কোরেছেন,—হায়! রে বঙ্গদেশবাসী কামিনীগণ! তোরা কি নিমিত্ত এই দয়াহীন দেশে জন্ম পরিগ্রহ করিস? যে দেশে তোদের অজ্ঞানাবস্থায় তাহারই সঙ্গে মিলন হয়... একত্রে বাস কোর্তে হবে, এক সুখেই সুখী হতে হবে, এবং এক দুঃখেই দুঃখীতে হতে হবেও যাহার বিচ্ছেদে জীবনের সকল সুখেই জলাঞ্জলি দিয়ে চিরন্তন দুঃসহ বৈধব্য যন্ত্রণায় কালযাপন কোর্তে হবে?—যে দেশে পিতা মাতাই আপনাদের পরম প্রেমাস্পদ কন্যাগণের প্রতি ঐ সকল নিষ্ঠুরাচরণে প্রবৃত্ত হয় এবং যে দেশে পাত্রে গুণাগুণ ও দৌল্যাতি কিছুমাত্র বিবেচনা না কোরে চিররোগী ও অজ্ঞান শিশুদের হস্তে তোদের সমর্পণ করে!”^{১৯}

চতুর্থ অঙ্কে দেখা যায় যে, বলহীনের পুত্র গোপালের যক্ষ্মা রোগ আরো বৃদ্ধি হয়েছে। বলহীন পুত্রের অসুখ নিবারণে কি করবেন ভেবে উঠতে পারেননি। ক্রমেই বলহীনের বিষয় সম্পত্তিও হ্রাস হয়ে গেছে। বলহীনের যক্ষ্মারোগ আছে তাই বলহীনেরও আশঙ্কা হয়, পুত্র গোপালেরও হয়ত তার সঙ্গেই মৃত্যু হবে। বলহীন জানে যক্ষ্মায় কেউ কোনকালেও আরোগ্য লাভ করেনি। বলহীন নিজে যক্ষ্মারুগী তাই সন্তানও যে বলিষ্ঠ হবে না তাতে কোন সন্দেহ নেই। স্বয়ং বলহীন এবং তার পুত্রটিও মৃত্যুমুখে এসে দাঁড়িয়েছে। ধনহীন, বলহীনের অবস্থা দেখে হতাশায় দীর্ণ হয়েছেন ও ভেবেছেন বাল্যবিবাহ দুঃখেরই নামান্তর। ধনহীন তা সহ্য করতে না পেরে বিষ খেয়ে দুঃখে হতাশায় যন্ত্রণায় সমাজের এরূপ কুপ্রথায় বিদ্ধ হয়ে মনে মনে অপরাধপ্রাপ্ত হয়েছে এবং আত্মহত্যা করেছে।

চতুর্থ অঙ্কের, তৃতীয় দৃশ্যে দেখা যায় যে, গোপালের মৃত্যু হয়েছে। মায়াবতী, অম্বিকা, বলহীন, বুদ্ধিহীনের বিলাপে, অশ্রুজলে সন্তান হারানোর যন্ত্রণা প্রকাশিত। কিন্তু গোপালের বিধবা স্ত্রী অষ্টম বর্ষীয়া কন্যা অবলার কোন প্রতিক্রিয়া নেই। কারণ অবলা জানতেই পারে না যে, তার জীবনের কি পরিণতি হল। সে বুঝতেই পারে না যে তার ভবিষ্যত জীবন কতটা কঠিনতর হতে চলেছে। দুমাসের মধ্যে বিধবা হয়ে অবলা কঠিন বৈধব্যাচারে নিমজ্জিত হয়েছে। অনুশোচনায় দগ্ধ হয়ে অবলার পিতা নিজ কন্যার দিকে তাকাতে পারেননি। বিধবা কন্যাটির মুখদর্শনে বুদ্ধিহীনের হৃদয় বেদনায় হাহতাশ করেছে,—“...আমার ঐ এক মাত্র কন্যা উহার মুখ নিরন্তর দর্শন করিয়া কেবল প্রজ্জ্বলিত মানানলেই দগ্ধ হবো; আবার ঐ নির্দোষী বালিকাকে বলহীন যে দুর্বাক্য প্রয়োগ করেছে তাহা কস্মিন কালেও বিস্মৃত হইতে পারিব না!”^{২০} বুদ্ধিহীন

শেষ পর্যন্ত এ যন্ত্রণার উপশম খোঁজে। সে বুঝতে পারে যে, বাল্যবিবাহ এক নরঘাতী প্রথা। এই প্রথায় কত অবলা কুলবালারা দারুণ দুঃসহ বৈধব্য যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে কুলমান জলাঞ্জলি দিয়েছে। কত পুরুষ সংসার প্রতিপালনে অসমর্থ হয়ে আত্মঘাতী হয়েছে। বাল্যবিবাহ নামক কুপ্রথা সমাজের বুকে ঘাতক স্বরূপ। তাই সমাজের নারী জাতির দুঃখ উপশম করতে হলে বাল্যবিবাহ বন্ধ হওয়া আবশ্যিক। বুদ্ধিহীনের দুঃখের মধ্য দিয়ে নাট্যকার উনিশ শতকের সমাজ ব্যবস্থার এক অসহায় পিতার দুর্দশার ছবি তুলে ধরেছেন।

‘বাল্যোদ্ধার নাটক’ এর মূল কাহিনী বাল্য বিবাহের কুফল নিয়ে রচিত হলেও, কাহিনীবৃত্তে বিধবা প্রসঙ্গ উপস্থাপিত হয়েছে। কৌলিন্য প্রথা জনিত কারণে, বৃদ্ধের সঙ্গে নাবালিকা কন্যার বাল্যবিবাহ এবং পরিণতি হিসাবে অকাল বৈধব্য। সেই বৈধব্যের যুপকাঠে বলি প্রদত্ত হয়েছে অবলা নারীরা। নাট্যকার এভাবেই বাল্যবিবাহের কুফলের সঙ্গে জড়িত বিধবা সংকটের কার্যকারণ সূত্রকে উপস্থাপন করেছেন।

উনিশ শতকে ‘বিধবা বিবাহ’ আন্দোলনকে ঘিরে সমাজের সাধারণ মানুষ, বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় দুটি শিবিরে ভাগ হয়ে যায়। বিধবাবিবাহকে কেন্দ্র করে পক্ষে-বিপক্ষে যেমন নানা মতামত গড়ে ওঠে, তেমনি গড়ে ওঠে পক্ষে-বিপক্ষের দলও। হারাণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের (শর্মা) ‘দলভঞ্জন’ (১৮৬১) নাটকে বিধবাবিবাহ নিয়ে পক্ষ-বিপক্ষ অবলম্বনকারী দুই যুযুধান দলের মানসিকতাকে পাঠকের সামনে হাজির করেছেন। নাট্যকার বিধবাবিবাহ সমর্থনকারীদের পক্ষ অবলম্বন করেছেন। ‘দলভঞ্জন’ নাটকে বিধবা বিবাহের যৌক্তিকতা, প্রাসঙ্গিকতা, তর্ক-বিতর্ক প্রভৃতি তুলে ধরেছেন।

‘দলভঞ্জন’ তিন অঙ্কে রচিত নাটক। প্রথম অঙ্কের কাহিনী সংগঠিত হয়েছে, মধুসূদন মুখোপাধ্যায়ের দোচালায়। নাটকের কাহিনীতে আছে, মধুসূদন মুখোপাধ্যায় কুলীন ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণ্য ধর্মকে কাজে লাগিয়ে নিজের আখের গোছানোই তার লক্ষ্য। মধুসূদনের মধ্যে কোন শিষ্টাচার লক্ষ্য করা যায় না। বিধবা রমণীদের বিবাহের বিরুদ্ধে তিনি উচ্চকণ্ঠ, —“আর দেকি দেকি কোন রকমে যে দিনকার রাঁড়ের বের দরুণ একটা দলাদলি পাকিয়ে তুলে [তুলতে] পারি।”^{১১} মধুসূদন মুখোপাধ্যায় নিজ স্বার্থের খাতিরে বিধবা বিবাহের বিরুদ্ধে দল পাকিয়েছে। অন্যদিকে ভবশঙ্কর বিধবা রমণীদের দুঃখে সমব্যথী হয়ে বিধবাদের পুনর্বিবাহে আগ্রহ প্রকাশ করে দল গঠন করে। ভবশঙ্কর জানিয়েছে, —“এরূপ অল্প বয়স্কা বিধবা অবলার বিবাহ হইলেই তো দেশের মঙ্গল আর ইহা নিতান্ত যুক্তিসিদ্ধ ও শাস্ত্রসম্মত কর্ম।”^{১২} ভবশঙ্কর মনে করেন,

দেশহিতৈষী অশেষ গুণসম্পন্ন বিদ্যাসাগর মহাশয় বিধবাবিবাহ বিষয়ে যেভাবে যত্নশীল ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছেন তাতে অনভিজ্ঞ সামান্য লোকের প্রয়োজন ক্রমাগত ফুরিয়েছে। স্বার্থপর মধুসূদন মুখোপাধ্যায় এ ধরনের উদার মানসিকতায় বিশ্বাসী নয়। তিনি নিজের আখের গোছাতে ব্যস্ত। বিধবা বিবাহের যৌক্তিকতায় মধুসূদনের স্বার্থে আঘাত লাগে। তিনি ভাবেন ভবশঙ্কর অর্থলোভে বিধবা বিবাহের দলে মিলিত হয়েছে। বস্তুত ‘দলভঞ্জন’ নাটকে রীতিমত বিধবা বিবাহের পক্ষে ও বিপক্ষে দুটি দলের তর্ক-বিতর্ক তুলে ধরেছেন নাট্যকার।

মধুসূদনের মতো নীলকণ্ঠ, ভূতনাথ, কান্তিচন্দ্র, অম্বিক প্রমুখ বিধবা বিবাহে অসম্মতি প্রদান করে নিজেদের গোঁড়া হিন্দুত্ব রক্ষার জন্য দল গঠন করেছে। দ্বিতীয় অঙ্কের কাহিনীস্থল বকুলতলার পুষ্করিণী। বিমলা, মালতী, রাধামণি, তারামণি ও ছোটবধূ প্রভৃতি মহিলারা বকুলতলায় পুষ্করিণীর সামনে দাঁড়িয়ে বিধবা-বিবাহ নিয়ে তর্কে-বিতর্কে ব্যস্ত থেকেছে। রাখালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের মাতৃশ্রদ্ধে সব ব্রাহ্মণেরা যোগদান করবে না বলে ঠিক করে। রাখালচন্দ্র বিধবাবিবাহে সম্মতিদানের প্রতিদান স্বরূপ ব্রাহ্মণজাতির দ্বারা বয়কট হয়েছে। রাখালচন্দ্র বুঝতে পারে, দেশটা শুধুমাত্র দলাদলিতেই শেষ হয়ে যাচ্ছে। রাখালবাবুর মতসমাজ হিতৈষী গোপালবাবুও অনিষ্টকারী দলাদলির কুফল দেখতে পাচ্ছেন। অন্যদিকে রামবল্লভ চক্রবর্তী, পার্বতীচরণ রায়, মহেশচন্দ্র মজুমদার, রামতরণ লাহিড়ী প্রমুখ গোঁড়া হিন্দুয়ানির ধর্মকে ভিত্তি করে নানা ভাবে বিরোধিতা করেছেন। এঁদের দল গঠনের উদ্দেশ্য শুধু অর্থলোভ। সামাজিক কিছু অমানবিক প্রথার বিরুদ্ধে সরব হলেই এঁরা বিরুদ্ধ দল তৈরি করে নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধি করতে চেয়েছেন। সমাজ হিতৈষী গোপালবাবুর আক্ষেপ,—“আমরা কেবল বিধবা বিবাহ দিতে গিছলুম বলেই আমাদের জাত গেল, কিন্তু তাদের মধ্যে কত লোক কত শত মন্দ কর্ম কোঁচে তাতে তাদের জাত যায় না।”^{৩০} বোঝা যায়, অস্পৃশ্যতার মতই সমাজে বিধবা বিবাহ সমর্থনকারীদের একঘরে করবার যে প্রবাহ চলেছিল তাকে নাট্যকার অসামান্য ভাবে তুলে ধরেছেন। ‘দলভঞ্জন’ নাটকে বিধবা বিবাহ সমর্থন ও অসমর্থনের চাপান-উতরের পাশাপাশি মদ গাঁজা আফিম ইত্যাদি নেশার কুফল দেখানো হয়েছে।

হরিশচন্দ্র মিত্র ছিলেন, উনিশ শতকের বিশিষ্ট প্রহসনকার। প্রহসন রচনা করতে গিয়ে তিনি ‘বোমচাঁদ বাঙ্গাল’ ছদ্মনাম গ্রহণ করেন। বিধবা বিবাহের সমর্থনে হরিশচন্দ্র মিত্র ‘শুভঙ্গ শীঘ্রং’ (১৮৬১) ও ‘ম্যাও ধরবে কে’ (১৮৬২) নামে দুটি নাটক রচনা করেন। এই দুটি নাটকে উঠে এসেছে বিধবা বিবাহ প্রসঙ্গ ও বিধবা নারীর সংকট চিত্র। হরিশচন্দ্র মিত্রের ‘ম্যাও ধরবে

কে?’ (১৮৬২) নাটকটি পঁয়ত্রিশ পৃষ্ঠার সংক্ষিপ্ত পরিসরে রচিত। সমাজ সংস্কারে বাগাডাম্বরে বিশ্বাসী ব্যক্তিদের সমালোচনা করে ও বিধবা বিবাহকে সমর্থন করে ‘ম্যাও ধরবে কে?’ প্রহসন নাটকটি রচিত। ‘ম্যাও ধরবে কে?’ প্রহসনের ভূমিকায় নাট্যকার লিখেছেন,—“এদেশীয় বিধবাবিবাহ প্রচলনোদ্যোগি-স্বাক্ষরকারীদিগকে উত্তেজনা করণাশয়ে বিগত বর্ষের অগ্রহায়ন মাসে “শুভস্য শীঘ্রং” নামে একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক প্রচারিত হয়। আমি যে সময়ে ঐ পুস্তক প্রচারিত করি, তখন ভরসা করিয়াছিলাম স্বাক্ষরকারীগণ অনতিবিলম্বে আপনাদিগের স্থির প্রতিজ্ঞা প্রদর্শাইয়া এ প্রদেশে বিধবাবিবাহ-প্রথা প্রবর্তিত করিয়া তুলিবেন। এক্ষণে সে আশা অন্তঃকরণ হইতে প্রায় অন্তর্হিত হইয়াছে। স্বাক্ষরকারীগণ যেরূপ দীর্ঘসূত্রিতা অবলম্বন করিয়াছেন, তাহাতে অনুমিত হয়, তাঁহারা কৃতার্থতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে সমর্থ হইবেন না। এই ঘটনাপোলক্ষে এ প্রদেশে সাধারণ্যে যে রূপ চর্চা হইতেছে, এই পুস্তকে তাহাই বর্ণিত হইল।”^{১৬৪}

‘ম্যাও ধরবে কে?’ দুই অঙ্কে রচিত নাটক। প্রতি অঙ্কে দুটি করে গভাক্ষ আছে। প্রথম অঙ্কের প্রথম গভাক্ষে, কমলিনী, কুমুদিনী, সরলা, কামিনী প্রমুখের সংলাপের মধ্য দিয়ে বিধবা বিবাহ প্রসঙ্গে উপস্থাপনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় গভাক্ষে, বিধবা কুমুদিনীর পুনর্বিবাহ সম্পর্কিত মনোভাব প্রকাশিত হয়েছে। দ্বিতীয় অঙ্কের, প্রথম গভাক্ষে বিধবা কুমুদিনীকে বিবাহে শশাক্ষমোহনের অসম্মতি প্রদান। দ্বিতীয় গভাক্ষে বিধবা বিবাহ না হওয়ার সমাজিক কারণ প্রদর্শিত হয়েছে। এ নাটকে দুই পক্ষকে হাজির করেছেন নাট্যকার। একপক্ষ বিধবা বিবাহের পক্ষে, অন্যপক্ষ বিধবা বিবাহের বিপক্ষে। বিধবা কুমুদিনীর পুনর্বিবাহকে কেন্দ্র করে এ নাটকের কাহিনী ঘনীভূত হয়েছে। বিধবা কুমুদিনীকে প্রভাতবাবু, ঈশ্বরবাবু প্রমুখ নব্য যুব সম্প্রদায় পুনর্বিবাহ দিতে উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। অন্যদিকে, বিদ্যাভূষণ, কবিকঙ্কণ প্রমুখ প্রাচীনপন্থী রক্ষণশীলের দল বিধবার পুনর্বিবাহে বাধা সঞ্চার করেছেন।

প্রভাতবাবু গোপনে বিধবা কুমুদিনীর পুনর্বিবাহ বিষয়ে মতামত নিয়ে জানতে পেরেছে সে, শশাক্ষমোহনকে ভালোবাসে। শশাক্ষমোহনও কুমুদিনীকে ভালোবাসে, নাটকের অন্তিমে দেখা গেছে, সমাজ অনুশাসনের ভয়ে, শশাক্ষমোহন বিধবা নারীর পুনর্বিবাহে অসম্মত হয়েছে এবং পালিয়ে এসেছে এই পুনর্বিবাহের সংস্পর্শ হতে। শশাক্ষমোহনের পত্রসূত্রে জানা যায়, অভিভাবক, স্বদেশ ও স্বজন ও সমাজের ভয়ে সে বিধবার বিবাহ হতে বিরত থেকেছে। সে জানিয়েছে অন্য কেউ বিধবা বিবাহ করে দৃষ্টান্ত স্থাপন করলে, সে বিধবা বিবাহে এগিয়ে আসতে পারে।

‘ম্যাও ধরবে কে?’ নাটকের নায়ক শশাঙ্কমোহন ভীরা ও দুর্বল চিত্তের অধিকারী। অন্যদিকে নায়িকা কুমুদিনী যুবতী বিদূষী রূপেই চিত্রিত। কুমুদিনী তাঁর বোন মোহিনীর বিবাবেহ অনুপস্থিত থাকতে চেয়েছে তাঁর কল্যাণ বোধে। কুমুদিনী ভেবেছে শুভকাজে বিধবারা অশুচি, অপবিত্র। এ কারণে তাঁর দুঃখ অন্তঃহীন।

এ নাটকের অন্তিমে প্রভাত মজুমদার, হর, রমেশ, তর্করত্ন প্রমুখের সংলাপে বিধবা বিবাহের সমকালীন প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে নাট্যকার দীর্ঘ এক নাট্যসংলাপ রচনা করেছেন,—“[প্রভাত দড়ায়মান হইয়া] হে সভাস্থ সজ্জনগণ! আপনারা পক্ষপাত পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্মতঃ প্রতিজ্ঞা করিয়া মুক্ত কণ্ঠে বলুন [ন] দেখি, এ প্রদেশের বিধবা বিবাহ প্রচলিত করা উচিত কিনা? যখন কোন বিধবা সোচনীয় বেশে আপনাদের দৃষ্টিপথবর্ত্তিণী হয়, তখন আপনাদের বিধবা বিবাহ প্রচলিত করিতে আত্মিক অভিলাষ জন্মে কিনা?”^{৬৫}

প্রভাতের এই বক্তব্যকে সমর্থন করেছেন মজুমদার। মজুমদার প্রভাতকে সমর্থন করে বলেছেন,—“যথার্থ। যখন আপনারা কোন বালবিধবাকে একাদশী প্রভৃতি ব্রতোপলক্ষে পিপাসায় শুষ্ক কণ্ঠ হইয়া বিষন্ন দবনে জলপানের নিমিত্ত জনক জননীর নিকট কাতরতা প্রকাশ করিতে দেখেন, তখন এ প্রদেশে বিধবা বিবাহ প্রচলিত করিতে আপনাদিগের আত্মিক বাসনা জন্মে কিনা?”^{৬৬}

রমেশ জানিয়েছে,—“(স্বগত) সত্য, সন্দেহ কি।—যখন কোন সম্ভ্রান্ত ফুলদ্রবা [কুলদ্রবা] বিধবা রমণীর ব্যাভিচার বৃত্তান্ত আপনাদিগের কর্ণপথে প্রবিষ্ট হয়, তখন এ প্রদেশে বিধবা বিবাহ প্রচলিত করিতে আপনাদিগের আত্মিক বাসনা জন্মে কিনা?”^{৬৭} হর রমেশের এই মতামতকে সমর্থন জানিয়েছেন অকুণ্ঠচিত্তে। হর বিধবা বিবাহকে সমর্থন করে বলেছেন,—“যথার্থ।—যখন কোন বিধবার ভ্রূণ হত্যা প্রভৃতি উৎকট পাপের মোচনীয় সংবাদ আপনাদিগের শ্রুতিরন্ধ্রে প্রবেশ করে, তখন এ প্রদেশে বিধবা বিবাহ প্রচলিত করিতে আপনাদের একান্ত ইচ্ছা জন্মে কিনা—”^{৬৮} তর্করত্ন মহাশয় এই বক্তব্যের সমর্থন করে বলেছেন,—“(স্বগত) নিঃসংশয়।—যে বিধবা বিবাহ প্রচলিত করিলে এ দেশের অসংখ্য পাপের স্রোত রুদ্ধ হইয়া যাইবে—অসংখ্য বিধবার অশ্রু জল নিবারিত হইয়া যাইবে—অসংখ্য জীবের অকাল মৃত্যু নিরাকৃত হইয়া যাইবে, অসংখ্য কুলকামিণীর ব্যাভিচার আশঙ্কা উন্মূলিত হইয়া যাইবে, এক দেশাচারের অকিঞ্চিৎকর অনুরোধে ঈদৃশী মহোপকারিণী প্রথা প্রবর্ত্তিত করিতে পরান্মুখ থাকা কি আপনাদের উচিত? না বুদ্ধি বিশিষ্ট মনুষ্যের উচিত?”^{৬৯}

বস্তুত বিধবা বিবাহে অগ্রণী ভূমিকা নেবে কে? এই দ্বিধাগ্রস্ততা এবং সাহসী পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন কে? এই প্রশ্ন নাট্যকার তুলেছেন ‘ম্যাও ধরবে কে?’ নাটকে। প্রচলিত প্রবাদকে সামনে রেখে নাট্যকার আলোচ্য নাটকের নামকরণ করেছেন, ‘ম্যাও ধরবে কে?’। ১৮৫৬ সালে বিধবা বিবাহ আইনত পাশ হয়। আর, ‘ম্যাও ধরবে কে?’ নাটক প্রকাশিত হয় ১২৬৯ বঙ্গাব্দে অর্থাৎ ১৮৬১ সালে। অর্থাৎ তখনও বিধবা বিবাহ নিয়ে ছিল সামাজিক ভীতি ও কুণ্ঠাবোধ। সে কথাই এ নাটকে প্রস্ফুটিত হয়েছে। এ নাটকের গদ্যসংলাপে প্রাচীন যাত্রারীতি অনুসৃত হয়েছে।

১৮৬২ সালে প্রকাশিত হয় ‘আইন সংযুক্ত কাদম্বিনী নাটক’। কুশদেব পাল পেশায় আইনজীবী ছিলেন। নাট্যকাহিনীর পাশাপাশি নাট্যকার আইনের নানা প্রসঙ্গ এ নাটকে উপস্থাপিত করেছেন। ‘আইন সংযুক্ত কাদম্বিনী নাটক’ সম্পর্কে নাট্যকার অমৃতলাল বসু তাঁর আত্মকথায় লিখেছেন,—“বটতলার বিখ্যাত পুস্তকবিক্রেতা বেণীমাধব দে’র পুত্র লালবিহারী আমার সহপাঠী ছিল। তাহাদের দোকানে যত উপন্যাস নাটক ছিল, এক একখানি করিয়া বোধ হয় সবগুলিই পড়িয়া ফেলিয়াছিলাম। নাটকের প্রতি আমার বিশেষ টান ছিল। লালবিহারী একদিন দোকান হইতে আমাকে একখানি নাটক পাঠাইয়া দিল,—তাহার নাম ‘আইন সংযুক্ত কাদম্বিনী নাটক’। ভাবিলাম না জানি কি রহস্যই ইহার মধ্যে আছে। Preparatory class -এর মার্শম্যান পাঠ করিয়া কখন যে ওখানা পড়িতে পাইব, তাহার জন্য অস্থির হইয়া রহিলাম। পড়িয়া দেখিলাম,—কথোপকথন ছলে সমস্ত পিনাল্ কোড্‌খানা নাটকে পরিণত করিবার চেষ্টা! বুঝিতে পারিলাম ডাক্তার যদুগোপালের ‘ধাত্রীশিক্ষা’র ধরণটুকুর অনুকরণের ব্যর্থ প্রয়াসের ফলে লেখকের এই বিষম বিড়ম্বনা। Dialogue-এ কিছু লেখা হইলোই তা নাটক হইল, এই ধারণার বশবর্তী হইয়া উকিল-গ্রন্থকার এই নাটক লিখিয়া ফেলিয়াছেন।”^{৭০}

‘আইন সংযুক্ত কাদম্বিনী’ নাটকের কাহিনীতে দেখা যায়, রমণীমোহন সদানন্দের মাতৃশ্রাদ্ধে উপস্থিত। গদাধর সেনের বিধবা কন্যা কাদম্বিনী, রমণীমোহনকে ঠাকুরদাদা বলে সম্বোধন করে। কাদম্বিনীর যে বছর বিবাহ হয়, সেই বছর বিধবা হয়। কাদম্বিনী তার বৈধব্য দশা ও যৌবনের ধর্মকে আড়াল করতে পারেনি। কাদম্বিনী রমণীমোহনকে কটাক্ষের দ্বারা আকর্ষণ করে। রমণীমোহনও সুন্দরী কাদম্বিনীর প্রতি আকৃষ্ট হয়। বিধবা কাদম্বিনী যৌবনধর্মে চঞ্চল হয়ে ওঠে,—

“রজনী হইল যবে, ঘন্টা নয় দশ।

অদর্শনে উভয়ের, শূন্য দিক্ দশ।।

রমণীমোহন ভাবে, একি সর্বনাশ।

কামিনীর হেরি বুঝি, দেহ হয় নাশ।^{১১১}

অন্যদিকে রমণীমোহনের চিত্ত কাদম্বিনীকে পাওয়ার জন্য উদ্গীৰ্ণ হয়। কাদম্বিনী ও রমণীমোহন উভয়েই পরস্পরের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ে। সুযোগ বুঝে দুজনেই পরস্পরের সান্নিধ্য পাওয়ার চেষ্টা করে। নানা অছিলায় কাদম্বিনী রমণীমোহনকে নিজগৃহে নিয়ে আসে। পরস্পরের ব্যকুলতা বিরহে পরিণত হয়।

রমণীমোহন তারকেশ্বরে পূজো দেয়। বাড়ী ফিরে কাদম্বিনীর অদর্শনে দিনাতিপাত করে, বিরহ যাপন করে। রমণীমোহন অস্থির হয়ে পুণরায় সদানন্দের বাড়ীতে আসে। কাদম্বিনীও রমণীমোহনের দর্শন পেয়ে আহ্লাদিত হয়। রমণীমোহন, কাদম্বিনীর মনোভাব জিজ্ঞাসা করলে কাদম্বিনী ছলনা করে। কাদম্বিনী ইচ্ছাকৃত ভাবে রমণীমোহনের ব্যকুলতা বাড়িয়ে দেয়। রমণীমোহন কাদম্বিনীকে কাছে পেয়ে, নিবিড় করে পেতে চায়। কিন্তু কাদম্বিনী নিজের মনের ইচ্ছা গোপন করে, রমণীমোহনের মনকে যাচাই করে নেয়। কাদম্বিনীর কথায় আদিম যৌন ইচ্ছা জাগ্রত হয়। কিন্তু কাদম্বিনী সংকুচিত ও শঙ্কাগ্রস্থ হয়ে জানায়,—“...তা ভাই হবে না সে আশা ছাড় দেখে শুনে যে ভয় হয়, বিশেষ তাও যা হোক একটা দায় ভারি শক্ত, সেবার বড় বাড়ীর মেজো কর্তার মেয়ে ৫/৬ মাস চুপি চাপে রেখে শেষ ফেলবার জন্যে কত লাঞ্ছনা সে কথা বলবার নয়, তা মনে কল্পে গা সিউরে ওঠে, গায় জ্বর এসে।”^{১১২} বস্তুত উনিশ শতকের বহু ঘরেই এই ধরনের ভ্রণহত্যা ঘটে থাকত। বিধবা নারীরা আদিম ইচ্ছার বশীভূত হয়ে পুরুষ সঙ্গমে লিপ্ত হত। পরবর্তীতে, সন্তান ধারণ করলে ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত ভ্রণহত্যার মত পৈশাচিক কাজে লিপ্ত হত।

কুশদেব পাল তাঁর ‘আইন সংযুক্ত কাদম্বিনী নাটকে’ এ ধরনের নারকীয়তার ইঙ্গিত দিয়েছেন। কাদম্বিনী ও রমণীমোহনের মিলন ইচ্ছার ফলস্বরূপ সন্তান ধারণের আশঙ্কায় কাদম্বিনী ভীত হলে ভবিষ্যতে রমণীমোহন তার প্রতিকার স্বরূপ জানিয়েছে,—“তুমি যেই জন্য ভাব্চ? তার জন্যে ভয় কি আমি পাঁচ সাত রকম ঔষধ জানি, তা আর ভাব্তে হবে না, একটা শুনবে? অফুলো কদমের বিচি সওয়া ছগুণা, আর নিম্বুল করবীর শিকড়, আর খাসী ছাগলের দুধ দিয়ে বেটে চারি দিনের দিন খেলে, এ জন্মে আর সে ভোগ ভুগতে হবে না।”^{১১৩} অর্থাৎ বিধবা কাদম্বিনী বাঁজা রমণীতে পরিণত হবে।

কিছুদিন পর কামার্ত রমণীমোহন রাত এগারোটার সময় নানান ফন্দি এঁটে সকলের অলক্ষ্যে কাদম্বিনীর ঘরে প্রবেশ করে ও তার মনোভাব জানতে চায়। কাদম্বিনী রিপূর কাছে হার

মানে ও ধর্মরক্ষায় অসমর্থ হয়। রমণীমোহন ও কাদম্বিনীর মিলন হয়। পাঁচ দশ দিন অন্তর অন্তর তাদের মিলন ঘটে। এইভাবে রমণীমোহন ও কাদম্বিনী দীর্ঘ চার পাঁচ বৎসর একসঙ্গে রাত্রিবাস করে। ইতিমধ্যে কাদম্বিনী মামার বাড়ী গেলে সেখানেও রমণীমোহনের সাক্ষাতে কাদম্বিনীর সম্ভোগসুখ ঘটে। কিন্তু রমণীমোহনের ধীরে ধীরে মনের পরিবর্তন ঘটতে শুরু করে। রমণীমোহনের লোকনিন্দার ভয়, আলস্য সবকিছুই ধীরে ধীরে কাদম্বিনীর প্রতি আকর্ষণ কমিয়ে দেয়। রমণীমোহন কাদম্বিনীর সঙ্গসুখ চায় ঠিকই কিন্তু তাকে নিজগৃহে আশ্রয় দিতে চায় না। কাদম্বিনী রমণীমোহনের প্রতি পুরোপুরি সমর্পিত হলেও চতুর রমণীমোহন শুধুমাত্র দৈহিক চাহিদা চরিতার্থ করার জন্য লালায়িত হয়।

একদিন রমণীমোহনের গৃহে পূজা উপলক্ষ্যে কাদম্বিনী উপস্থিত হলে, নির্জনে তাদের সাক্ষাৎ হয়। সেইস্থানে রমণীমোহনকে কাদম্বিনী জানায়,—“...এখন একটু ঠাঁই দেওগে তোমার নিকট থাকি।”^{৭৪} কিন্তু রমণীমোহন সংকুচিত। স্বগতঃ ভাষণে রমণীমোহনের কাদম্বিনীকে প্রত্যাখ্যানের কথা জানিয়েছে। চতুর রমণীমোহন কাদম্বিনীকে সান্ত্বনা দেয় ও সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার আশ্বাস দিয়ে বিদায় নেয়। অতঃপর রমণীমোহনের মিথ্যা আশ্বাসের ফলস্বরূপ কাদম্বিনীর গৃহত্যাগ করে,—

“এখানেতে কাদম্বিনী, হইয়া অস্থির।

বোচ্কা বিড়ে বেঁধে ধনী, হইল বাহির।”^{৭৫}

কাদম্বিনী মাঝরাতে রমণীমোহনের উদ্দেশ্যে ঘরের বাইরে বের হয়। নাপেতানীর সাহায্য প্রার্থনা করে কাদম্বিনী। কিন্তু নাপেতানী তাকে সাহায্য না করে বাড়ী ফিরে যেতে অনুরোধ করে। কাদম্বিনী নাপেতানীর অনুরোধ উপেক্ষা করে বৈষ্ণবীর সাহায্য প্রার্থনা করে। কিন্তু বৈষ্ণবীও কাদম্বিনীকে ঘরে ফিরে যাবার অনুরোধ জানায়। কাদম্বিনী নাছোড়বান্দা। কিছুতেই কাদম্বিনী ঘরে ফিরে যাবার কথা চিন্তাই করতে পারে না। রমণীমোহনই কাদম্বিনীর সর্বস্ব। তাই রমণীমোহনের আশ্রয়েই সে বাঁচতে চায়। বৈষ্ণবী কাদম্বিনীকে বলে যে জাত কুল মান খোয়ালেও যদি বাপের গৃহে ফিরে যাওয়া যায়, তবে অন্তত তার ভবিষ্যত কষ্ট কিছুটা হলেও কম হবে। অন্ন সংস্থান হবে। মাথার উপর ছাদ থাকবে ও জীবনের সুরক্ষা থাকবে। বাড়ীর বাইরে তার একান্ত অভাব হওয়াই স্বাভাবিক। বৈষ্ণবীর কথায় তৎকালীন সমাজের কঠোর বাস্তব দিকটি ফুটে উঠেছে।

কাদম্বিনী বৈষ্ণবীর কথায় কর্ণপাত করে না এবং রমণীমোহনের কাছে যায়। ভীতু ও স্বার্থপর রমণীমোহন লোকনিন্দার ভয়ে কাদম্বিনীকে নিজের কাছে এনে রাখে না বরং বৈষ্ণবীর

ঘরে থাকতে বলে,—“...এখন আমি বলি কি সেই বৈষ্ণবীর বাটীতে দিনকতক কাটাও পরে বিবেচনা করা যাবে নৈলে এখন এখানে আনলে আমার বড় বদনাম হতে পারে।”^{৭৬} স্বার্থপর রমণীমোহনের প্রতি সরল কাদম্বিনী নিজপ্রাণ মন সঁপেছে। কাদম্বিনী জানায়,—“আপনার যা ইচ্ছে হয়, আমাকে বৈষ্ণবীর বাড়ি রাখুন আর জলে রাখুন, বা জঙ্গলে রাখুন, যেখানে রাখেন সেইখানেই থাকব, এখন আমি কষ্ট পাই সেও ভাল তাতে হানি নাই, ফলে আপনার কোন রকমে কষ্ট না হয় তাই করণ।”^{৭৭}

বস্তুত উনিশ শতকের সমকালীন সমাজ ব্যবস্থায় একজন নারীর কাছে তার স্বামীই সর্বস্ব। মৃত স্বামীর ভাৰ্য্যা হয়ে গোটা জীবন কাটানো একজন নারীর পক্ষে বেদনাদায়ক। ফলত, চোখে পড়ে বিধবাদের চারিত্রিক স্থলন। বিধবা রমণীর ঠাই হয় অন্যত্র। যারা খোঁজে তার প্রিয় মানুষটির আশ্রয়, খুঁজে নিতে চায় তার সুখ। তাতে যদি বিধবা নারীর সর্বস্ব লুপ্ত হয় তাতেও সে সুখী। কাদম্বিনীও ঠিক তাই। রমণীমোহনের প্রতি কাদম্বিনী প্রবল নির্ভরতায় সমর্পিত। তাই কাদম্বিনীর নিজ দুঃখকে ছাপিয়ে বড় হয়ে উঠেছে রমণীমোহনের সম্মান।

মাস দুয়েক পর কাদম্বিনীকে নিয়ে রমণীমোহন নগরের অন্যত্র একটি বাড়ীতে বসবাস শুরু করে। কাদম্বিনীর সঙ্গে প্রথম কয়েকদিন বেশ ভালোই কাটে রমণীমোহনের। কিন্তু পাঁচ ছয় মাস পর থেকেই রমণীমোহনকে লোকমুখে নিজ অপমান শুনতে হয়। বিরক্ত রমণীমোহন কাদম্বিনীর সঙ্গে থেকে বেরিয়ে আসতে চায়। তাই কাদম্বিনীকে অন্যত্র রাখবার ফন্দি আঁটে। সরল কাদম্বিনীর মন রমণীমোহনকে অন্ধবিশ্বাস করে বাঁচতে চায়,—“সে কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করাই বাহুল্য, পূর্বের বলাই আছে, আমি কষ্ট পাই হানি নাই, আপ্নি যাতে কষ্ট না পান তাই করবেন।”^{৭৮}

রমণীমোহন কাদম্বিনীর সঙ্গে খুব তাড়াতাড়ি সাক্ষাৎ করবে বলে জানায়। ইতিমধ্যে কাদম্বিনীর সঙ্গে প্রতিবাসিনী জগদম্বার সাক্ষাৎ হয়। জগদম্বাকে কাদম্বিনী জানায় যে সে রসিকগঞ্জে ভগীময়রাণীর বাড়ীতে কিছুদিন থাকবে। ভাগ্যবিড়ম্বিত জগদম্বা সরল কাদম্বিনীকে সতর্ক করে বলে যে, সে যেন রসিকগঞ্জে না যায়, তাহলে কাদম্বিনী রক্ষা পাবে। জগদম্বার কথা বুঝতে পেরে কাদম্বিনী ভয় পায় ও সাবধান হয়। কাদম্বিনী রমণীমোহনের ফন্দি বুঝতে পেরে গহনা ও নানান দামী দামী জিনিস দাবী করে তার কাছে। ধূর্ত রমণীমোহন কাদম্বিনীর চালাকি বুঝতে পারে। কাদম্বিনীর প্রতি ক্ষিপ্ত রমণীমোহন কাদম্বিনীকে উপেক্ষা করে। রমণীমোহনের অভিসন্ধি সিদ্ধ না হওয়ায়, সে কাদম্বিনীকে শুধুমাত্র অনবস্থ দেওয়ার কথা স্বীকার করে। মাসিক ৩ টাকা

দিয়ে রমণীমোহন কাদম্বিনীর প্রতি দায়িত্ব পালন করবে বলে জানায়।

ভালোবাসার মোহে, জীবন উপভোগের তাগিদে কাদম্বিনী কুলমান খুইয়ে রমণীমোহনের হাত ধরে বাইরে বেরিয়ে এসেছে। সেই রমণীমোহনই যখন কাদম্বিনীর প্রতি বিমুখ হয়েছে তখন কাদম্বিনীর দুঃখ অপারিসীম হয়ে দাঁড়িয়েছে। নাট্যকার কুশদেব পাল ভণিতার চঙে লিখেছেন,

—“কুশদেব বলে ধনী, কাঁদিলে কি হবে।

কুল খেয়ে আসিয়াছ, কুল নাহি পাবে।।”^{৭৯}

প্রতিবেশী জগদম্বার পরামর্শে ভাগ্যবিড়ম্বিত কাদম্বিনী উকিলের দারস্থ হয়। উকিলের পরামর্শমত কাদম্বিনী দেওয়ানীতে নালিশ করে। দেওয়ানীতে নালিশের আরজীর মুসাবিদা অনুযায়ী কাদম্বিনী রমণীমোহনের কাছে প্রতিমাসে ১০ টাকা করে মাসিক খরচের দাবী করে। কিন্তু তাতেও কোন সুরাহা হয় না। কাদম্বিনী বুঝতে পারে যে, রমণীমোহনকে আর কোনভাবেই ফেরানো সম্ভব নয়। কাদম্বিনীর শরীর জীর্ণ হয়ে আসে। এদিকে জগদম্বা কাদম্বিনীকে বোঝায় যে,—“...তুই যদি বেঁচে বর্ত্তে থাকিস্ আর যদি মনে করিস তবে তার মত কত বাবু এই দ্বারে গড়াগড়ি যাবে।”^{৮০} কিন্তু কাদম্বিনী রমণীমোহনের প্রতি অধিক আসক্ত। যৌবন রিপূর তাড়নায় বিধবা কাদম্বিনী পরকীয়ায় লিপ্ত হতে বাধ্য হয়েছে। পরকীয়ায় সর্বস্ব হারিয়েছে কাদম্বিনী। নিঃসঙ্গ বিধবা কাদম্বিনীর পরিণামের মধ্য দিয়ে তৎকালীন সমাজের বহু অসহায় বিধবা রমণীর প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে।

১৮৬২ সালে প্রকাশিত হয়, গুরুপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘পুনর্বিবাহ নাটক’। এনাটকের কাহিনী শুরু হয়েছে, একটি নারীর ঋতুমতী হওয়ার পর স্বামী দ্বারা পুনঃগ্রহণের উৎসবের মধ্য দিয়ে। উনিশ শতকের যুগ পরিবেশে দেখা যেত, বাল্য বিবাহের পর কন্যা পিতৃগৃহে অবস্থান করতেন। কন্যা যৌবনবতী হলে তথা ঋতুমতী হলে তাঁকে স্বশুর গৃহে পাঠানো হত। হিন্দু সমাজে বিবাহের পর নারী প্রথম ঋতুমতী হলে তাঁকে ঘিরে স্বামী দ্বারা পুনঃ গ্রহণের অনুষ্ঠান হত। এই অনুষ্ঠানকে ঘিরে পাড়া-প্রতিবেশী বিবাহিত-অবিবাহিত মহিলারা জড় হতেন, হাসি-ঠাট্টা আনন্দে মসগুল হতেন, রসসম্ভোগ করতেন। গায়ে হলুদ, সিঁদুর দান সবকিছুতে অংশ গ্রহণ করতেন হিন্দু বিবাহিত রমণীরা। বিধবা নারীরা এধরনের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে পারতেন না। তাঁদেরকে অমঙ্গলের দ্যোতক হিসাবে দেখা হত। দূর থেকে বিধবা রমণীরা এধরনের অনুষ্ঠান দেখতেন এবং মনে মনে আক্ষেপ করতেন। তেমনই এক দৃশ্যকে নাট্যকার এখানে উপস্থিত করেছেন। বিধবা রমণীরা তাঁদের বঞ্চিত জীবনের কথা স্মরণ করে আক্ষেপ করতেন। অপূর্ণ

যৌনতার আখ্যানকে নাট্যকার দৃশ্যকাব্যে তুলে ধরেন।

‘রাঁড়ের বে’র ব্যবস্থা দিয়েছেন বলে, বিদ্যাসাগর বিধবা রমণীদের কাছে বাহবা পেয়েছেন। অক্ষর পরিচয়হীন অশিক্ষিত বিধবা নারী বিলাসবতী। সে বিদ্যাসাগর নামটি ঠিক ভাবে উচ্চারণ করতে পারে না। স্বামীর অবর্তমানে সে একাদশী পালনে অরুচি প্রকাশ করে। জ্ঞানচক্ষু উন্মিলিত হবার পূর্বেই সে তার স্বামীকে হারিয়েছে। বৃদ্ধ স্বামী তাঁর কাছে শৈশবের এক ঝাপসা স্মৃতি। মনের কোথাও তাঁর স্বামীর কোনো অস্তিত্ব নেই। তার মনে প্রশ্ন জাগে, স্বামী মানেই যদি একাদশীর নির্জলা উপবাস, বিবর্ণ সাদা কাপড়, তেলহীন শুষ্ক চুল, মাস্টলিক অনুষ্ঠানে প্রবেশের বাধানিষেধ তাহলে সে স্বামীকে কেন স্মরণ করার চেষ্টা। বাল বিধবা বিলাস জানিয়েছে, —“এই যে আমার ভাতার বের হল্‌দে কাপড় না ঘুচতে ঘুচতেই পটল তুললো, তা কি করবো বল? এ বলে কি দিবারাত্রি কেঁদে কেঁদে শরীর খোয়াব।”^{৮১}

বিধবা বিবাহের সমর্থনে মধুসূদন দত্তের সুহৃদ গৌরমোহন বসাক ১৮৬২ সালে লেখেন ‘অশুভ পরিহারক’ নামক প্রহসন। ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে ঢাকা থেকে প্রকাশিত ‘অশুভ পরিহারক’ প্রহসন। অধুনা দুস্ত্রাপ্য এই প্রহসনের উল্লেখ সমালোচক অশোককুমার মিশ্রের ‘বাংলা প্রহসনের ইতিহাস’ গ্রন্থে মেলে। ৫১ পৃষ্ঠার বড় মাপের এই প্রহসনে গৌরমোহন, নীতিবাগীশের ভূমিকা নিয়েছেন। বাল্য বিধবাদের নিয়ে সমাজে যে ব্যভিচার এবং অবিচার বাংলার নারী সমাজের সবচেয়ে বড় দুঃখের কারণ ছিল, এই প্রহসনটিতে হাস্যরসের মাধ্যমে তাই বিন্যস্ত হয়েছে। কাহিনীটি সংক্ষেপে নিম্নরূপ—মহেন্দ্র, মহিম আর উপেন্দ্র তিন শিক্ষিত যুবক রাজপথে চলতে চলতে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতে থাকে—ধর্মধ্বজী সমাজপতিরা বিধবা বিবাহের প্রতিবাদ করে চলেছে; কারণ বিধবা-বিবাহ চালু হয়ে গেলে ‘অনেকের রাসলীলা সম্বরণ’ হয়ে যাবে। প্রসঙ্গত উঠেছে এক সমাজপতি শ্যামচাঁদের কথা। তার দশ বছরে বিধবা-হওয়া-কন্যা যুবতী হয়ে গর্ভবতী হয়েছে বৈরাগী বাবাজীর দ্বারা। পাড়ার লোকেরা সব জানতে পেরে বৈরাগীর উপর চড়াও হয়। টাকা দিয়ে বৈরাগী সমস্যার সমাধান করে।

এরপর দেখানো হয় এক ভদ্রলোকের বিধবা কন্যা বিশাখা মুসলমানের সঙ্গে গৃহত্যাগ করে চলেছে। উপেন্দ্র জানিয়েছে, “বিদ্যাসাগরের মহাশয়ের শাস্ত্রে যে রূপ বিধি দর্শিয়েছেন তদ্রূপ হলে কি ওর এরূপ যত্নগা ভোগ করতে হোত,...”^{৮২} এখানে এক বিদ্যাভূষণের পরিচয় দেওয়া হয়েছে। যিনি বিদ্যাশূন্য মানুষদের কাছে বিধবা বিবাহের বিরুদ্ধে নিজ মত প্রকাশ করে নিজেকে পণ্ডিত বলে জাহির করে। বিধবা বিবাহের সমর্থক অথচ কাজের সময় উৎসাহহীন

কিছু মানুষের বিরুদ্ধেও ব্যঙ্গ করা হয়েছে। এবং পরিশেষে উপদেশ দেওয়া হয়েছে, বিধবাবিবাহের বিরোধিতা রূপ অশুভ পরিহার করে বিধবাবিবাহ রূপ শুভকে গ্রহণ করার জন্য। প্রহসনে হাস্যরসের যোগান দিয়েছে কিছু তির্যক অর্থবোধক ছড়া,—এগুলি অধিকাংশই সমাজে সাধু সেজে যারা ঘুরে বেড়ায় তাদের ছদ্মবেশের মুখোশ উন্মোচন প্রয়াসে উক্ত,—

সমাজপতি প্রসঙ্গে,—“লোকে বলে সাধু সাধুতা ত ভারি।

পাইলে পরের ধন ছলে লয় হরি।”

বৈরাগী প্রসঙ্গে,—“মুচির পুত্র শুচি হয় যদি কপ্পি ধরে।

বেশ্যারাও পূজ্যা হয় শেষ অবতারে।।”^{১০}

অশোক কুমার মিশ্র আরো জানিয়েছেন, ১৮৬৩ সালে প্রকাশিত হয় গোবিন্দচন্দ্র চক্রবর্তীর ‘অশুভস্যকালহরণং’ নাটক। এ নাটকে উঠে এসেছে বিধবার সংকট প্রসঙ্গ। যদিও দুষ্প্রাপ্য এ নাটকের আমরা সন্ধান পাইনি। এই নাটকটিকে আলোচনার বাইরে রেখেছি।

যদুনাথ চট্টোপাধ্যায় ছিলেন উনিশ শতকের বিশিষ্ট লেখক। বহু গল্প উপন্যাসের রচয়িতা তিনি। যদুনাথ চট্টোপাধ্যায় রচিত ‘বিধবা বিলাস নাটক’ নাটক প্রকাশিত হয় ১৮৬৪ সালে। নাটকটি মুদ্রিত হয় শ্রীযুক্ত বেহারিলাল দত্ত দ্বারা শ্রীরামপুর ফ্রেণ্ড যন্ত্রালয়ে। মূল্য দশ আনা। ‘বিধবাবিলাস নাটকে’ তিনি সমকালীন এক সমাজ সত্যের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। বিধবা বিবাহ আইনত স্বীকৃত হলেও সমাজে বিধবা বিবাহ নিয়ে সংকোচ ছিল পুরোমাত্রায়। ‘বিধবা বিবাহ’ আইনত স্বীকৃতি পাবার আট বছর অতিক্রান্ত হলেও বিধবা নারীরা সেভাবে পুনর্বিবাহে আগ্রহ প্রকাশ করেননি এবং সমাজ মানসিকতার বদলও সেভাবে হয়নি।

‘বিধবা বিলাস’ নাটকের ভূমিকায় বলা হয়েছে,—“বিধবা বিবাহ প্রস্তাব এক্ষণে অনেকের উচ্ছিষ্ট গলিত বিশ্বাদ ও দুর্গন্ধবিশিষ্ট বোধ হইয়াছে। এবং এতৎ প্রস্তাব উপলক্ষে দেশীয় পণ্ডিতবর্গের সহিত শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহোদয় শাস্ত্রীয় বিচার প্রসঙ্গে প্রবর্ত হইয়া তাঁহাদিগের বহুতর আপত্তি খণ্ডনপূর্বক যথার্থ মীমাংসা দ্বারা বিধবাবিবাহ যে শাস্ত্রসম্মত তাহা নিশ্চয়রূপে প্রমাণ করিয়াছেন। কিন্তু এবিষয়ে শাস্ত্রসম্মত সপ্রমাণ হইলেও অদ্যাপি সর্ব সাধারণ ব্যক্তিগণের মন হইতে যে এতৎ প্রস্তাব উপলক্ষে সমুদায় কুসংস্কার দূরীভূত হইয়াছে এমত বিবেচনা হয়না। সুতরাং এবিষয় পুনর্ব্বার আন্দোলন করণের বিশেষ প্রয়োজন দৃষ্ট হইতেছে, কারণ এই গুরুতর বিষয়ে প্রচলিত না হওয়াতে আমাদের যে বহু প্রকার অমঙ্গল ঘটিতেছে এবং আমাদের সুখ সৌভাগ্যের সমূহ হানি হইতেছে এবং এই শুভকরী প্রথা প্রচলিত

হইলে যে বিশেষ কোন অনিষ্ট না ঘটয়া পূর্বোক্ত অশেষ দোষের মূলোৎপাটিত হইবে যাহা পূর্ব সাধারণ ব্যক্তিগণের মনে নিশ্চয়রূপে প্রচলিত না হওয়া পর্য্যন্ত সহসা এ বিষয়ে কেহ হস্তক্ষেপণ করিতে উদ্যত হৈবেন না...যদিও অনেক নাটক না-টক, না-মিষ্ট এখন যেরূপ না-টক না মিষ্ট হইয়া পাঠকবর্গের-অরুচিত সুরচিজনক হইলে শ্রম সকল জ্ঞান করিব।^{১৮৪} ‘বিধবাবিলাস’ নাটকের শুরুতে নাট্যকার একটি প্রস্তাবনা যুক্ত করেছেন। প্রস্তাবনা অংশে রয়েছে প্রজাপতির বন্দনা। সংস্কৃত নাট্যরীতি অনুসারে সূত্রধার ও নটীর মাধ্যমে নাটকটির পটভূমি রচিত হয়েছে।

যদুনাথ চট্টোপাধ্যায়ের ‘বিধবাবিলাস’ নাটকটি ছয়টি অঙ্কে বিন্যস্ত। প্রথম অঙ্কে কোনো গর্ভাঙ্ক নেই। দ্বিতীয় অঙ্কে দুটি, তৃতীয় অঙ্কে দুটি, চতুর্থ অঙ্কে দুটি পঞ্চমাঙ্কে তিনটি এবং ষষ্ঠাঙ্কে পাঁচটি গর্ভাঙ্ক রয়েছে। ‘বিধবাবিলাস’ নাটকে একাধিক বিধবা চরিত্র স্থান পেয়েছে। উল্লেখযোগ্য বিধবা চরিত্রেগুলি হল,—সুমতি, সুনীতি, সাবিদ্রী, সুশীলা, সতী, পতিব্রতা প্রভৃতি। উক্ত চরিত্রেরা প্রত্যেকেই পুনর্বিবাহে উৎসাহী। এ নাটকে এমন কয়েকজন বিধবা চরিত্রকে স্থান দেওয়া হয়েছে যাঁরা, পদস্থলনে গর্ভবতী হয়েছেন। পদস্থলিত এই বিধবা চরিত্ররা হলেন,—বিলাসিনী, রঙ্গিনী, কাঞ্চনী, রসবতী প্রভৃতি। এছাড়া রয়েছে, বাঞ্জুরাম বন্দ্যোপাধ্যায়, কুলপ্রদীপ মুখোপাধ্যায়, কুলতিলক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। এরা প্রত্যেকেই বিধবা নারীদের পিতা। মিহেরাম বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিদাস ভট্টাচার্য প্রমুখ হলেন, বিবাহ প্রার্থী বর। এছাড়া রয়েছে, দেশাচার (রাজা), যুক্তিশূন্য ভট্টাচার্য (রাজমন্ত্রী), মদন (প্রতিবাসী) প্রমুখ।

বাঞ্জুরামের দুই বিধবা কন্যা সুমতি ও সুনীতি। একাদশী ব্রত পালতে সুমতি ও সুনীতির জীবন মৃতপ্রায়। একাদশীর হতাশনে তাদের হৃদয় জ্বলেছে। চোখের জল শুকালেও অন্তরে বাহিত হয়েছে অশ্রুধারা। বয়সোচিত যৌবনধর্মে গ্রীষ্মের প্রখরতার মতই যৌবন জ্বালা তাড়া করেছে। একাদশীর কৃচ্ছ্রতায় সুনীতির বাঁচবার ইচ্ছেটা ক্রমশ হারিয়ে গেছে,—

“সদা জ্বলছে যেন, অগ্নিসম আমারও অন্তর।

জলবিনে নয়নে বহে নিরন্তর।।

অঙ্গক্ষীণ অন্নবিনে, আর যে বাঁচিতে প্রাণে,

একাদশী হতাশনে, শুখাচ্ছে কলেবর।^{১৮৪}

সুনীতি ও সুমতি দুই বোন একাদশীর যন্ত্রনা ঘোচানোর উপায় খুঁজতে চায়। তাই তারা গঙ্গাজল পাতানো সইয়ের সঙ্গে পরামর্শের কথা ভাবে। অন্যদিকে কুলপ্রদীপ মুখোপাধ্যায়ের চার কন্যা সাবিদ্রী, সুশীলা সতী ও পতিব্রতা—চারটি কন্যার বিধবা রূপে দক্ষ হওয়ার পরেও গৃহিনী তাঁর

ছেলের বৌ এর মুখ চেয়ে শান্ত হয়ে সুখী হবার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু বিধাতা একমাত্র ছেলেকেও কেড়ে নিয়েছে। যার ফলে চারটি কন্যা ও তার একটি বৌমার ভয়ঙ্কর বৈধব্যদশায় নিরন্তর জ্বলেপুড়ে দগ্ধ হয়েছেন। বিধবা কন্যাগণ ও পুত্রবধূর কঠিন একাদশীর ব্রত পালন দেখে সধবা গৃহিনীর গলা দিয়ে অন্ন নামেনি। ভালোমন্দ খাবারে মুখ দিতে গিয়ে অশ্রুজলে সিক্ত হয়েছেন।

সাবিত্রী, সুশীলা, সতী ও পতিব্রতাকে তাঁর পিতা কুলীন ব্রাহ্মণের হাতে পাত্রস্থ করেছেন। কিন্তু বালিকা অবস্থায় তারা বিধবা হয়। সমস্ত পার্থিব সুখ থেকে বঞ্চিত হয় তারা। কিন্তু যৌবনকালে তাদের রূপের ছটায় ঘর আলোকিত। কিন্তু বিধির বিধানে একাদশী পালন তাদের কর্তব্য। তাই মা হয়ে এ দুঃখ বহন করা অতি কষ্টের। বস্তুত গৃহিনীর হৃদয়বিদারী দুঃখ তৎকালীন সমাজের বহু পিতামাতার হৃদয় নিঙড়ানো দুঃখের প্রতিবিশ্ব। যদুনাথ চট্টোপাধ্যায় তাঁর ‘বিধবাবিলাস নাটকে’ বিধবা কন্যাদের মাতা তথা কুলপ্রদীপ মুখোপাধ্যায়ের স্ত্রীর হৃদয় বিদারিত কান্নার মধ্য দিয়ে কন্যাদের দুর্দশাকে অসামান্যভাবে তুলে ধরেছেন,—

“পাইলে কুলীন বর, হয়ে অতি তৎপর,

অবিলম্বে দিলেন বিবাহ।

.....

কি কব রূপের কথা, মেয়েগুলি স্বর্ণলতা,

সুবর্ণ নিন্দিত যেন বর্ণ।

.....

নাহিক রূপের সীমা, এসব স্বর্ণ প্রতিমা,

বিধি গড়েছিল কার জন্য।

একাদশী দিনে সবে, কিরূপে এ দুঃখ সবে,

এই ভেবে হই জ্ঞানশূন্য।”^{৮৫}

সুনীতি ও সুমতি তাদের সখীদের সঙ্গে দেখাকরে নিজ নিজ মনোভাব ব্যক্ত করেছে। মহাভারত-রামায়ণ ইত্যাদি ধর্মগ্রন্থের প্রতি একাগ্রতা থাকাটাই বিধবাদের ধর্মীয় শুদ্ধি। কিন্তু সুনীতি ধর্মশাস্ত্রে মন দিতে পারেনি। গ্রীষ্মের দাবদাহে পিপাসার্ত সুনীতির প্রাণ ওষ্ঠাগত। অন্যদিকে নির্জনতা একাকিত্বে বয়সোচিত যৌবনধর্মে বিধবা কুলবালার প্রাণ বসন্ত আগমনীর সুরে সর্বদা

জ্বলেছে। যৌবনতৃষ্ণায় কুলবালা ক্ষণে ক্ষণে চমকিত হয়েছে। বিধবা সাবিদ্রী কুলপ্রদীপের জ্যেষ্ঠ কন্যা। ষোল বছর বয়সে এক কুলীন ব্রাহ্মণের সঙ্গে তার বিয়ে হয়। কিন্তু সর্প দংশনে বৃদ্ধের আয়ুক্ষয় ঘটে। সাবিদ্রীর প্রাণ তাঁর ছোট বোনদের জন্য সতত কাঁদে। সাবিদ্রীর মত সুমতী ও সুনীতি নারী জন্মকেই দুঃখের জন্ম বলতে বাধ্য হয়েছে। তাঁরা বলতে বাধ্য হয়েছে যে—যদিও বা জন্ম হয় কুলীন ঘরে জন্ম নয়। সরলতা বিধবা হবার পর তাঁর পছন্দের সাজগোজ বাক্সবন্দী হয়েছে। আক্ষেপকরে সরলতা বলেছে,—

“আমরা বিধবা রামা, হয়েছে ঢাকের বামা,
নাহি লাগি কোন শুভ কায়ে।”^{৮৬}

বিধি যেন নির্জর্জনে বসে অনেক যত্নে সুনিপুণভাবে গড়ে তুলেছে সতীকে। কিন্তু একাদশীর কালনাগ সে রূপের মধ্যে বিষ ঢেলে চলেছে। কাম দহনে হৃদয়ে সতত বয়ে চলেছে ঝড়,—

“কান্ত বিনে রতিকান্ত, দিতেছে যন্ত্রণা।

কিরূপে বাঁচিবে বল, বিধবা ললনা।।”^{৮৭}

বিরহ যাতনা, মদন জ্বালায় বিধবাদের জীবন মৃতপ্রায়। আদিম রিপূর কাছে নিষ্ঠার বারংবার পরাজয়ের পর ক্ষুব্ধ বিধবা কন্যাদের অভিযোগ মদনের বিরুদ্ধে। কিন্তু সুমতি জানে, পরাশরসংহিতায় বিধবাদের বিবাহের উল্লেখ আছে। বিধবাদের হিতৈষী বিদ্যাসাগর মহাশয় বিধবা বিবাহের পথ উন্মোচিত করলেন। বিধবা বিবাহের বিপক্ষে তুমুল ঝড় উঠলেও দু-একটি বিধবা বিবাহ হয়। কিন্তু হিন্দু মতব্বরেরা বিধবা বিবাহ প্রদানকারী পরিবারকে হয় একঘরে করেছে নয়ত বা দেহশুদ্ধি করেছে। ফলে বিধবা বিবাহের প্রতি মানুষের ভীতি জন্মেছে। বিধবাদের বদলে যাওয়া সৌভাগ্য, ক্রমে দুর্ভাগ্যে রূপান্তরিত হয়েছে। সুমতির কথায়,—

“একঘোরে হোল কেহ, কারো সুদ্ধ হয় দেহ,

চান্দায়ণ প্রায়শ্চিত্ত কোরে।

হায়২ একি দুঃখ, বিধবার হর্ষমুখ

মলিন হইল একেবারে।।”^{৮৮}

কামানলে দগ্ধ হওয়া বিধবা রমণীদের আক্ষেপ এই যৌবনকাল নিয়ে। তাই তারা প্রত্যেকে মদনের অর্থাৎ কামানলের জ্বালা থেকে নিজেদের মুক্তির কথা ভাবে। সাবিদ্রী, সুনীতি, সুমতি, কুলবালা—প্রত্যেকে দেশাচার অর্থাৎ সমাজের নিয়মনীতির বিরুদ্ধে আদালতে নালিশ জানানোর কথা চিন্তা করেছে। স্বয়ং বিদ্যাসাগর মহাশয় উকিল হয়ে বিধবাদের মনের কথা তুলে ধরতে

পারেন—এই আশায় পত্র লিখিত হয় বিধবা কুলবালাদের দ্বারা। পত্রে আবেদন করা হয়, এই যে যদি রাজা মদনকে শাস্তি দিতে না পারেন তবে যেন বিধবা রমণীদের পুনর্বিবাহের সম্মতি প্রদান করেন। সুশীলা ও কুলবালা শুধুমাত্র বিবাহের নামেই আনন্দে মুখর। তারা পুণরায় নিজেদের সাজিয়ে তুলবার স্বপ্নে মশগুল,—

“দিদি ফিরিবে কপাল।

বিয়ে হবে দুঃখ যাবে ঘুচিবে জঞ্জাল।।

আলোচাল আর খুঁড়ের ডেলে, রাখবো দিদি শীকেয় তুলে,

ইলীব মাচ বোলে আশ্বলে খাব চিরকাল।।

সাতনরী কণ্ঠমালা, কণ্ঠফুল আর কানবালা,

ঢাকাই সাড়ী পরে আবার বামবামাব মল।”^{৮৯}

এরপর দেখা গেছে, মহারাজ দেশাচার, যুক্তিশূন্য ভট্টাচার্য, মন্ত্রী, পাত্র-মিত্রদের নিয়ে রাজসভায় আসীন। মহারাজ ধর্ম নিয়ে ভীষণ চিন্তিত। এই সময়, বিদ্যাসাগর মহাশয় বিধবাদের পক্ষ থেকে উকিল হয়ে এসেছেন। বিধবাদের আবেদন পত্র রাজার কাছে আনা মাত্রই কৌতুক-হাসি মজার আবহ তৈরি হয়েছে। আবেদনপত্রে যুবতী বিধবারা তাদের মনের দুঃখ কষ্টের কাহিনী লিখেছেন। বিধবা হবার পর, যৌবন কালের জৈবিক চাহিদা তাদের তাড়িয়ে বেড়ায়। বহু বিধবা কুলত্যাগী হয়েছে, আবার কেউ বা আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছে।

ঋষি পরাশর হিন্দু শাস্ত্রে বিধবাদের বিবাহ দেবার কথা বলেছেন। রামায়ণ, মহাভারতেও এক নারী বহু পুরুষসঙ্গ যাপন করেছেন কিন্তু সতী হয়ে থেকেছেন তারা। তবে বিধবাদের শুধুমাত্র নরক জীবনে ঠেলে দেওয়া কেন? পুরুষরা একাধিক বিবাহ করতে পারে কিন্তু নারীরা সবকিছু হতে বঞ্চিত। নারীর গর্ভে পুরুষের জন্ম, তবে নারীর ক্ষেত্রেই পক্ষপাতিত্ব কেন? নারীরা আকাশ থেকে পতিত হয়নি। একজন পুরুষেরই মত মাতৃগর্ভে তারও জন্ম। তবুও নারী ও পুরুষের নিয়মধর্ম এতটাই আলাদা যা বিধবা নারীদের অভিষাপ স্বরূপ। এই অভিষাপ জীবন থেকে মুক্তি চায় তারা। বিধবাদের বিবাহ দেওয়া হলে কলঙ্কের ভয় থাকবে না। কামাশরে দগ্ধ হয়ে ধর্ম নষ্ট হবে না। বিধবা নারীদের পিতামাতা কন্যার মুখদর্শনে সদা সন্তোষিত হয় এবং কন্যার কলঙ্ক ভয়ে সর্বদা কুণ্ঠিত হয়ে থাকেন। সংসারের সর্বসুখ বঞ্চিতা বিধবারা অন্যের সংসারের সুখে ঈর্ষান্বিত হয়। যৌবনের চাহিদায় তারা সাড়া দিয়ে কুলত্যাগী হয়। তাই রাজার কাছে তাদের

দাবী,— দেশে পুনর্বিবাহের প্রচলন করার সুবন্দ্যোবস্ত করা। পুনর্বিবাহের মধ্য দিয়ে বিধবারা অভিশাপসম জীবন থেকে নিষ্কৃতি চেয়েছে।

মন্ত্রী জানিয়েছে, শাস্ত্রে বিধবাদের যে প্রকারের কঠিন কৃচ্ছ্রসাধনের কথা বলা হয়েছে তা বলপূর্বক প্রচলন করা হয়নি বলেই হয়ত বিধবাদের স্পর্ধা এত বেড়েছে। মন্ত্রী তাই রাজমহাশয়কে দুঃখ পেতে বারণ করেছেন। বিধবাদের এরূপ দুর্দশার কারণ জাবার জন্য মন্ত্রীকে পুথির দারস্থ হতে হয়। মিছেরাম বন্দ্যোপাধ্যায় নামক এক অবিবাহিত ব্রাহ্মণ বিধবার পুনর্বিবাহ করার জন্য মহারাজের কাছে আসেন। আসেন উনচলিশ বৎসরের, হরিদাস ভট্টাচার্য্য। হরিদাস ও মিছেরাম বিধবা বিবাহের উদ্দেশ্যে মহারাজের কাছে নাম লিখিয়ে যায়। ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত মিছেরাম জানে, বিধবাদের বিবাহ না হওয়ার কারণে ভ্রূণহত্যা, স্ত্রীহত্যা ও কুৎসিৎ কলঙ্কঘটনা ঘটে চলেছে সর্বত্র। এসব কিছু প্রতিকার হিসাবে বিধবা বিবাহই প্রধান অস্ত্র। বিধবাদের বিবাহ হলেই একমাত্র কুলকলঙ্ক লোপ পেতে পারে। মিছেরামের স্বগতোক্তির মধ্য দিয়ে উনিশ শতকে বিধবা বিবাহের প্রয়োজনীয়তা দারুণভাবে ফুটে উঠেছে।

সুমতি, সুনীতি, সাবিদ্রী, কুলবালা, সতী, সরলতা, সুশীলা প্রত্যেকেই রাজসভায় উপস্থিত হয়ে তারা তাদের সারাজীবনের দুঃখ কষ্ট যন্ত্রণার কথা জানিয়েছে। তারা মনে করেছেন, বিধবা হয়ে সারাজীবন জ্বলে পুড়ে মরে যাওয়ার চেয়ে মৃত স্বামীর সঙ্গে সতী হওয়া অনেক শান্তির। বিধবাদের যন্ত্রণার কথা বিধবাপক্ষের উকিল মহাশয় উপস্থাপন করেন রাজসভায়। রাজসভায় রাজা, মন্ত্রী, পাত্রমিত্র, বিধবা নারী সমূহ ও বিধবাপক্ষের উকিল উপস্থিত হন। অন্যদিকে যৌবন তাড়নায় পদস্থলিত বিলাসিনী রঙ্গিনী কাঞ্চনী ও রসবতী নামক গর্ভবতী বিধবারা তাদের গর্ভজাত সন্তানদের রক্ষার উদ্দেশ্যে রাজসভায় উপস্থিত হয়। স্বামীহীন সন্তান ধারণের ফলে বিধবা রমণীদের উপহাসের পাত্রী হতে হয় মন্ত্রীর কাছে। শুধু মন্ত্রী নয়, সমাজে নানান লোকের হাসির খোরাকে পরিণত হয় তারা।

রাজার কাছে শ্রীবিলাসী লিখিত আবেদন পেশ করেছে। শ্রীবিলাসী বিবাহে রাজী নয়। সে শুধুমাত্র যৌবন দহে দন্ধ হয়ে নারীরা যে পাপকার্যে লিপ্ত হচ্ছে সেটা যাতে আর বৃদ্ধি না হয় সে ব্যাপারে রাজমহাশয়কে অবগত থাকতে বলেছে। অতএব, রাজসভায় রাজার হুকুমে মদনকে কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হয়। মদন জানায় যে, সে শুধুমাত্র সুখের খোঁজে মনুষ্য সমাজে বিরাজ করে। স্বামী স্ত্রীর প্রণয় সুখ বিস্তার করাই মদনের একমাত্র অভিপ্রায়। কিন্তু বিধবার স্বামী বিরহের যাতনা অসহ্য হওয়ায় সুখের খোঁজে তারা বিপথগামী হয়েছে। দেশাচারের অত্যাচারের ফলে

বঙ্গদেশে বিধবাদের এমন করুণ পরিস্থিতি। অতএব মদনকে দোষী করা কোন ভাবেই উচিত কাজ নয় বরং বিধবা বিবাহে তৎপর হওয়া আবশ্যিক।

রাজা বিধবাদের পুনরায় বিবাহ দিতে মনস্থির করেন। বিধবাপক্ষের উকিল বিদ্যাসাগর মহাশয় বিধবা বিবাহের সপক্ষে জানিয়েছে,—“...বিধবারা অবিবাহিতা থাকিলে পূর্বোক্ত কলিধর্ম প্রবল হইবার সম্ভাবনা।”^{৯০} তাছাড়া বিধবাবিবাহ শাস্ত্রসিদ্ধ ও যুক্তিসিদ্ধ। বিধবা বিবাহের বিপক্ষে মন্ত্রী নানা শাস্ত্রের নিয়ম উত্থাপন করলে বিধবাপক্ষের উকিল প্রতিটি শাস্ত্রের শ্লোক ধরে যুক্তি খণ্ডন করে পরাশরের সংহিতার সমর্থনে বিধবা বিবাহের যৌক্তিকতা প্রমাণ করেছেন। ‘পরাশর সংহিতা’য় বলা হয়েছে,—‘নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ।/পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং পতিরণ্যে বিধীয়তে।। অর্থাৎ স্বামী অনুদ্ভিষ্ট হইলে মরিলে সংসার ধর্ম পরিত্যাগ করিলে ক্লীব স্থির হইলে ও পতিত হইলে স্ত্রীদিগের পুনর্ব্বার বিবাহ করা শাস্ত্র বিহিত।’ ‘পরাশর সংহিতা’র যুক্তিতে ক্ষিপ্ত হয়ে মন্ত্রী—‘আদিপুরাণ’, ‘ঋতুসংহিতা’, ‘আদিত্যপুরাণ’, ‘বৃহন্নারদীয় পুরাণে’ বিধবাদের পুনর্ব্বিবাহ সম্পর্কিত নিষেধাজ্ঞার কথা তুলে ধরেছেন।

প্রাজ্ঞ উকিল বিধবা বিবাহের সমর্থনে জানিয়েছে, ‘কাত্যায়ন সংহিতায়’ বলা হয়েছে,—যার সঙ্গে বিবাহ দেওয়া হচ্ছে, সে যদি পতিত, ক্লীব, যথেষ্টাচারী, সগোত্র দাস, চিররোগী হয় তা হলে বিবাহিতা কন্যাকেও বস্ত্র অলংকারে ভূষিত করে পুনরায় অন্য পাত্রে সম্প্রদান করা যাবে। অর্থাৎ বিভিন্ন শাস্ত্রে বিধবার পুনর্ব্বিবাহের বিধি আছে। বিধবা বিবাহের বিপক্ষের উকিল বিধবাবিবাহ অপেক্ষা ব্রহ্মচর্য পালন উৎকৃষ্ট ধর্ম বলে দাবী করলে। বিধবা বিবাহের সমর্থনে বিচক্ষণ উকিল বিদ্যাসাগর জানিয়েছেন,—“এই ব্রহ্মচর্য পরিপালনে অসমর্থ অনেক বিধবার পক্ষে এ ব্যবস্থা স্থাপন আপেক্ষা প্রাণান্ত ব্যবস্থা সহগমন সহস্রগুণে সহজ বোধ হয়। কারণ পঞ্চম বর্ষীয় বালিকার পক্ষে ব্রহ্মচর্য ধর্মের অনুষ্ঠান করা মরণাপেক্ষা ক্লেশদায়ক এবং অনেকানেক যুবতী বিধবাগণের পক্ষে এই সুকঠিন নিয়ম স্থাপন করাতে তাহাদিগকে কেবল কুলকলঙ্ক বৃদ্ধিসহ কলুষসাগরে নিমগ্ন করা হইতেছে।”^{৯১}

উকিল মহাশয় যথার্থই বলেছেন যে, যে সকল বালিকা বা যুবতী বিধবাদের বিবাহ দেওয়া উচিত তাদেরই বিবাহ হবে। আত্মীয়, পরিজন, মাতা, পিতা এরাই স্থির করবেন যে, বৈধব্যাবস্থায় তার কন্যার পুনর্ব্বিবাহ দেওয়া উচিত কি অনুচিত। যেরকমভাবে প্রথম বিবাহকালে কন্যার বিবাহ দানে মাতা-পিতা, কন্যার মতামত নিয়ে সম্প্রদান করেছেন, দ্বিতীয়বার বিবাহেও সেরূপ বিচার বিবেচনা করবেন। ‘বিধবা বিবাহ’ প্রচলিত হলে কুমারীদের বর অপ্রতুল হবে তা

নয় বরং কুমারীদের যে সব পরিত্যাজ্য বর তাদের সঙ্গে বিধবাদের বিবাহ হবে।

মন্ত্রী মহারাজকে সর্বশক্তির দ্বারা বোঝাবার চেষ্টা করেছেন যে, বিধবাবিবাহ দেওয়া উচিত কাজ নয়। তাই মন্ত্রী মহাশয় রাজাকে ‘বিধবা বিবাহ আইন’ চালু না করার পরামর্শ দিয়েছেন। কিন্তু বিচক্ষণ রাজা মনে মনে বুঝতে পেরেছেন যে, বিধবাদের বিবাহ দেওয়া আবশ্যিক। সতীদাহপ্রথা রদ হওয়ার ফলে বিধবাদের কষ্টসাধ্য জীবনযাপনে নারীদের দুর্দশার করুণ পরিনতি রাজার কাছে অজ্ঞাত নয়। এই প্রসঙ্গে বিধবাবিবাহকে কেন্দ্র করে মন্ত্রী ও উকিলের মধ্যে পক্ষে-বিপক্ষে বাকবিতণ্ডা হয়। উকিল মহাশয় বিধবা বিবাহের ইতিবাচক দিকগুলিকে তুলে ধরে বিধবা সমাজকে রক্ষা করার জন্য মহারাজের কাছে কাতর আর্তি জানিয়েছেন। মন্ত্রী মহাশয় সক্রোধে বিধবাদের বিবাহে প্রবল আপত্তি জানিয়ে উকিল মহাশয়কে তার বিধবা ভগ্নী অথবা কন্যাকে প্রথম বিবাহ দেওয়ার কথা বলে তর্কের মাত্রা বাড়ায়। উক্তি-প্রত্যুক্তির মধ্য দিয়ে মামলার অগ্রগতি হলে শেষ পর্যন্ত নিজ স্বার্থ সিদ্ধির জন্য রাজা বিচার করেন যে, বিধবাদের বিবাহ দেওয়া উচিত কাজ নয়। তাছাড়া রাজা অমানবিক ভাবে হুকুম দেন যে বিধবা নারীরা গোপনে পতিবরণ করতে পারবে এবং গর্ভবতীরা গোপনে গর্ভপাত করাতে পারবে। কিন্তু অবৈধতার প্রকাশ হলে দণ্ডিত হতে হবে। আর যারা এই হুকুম অমান্য করবে তারা পিত্রালয়ে একাহারী হয়ে যাবজ্জীবন কাটাবে। প্রায় দশলক্ষ বিধবা যারা পুনরায় বিবাহ করার আশায় আবেদনপত্র জমা দিয়েছিল রাজ দরবারে তারা রাজার এইরকম সিদ্ধান্তে চূড়ান্ত হতাশ হয়ে ভেঙে পড়ে এবং গর্ভপাত নিবারণের জন্য যাঁরা প্রথমবার পাঁচশত, দ্বিতীয়বার দুইহাজার এবং আড়াই হাজার দরখাস্ত দাখিল করেছিল তাঁরা ভ্রণরক্ষা করতে অসমর্থ হয়ে পড়ে।

কাহিনীর অগ্রগতিতে দেখা যায়, তিন মেয়েকে খুঁজে না পাওয়ায়, কুলপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায় ভেবেছেন তার তিন মেয়ে ঘর ছেড়ে পালিয়েছে। পাড়াপ্রতিবেশী সবাই কুলত্যাগী বলে নিন্দা করেছে। কুলপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্ত্রী বুকফাটা কান্নার আওয়াজে প্রকাশিত হয়েছে মাতৃস্নেহের প্রকাশ। তিনি জানেন কন্যারা ধর্মনষ্ট করতে পারে না। তাই কন্যাদের কুলটা বলতে তাঁর অন্তর হাহাকার করে ওঠে ক্রমে কুলপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায় জানতে পারে যে তাঁর কন্যারা অপহৃত হয়েছেন। প্রতিবেশী বন্ধুগণের কাছে, তিনি জানিয়েছেন যে, তার রূপবতী কন্যা সতীকে দেশাচার রাজা বন্দী করেছে। দেশাচার তার লোলুপ দৃষ্টিতে সতীর সতীত্ব নষ্ট করতে চাইছে। যে রাজার নিয়মে দাসত্ব স্বীকার করে প্রজারা নিশ্চিন্তে জীবন কাটাবে, সেই রাজাই যদি হয় ভক্ষক তাহলে বিধবারমণীদের অসহায়তার সীমা থাকে না। ক্রমেই সর্বসাধারণ বুঝতে পারে যে শুধুমাত্র

পৈশাচিক লোভেই মন্ত্রী ও রাজার বিধবা কন্যাদের পুনর্বিবাহে আপত্তি। ফলে প্রত্যেকের কন্যাধন রক্ষার স্বার্থে রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা উচিত। কুলপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায় বুঝতে পারেন যুবতী বিধবাদের বিবাহ দেওয়া উচিত,—“দেশাচারের বিপক্ষে বিদ্রোহী হইয়া এই সকল অত্যাচার নিবারণ পূর্বক বালিকা ও যুবতী বিধবাগণের বিবাহ দেওয়া সর্বোত্তমাবে উচিত। এই দণ্ডে মহাশয়েরা একমত অবলম্বন পূর্বক দেশাচারের হস্ত হইতে বিধবাগণকে রক্ষা করিতে প্রস্তুত হউন। দেখুন এ বিষয়ে বিলম্ব করার কোন ফল নাই। বরং সম্পূর্ণ অনিষ্টের সম্ভাবনা।”^{১২} কুলপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায় প্রতিজ্ঞা করেন যে, তিনি দেশাচারের লোলুপতার শিরচ্ছেদ করে ধরাকে পবিত্র করবেন এবং সেইখানেই আপন বিধবা কন্যাদের বিবাহ দেবেন।

বৈঠকখানার ঘরে রাজা মদন ও গায়কেরা উপবিষ্ট রয়েছে। সতীর আত্ননাদ যাতে অন্দের ভেদ করে বাইরে পৌঁছতে না পারে তার জন্য রাজা গায়কদের চিৎকার করে গান গাওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন। এই অংশে সিন্ধু রাগিনী, খেমটা তালের একটি গান সংযোজিত হয়েছে। প্রজাবর্গ দেশাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে রাজাকে আক্রমণ করলে রাজা প্রজাবর্গের হাতে বন্দী হয়। উদ্ধার করা হয় সতীকে। বন্দী রাজার বানিয়ে তোলা মিথ্যে নিয়মের বেড়াজাল ভেঙে সৈন্যাধ্যক্ষ ভট্টাচার্য মহাশয়কে তার বিধবা কন্যার বিবাহে সম্প্রদান করার কথা বলেন। শেষপর্যন্ত প্রজাবর্গ বিধবা যুবতী কন্যাদের পুনর্বিবাহ দিয়ে বিধবাদের দুর্দশা মুক্ত করে সমাজকে নিষ্কলুষ করেছে। প্রসঙ্গত উনিশ শতকীয় সমাজব্যবস্থায় বিধবা রমণীদের পুনর্বিবাহ দান কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা নাট্যকার উপলব্ধি করেছেন। তাই তিনি রক্ষণশীল সমাজব্যবস্থায় দাঁড়িয়ে শুধুমাত্র বিধবাদের পুনর্বিবাহের যৌক্তিকতায় থেমে থাকেননি বরং নাটকে বিধবাদের বিবাহ দিয়ে সমাজকে কলুষমুক্ত করেছেন।

উনিশ শতকের বিশিষ্ট সামাজিক নাট্যকার রামনারায়ণ তর্করত্ন। তাঁর নাটকে উনিশ শতকের সামাজিক সমস্যা প্রধান বিষয় হিসাবে ধরা দিয়েছে। রামনারায়ণ তর্করত্ন ‘জোড়াসাঁকো নাট্যশালা’ কর্তৃক আকৃষ্ট হয়ে ‘নবনাটক’ প্রণয়ন করেন। ‘নবনাটক’ প্রকাশিত হয় ১৮৬৬ সালে। ১৭৮৮ শকাব্দে বহুবাজারস্থ ১৭২ সংখ্যক ভবনে স্ট্যানহোপ যন্ত্রে শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোম্পানি কর্তৃক এ নাটক মুদ্রিত হয়। মূল্য ১ টাকা। ‘নবনাটক’ রচনাকালে নাট্যকার নাটকটির পরিচয় সূত্রে নামপত্রে নাট্যকার লিখেছেন,—‘বহুবিবাহ প্রভৃতি কুপ্রথা বিষয়ক ‘নব-নাটক’ এবং নাটকটির পরিচয় সূত্রে বিজ্ঞাপন অংশে লিখেছেন,—“আমি যোড়াসাঁকো নাট্যশালা কমিটী কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া এই বহুবিবাহ বিষয়ক নব-নাটক প্রণয়ন করিলাম। কাব্যকলা-বিনোদী কোবিদবর্গ

অনুগ্রহ-পূর্বক কিঞ্চিৎ পরিশ্রম স্বীকার করিয়া ইহা আদ্যোপান্ত পাঠ করেন এই আমার প্রার্থনা।”^{৩৩} আমাদের আলোচ্য বিধবা কেন্দ্রিক সমস্যা এ নাটকের মূল উপজীব্য বিষয় নয়। কিন্তু এ নাটকের এক প্রতিবাদিনী বিধবা নারী চরিত্র নিম্নলিখিত আমরা পাই। সেকারণে নাটকটি বিশেষ আলোচনার দাবী রাখে। কৌলিন্য ও বহুবিবাহের সূত্রে লগ্ন হয়ে আছে বৈধব্যের প্রসঙ্গ। এ নাটকে তার প্রকাশ রয়েছে।

বিদ্যাসাগর যে সময়কালে বিধবা বিবাহ নিয়ে আন্দোলন করছেন সেময়ে রামনারায়ণ তর্করত্ন কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক পদে বিরাজমান এবং কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের বিদ্যাসাগরের সহকর্মী হিসাবে অধ্যাপনা করছেন। রামনারায়ণ তর্করত্ন বিদ্যাসাগরের সমাজ আন্দোলকে সমর্থন করছেন নাটক রচনার মধ্য দিয়ে। ‘নবনাটকে’ নাট্যকার ‘বহুবিবাহ প্রভৃতি কুপ্রথা বিষয়ক’ বললেও এ নাটকের কাহিনী বৃন্তে তিনি বিধবার সংকট ও সমস্যাকে তুলে ধরেছেন কয়েকটি দৃশ্যে।

সূত্রধার ও নটীর প্রস্তাবনার মধ্য দিয়ে নাটক শুরু হয়েছে। প্রথম অঙ্কে, ভগি ও সাবি দুই দাসীর কথোপকথনের মধ্য দিয়ে কাহিনী শুরু হয়েছে। তাদের আলোচনার বিষয়, বার্দাকে উপনীত মনিবের দ্বিতীয় বিবাহ নিয়ে। গবেশবাবু গ্রাম্য জমিদার। তিনি নিজেকে গ্রামের ভাগ্য নির্ধাতা মনে করেন। তাকে তোষামোদ করার জন্য চারপাশে ঘুরে বেড়ায় মোসাবের দল। এঁরা হলেন, পণ্ডিতাভিমানী বিধর্মবাগীশ, চিত্ততোষ প্রমুখ। এই মোসাহেবরা জমিদার গবেশের কথাকে ভগবান তুল্য মনে করে। ন্যায় অন্যায় বিচার না করে, অন্ধভাবে গবেশের বক্তব্যকে শিরোধার্য করে কিছু উপটৌকন লাভের আশায়। পণ্ডিতকে তাঁরা অসম্মান করতেও পিছুপা হননা।

জমিদার গবেশ গ্রামে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনে বাধা দিলে, বিধর্মবাগীশ ও চিত্ততোষ এই কাজকে সমর্থন করেন। তাঁরা মনে করেন, স্ত্রীজাতি পড়াশুনা করলে তারা অধর্মের পথকেই প্রশস্ত করে। বিধর্মবাগীশ জানিয়েছে,—“গ্রাম্যমধ্যে যে একটা অধর্মের অঙ্কুর স্বরূপ স্ত্রী বিদ্যালয় হচ্ছিল, তা হলো এতদিন যে একাধ্বন হয়ে উঠতো, ভাগ্যে বাবু সে বিষয়ে লেগেছিলেন তাতে তো হতে পেলো না।”^{৩৪} বিধর্মবাগীশ মনে করেন স্ত্রী জাতির লেখাপড়া করাটা ঘোর অধর্মের কাজ। তাঁর ধারণা,—“গোহত্যা ব্রহ্মহত্যা অপেক্ষাও ওটা অধর্ম।”^{৩৫} নাট্যকার যেন ব্যঙ্গের সুরে বলতে চান, স্ত্রীজাতি পড়াশুনো করলে ভয়, স্ত্রীজাতি দ্বিতীয়বার বিবাহ করলে ভয়, স্ত্রী জাতি ধর্মচ্যুত হলে ভয়। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে স্ত্রীজাতির উন্নতির সমস্ত পথই যেন অধর্মের। অতএব স্ত্রী জাতির উন্নতির কোনো প্রয়োজন নেই।

‘নবনাটকে’ মূলত দেখানো হয়েছে, একজন পুরুষ যত ইচ্ছা বিবাহ করতে পারে, তাতে কোন দোষ থাকত পারে না। কিন্তু একজন স্ত্রী এরূপ কার্য কোনদিনও যেন করতে না পারে। বৃদ্ধ গবেশের পুণরায় দারপরিগ্রহকে কেন্দ্র করে নানান মতের উত্থাপন হয়। প্রগতিশীল মনের অধিকারী সুধীর বহু শাস্ত্রের ব্যাখ্যা করে,—গবেশ, চিত্ততোষ ও বিধর্মবাগীশের বহু বিবাহের সপক্ষে নানা মিথ্যা যুক্তির মতকে খণ্ডন করতে চেয়েছেন। কিন্তু তাদের মত ভণ্ড কুসংস্কারচ্ছন্ন পুরুষতান্ত্রিক রক্ষণশীল মনোভাবাপন্ন ব্যক্তির কিছুতেই প্রগতিশীল যুক্তি মেনে নিতে পারেননা। একজন কুলীন ব্রাহ্মণ একাধিক বিবাহ করলে তা সমাজে গ্রহণযোগ্য হয়। সেই কুলীন ব্রাহ্মণ গত হলে তাঁর একাধিক স্ত্রী বৈধব্য দশায় উপনীত হয় এবং বৈধব্য জ্বালায় জর্জরিত হয়। দুঃখে জ্বালায় বিধবা রমণীরা মনে করতে বাধ্য হয় যে, বিধবা মেয়েদের পক্ষে ‘পূর্বের (র) সহগমন প্রথাই মঙ্গলকর ছিল। কারণ বিধবা হয়ে আমৃত্যু পর্যন্ত দন্ধ হওয়ার চেয়ে মৃত স্বামীর সঙ্গে চিতায় দন্ধ হয়ে মৃত্যু অনেক শাস্তির।

নারীর এই কষ্টও, কুলীনদের ব্যবসার জোগাড়। নারীদের কণ্ঠে কুলীনদের কিছু এসে যায় না। পয়সা পেলে বিয়ে এবং বিয়ে করে নারীদের উদ্ধার। বিধর্মবাগীশ জানিয়েছেন,—“তা স্ত্রীদিগের ক্লেশ হলো তা কুলীনদের কি? তাঁরা পয়সা পেলেন বিয়ে করলেন ও ব্যবসায়ই কি মন্দ?”^{৯৬} অর্থাৎ বিবাহ একটি লাভজনক ব্যবসা। যাতে বলি হয় শুধুমাত্র স্ত্রীজাতি। হয় বৈধব্যযন্ত্রণা নয় সতীনকাঁটা—এ সংসারে এ নারীজাতির স্থান নির্ধারিত।

দ্বিতীয় অঙ্কের কাহিনী শুরু হয়েছে, বিমলা, কমলা, চন্দ্র, নির্মলা নামক প্রতিবাসিনীদের গার্হস্থ্য জীবনের কথাবার্তার মধ্য দিয়ে। বিমলা, কমলা, চন্দ্র প্রত্যেকেই সধবা কিন্তু সতীনের জ্বালায় জর্জরিত। নির্মলা বিধবা। তাই নির্মলা আর পাঁচজনের চেয়ে আলাদা। কমলা ও বিমলার কথপোকথনে উঠে এসেছে নারীজাতির দুঃখের কথা। নারীর জন্মই যেন দুঃখের জন্ম। উনিশ শতকের সময়কালে নারীর জন্মকালেই তার পাত্র খোঁজার জন্য তার পিতাকে ছুটতে হয়। কারণ কন্যাকে পাত্রস্থ করতে না পারলে তারা ধর্মচ্যুত হবে। তাই যেভাবেই হোক কন্যাকে কুলীন পাত্রস্থ করা প্রয়োজন। সে পাত্র বৃদ্ধই হোক আর বহুপত্নীই হোক। কমলার কথায় আক্ষেপের সুর স্পষ্ট,—“কতো গোহত্যে ব্রহ্মহত্যে করো নারীজন্ম পেয়েছি। আমাদের মত চিরদুঃখিনী কে আছে। চিরকাল মা বাপের গলগ্রহ হয়ো রয়েছে, আমাদের উপর তো মা বাপের অনাদর হবেই, তোরা তো পাঁচ দিন বাদে শ্বশুরঘর করতে এসেছিস, তোরাই মা বাপের কাছে কতো আদর পেয়েছিলি? ছেলের উপর মা বাপ যত স্নেহ মমত্ব করেন মেয়ের উপর কি তাদের ততটুকু

হয়? তেমন হলে অমন হেনস্থায় রাখএবন কেন? তা মা বাপ যে এমন সামগ্রী যারপরনাই, তাঁরা যদি অগ্রাহ্য কল্যেন তবে অন্যে কিনা করবে বলো?”^{৯৭} বাপের বাড়ীতেই মেয়েদের অনাদরে থাকতে হয়। সংসারের বোঝা সরুপ তাদের অবস্থান। কন্যাদের বিবাহ দিতে পারলেই পিতামাতার মোক্ষলাভ হয়। বাড়ীর একটি পুত্রসন্তান যে স্নেহ আদর যত্ন পায় কন্যাসন্তানের ক্ষেত্রে তা কখনোই হয় না। বিবাহের পর বাপের বাড়ীর স্নেহ বঞ্চিতা কমলা স্বশুরবাড়ীতেও অগ্রাহ্য হয়েছে। ফলে সধবা হয়েও পতিসুখ হারা কমলা স্বামীকে কাছে পায়নি।

কমলার কথায় নির্মলার দুচোখে অশ্রুধারা বয়। নির্মলা বিধবা। স্বামীর সুখ পেয়েও আজ সে বঞ্চিত। নির্মলার স্বামী নির্মলাকে অতি যত্নে রাখত। কিন্তু নির্মলার সুখ ছিল কিছুদিনের। অচিরেই নির্মলাকে বৈধব্যের শিকার হতে হয়। যখনই তার স্বামীর কথা মনে পড়েছে, তখনই সে কষ্ট পেয়েছে। এইসব কথাবার্তার মধ্যে অমলা, বিমলা, কমলা, চন্দ্রকলা তাদের মনের বিভিন্ন রাগ অভিমান দুঃখ জ্বালা একে অপরের কাছে প্রকাশ করে। নির্মলা বিশ্বাস করে, শাস্ত্রানুযায়ী বিধবাবিবাহ সম্ভব। নির্মলা, কমলা ও চন্দ্রকলার কথোপকথনে উত্থাপিত হয়েছে বিধবার পুনর্বিবাহের প্রসঙ্গ,—

“কমলা ॥ শাস্ত্রে কি রাঁড়ের বিয়ের বিধি আছে সত্যি?

নির্মলা ॥ তুই দিদি কি বলিস্, শাস্ত্রে নেই? স্বামী মল্যে স্ত্রীর অমনি একেবারে গঙ্গাজলে ধুয়ে খেতে হবে, আর পুরুষ স্ত্রী থাকতেও ১০।২০ যত ইচ্ছে বিয়ে করবে গে, এই বুঝি তোমার শাস্ত্রের বিধি?

কমলা ॥ না ভাই, শুনিছি সকল শাস্ত্রে রাঁড়ের বিয়ের বিধি নাই। কোন কোন শাস্ত্রে নাকি আছে, তাই মতামতি হয়ে উঠেছে।

নির্মলা ॥ ঐ মতামতিতেই ওদের মাতামাতি, মরুক গে, না হতে দিক্ হবেই এর পর, তবে আমাদের অদেষ্টে হলো না!

চন্দ্রকলা ॥...হতো আমাদের হাতে কলম্ তো দেখতে পেতিস্, কেমন মনের সাথে শাস্ত্র করে ফেল্‌তেম।”^{৯৮}

প্রসঙ্গত উনিশ শতকের যুগ পরিবেশে পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় পুরুষের একচেটিয়া ক্ষমতা ও রক্তচক্ষুর শাসনে ক্ষত-বিক্ষত বিরুদ্ধে নারী জাতির বিদ্রোহী মনোভাব ফুটে উঠেছে উল্লিখিত কথোপকথনের মধ্য দিয়ে।

বিধবা নির্মলা জানে যে, শাস্ত্রে কখনোই পুরুষের কুড়ি-ত্রিশটি বিবাহের উল্লেখ থাকতে পারে না। শুধুমাত্র সমাজ নিজস্বার্থে বিধবাদের ক্ষেত্রে নিয়মকানুন বিধিনিষেধের বেড়াজাল তৈরি করেছে। তাই যখনই বিধবাদের জীবনে সুখের একটি দিক উন্মোচিত হবার আশা দেখা দিয়েছে তখনই সমাজপতিদের রক্তচক্ষু শাস্ত্রের দোহাই দিয়েছে। পুরুষজাতির ঘৃণ্যশোষণ প্রণালী শাস্ত্রকে হাতিয়ার করেছে। নির্মলা বুঝতে পেরেছে যে, যতই বাধা আসুক বিধবাদের বিবাহ শাস্ত্রসম্মত হবেই,—“ঐ মাতামতিতেই ওদের মাতামাতি, মরুক্কে, না হতে দিক্ হবেই এরপর, তবে আমাদের অদেষ্টি হলো না!”^{৯৯} এরূপ কথোপকথনের পর নির্মলা, কমলা, অমলা চন্দ্রকলা সকলে গবেশবাবুর অন্দরমহলে প্রবেশ করে। গবেশবাবুর দ্বিতীয় বিবাহে তার স্ত্রী সাবিত্রীর দ্বিমত নেই। কারণ সাবিত্রী গবেশবাবুকে গুরুজন জ্ঞানে মানে। তাই সাবিত্রী তার সতীনকে হাসিমুখেই মেনে নিতে চায়। নাট্যকার রামনারায়ণ ‘নবনাটক’ এর মধ্য দিয়ে দেখাতে চেয়েছেন যে, একজন পুরুষের কুড়ি-ত্রিশটি বিবাহের পরিণতি স্বরূপ সমাজ বাল্য বিধবাদের সংখ্যা বেড়েছে ফলে বিধবা সমস্যা নারীজাতির দুর্দশার কারণ হয়েছে। বহুবিবাহ একটি সামাজিক কুপ্রথা, যার ফলে শুধুমাত্র বিধবা সমস্যা নয়, সংকট উপস্থিত হয়েছে নারী জাতির অস্তিত্বে। নাট্যকার সমাজের কুপ্রথাগুলির কুফল চিহ্নিত করেছেন এবং এর প্রতিকারের জন্য সদুপদেশ প্রদান করেছেন।

জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে ‘নবনাটক’ প্রথম অভিনীত হয়। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি সূত্রে এই নাটক অভিনয়ের বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। রামনারায়ণের ‘আত্মকথা’ সূত্রে বসন্তরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন,— “নবনাটক ১২৭৩ সালে রচিত হয়। ইহাতে কলিকাতা জোড়াসাঁকোবাসি গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর ২০০ টাকা পারিতোষিক দেন। এই নাটক তাঁহার বাটীতে ৯ বার অভিনীত হয়।’ নাটকটি প্রথম অভিনীত হয় ৫ জানুয়ারি ১৮৬৭ তারিখে।”^{১০০} সেকালে প্রভূত সমাদর পেয়েছিল এ নাটক।

উনিশ শতকের বিশিষ্ট সামাজিক নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র। দীনবন্ধু সামাজিক নাটক লিখতে গিয়ে সমকালীন বিধবা বিবাহের বাগ্‌বিতণ্ডাকে উপেক্ষা করতে পারেননি। দীনবন্ধু মিত্র তাঁর প্রথম প্রহসন নাটক ‘বিয়ে পাগলা বুড়ো’ (১৮৬৬) নাটকের ঘটনাবৃত্তে তুলে ধরেছেন বিধবার সমস্যা, সংকট। যদিও এ নাটক সমাজ পুরোপুরি সমাজ সমস্যামূলক নাটক নয়। কিন্তু এ নাটকের কাহিনী বৃত্তে বালবিধবা ও বয়স্ক বিধবার কথা উপস্থাপিত হয়েছে। নাট্যকার এ নাটক উৎসর্গ করেন বন্ধুবর সারদাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়কে। ‘বিয়ে পাগলা বুড়ো’ নাটকের উৎসর্গপত্রে দীনবন্ধু মিত্র লিখেছেন,— “যাহাকে ভালবাসা যায় তৎসম্বন্ধীয় কোন বস্তু নিকটে থাকিলে কিয়দংশ মনের

তৃপ্ততা জন্মে—এই প্রত্যয়ে নির্ভর করিয়া নির্দেশ—আমোদপ্রদ মৎপ্রণীত এতৎ প্রহসনটি তোমার হস্তে ন্যস্ত করিলাম।”^{১০১} বোঝা যায়, নির্দেশ আমাদে প্রদানের জন্য এ নাটক রচিত কিন্তু তা সত্ত্বেও এ নাটকের কাহিনীবৃত্তে উঠে এসেছে বিধবা বিবাহের সংকটচিত্র।

দীনবন্ধু মিত্রের ‘বিয়ে পাগলা বুড়ো’ প্রহসনধর্মী নাটক। কৌতুকধর্মী এই প্রহসন দীনবন্ধু মিত্রের অপূর্ব সৃষ্টি। বিবাহ বাতীকগ্রস্ত, বৃদ্ধ রাজীবলোচনের আচার-আচরণ ও শাস্তি প্রদান এ নাটকের বিষয়। দুই অঙ্কে রচিত ‘বিয়ে পাগলা বুড়ো’ প্রহসন নাটকের প্রথম অঙ্কে, বৃদ্ধ রাজীব মুখোপাধ্যায়ের নকল বিবাহের ষড়যন্ত্র এবং দ্বিতীয় অঙ্কে, নকল বিবাহ অনুষ্ঠান ও তাকে নিয়ে লাঞ্ছনা-অপদস্থ করা হয়েছে। ‘বিয়ে পাগলা বুড়ো’ নাটকের প্রথম অঙ্কে তিনটি গর্ভাঙ্ক ও দ্বিতীয় অঙ্কে তিনটি গর্ভাঙ্ক রয়েছে। রাজীব মুখোপাধ্যায়কে জব্দ করার উদ্দেশ্যেই সমগ্র ঘটনাটি নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। বৃদ্ধ রাজীবের পুনর্বিবাহের সখ। পুনর্বিবাহ করার পাশাপাশি তার মধ্যে রয়েছে অন্য নানান চারিত্রিক দোষ। যেমন,—কৃপণতা, নারী লোলুপতা, অনুদারতা, গোঁড়ামি প্রভৃতি। বৃদ্ধ বয়সে পুনর্বাহ বিবাহ করবার বাসনায় রাজীব ঘটকের সঙ্গে নানান শলা-পরামর্শ করেছেন। রাজীবের বিধবা কন্যা গৌরমণি ও রামমণির এ বিবাহে প্রবল আপত্তি থাকায় রাজীব তাদের যেমন তীক্ষ্ণভাবে অপমান করেছেন তেমনি, দুই বিধবা কন্যার পুনর্বিবাহ বিষয়ে সম্পূর্ণ নীরব থেকে গেছেন।

এহেন বিয়ে পাগল রাজীবকে উচিত শিক্ষা দিতে তার শরীরে তীক্ষ্ণ কাঁটা বিঁধিয়ে মিথ্যে সাপে কাটার ভয় দেখিয়ে নির্মমভাবে কাঁটাপেটা করা হয়েছে। নকল বিবাহের অনুষ্ঠান করে রাজীবের নববধূরূপে ডুমুনী, পেচোর মা এবং নবজাত সন্তানরূপে এক শূকরছানাকে হাজির করে রাজীবকে উচিত শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। ‘বিয়ে পাগলা বুড়ো’ নাটকে রামমণি ও গৌরমণি এই দুই বিধবা চরিত্রকে আমরা পাই। রাজীব মুখোপাধ্যায়ের কন্যা রামমণি ও গৌরমণি দুজনেই বাল্যবিধবা। বাপের বাড়িতে আশ্রিত রামমণি সারাদিন বাড়ির কাজকর্মে ব্যস্ত থেকেছে। বার্তাক্যে উপনীত পিতার পুনর্বাহ বিবাহ করবার ইচ্ছায় রামমণি আহত হয়েছে। বৃদ্ধ পিতার কটুবাক্যে রামমণি মনে মনে ক্ষতবিক্ষত হয়েছে—“... পাজী বেটি, দূর হ এখান থেকে, কড়েরাঁড়ী আমার বাড়ী তোর আর জায়গা হবে না, তোর ভাতারের বাবা রাখে ভাল, না হয় নতুন আইন ধরে বিয়ে কর গে।”^{১০২} বিধবা রামমণির শ্বশুরবাড়িতে জায়গা হয়নি, বাপের বাড়ির আশ্রয়টুকু আঁকড়ে ধরে সে বেঁচে থাকার চেষ্টা করে গেছে নিরন্তর। কিন্তু নিজ পিতার এহেন আচরণে রামমণির বৈধব্য জীবনের কষ্ট দ্বিগুণ হয়ে উঠেছে।

একাদশীর মত কঠিন ব্রতের নিয়মে বালিকা বিধবাদের জীবনযাতনা অসহনীয়। গৌরমণি বলেছে,—“বালিকা বিধবাদের কত যাতনা-একাদশীর উপবাসে আমাদের অঙ্গ জ্বলে যায়, পেটের ভিতর পাঁজার আগুন জ্বলতে থাকে, জ্বর বিকারে এমন পিপাসা হয় না। একখান থাল নিয়ে পেটে দিই, তাতে কি জ্বালা নিবারণ হয়। দ্বাদশীর দিন সকালে গলা কাটের মত শুকিয়ে থাকে, যেমন জল ঢেলে দিই তেমনি গলা চিরে যায়, তার জন্যে আবার কদিন ক্লেশ পেতে হয়। আমি যখন সধবা ছিলাম, তখন তিন বার ভাত খেতেম, এখন একবার বই খেতে নাই; রেতে খিদেয় যদি মরি তবু আর খেতে পাব না।”^{১০০}

একাদশীর নিয়মের ফাঁসে বিধবা রমণীদের সারা জীবন অতিবাহিত হয়। গৌরমণি বুঝতে পারে-এসব ঘৃণ্য নিয়ম মনুষ্যসৃষ্ট। পরমেশ্বর এই নিয়ম সৃষ্টি করতে পারেন না। যদি স্বয়ং পরমেশ্বরের বিধি নিয়ম এরূপ হত, তাহলে বিধবা রমণীদের ক্ষুধা, পিপাসা, আশা, বাসনা সবকিছু মৃতস্বামীর সঙ্গে ভস্ম হয়ে যেত। বিধবা গৌরমণি যৌবনা। পতিসুখে সুখী হওয়ার বাসনা তার মনে সদা জাগ্রত। তার পুনর্বিবাহ হলে সে স্বামীসুখ পেত। স্বামীর প্রণয়ে বিহ্বল হতে চায় গৌরমণি। স্বামীর মনের মতন করে সেজেগুজে পঞ্চব্যঞ্জনে স্বামীকে ভাত খাওয়ানো, চায়। কখনো প্রতিবেশীদের প্রসঙ্গে স্বামীর সঙ্গে সময় কাটানো ও কৌতুক কথা বলে অহংকার করতে চায় সে। আবার কখনো চায় পুত্রবতী হয়ে পুত্রবধূ ঘরে এনে সুখী হতে। স্বপ্ন দেখে নিজ কন্যার সাথে পাড়া প্রতিবেশীকে পরমান্ন পরিবেশন করতে করতে আপন সুখে সুখী হয়েছে সে। গৌরমণি বলেছে,—“দিদি! ভাল খেতে ভাল পড়ে, ভাল করে সংসারধর্ম কত্তে কার না সাধ যায়?”^{১০১} মনের সুপ্ত বাসনার কাছে হার মেনে গৌরমণি পুনর্বার বিবাহ করতে চায়। কিন্তু স্বেচ্ছাসমাজ বিধিনিষেধে অসহায় হয়ে, নিজ স্বপ্নের অপমৃত্যু দেখে সে নিজেকে পুড়িয়ে আত্মাহুত্যা কিংবা সহমরণ যাওয়াকে শ্রেয় মনে করেছে।

দীনবন্ধু মিত্র তাঁর ‘বিয়ে পাগলা বুড়ো’ গ্রন্থে বিধবাদের মনোবিশ্লেষণ সহানুভূতির সঙ্গে সম্পাদন করেছেন। বিধবা রামমণি ও গৌরমণির বক্তব্যে বিধবাদের যৌন ও আর্থিক সমস্যামুক্তির আর্তি প্রকাশ পেয়েছে,—

“রামমণি ॥ গৌর, বিধবা বিয়ে চলিত হলে তুই বিয়ে করিস?

গৌরমণি ॥ আমার এই নবীন বয়স, পূর্ণ যৌবন, কত আশা, কত বাসনা মনের ভিতর উদয় হচ্ছে, তা গুণে সংখ্যা করা যায় না...। দিদি! ভাল খেতে, ভাল পড়ে, ভাল করে সংসারধর্ম কত্তে কার না সাধ যায়?

গৌরমণি ।। দিদি! বালিকা বিধবাদের কত যাতনা—একদশীর উপবাসে আমাদের
অঙ্গ জ্বলে যায়, পেটের ভিতর পঁজার আগুন জ্বলতে থাকে, জ্বর
বিকারে এমন পিপাসা হয় না।... দ্বাদশীর দিন সকালে গলা কাঠের মত
শুকিয়ে থাকে, যেমন জল ঢেলে দিই, তেমনি গলা চিরে যায়, তার
জন্যে আবার কদিন ক্লেশ পেতে হয়।— দেখ দিদি এসব পরমেশ্বর
করেননি, মানসে করেছে, তিনি যদি কতেন, তঙে আমাদের ক্ষুধা,
পিপাসা, আশা, বাসনা স্বামীর সঙ্গে ভস্ম করে দিতেন।”

রামমণি ও গৌরমণির কথোপকথনে প্রকাশিত হয়েছে বৈধব্যের আর্তি, বেদনা ও যন্ত্রনার অনাবিল
করণ দুঃখসার।

‘বিয়ে পাগলা বুড়ো’ নাটকে বিধবা রামমণি গর্জে উঠে জানিয়েছে,—“অনেক মেয়ে
দ্বিতীয় বিয়ে না হতে বিধবা হয়েছে, তার স্বামী কখন দেখিনি, তাদের বিয়ে দিলে দোষ কি?”^{১০৫}
গৌরমণি রামমণির চিন্তাভাবনা থেকে একধাপ এগিয়ে ভেবেছে। গৌরমণি মনে করেছে,—ছোট
হোক বা বড় বিধবা বিবাহে কোনো দোষ নেই। পুরুষেরাও স্ত্রীবিরোগের পর পুনরায় বিবাহ
করে। আবার কেউ করে না। বিধবা বিবাহের ক্ষেত্রেও তাই হওয়া উচিত। ভারতীয় পুরাণেও
বিধবাবিবাহের রীতি রয়েছে। রামায়ণে, ‘বালি’র মৃত্যুর পর ‘তারা’ পুণরায় বিবাহ করেছিলেন,
রাবণের স্ত্রী মন্দোদরীও পুণরায় স্বামীলাভ করেছিলেন। শিক্ষিত গৌরমণির চিন্তাভাবনার প্রসারে
উক্ত প্রহসনটির প্রথম অঙ্কের তৃতীয় গর্ভাঙ্ক উৎকর্ষতা লাভ করেছে।

‘বিয়ে পাগলা বুড়ো’ প্রহসনটিতে দীনবন্ধু মিত্র, রামমণি ও গৌরমণি—এই দুই বিধবা
চরিত্রদের অঙ্কন করে তৎকালীন সমাজব্যবস্থার কদর্য রূপের খানিকাংশ সুন্দরভাবে ফুটিয়ে
তুলেছেন। উনিশ শতকে বিধবাদের দুরবস্থার বর্ণনা খুব স্বল্প পরিসরে ফুটিয়ে তুলেছেন নাট্যকার।
বৃদ্ধ বয়সে পুনর্বিবাহ করার সখের মত, কুমানসিকতাকে রাজীব মুখোপাধ্যায়ের মত চরিত্রের
মধ্য দিয়ে যেমন তুলে ধরেছেন নাট্যকার, ঠিক তেমনি গৌরমণি ও রামমণি-দুই বিধবা চরিত্র
সৃষ্টির মধ্য দিয়ে বিধবা বিবাহের প্রয়োজনীয়তা সুকৌশলে তুলে ধরেছেন।

১৮৬৭ সালে প্রকাশিত হয় ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের ‘মেঘনাদবধ নাটক’ (১৮৬৭)।
‘মেঘনাদবধ নাটক’ পৌরাণিক কাহিনী নির্ভর রচনা। পৌরাণিক নাটক লিখতে বসে নাট্যকার
সমাজ ও সমকালকে উপেক্ষা করতে পারেননি। রাম-রাবণ ও মন্দোদরীর কাহিনী লিখতে বসে
সমকালের সমাজ আলোড়নকারী বিধবা বিবাহ আন্দোলন, বৈধব্যের যন্ত্রণাকে এড়িয়ে যেতে

পারেননি। ‘মেঘনাদ বধ নাটক’ পৌরাণিক নাটক হয়েও গভীর সমকালীনতায় উদ্ভীর্ণ। উনিশ শতকের যুগ পরিবেশে নারী এক অবলা জাতি। অবলার গতি হল স্বামী। নারীর যা কিছু শক্তি পিতা ও স্বামীকে ঘিরে আবর্তিত। সে যুগের সমাজ সত্যকে নাট্যকার পৌরাণিকতার মোড়কে তুলে ধরেছেন। প্রমীলা তাঁর স্বামী ইন্দ্রজিৎকে হারানোর আশঙ্কায় জানিয়েছে,—

“অবলার পতি সম নাহি অন্য ধন।

না প্রকাশি পতি পাশে কি আছে বেদন।।

পতির চরণ, করি হৃদয়ে ধারণ,

নাশি দুঃখ অনুক্ষণ।”^{১০৬}

‘মেঘনাদবধ নাটকে’ নাট্যকার ত্রৈলোক্যনাথ সহমরণ ও বিধবা বিবাহের প্রসঙ্গকে কাহিনী বৃত্তে বুনিয়েছেন। বীর ইন্দ্রজিৎের প্রয়াণের পর পুরোহিত জানিয়েছেন,—“কুমারের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার কাল নিকট আবার একটা সহমরণের কাণ্ড আছে, সেটাত সামান্য নয়।”^{১০৭} ১৮৫৬ সালে বিদ্যাসাগরের প্রচেষ্টায় ‘বিধবা বিবাহ’ আইনত স্বীকৃতি পায়। সমকালীন বাংলা নাটকের কাহিনী বৃত্তে বারে বারে ঘুরে ফিরে এসেছে বৈধব্যের যন্ত্রণা ও এই যন্ত্রণা মুক্তির উপায় হিসাবে বিধবা বিবাহের প্রসঙ্গ। ১৮৬৭ সালে প্রকাশিত ‘মেঘনাদবধ নাটকে’ ইন্দ্রজিৎ মারা যাবার পর প্রমীলা বৈধব্যের যন্ত্রণার করুণ অনুভব ব্যক্ত করে শাশুড়ী মন্দোদরী জানিয়েছে,—“আর্যো! ভেবে দেখুন বিধবা কন্যা আর বিধবা পুত্রবধূর মরণই ভাল। তাদের দেখলে জামাই ও পুত্রের শোক প্রতিদিন নতুন করে জ্বলতে থাকে। যখন আমি উপবাসে কাতর হয়ে শুষ্ক মুখে আর শুষ্ককণ্ঠে প্রাণ পতির উদ্দেশে রোদন কোরবো তখন তুমি কি তোমার মেঘনাদের জ্বালা ভুলবে!... আর্যো! প্রণাম করি, আশীর্ব্বাদ কর যেন জন্মান্তরে বৈধব্য যন্ত্রণা ভোগ না করি।”^{১০৮} এভাবেই পৌরাণিক কাহিনীর অন্তরালে সমকালীন বিধবার যন্ত্রণাবোধ, করুণ আর্তি ধরা দিয়েছে।

১৮৬৮ সালে প্রকাশিত হয় হারাণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের ‘বঙ্গকামিনী’ নাটক। বামাপুকুর লেন থেকে, শ্রীকালীকুমার চক্রবর্তী দ্বারা ‘বঙ্গকামিনী’ নাটকটি বি.পি.এমস যন্ত্রে মুদ্রিত হয়। এ নাটকের কাহিনীর মধ্যে উঠে এসেছে বিধবার সংকট চিত্র। ‘বঙ্গকামিনী’ ছয় অঙ্কে রচিত নাটক। এ নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র কামিনী রূপে গুণে অতুলনীয়। কামিনী, শিক্ষিতা গুণবতী নারী। কামিনীর জন্য উপযুক্ত পাত্র নির্বাচনের জন্য তার মাতা জাহ্নবী তৎপর। জাহ্নবী চায় তার কন্যার বিয়ে হোক উন্নত রুচিশীল ইংরেজি জানা কোনো শিক্ষিত পাত্রের সঙ্গে। অন্যদিকে কামিনীর পিতা গদাধর বিদ্যাবাগীশ, যেকোনো পাত্রের সঙ্গে কন্যার বিয়ে দিয়ে মুক্তি পেতে চান। গদাধর

বিদ্যাবাগীশের বন্ধু মুকুন্দরাম তর্কালঙ্কারের ভাষায়,—“আরে রেখে দ্যাও হে, মনোমত আর অমনোমত! যাতে তাতে ঘর থেকে বার কোত্তে পাল্লেই হোলো। ওগুলো জন্মে কেবল চিরকালটা বাপ মাকে জ্বলিয়ে পুড়িয়ে মারে বইত নয়। ওদের দ্বারা বাপ মায়ের কি উপকার হোতে পারে? রাত দিন কেবল দ্যাওরে দ্যাওরে! ওদের সঙ্গে কেবল খাওয়ার আর নেওয়ার সম্পর্ক।”^{১০৯}

এদিকে কামিনী তার পছন্দের পুরুষ সত্যশীলকে ভালোবাসে। সত্যশীলও কামিনীর প্রতি দুর্বল। কামিনীর অনিচ্ছা সত্ত্বেও অন্য একটি অযোগ্য পাত্রের সঙ্গে তার বিবাহ হয়। কামিনী ও সত্যশীল দুজনেই বিরহে কাতর হয়। বিরহ যাপনে কামিনী ও সত্যশীলের দেহের কৃষতা দেখা দেয়। অযোগ্য পাত্রের কাছে আত্মসমর্পণ করার চেয়ে মৃত্যুকে শ্রেয় বলে মনে করে কামিনী। সত্যশীলের ভবঘুরে মন শুধুমাত্র কামিনীকে আশ্রয় করে বাঁচে। নানান ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যে সত্যশীল ও কামিনীর দেখা হয়। কিন্তু সে সাক্ষাৎ সুখকর নয়। সত্যশীল জানে কামিনীর অন্যপাত্রের বিবাহ হয়েছে তবুও সে কামিনীর সাক্ষাতের জন্য ব্যাকুল হয় এবং একসময় প্রবল আত্মগ্লানী অনুভব করে সত্যশীল। আত্মগ্লানিতে সত্যশীলের মূর্ছাপ্রাপ্তি হয় ও মৃত্যু ঘটে। কামিনী সত্যশীলের মৃত্যুর জন্য নিজেকে দায়ী মনে করে। কামিনীর অশ্রুসিক্ত হৃদয়বিদারিত ও মামা শশিভূষণের সান্ত্বনা ও বিলাপের মধ্য দিয়ে নাটকটি শেষ হয়।

আমাদের আলোচ্য ‘বঙ্গকামিনী’ নাটকে দুজন বিধবা চরিত্র,—‘রঙ্গিনী’ ও ‘মোহিনী’কে আমরা পাই। সধবা ফুলকুমারীর সঙ্গে কথোপকথন সূত্রে এ নাটকের তৃতীয় অঙ্কে ‘রঙ্গিনী’ ও ‘মোহিনী’র সাক্ষাৎ মেলে। সধবা হয়েও ফুলকুমারীর জীবন করুণ পরিণতিতে উপনীত হয়েছে। এর পাশাপাশি বিধবা রঙ্গিনী ও মোহিনীর বৈধব্য জ্বালা প্রতিটি মুহূর্তে ফুটে উঠেছে আলোচ্য নাটকে। ফুলকুমারীর স্বামী থাকা সত্ত্বেও সে জনমদুখী। ফুলকুমারী বাপের বাড়িতে কোন আদর যত্ন পায়নি। বিবাহ পরবর্তী জীবনে সুখ লাভের আশায় জীবন অতিবাহিত করলেও তা পূর্ণ হয়নি। বার্লুকো উপনীত হওয়া স্বামীকে নিয়ে ফুলকুমারীর আক্ষেপ চিরন্তন নারী হৃদয়ের বেদনা উদ্ভাসিত,—“মেয়ে মানুষের সোয়ামীই সব, তা বিধেতা আমাকে তাতেও বঞ্চিত করেছে। যে থাকা না থাকা দুই সমান।”^{১১০} অন্যদিকে রঙ্গিনী বিধবা। বৈধব্য জ্বালা যন্ত্রণায় জর্জরিত। রঙ্গিনীর আক্ষেপের জায়গাটা আলাদা। রঙ্গিনীর কথাবার্তায়, তার প্রতিটি দীর্ঘ নিশ্বাসে হৃদয়ের মর্মবেদনার প্রকাশিত হয়েছে। রঙ্গিনী জানিয়েছে,—“ভাই, তোর তো তবু আছে, আমি যে একেবারে বঞ্চিত! দেখ, যে অকুল পাঁথারে ভাস্চে সে যদি একখান ভাঙ্গা নৌকাও পায়, তবু তার অনেক ভরসা হয়; কিন্তু আমি এ দুঃখের সাগরে রাত দিন ভাস্চি, নৌকো দূরে থাক্,

একখান কাঠও নেই, যে তা ধর্যে উঠে খানিক হাঁপ জিরতে পারি।”^{১১} একদিকে রঙ্গিনীর বৈধব্যযন্ত্রণা আর একদিকে ফুলকুমারীর স্বশুর বাড়ির অবহেলা সমান দুঃখ বহন করে এনেছে দুই নারীর জীবনে। বৈধব্য যন্ত্রণা যে কি—তা বিধবা মোহিনী জানে। তাই সে মনে প্রাণে প্রার্থনা করে, কোন নারীই যেন অকালে বিধবা না হয়। অকাল কুস্মান্ধ স্বামী হোক—তবুও ভালো কিন্তু বৈধব্য যন্ত্রণা যেন সহ্য করতে না হয়। কামিনীর অদৃষ্টের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে মোহিনী ও রঙ্গিনীর মন ভারাক্রান্ত হয়।

‘বঙ্গকামিনী’ নাটকে দেখা গেছে, গদাধর বিদ্যাবাগীশের মত সেকালের অভিভাবকেরা—নিজ কন্যাকে বাড়ির জঞ্জাল বলে মনে করতেন। তারা মনে করতেন, বাড়ির সমস্ত কাজকর্ম এবং আস্তাকুঁড় পরিষ্কার করবার পর একমুঠো খাবারের প্রার্থনা করাই মেয়ে জাতির ধর্ম। সেকালে অভিভাবকের দ্বারা অপাত্রে কন্যাদান মূলত নারী জাতির অধঃপতন ও বৈধব্য সংকটের আগাম অশনি সংকেতকে বহন করে আনত। সেকথাই নাট্যকার মূলত ‘বঙ্গকামিনী’ নাটকে তুলে ধরতে চেয়েছেন।

১৮৬৮ সালে প্রকাশিত হয় বিপিনমোহন সেনগুপ্তের ‘হিন্দু মহিলা নাটক’। বিপিনমোহন কলকাতা ‘আমাস্ট্রীট’ হতে ১৮৬৮ সালে বিপিনমোহন সেনগুপ্তের ‘হিন্দু মহিলা নাটক’টি প্রকাশিত হয়। এ নাটকের আখ্যাপত্রে লেখা হয়েছে,—“A DRAMA ON THE HINDOO FEMALES ENCOURAGED BY THE LATE JORASANKO THEATRICAL ASSOCIATION. BY BEPIN MOHUN SEN. হিন্দু মহিলা নাটক অর্থাৎ হিন্দু যোষাদিগের হীনাবস্থা ব্যঞ্জক দৃশ্যকাব্য। শ্রীবিপিনমোহন সেনগুপ্ত প্রণীত।”^{১২} বিপিনমোহন সেনগুপ্ত এ নাটক উৎসর্গ করেন তৎকালীন যোড়াসাঁকো নাট্যশালার অধ্যক্ষকে। উৎসর্গপত্রে নাট্যকার লিখেছেন,—

“সবিনয় নিবেদন যেতঃ।

হিন্দুমহিলাগণের বর্তমান দুর্ভাবস্থা বিষয়ে একখানি নাটক রচনা করিলে উৎকৃষ্ট রচয়িতাকে মহাশয়েরা দ্বিশত মুদ্রা পারিতোষিক প্রদান করিবেন, এই বিজ্ঞাপন “সোমপ্রকাশে” ও ইংরেজী সংবাদপত্রে দৃষ্টি করায় এ নাটকখানি প্রণীত হইল। নাটক লেখা এই আমার প্রথমোদ্যম; এতন্মধ্যে যে ক-একটি সচরাচর ইক্ষিত বিষয় সন্নিবেশিত হইল, তাহাতে বোধ হয় সম্বদয় মহোদয় মাঝেই প্রাপ্ত মহিলাগণের হীনাবস্থা সবিশেষ ? করিতে পারিবেন। অভিনয়-অনুপযোগী হওনাশঙ্কায় ইহাতে পদ্যাদি নানা ছন্দ সাধ্যপক্ষে পরিত্যাগ করিয়াছি, তবে যে স্থলে দুই একটি না রাখিলে নিতান্ত নাট্যালঙ্কার বিহীন হয়, এমত স্থানেই তত্তাবৎ নিবেশিত হইয়াছে। যাহা হউক যদি কিঞ্চিৎ

পরিমাণেও ইহা আপনাদিগের স্বদেশ হিতৈষী এই সাধিসী চেষ্টার কলোপ সম্বন্ধে সাফল্য সম্পাদন করে, তাহা হইলে স্বীয় বহায়াসে পূর্ণাভীষ্ট বোধে সমধিক সুখী হইব নিবেদন মিতি।

সোমড়া বাটী

ভবতামেকান্ত বশ

৩০এ বৈশাখ, শ: ১৭৮৮।

শ্রীবিপিনমোহন সেনগুপ্তস্য”^{১২}

‘হিন্দু মহিলা নাটকটি’র বিজ্ঞাপন সূত্রে জানা যায়, এ নাটকটির পরীক্ষক ছিলেন, সংস্কৃত কলেজের ইংরেজির অধ্যাপক প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী ও প্রেসিডেন্সী কলেজের সংস্কৃত অধ্যাপক কৃষ্ণকমল বিদ্যাবুধি ভট্টাচার্য। ‘হিন্দু মহিলা নাটক’ সাতটি অঙ্কে বিন্যস্ত। প্রতিটি অঙ্কে একাধিক গর্ভাঙ্ক রয়েছে। ‘হিন্দু মহিলা নাটক’ এক অর্থে উনিশ শতকের সমাজদর্পন মূলক নাটক। বাল্যবিবাহ, বিধবা সমস্যা, অপরিণত বয়সে গর্ভধারণ ও তার করুণ পরিণতি, বিধবাদের পদস্থলন, বেশ্যাবৃত্তি, বহুবিবাহ প্রভৃতি বিষয় এ নাটকের কাহিনীবৃত্তে উঠে এসেছে।

এ নাটকের কাহিনীসূত্রে জানা যায়,—কৃপারাম রায় প্রৌঢ়া গৃহস্থ। কৃপারামের দুই পুত্র, প্রসন্নকুমার ও বসন্তকুমার এবং দুই বিধবা কন্যা সুমতি ও গোলাপী। কৃপারামের সহধর্মিণী কমল। প্রসন্নকুমারের দুই স্ত্রী মোহিনী ও শশিমুখী। বসন্তকুমারের স্ত্রী প্রমদা। কৃপারামের বাড়ির যুবতী দাসী সহচরী এবং নাপেতানি হরমণি। ‘হিন্দু মহিলা নাটকটি’র কাহিনী শুরু হয়েছে সাংসারিক কোন্দলের মধ্য দিয়ে। কৃপারামের স্ত্রী কমল ও তার পুত্রবধূ শশিমুখীর সাংসারিক কলহে নারীদের লেখাপড়ার প্রসঙ্গ উঠে আসে। কমল বিশ্বাস করে মেয়েদের লেখাপড়া শেখালে তারা বিধবা হয়। তাই বিধবা গোলাপীর প্রতি মাতা কমলের কটাক্ষ,—“লেখাপড়া না শিখলে আর এমন দশা হয়েছে?”^{১৩}

সাংসারিক জটিলতার বাইরে গোপালচন্দ্র ও বেণীমাধব—এই দুই ছাত্র মেয়েদের স্কুল স্থাপনে যথেষ্ট আগ্রহী। গোপালের শিক্ষিত মস্তিষ্কে জরাজীর্ণ সমাজের কারণ হিসাবে উঠে এসেছে বাল্যবিবাহের কুফল ও বিধবা সংকটের কথা,—“বাল্য-বিবাহই বিধবা হবার ও ভ্রূণ হত্যার এবং অকাল মৃত্যুর নিদানভূত কারণ, তার সন্দেহ কি?”^{১৪} বেণীমাধব জানে যে, বাল্যবিবাহ নিবারণ, অবস্থানুসারে বিধবাবিবাহ প্রচলন স্ত্রীলোকের পরিধেয় সম্বন্ধে নতুন প্রণামী সংস্থাপন, বৈদিকদের পেটে পেটে সম্বন্ধ নিবারণ ও স্ত্রীশিক্ষা প্রচলিত করতে পারলে একদিন সমাজ মানসিকতার শ্রীবৃদ্ধি হবে। প্রতিবেশী বংশজ ব্রাহ্মণ নটবর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সপ্তমবর্ষীয়া কন্যা মনোরমার বিবাহ উপলক্ষে বিধবা গোলাপীর প্রশ্ন,—“হ্যাঁগা মনোরমার বিয়ে, মনোরমার

বয়েস কি, যে বিয়ে দেবে, সম্বন্ধই বা কবে হল; কথায় বলে ওট ছুঁড়ী তোর বিয়ে, এ যে তাই হল দেখি।”^{১৬} বিধবা গোলাপীর মনে মনে বাল্যবিবাহের বিপক্ষে যে ঝড় ওঠে তা নিজভাগ্যের পরিহাসে বহির্ভাগে প্রকাশ্যে চলে আসে। কিন্তু গোলাপীর বিধবা বোন সুমতি অন্য ধাঁচের। সুমতি সাত বছরের মেয়ের বিয়েতে আশ্চর্য নয়। সে অনায়াসে বলে, তিন চার বছর বয়সের মেয়েদের ও বিবাহ খুব একটা অস্বাভাবিক নয়। সাত বছরের মেয়ের বিয়ে দিয়ে নটবর বন্দ্যোপাধ্যায় তিনশ টাকা পণ নেবে। বিধবা গোলাপীর বিবাহের পরিবর্তে কৃপারাম আড়াইশ টাকা পণ নিয়েছিল। আবার প্রসন্নের প্রথমা স্ত্রী মোহিনীর ‘পরিবত্ত’ বিবাহ হয়েছিল। উনিশ শতকের সমাজব্যবস্থায় ‘পরিবত্ত’ বিবাহ অর্থাৎ যে পরিবার নিজ পুত্রের বিবাহ দেওয়া হবে সেই বৈবাহিক সম্পর্কে পুত্রবধূর দাদা বা ভাইয়ের সঙ্গে নিজ কন্যার বিবাহ দেবার নামই ‘পরিবত্ত’ বিবাহ। কিন্তু এত আলোচনার মধ্যেও বিধবা গোলাপীর মনে প্রশান্তি নেই। বিরহের দাবানলে যৌবনের তাড়নার কবলে পড়ে সে সততই জর্জরিত।

মনোরমার বিবাহের মণ্ডপে জানা যায় যে, পাত্র ষাট বছরের বয়স্ক প্রবীণ। ফলস্বরূপ নটবর বন্দ্যোপাধ্যায় কন্যা পাত্রস্থ করতে বেঁকে বসে। নটবর বন্দ্যোপাধ্যায় বিবাহ মণ্ডপে আরও ত্রিশটাকা বাড়তি নিয়ে বালিকা কন্যাটিকে তুলে দিতে প্রস্তুত হয় বয়স্ক পাত্রটির হাতে। পাত্রটিকে দেখে গোলাপীর অপছন্দ হয়। কিন্তু মনোরমার পিতা শুধুমাত্র অর্থের লোভে তিন শত ত্রিশ টাকায় নিজ কন্যাকে একটি চোখে চালশে ধরা হাবা (বধির) পাত্রে বিক্রয় করে।

কৃপারামের ছোট ছেলের বউ প্রমদার বয়স বারো উৎরে তেরোয় পড়েছে। কিন্তু সমাজের নিয়মে এই বাল্যবয়সেই মাতৃত্ব লাভ করবার জন্য তার স্ত্রীআচার চলছে। প্রমদা প্রথম রজঃস্বলা হলে কৃপারামের অর্থ্যদানের নিয়ম রয়েছে,—“আমার ছোট বৌমা অদ্য দুই দিবস হইল প্রথম রজোদর্শন করিয়াছেন, এসময় কালেজ বন্ধ হওয়ায় বসন্তও বাটীতে আছে, ইতিমধ্যেই যাহাতে একটি সূর্য্য অর্থ্য দেওয়া, হয় একটি শুভ দিন দেখুন।”^{১৭}

কলেজের ছাত্র বেণীমাধব নারীশিক্ষার বিষয়ে আগ্রহী ও যুক্তিশীল। একমাত্র লেখাপড়াই নারীজাতির কদর করতে শেখাতে পারে সমাজকে। কিন্তু কৃপারামের মতো লোকেরা নারীদের লেখাপড়া করাকে সম্মতি দেয় না। কৃপারামের ধারণা লেখাপড়া না শিখলে সহজে ব্যভিচারিনী হতে পারবে না এবং শিখলে অনায়াসে চিঠি লিখে পরপুরুষের সঙ্গে সঙ্গম করবে। তাছাড়া লেখাপড়া শিখে মেয়েরা বিধবা হয়েও একাদশী না করে ঢাকাই শাড়ি পরে সধবার মতো ঘুরে বেড়াবে। বিধবাদের পুনরায় বিবাহ হলে দেশটা রসাতলে যাবে। নানান তর্কবিতর্কের মধ্য

দিয়ে স্ত্রীশিক্ষা যে শাস্ত্রসম্মত, তা প্রমাণ হলে কৃপারামের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটে। অন্যদিকে মুখুয্যে বংশের কন্যা সন্তান কামিনী ঘরের বাইরে বের হয়ে যায়। কুলীন কন্যা কামিনীর স্বামীনবু বন্দ্যোপাধ্যায় বহুবিবাহ করায় কামিনীর কপালে চিরদুঃখ লেখা ছিল। কামিনীর স্বামী কামিনীকে চিনতেও পারত না সঠিকভাবে। বহু স্ত্রীর কারণে কামিনীর স্বামী শুধুমাত্র বিবাহিত স্ত্রীর কাছে পাত্রী স্বামীর মর্যাদায় স্থান পেত। কখনো এয়োস্ত্রীটির সুখের কারণ হত না।

কাহিনীর অগ্রগতিতে আমরা দেখতে পাই যে, বালিকা প্রমদা সন্তানসম্ভবা হয়ে পড়ে। তাকে ঘিরে বহু স্ত্রীআচার ইত্যাদি হয়। কামিনীর বেশ্যালেয়ে তার কুলীন স্বামীর আগমন ঘটে। কিন্তু বিধির নিয়মে কামিনীকে তার স্বামী চিনতেই পারে না। ধীরে ধীরে কামিনী তার স্বামী নবু বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিজ পরিচয় দেয়। কামিনী নিজ পরিচয় দিয়ে তার স্বামীকে এটা বোঝাতে চায় যে, বহুবিবাহের কারণে বহু স্ত্রীর ভয়ানক ভবিষ্যৎ পরিণতি ঘটছে। নবু বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত বহু কুলীন ব্রাহ্মণ বহু বিবাহের ফলে সমস্ত স্ত্রীদের সঙ্গে সহবাসও করতে পারে না। কিন্তু তারপরেও দেখা যায় অনেক স্ত্রী গর্ভবতী। নবু বন্দ্যোপাধ্যায় কামিনীর কাছে স্বীকার করে যে, —“আপনি জানেন না, কুলীদের সন্তানাদি কি সব পিতৃজাত হয়? কখনই নয়।”^{১৭} অর্থাৎ এয়োস্ত্রীরা যৌবনের ধর্মে স্বামীসঙ্গ না পেয়ে ব্যাভিচারিনী হয় ও গর্ভবতী হয়ে পড়ে। অনেকে কামিনীর মতো বেশ্যাবৃত্তি গ্রহণ করে। নবু বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত কুলীন ব্রাহ্মণরা ধনলোভে, খাদ্যলোভে বিবাহ করে থাকে। কামিনীর আত্মোপলব্ধির কারণে, তার স্বামীকে অন্য স্ত্রীদের সঙ্গে সহবাস করার কথা বলে, যাতে তার মতো অন্যান্য স্ত্রীরা মনোকষ্টে দৈহিক চাহিদায় ব্যাভিচারিণী না হয়ে পড়ে। পুরুষশাষিত সমাজে খানিকটা ব্যক্রিমী হয়ে কামিনী নিজে তার স্বামীর অল্পসংস্থানের ভার গ্রহণ করে।

কৃপারাম রায়ের বাড়ির যুবতী দাসী সহচরী। সহচরীর কাছে বিধবা গোলাপী কামিনীর কথা জানতে পারে। গোলাপী, কামিনীর জীবনযাত্রা বিষয়ে আগ্রহী। বিধবার দুর্দশার কবলে পড়ে গোলাপীর অস্থির মন সতত সুখের সন্ধান চায়। গোলাপী সহচরীর কাছে জানতে পারে যে, বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়ে কামিনী সুখেই আছে। সোনার সাতনরী, কাণবালা, ফুলঝুমকো, কোমরে সোনার চন্দ্রহার, দশটাকা দামের শাড়ি প্রভৃতি অলংকারে সজ্জিত কামিনী রূপের ছটায় চারিদিকে আলোকিত। কামিনীর এরূপ সুন্দর জীবনের গল্প শুনে আড়ম্বরহীন, একাদশীর মতো কঠিন ব্রত পালনের মতো নিজ জীবনের প্রতি গোলাপীর ঘৃণা ধরে যায়।

কাহিনীর অগ্রগতিতে আমরা দেখতে পাই যে, বসন্তের স্ত্রী প্রমদা অষ্টমমাসের গর্ভবতী।

প্রমদা নিজশিক্ষা ও গুণের কারণে স্বভাবেও চরিত্রে সুশীলা ও সুন্দরী। গোলাপী প্রমদাকে সম্মান করে। গোলাপী পড়াশুনোর মূল্য বোঝে। কিন্তু আড়ম্বরহীন জীবন থেকে মুক্তি পেতে গোলাপী পরামর্শ করে বেশ্যা কামিনীর কাছে যাওয়ার জন্যে। হর নাপ্তেনীর সঙ্গে গোলাপী পরামর্শ করে বেশ্যা কামিনীর কাছে যাওয়ার জন্যে। অতএব সুযোগ বুঝে হর নাপ্তেনীর সঙ্গে গয়নাগাটি নিয়ে গোলাপী কুলত্যাগী হয় ও বেশ্যাবৃত্তি গ্রহণ করে। গোলাপীর বিধবা বোন সুমতি বুঝতে পারে যে, তার বোন গোলাপী কুলত্যাগী হয়েছে। সাংসারিক কাজকর্মে নিপুণা সুমতির কাছে তার মা-বাবা, ভাই ও ভাজের চেয়ে আপন আর কেউ নেই। প্রসন্নের একমাত্র সন্তানের মৃত্যুতে শোকাচ্ছন্ন সুমতির হৃদয় বিদারিত হয়। বড় বৌ আত্মহত্যার চেষ্টা ও বসন্তের স্ত্রী তের বছর বর্ষীয়া প্রমদার সন্তান প্রসবের সময় অকাল মৃত্যু—এসবের মধ্য দিয়ে সুমতি নিজ স্বপ্নের সংসারের মৃত্যু দেখতে পায়। প্রসন্নকুমারের বড়বৌ মোহিনীর সন্ন্যাসিনী হয়ে যাওয়ার মধ্য দিয়ে নাটকের সমাপ্তি ঘটে।

১৮৭১ সালে প্রকাশিত হয় ‘সাক্ষাৎ-দর্পণ’ নাটক। নাটকের নামপৃষ্ঠায় নাট্যকারের নাম পাওয়া যায় না। কোনো এক অজ্ঞাত নাট্যকার দ্বারা এই নাটক রচিত হয়। নাটকটি কলিকাতা কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট হইতে দ্বৈপায়ণ যন্ত্রে শ্রী যদুনাথ রায় কর্তৃক মুদ্রিত হয়ে প্রকাশিত হয়। ‘সাক্ষাৎ-দর্পণ’ নাটকের বিজ্ঞাপনে নাট্যকার লিখেছেন,—“যে সকল ভয়ানক দোষ বিগর্হিত আচার ব্যবহার বর্তমান বঙ্গ সমাজে প্রচলিত আছে, এই ‘সাক্ষাৎ-দর্পণ’ নাটকে তাহাই সাধ্যানুসারে বর্ণন করিলাম।”^{১৮} উনিশ শতকের সমাজ ব্যবস্থায় বিভিন্ন কুপ্রথার প্রচলনের ফলে যে, সামাজিক অবক্ষয়ের সৃষ্টি হয়েছিল তার দৃষ্টান্ত ধরা পড়েছে সমকালীন বহু নাটকে। সমাজের রক্তচক্ষুর শাসনে দুমড়ে যাওয়া নারী ও পুরুষের সম্পর্কের টানাপোড়েন, অল্প বয়সে বিবাহ, বিধবা সমস্যা, অসহায় নারীত্বের জৈবিক চাহিদা ও পদস্থলন ধরা পড়েছে এ নাটকে।

‘সাক্ষাৎ-দর্পণ’ নাটকটি পাঁচ অঙ্কে বিন্যস্ত। এ নাটকের বিষয় বস্তুতে আছে, ধনাঢ্য ব্যক্তি হরিহর চট্টোপাধ্যায় ও তাঁর স্ত্রী মোক্ষদার কন্যাধ্ব কামিনী ও নলিনীর কাহিনী। হরিহর, তাঁর প্রতিবেশী হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের পুত্র সুবোধের সঙ্গে তাঁর কনিষ্ঠ কন্যা নলিনীর বিবাহ সম্বন্ধ স্থির করেন। কামিনী বিবাহিতা, কিন্তু কামিনীর স্বামী রামনারায়ণ ভট্টাচার্যের পুত্র দোয়ারি একজন মাতাল, চরিত্রহীন, লম্পট। কামিনী ছোটবেলা থেকেই সুবোধের প্রতি আকৃষ্ট। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কামিনী ও সুবোধ একে অপরের প্রতি গভীর টান অনুভব করে। তারা একে অপরকে কাছে চায়।

অন্যদিকে, সুবোধ কামিনীর বোন নলিনীকে বিবাহ করতে অপ্রস্তুত। কারণ সে কামিনীকে ভালোবাসে। কামিনী ও সুবোধ পরস্পরের জন্য ব্যাকুল হলে, কামিনীর দাসী লক্ষ্মীর মধ্যস্থতায় তাদের সাক্ষাত ঘটে। সুবোধ ও কামিনী পরস্পরের সম্পর্ক গভীর হয় ও মনের যত ভাব তারা বিনিময় করে একে অপরের মধ্যে। কিন্তু কামিনীর লম্পট স্বামী দোয়ারী তাদের সম্পর্কের কথা জানতে পেরে, তরোয়াল দিয়ে কামিনীকে হত্যা করে। সুবোধ রাগে ও শোকে দোয়ারীকে হত্যা করে, নিজে আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়।

‘সাক্ষাৎ-দর্পণ’ নাটকে বিধবা চরিত্র হিসাবে নাট্যকার তুলে এনেছেন, রামনারায়ণ ভট্টাচার্যের কন্যা বামাসুন্দরীকে। এ নাটকের তৃতীয় অঙ্কে বিধবা বামাসুন্দরীর বৈধব্য জীবনের পরিচয় দিয়েছেন নাট্যকার। বামাসুন্দরীর বৈধব্য জীবনের দুঃখ কষ্টের কথা নাট্যকার তুলে ধরেছেন তাঁর স্বামী হারানোর স্মৃতি চিন্তনের সূত্রে। বামাসুন্দরীর অপূর্ণ জীবনে বারে বারে মৃত স্বামীর স্মৃতি ঘুরে ফিরে এসেছে। বিধবা নারীর শ্বশুর বাড়িতে ঠাই হয় না। বাধ্য হয়ে আশ্রয় নিতে হয় বাপের বাড়িতে। কিন্তু বাপের বাড়িতে আসবার পর জোটে অবজ্ঞা, লাঞ্ছনা ও মাত্রাতিরিক্ত পরিশ্রম। বাড়ির সমস্ত কাজকর্মের পর খাবার জোটে। পরণের কাপড় জোটে ছেঁড়া। মুখ ফুটে কিছু চাইবার অবকাশ নেই, অসুখ বিসুখে বন্দি নেই, পেট ভরে খাবার নেই—রয়েছে শুধু গঞ্জনা। বিধবা নারীদের দুবেলা ভাত খাবার নিয়ম নেই। লোকের পাতে মাছের মুড়ো, কিন্তু বিধবা নারীকে নিরামিষ শাক-চচ্চড়ি দিয়েই সারাটা জীবন ভাত খেতে হবে। তার ওপর ভয়ঙ্কর একাদশীর নিয়ম। তেষ্ঠায় বুক ফেটে গেলেও একফোঁটা জল গলায় ঢালা জাবে না অবলা বিধবা রমণীদের। খাওয়া-দাওয়া, সাজ-পোষাক সবকছু বর্জন করার পরেও বিধবা রমণীদের জোটে পায় লাঞ্ছনা গঞ্জনা ও অপমান।

স্বামীর ছায়ায় বেঁচে থাকা রমণীর জীবন স্বর্গসুখে ভাসে। শ্বশুরবাড়ি অথবা বাপের বাড়িতেও সেই সধবা রমণীর কদর থাকে। কিন্তু বিধবা হবার পর আশ্রয়হীন হয়ে সেই রমণীর যখন পুণরায় বাপের বাড়ির দ্বারস্থ হতে হয়, সেইখানে জোটে অবহেলা, অবমাননা এবং লাঞ্ছনা। ‘সাক্ষাৎ-দর্পণ’ নাটকে বামাসুন্দরীর বৈধব্য জীবন বাপের বাড়ির অন্দরমহলে কেটেছে। বাপের বাড়িতে ফিরে এসে, বামাসুন্দরী বাড়ির সমস্ত কাজকর্ম করেছে, নিজের মত ভালো থাকার চেষ্টা করেছে। বাড়ির সবাই দাসীর মত ব্যবহার করেছে বামাসুন্দরীর সঙ্গে। দুঃখ কষ্টের কথা বামাসুন্দরী কাউকে বলতে না পারলেও সে তার বৌদি কামিনীকে ভালোবেসেছে। অবসরে তাঁর মনের দুঃখকথা ব্যক্ত করেছে। এ ভাবেই তাঁর জীবন অতিবাহিত হয়েছে।

১৮৭৪ সালে প্রকাশিত হয়, গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের ‘বিধবার দাঁতে মিশি’ নাটক। নাট্যকার ‘বিধবার দাঁতে মিশি’ নাটকটিকে বলেছেন দৃশ্যকাব্য। ‘বিধবার দাঁতে মিশি’ নাটকের কাহিনী সৌদামিনী নামক এক বিধবাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে। বিধবা হওয়ার কারণে সৌদামিনীর জীবনে যে বিপর্যয় নেমে আসে, তারই প্রতিচ্ছবি দেখতে পাওয়া যায়, এ নাটকে। যদিও পরবর্তী সময়ে নাট্যকার সৌদামিনীর স্বামীকে ফিরিয়ে এনেছেন নাটকের কাহিনীকে মিলনান্ত করার প্রয়োজনে। ‘বিধবার দাঁতে মিশি’ নাটকটির কাহিনীর পরিধিতে সৌদামিনীর বিধবা হওয়া ও বিধবা পরবর্তীকালীন সময়ের সংকট চিত্র তুলে ধরেছেন নাট্যকার।

প্রথম অঙ্কের কাহিনী শুরু হয়েছে শিবপুর বরদাকান্তের বৈঠকখানায়। বরদাকান্ত, গোরচাঁদ, উদ্ভুস্বর—প্রত্যেকেই মদ খেয়ে নিজেদের মধ্যে নানান আলোচনায় ব্যস্ত। আলোচনা থেকে জানা যায়, জাগতিক সমস্ত বিষয়ের জ্ঞান বিনিময় এরা মদ খেয়েই করে থাকেন। শিক্ষিত হবার দরুণ সুরাপানকে এরা বুদ্ধিদীপ্ততার লক্ষণ বলে মনে করেন। মাতাল হয়ে এরা মেয়ে মানুষের প্রতি কুদৃষ্টি নিক্ষেপ করে থাকেন। এই অঙ্কের দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে, দেখা যায় শিবপুর কমলাকান্তের শয়নঘর। ঘুমন্ত কমলাকান্তের খাট নিয়ে মাতাল গোরচাঁদ, উদ্ভুস্বর ও বিধুর যাত্রা ও হরিবোল ধ্বনি দিয়ে বেলেগ্লাপনা করেছেন। মাতাল হয়ে এরা দিক্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য। মাতাপিতার সম্মান এরা রাখতে জানে না। মদই এদের ধ্যান জ্ঞান—সবকিছু।

দ্বিতীয় অঙ্কের কাহিনী, শুরু হয়েছে শিবপুর হেমঙ্গিনীর শয়নঘরে, হেমঙ্গিনী ও যামিনী নিজেদের দুঃখের কথা আলোচনার মধ্য দিয়ে। একে-অপরকে স্বাস্থ্যনা দিয়েছে। নিজেদের স্বামী থাকা সত্ত্বেও তাদের কপালে যা দুর্ভোগ তা তাঁরা অদৃষ্ট বলেই মনে করে। কামিনীর স্বামী যায় মাতাল গোরচাঁদ ধূর্ত ও লম্পট। নিজের বিষয় সম্পত্তি মদের নেশায় খুইয়ে অন্যের সম্পত্তি গ্রাস করায় সে মত্ত। তাই সে তার বন্ধুদের মদ খেতে শেখায়। গোরচাঁদ জানে, মদ খেলে যক্ষা হয়, লিভার নষ্ট হয় এবং তাতে লোকে প্রাণ হারায়। ফলে গোরচাঁদ বরদাকান্তকে মদ খাইয়ে বিষয় সম্পত্তি হস্তগত করার ফন্দি আঁটে। বিষয় সম্পত্তির সঙ্গে সঙ্গে গোরচাঁদ ‘সৌদামিনী’ নামক বিধবা রমণীর প্রতি লোলুপ দৃষ্টি হানে। মাতাল ও চরিত্রহীন গোরচাঁদ সৌদামিনীকে বাগে পেতে চায়। বরদাকান্তের জ্যেষ্ঠ ভাতৃজায়া সৌদামিনীর প্রতি গোরচাঁদের লোভী দৃষ্টিভঙ্গি অশ্লীলতার মাত্রা অতিক্রম করে। গোরচাঁদের চারিত্রিক দোষ এতটাই যে, সে তার স্ত্রীকে হত্যা করতেও একমুহূর্ত ভাবে না।

বিধবা সৌদামিনী শিক্ষিত। কিন্তু সৌদামিনীর জীবন শান্তিহীন। শান্তি বিঘ্নিত হবার

প্রধান কারণ সৌদামিনী পতিসুখ বঞ্চিত। তাই তার জীবনধারণের ইচ্ছাটাও ক্ষীণ,—“বিধির বিধানে আমি বিধবা-নবীন জীবনে বিধবা-পাপিনী-অভাগিনী। আমার আর এ পাপজীবন ধারণে কি প্রয়োজন?...বঙ্গ রমণীর এক পতির চরণ কমলই সম্বল, পতিই সুখদাতা—পতিই গতি-পতিই স্বর্ষ্ব ধন। সেই হৃদয়রাজ - জীবন রাজপতি বিহনে আমার আর জীবন ধারণে কি প্রয়োজন? কি সুখ?”^{১৯} প্রতিটি ক্ষণে দুঃখ তাকে হাতছানি দেয়। যে প্রতিনিয়ত পরম করুণাময়ী ঈশ্বরের কাছে নিজ ভাগ্য প্রসঙ্গে প্রশ্ন করে, আক্ষেপ করে ও হতাশায় দীর্ঘ হয়।

এরপর দেখা যায়, বিরাজমোহিনী কর্তৃক সৌদামিনী একটি চিঠি পায়। চিঠিতে গোরাচাঁদের নোংরা প্রস্তাবের ইঙ্গিত পায়। কিন্তু সৌদামিনীর কাছে এই প্রস্তাব কণ্টকসম। সে নিষ্কলঙ্ক। ফলে সৌদামিনী ঘর ছাড়ার পরিকল্পনা নেয়। সৌদামিনী বাপের বাড়ী যাওয়ার সাহস পায় না লোকনিন্দার ভয়ে। ফলে সে কাশীতে মাতুলালয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। দাসী ছদ্মবেশে সৌদামিনী কাশীর পথে অগ্রসর হওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। হাবড়া রেলওয়ে স্টেশন সন্নিহিত রাজপথ যেখানে সৌদামিনী ছদ্মবেশে কাশী যাওয়ার উদ্দেশ্যে গঙ্গার ঘাটে বসেছিল, সেখানে ভাগ্যবিড়ম্বনায় সৌদামিনীর সঙ্গে গোরাচাঁদের দেখা হয়। কিন্তু মাতাল গোরাচাঁদ ছদ্মবেশী সৌদামিনীকে চিনতে পারে না। ধূর্ত গোরাচাঁদ সৌদামিনীর মুখের অংশ খানিকটা দেখতে পেলেও সৌদামিনী কৌশলে বাঁচে। লোলুপ গোরাচাঁদের অভব্য ব্যবহার সৌদামিনীকে সহ্য করতে হয়,—“দেখি শালী! তোর মুখখানা কেমন দেখি?”^{২০} অদৃষ্টের কৃপায় সৌদামিনী রক্ষা পায় এবং পলায়ন করে।

বরদাকান্তের অত্যধিক মদ্যপানে মৃত্যু হয়। বরদাকান্তের স্ত্রী হেমাঙ্গিনী বিধবা হবার শোকে বিহ্বল হয়ে পড়ে। বৈধব্য যাতনার ভয়ে, যামিনীর ঘরে ঢুকে হেমাঙ্গিনী আত্মহত্যার চেষ্টা করে। বিধবা সৌদামিনী কাশিবাসী হলে সেখানে বাঙালীটোলায় তার স্বামী শারদাকান্তকে খুঁজে পায়। সৌদামিনী জানত তার স্বামী মৃত। কিন্তু মৃত স্বামীকে পুণরায় জীবিত জেনে সে মুচ্ছা যায়। সৌদামিনীর স্বামী দেশান্তরিত হওয়ার পর কোনো খোঁজ না পাওয়ার দরুন সৌদামিনীকে তার বাড়ীর লোকেরা জানায় যে তার স্বামী মৃত। সৌদামিনী তার স্বামীকে পুণরায় ফিরে পেয়ে হারানো সুখ ফিরে পায়। কাহিনীর অন্তিমে দেখা যায়, গোরাচাঁদ বিষ খেয়ে মারা যায়। সৌদামিনী তার স্বামীকে ফিরে পায়। স্বামীর মৃত্যুর খবরে বিধবা সৌদামিনীর দাঁতে মিশি পড়েনি। দুখ জল ঘি খেয়ে দিন কাটাতো সে। নিয়মাচারে বদ্ধ সৌদামিনী স্বামীকে ফিরে সে মুক্ত জীবনচারী হয়ে ওঠে। শেষপর্যন্ত সৌদামিনী ও শারদাকান্তের মিলনের মধ্য দিয়ে নাটকের সমাপ্তি হয়।

গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ‘বিধবার দাঁতে মিশি’ নাটকটিতে উনিশ শতকের সামাজিক অবক্ষয়ের একটি দিক হিসাবে ‘মদ্যপান’কে দায়ী করেছেন। মদ্যপানের কারণে ঘরে ও বাইরে নানান সমস্যার দিকটি উন্মোচন করেছেন। সেইসঙ্গে বৈধব্য যন্ত্রণা ও বিলাপ সৌদামিনীর মত বহু বিধবা নারীর জীবন যন্ত্রণার প্রতিচ্ছবি ফুটিয়ে তুলেছেন নাট্যকার। শ্রীগোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের ‘বিধবার দাঁতে মিশি’ নাটকে বিধবা সৌদামিনীকে ভোগ করার তাড়না দেখা যায় মাতাল গোরচাঁদের মধ্যে। সৌদামিনীর সতীত্বকে নষ্ট করতে গোরচাঁদের লক্ষ্য স্থির। যার ফলে বিধবা সৌদামিনীকে বহুকষ্টে ছদ্মবেশে পালিয়ে যেতে হয়েছে। মূলতঃ নাট্যকার বিধবা সৌদামিনীর দুরাবস্থার কথা বর্ণনা করেছেন। সমাজের কিছু স্বার্থপর মানুষের স্বার্থসিদ্ধির বিষয়টিও তুলে ধরেছেন নাট্যকার। সৌদামিনীর বৈধব্য অবস্থায় তার দুঃখ ও স্বামী ফিরে আসার পর তার সুখ অর্থাৎ দাঁতে মিশি লাগাবার প্রতীকী ব্যঞ্জনটি ‘বিধবার দাঁতে মিশি’ নাটকে ব্যাপ্তি লাভ করেছে।

১৮৭৪ সালে প্রকাশিত হয় উপেন্দ্রনাথ দাসের ‘শরৎ সরোজিনী’ নাটক। ‘দুর্গাদাস দাস প্রণীত’ এই ছদ্মনামে গ্রন্থাকারে এ নাটক প্রকাশ করেন উপেন্দ্রনাথ দাস। ১৮৭৬ সালে উপেন্দ্রনাথ দাস ইংলণ্ডে থাকাকালীন ‘শরৎ সরোজিনী’ নাটকটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। স্বদেশপ্রেমী সৎ আদর্শবান দয়ালু জমিদার শরৎকুমার দত্ত ও তাঁর বাড়িতে পালিত কন্যা সরোজিনীর কাহিনী অবলম্বনে ‘শরৎ সরোজিনী’ নাটকটি রচিত। জমিদার মতিলাল দে শরৎকুমারের শত্রু। চারিত্রিক দিক দিয়ে লম্পট, লোভী, চরিত্রহীন, নিষ্ঠুর মতিলাল দে আনরপুর গ্রামের জমিদার। পতিপরায়ণা বিন্দুবাসিনী মতিলালের স্ত্রী। কিন্তু লম্পট মতিলাল বিন্দুবাসিনীকে ছেড়ে পরস্ত্রীর প্রতি লোলুপ। বিধবা ভুবনমোহিনীর সতীত্ব কেড়ে নিয়ে মতিলাল তাঁকে রক্ষিতা করে রেখেছে। বিধবা ভুবনমোহিনীর জীবনের করুণ পবনিত মতিলালের লোলুপ দৃষ্টিতে সদা উজ্জ্বল। মতিলাল তার আশ্রিত যুবক বিনয়ের কাছ থেকে ছল করে সমস্ত সম্পত্তি নিজ নামে করে নেয় ও বিনয়কে প্রাণে মারবার কৌশল করে। অসহায় বিনয় পালিয়ে গিয়ে কলকাতায় শরৎকুমারের আশ্রয়ে ঠাই পায়। পরোপকারী, দেশপ্রেমিক শরৎ বিনয়কে তাঁর গ্রামের বাড়িতে পাঠিয়ে দেয়। শরৎকুমারের বোন সুকুমারী ও বিনয়ের মধ্যে প্রণয় সম্পর্ক গড়ে ওঠে। অপরদিকে, লম্পট মতিলাল শরৎকুমারের বোনের প্রতি লোলুপ হয়ে তাদের ক্ষতি করতে উদ্যত হয়। কিন্তু ভুবনমোহিনীর কল্যাণে বিনয় ও সুকুমারী রক্ষা পায়। মতিলালের মৃত্যু ঘটে। অন্যদিকে, শরৎকুমার মুসলমানী প্রজাদের দ্বারা অপহৃত হয় ও বহুদিন পর নিস্তার পায়। সরোজিনী তার প্রণয়ের কথা মনে চেপে রাখে। সে শরৎকুমারকে ভালোবাসে। কিন্তু জানাতে না পেরে বাড়ি ছেড়ে চলে

যায়। বহুদিন পর সরোজিনীর শোকে পাগল শরৎকুমারে কাছে ছদ্মবেশে ফিরে আসে সরোজিনী। বিনয়-সুকুমারী ও শরৎ সরোজিনীর মিলনের মধ্য দিয়ে নাটকের সমাপ্তি ঘটে।

‘শরৎ-সরোজিনী’ নাটকের বিধবা চরিত্র ‘ভুবনমোহিনী’। সমাজের চোখে ভুবনমোহিনী অসতী। অসতী বলেই সে একঘরে, কোন্ঠাসা। বিধবা ভুবনমোহিনী যখন পুত্রতুল্য বিনয়কে কাছে ডাকেন তখন বিনয় স্বাভাবিক নিয়মে দ্বিধাগ্রস্ত হয়। মতিলালের লোলুপ দৃষ্টিতে ভুবনমোহিনী সতীত্ব হারায়। কিন্তু সমাজের চোখে মতিলাল নির্দোষ, ভুবনমোহিনী দোষী। বিনয় ভুবনমোহিনীর কাছে যেতেও ঘৃণা বোধ করে। সমাজ ভুবনমোহিনীকে মতিলালের ‘রক্ষিতা’ বলে আখ্যা দিয়েছে। শরৎকুমারের বিমাতা ভুবনমোহিনীর সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ার ফলে শরৎকুমার বিমাতাকে হীন দৃষ্টিতে দেখত। ভুবনমোহিনীর সঙ্গে দেখা করার সুবাদে সমাজে শরৎকুমারের বিমাতার চরিত্র নিয়ে নানান প্রশ্নে শরৎকুমার বিচলিত হয়ে বিমাতাকে পাপীয়সী বলতে দ্বিধা করেনি,—“ভুবনমোহিনী বলে একটা রক্ষিতা স্ত্রী আছে। তার বাড়িতে পাপীয়সী যাওয়া আসা করতে লাগল। লোকে কানাকানি আরম্ভ করলে।”^{১১১}

অসহায় বিধবা ভুবনমোহিনী লোকসমাজে বেশ্যায় পরিণত হয়। ফলে ভুবনমোহিনীর সঙ্গে যারা দেখা করতে যায় তারাও অসতী ও ভ্রষ্টা রূপেই আখ্যা পায়। শরৎকুমারের বিমাতার ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। বাপের বাড়ি ও শ্বশুরবাড়ি কোথাও তার ঠাঁই হয়নি। কিন্তু ভুবনমোহিনী নিজেকে বাঁচিয়ে রাখে। সে চায় তার অপরাধীকে শাস্তি দিতে,—“এই ভেবে মনে মনে প্রতিজ্ঞা কল্লেম, (দন্তঘর্ষণ) যে মতিলালের রক্তে চান করে আমার মেয়েজন্ম সার্থক করব।”^{১১২} ভুবনমোহিনী ছল করে মতিলালের বুকে বিশ্বাস স্থাপন করে যে, সে মতিলালকে হৃদয় থেকে ভালোবাসে। সমাজের কটুক্তি, হেয়জ্ঞান, নানা ব্যঙ্গবিদ্রুপেও ভুবনমোহিনী ভেঙে পড়েনি। সে শুধুমাত্র লম্পট মতিলালের চরম শাস্তি চায়। নিজহাতে মতিলালের জীবনের চরমতম সর্বনাশ ডেকে এনে তাকে শাস্তি দিতে চায়। লম্পট মতিলাল ভুবনমোহিনীর সর্বনাশ করার পর পুণরায় অন্য নারীর প্রতি লোলুপ দৃষ্টি দেয়। মতিলাল স্বগত ভাষণে জানিয়েছে,—“ভুবনমোহিনীকে আর ভাল লাগে না। চিরকাল কি একজনকে ভালবাসা যায়?”^{১১৩} লম্পট মতিলালের মত মানুষদের নিজ কন্যাসম নারীর প্রতিও কামবাসনা জাগে। বিকৃতমনস্ক লম্পট মতিলালের মত মানুষেরা বিধবা নারীদের ভোগের সমাগ্রী হিসাবের দেখে। বিধবা নারীদের হস্তগত করে, ফুসলিয়ে ভ্রষ্ট করার মধ্য দিয়ে আনন্দ লাভ করে। প্রতিশোধে বিধবা ভুবনমোহিনী, মতিলালের সর্বনাশের পথ খোঁজে। ভুবনমোহিনী সুযোগ বুঝে কিরীচ দিয়ে মতিলালকে আঘাত করে হত্যা করে ও

প্রতিশোধ নেয়। শেষে নিজেও কিরীচ দিয়ে নিজ বুকে আঘাত করে মৃত্যুশয্যা শায়িত হয়। একজন প্রতিশোধপরায়ণা বিধবা নারীর জীবনের করুণ পরিণতি এ নাটকে নাট্যকার অসামান্য দক্ষতার সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন।

উপেন্দ্রনাথ দাসের ‘শরৎ সরোজিনী’ নাটকটি বহু পত্র-পত্রিকায় সমালোচিত হয়েছিল। অমৃতবাজার পত্রিকা, প্রতিধ্বনি, সোমপ্রকাশ, সাপ্তাহিক সমাচার, সাধারণী, হাবড়া হিতকারী, এডুকেশন গেজেট, ভারত সংস্কারক, সহচর, আর্য্যদর্শন, মধ্যস্থ, বান্ধব, ঢাকাপ্রকাশ এসব পত্রিকায় ‘শরৎ সরোজিনী’ নাটকটির ভূয়সী প্রশংসা করা হয়েছে। ‘শরৎ সরোজিনী’ নাটকটি গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে ১৮৭৫ সালে, ২, ৩, ২৩ জানুয়ারি ও ২৭ ফেব্রুয়ারি অভিনীত হয়। সমালোচক শঙ্কর ভট্টাচার্য লিখেছেন,—“এই সময়েই গোলাপ বেঙ্গল থিয়েটার ছেড়ে গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে যোগ দেন। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দের ২রা জানুয়ারি গ্রেট ন্যাশনালে উপেন্দ্রনাথ দাসের ‘শরৎ-সরোজিনী’ নাটকের প্রথম অভিনয় হয়। এই নাটকে ‘সুকুমারী’-র ভূমিকাভিনয়ে গোলাপ অভূতপূর্ব সাফল্য লাভ করে বাঙলা নাট্যজগতে সুকুমারী নামে পরিচিত হয়ে পড়েন। উপেন্দ্রনাথের উদ্যোগে গ্রেট ন্যাশনাল দলেরই অভিনেতা গোষ্ঠাবিহারী দত্তের সঙ্গে সুকুমারীর তিন আইনে বিবাহ হয় ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে। এখান থেকে গোলাপের নাম হয় নাম হলো সুকুমারী দত্ত।”^{১২৪} ১৮৭৫ সালে ১৫ই মে, ‘শরৎ সরোজিনী’ নাটকটির অভিনয়ের পর উপেন্দ্রনাথ দাস ‘গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে’র নাট্যমঞ্চ থেকে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী এক জ্বালাময়ী বক্তৃতা প্রদান করেন। পরবর্তী কালে এই নাটকটি ১৮৮৫ সালের ১৪ই আগস্ট ‘দি ইণ্ডিয়ান (লেট গ্রেট) ন্যাশনাল থিয়েটারে’ পুনরায় মঞ্চস্থ হয়।

উপেন্দ্রনাথ ছিলেন, কলকাতার যুবক রিফর্মারদের মধ্যে প্রধান ব্যক্তি। উপেন্দ্রনাথ ‘র্যাডিক্যাল লীগ’ স্থাপন করেন। তিনি ছিলেন অসাধারণ বাগ্মী। ১৮৭৬ সালে গ্রেটন্যাশনাল থিয়েটারে ‘সুরেন্দ্র বিনোদিনী’ অভিনয়ের জন্য তিনি ইংরেজ সরকারের বিরাগ ভাজন হয়ে কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন। বাংলা নাটকে রাজদ্রোহের ঘটনায় ভীত হয়ে ইংরেজ সরকার ১৮৭৬ সালে ‘অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইন’ চালু করেন। উপেন্দ্রনাথ দাস ছিলেন বিধবা বিবাহ আন্দোলনের সমর্থক। ১৮৬৮ সালে উপেন্দ্রনাথের প্রথমা স্ত্রীর প্রয়াণ ঘটে। এরপর উপেন্দ্রনাথ এক নিম্নজাতির বিধবা স্ত্রীকে বিবাহ করেন। শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর ‘আত্মচরিত’ গ্রন্থে উপেন্দ্রনাথ দাসের ‘বিধবা বিবাহ’ সম্পর্কে লিখেছেন,—“এক দিন দুপুর বেলা উপেন কতিপয় বন্ধুসহ সংস্কৃত কলেজে আসিয়া আমাকে এল। এ ক্লাস হইতে ডাকিয়া পাঠাইলেন। বলিলেন, “তুমি শুনে সুখী

হবে, আমি এক বিধবাকে বিবাহ করতে যাচ্ছি। মেয়েটি ভবানীপুরে আছে, চুরি ক’রে আন্তে হবে। তার মায়ের মত আছে; কিন্তু মামা অভিবাবক, তাঁর মত নাই।...তৎপর দিন খিচুরী বিবাহ হইল। এরূপ শোনা গেল, মেয়েটি কায়স্থজাতীয়া; যদিও পরে জানা যায় যে তাহা নহে, তদপেক্ষা নিম্নজাতীয়া। কায়স্থদের’ কন্যা ইহা শুনিয়া উপেনের মনে হইল, তবে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মতে বিবাহ করিলে আইনসিদ্ধ হইতে পারে। সুতরাং পরদিন প্রাতেই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মতে বিবাহের বন্দোবস্ত হইল। তদনুসারে পুরোহিত ও ঠাকুর আসিয়া একটা বিবাহক্রিয়া হইল।”^{১২৫} নাট্যকার নির্দেশক অভিনয় শিক্ষক উপেন্দ্রনাথ দাস ছিলেন সেকালের প্রখ্যাত ব্যারিষ্টার শ্রীনাথ দাসের পুত্র। শ্রীনাথ দাস ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বিশিষ্ট বন্ধু। ‘বিধবা বিবাহ’ আন্দোলনের অন্যতম কাণ্ডারী ছিলেন উপেন্দ্রনাথ দাস। উপেন্দ্রনাথ বিধবা বিবাহ করার জন্য শ্রীনাথ দাসের দ্বারা ত্যাজ্যপুত্র হন। বিদ্যাসাগর শত চেষ্টা করে পিতা-পুত্রের মিলন ঘটাতে পারেননি।

১৮৭৫ সালে একটি নাটক প্রকাশিত হয়, অঙ্কাতনামা রচিত ‘বিধবা বঙ্গবালা’ নাটক নাটকটি আমাদের হাতে আসেনি। তাই এ নাটকটিকে আমরা আমাদের আলোচনার বাইরে রেখেছি।

১৮৭৬ সালে প্রকাশিত হয় জনৈক ভদ্রমহিলা প্রণীত ‘সন্তাপিনী নাটক’। আচার্য সুকুমার সেন মনে করেন, ‘চির সন্ন্যাসিনী’ (১৮৭২) নাটক রচয়িতা লক্ষ্মীমণি দেবী ‘সন্তাপিনী নাটক’ (১৮৭৬) এর রচয়িতা। সমকালে অনেকে এই নাটকটিকে পুরুষের বেনামী রচনা বলে সন্দেহ প্রকাশ করা হয়েছিল। সুকুমার সেন সন্দেহ নিরসন করে লিখেছেন,—“মেয়েলি ছড়ার ছড়াছড়ি এবং নারীসুলভ বাগ্‌ভঙ্গি হইতে মনে হয় যে রচনাটি মেয়েরই হাতের, পুরুষের বেনামি নয়।”^{১২৬} ‘সন্তাপিনী নাটক’ বিধবা বিবাহের পক্ষে রচিত। পুনর্বিবাহিতা নারীর সামাজিক স্বীকৃতি এবং তাঁদের সন্তান ধারণের ছবিকে বাঙ—ময় করে তুলেছেন নাট্যকার। দানশীলা মহারানী স্বর্ণময়ী দেবীকে এই নাটক নিবেদন তথা উৎসর্গ করা হয়েছে। প্রসঙ্গত স্মরণীয়, মহারানী স্বর্ণময়ী দেবী ১৭ বৎসর বয়সে বিধবা হন। তিনি কাশীম বাজারের কুমারের স্ত্রী ছিলেন। ১৮৪৭ সালে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী তাঁর মৃত স্বামীর সম্পত্তি অধিকার করে নিলে স্বর্ণময়ী আইনী লড়াই লড়ে স্বামীর হত সম্পত্তি ফিরে পান। অতীব দানশীলা স্বর্ণময়ী দেবী বিধবা বিবাহের সমর্থক ছিলেন। তিনি বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহ আন্দোলনে অর্থসাহায্য করেছিলেন।

বৈশাখ ১২৮৩ বঙ্গাব্দে ‘বামাবোধিনী পত্রিকায়’ ‘সন্তাপিনী নাটক’ এর গ্রন্থ সমালোচনায়

লেখা হয়,—“সুশিক্ষিতা বঙ্গমহিলা কর্তৃক যত পুস্তক প্রণীত হয় ততই আমাদের গৌরবের বিষয়। এই নাটকখানির উৎসর্গ পাঠে আমরা জ্ঞাত হইলাম, এখানি উক্ত ভদ্রমহিলার দ্বিতীয় উদ্যম। নাটকের ভাষা উত্তম বলিতে হইবে এবং স্থানে স্থানে গ্রন্থকর্ত্রীর কবিত্বশক্তিরও পরিচয় পাওয়া যায়। ইহাতে মনুষ্যচরিত্রের দুই একটি সুন্দর প্রতিকৃতি প্রদর্শিত হইয়াছে কিন্তু আমরা পুস্তকখানি নাটকোচিত গুণবিশিষ্ট বলিতে পারি না। আরা গ্রন্থকর্ত্রীকে অনুরোধ করি, তাঁহার বাঙ্গালা ভাষায় যেরূপ অধিকার আছে, তাহাতে তিনি যদি নাটক না লিখিয়া অন্যান্য বিষয়ে লেখনী চালন করেন, তাহা হইলে তাঁহার গ্রন্থ সর্বত্র আদরণীয় হইতে পারে।”^{১২৭}

মেয়েলি ছড়া ও সহজ কৌতুকে এ ‘সন্তাপিনী নাটক’ রচিত। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ঈষৎ ব্যঙ্গের ঝাঁজ। মূলত পুরুষের বহুবিবাহকে সমালোচনা করে ‘সন্তাপিনী নাটক’ রচিত। ‘সন্তাপিনী নাটক’ তিন অঙ্কে বিন্যস্ত। মূল কাহিনী আবর্তিত হয়েছে জমিদার পুত্র নবকুমার ও সিন্ধুবালার (সন্তাপিনী) বিবাহ, বিচ্ছেদ ও সিন্ধুবালা কর্তৃক নবকুমারের নৈতিক উপদেশ প্রদান প্রভৃতি বর্ণনার মধ্য দিয়ে। সিন্ধুবালা (সন্তাপিনী) এ নাটকের নায়িকা। প্রথম অঙ্কে দেখা যায়, নবকুমারের নৌকাডুবি হলে এবং নবকুমার গভীর বনে গিয়ে উপস্থিত হয়। সেখানে গিয়ে এক চামুণ্ডা কাপালিকের হাতে বন্দী হয়। চামুণ্ডার নিত্য সেবিকা সিন্ধুবালা কর্তৃক নবকুমার মুক্ত হয়। কৃতজ্ঞতাবশত এবং সিন্ধুবালার রূপে মুগ্ধ হয়ে নবকুমার তাকে বিবাহ করে। এই কাহিনী অনেকটা বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ‘কপালকুণ্ডলা’ (১৮৬৬) উপন্যাসের অনুসারী। এরপর দেখা যায়, নবকুমার পিতার ভয়ে বাড়ি ফেরার পথে নবকুমার (প্রথম পত্নী) বনবাসিনী সিন্ধুবালাকে জাহাজ থেকে ঠেলে জলে ফেলে দেয়। বাড়ি ফিরে নবকুমার পিতার নির্দেশে পুণরায় বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়।

এর পাশাপাশি দ্বিতীয় একটি আখ্যানে দেখা যায়, নবকুমারের পিতার বন্ধু, ইন্সপেক্টর বিশ্বেশ্বর তাঁর প্রথমা পত্নী বিরাজমোহিনীর অত্যাচার থেকে মুক্ত হবার জন্য পাটনা হতে পত্নীর আত্মীয়্যর এক বাল্যবিধবা কমলিনীকে বিয়ে করে ঘরে আনেন (নাটক রচয়িতার মতে আঁতুড় ঘরের বিধবা)। ধনী পিতার কন্যা কমলিনী শৈশবে বিধবা হলেও বাল্যকাল থেকে বাবা-মায়ের যত্নে লালিত পালিত হয়েছে। একাদশীর নির্মমতা কিংবা অর্থকষ্টের নিদারুণ দারিদ্রে তাঁর জীবন পীড়িত হয়নি। বিধবা, কমলিনী শিক্ষিতা। কমলিনীর শিক্ষাগত যোগ্যতা বিশ্বেশ্বরকে আকর্ষণ করেছে। বিশ্বেশ্বর ও কমলিনীর বিয়ে হিন্দু বা ব্রাহ্ম কোন মতেই হয়নি। তাঁদের বিয়ে হয়েছে গান্ধর্ব মতে। পাটনা থেকে বিধবা কমলিনীকে বিবাহ করে এনে তাঁকে পাটনাগী করে তুলেছেন

বিশ্বেশ্বর। কমলিনী, স্বামীর প্রিয়। রূপে গুণে, বিদ্যায় সতীত্বে, পবিত্রতায়, ভক্তিতে সে সকলের মন জয় করে নিয়েছে। নাট্যকার বিধবা বিবাহের সুফল দেখিয়েছেন, কমলিনী ও বিশ্বেশ্বরের কথোপকথনের মধ্য দিয়ে। দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কে শয়নকক্ষে কমলিনী ও বিশ্বেশ্বরের প্রেম অভিমান ও কৌতুক স্নিগ্ধ এক ছবি এঁকেছেন এইভাবে,—

“কমলিনী ॥ ‘জীবিতেশ্বর! মেঘের বারি ভিন্ন অন্য বারিতে চাতকিনীর পিপাসা দূর হয়না।

বিশ্বেশ্বর ॥ ‘সুন্দরী’ কোন উদ্যানের মধ্যে বিবিধ কুসুম প্রস্ফুটিত থাকলেও কেবল কমলিনীতে ভ্রমরের যথার্থ প্রীতি, তা প্রিয়ে, তোমার প্রতি আমার সেইরূপ তোমাকেই আমি...।’

কমলিনী ॥ ‘নাথ এবড় হাসির কথা, আমি দর্শন মাত্রেই জীবন যৌবন মন প্রাণ সর্বস্ব যাকে সমর্পণ করেছিলাম, এখন উল্টে সেই কথা তিনি বলেন।’”^{১২৮}

গান্ধর্ব মতে বিবাহিতা বিধবা কমলিনী দ্বিতীয় স্বামীর গুঁরসে গর্ভধারণ করেছে। বিধবা বিবাহ করার কারণে বিশ্বেশ্বরকে সমাজের কাছে, বন্ধু-বান্ধবের কাছে নিগ্রহ সহ্য করতে হয়েছে। পুনর্ভূ কমলিনী স্বামীর গরবে গরবিনী হয়েছেন। মেয়েমহলে শুনতে হয়েছে নানান কানাকানি। বিশ্বেশ্বরের প্রথম পত্নী বারবার চক্রান্ত করেছে বিশ্বেশ্বরের সতীন কমলিনীর বিরুদ্ধে। কারণ স্বামীর সব স্নেহ ভালোবাসা দ্বিতীয় স্ত্রীর পতি। এ সহ্য হয়নি প্রথম পত্নী বিরাজমোহিনীর। সে বারবার চক্রান্ত করেছে কমলিনীকে স্বামীর কাছে চক্ষুশূল করে তুলতে।

এরপর দেখা যায়, বিশ্বেশ্বরের প্রথম স্ত্রীর প্ররোচনায় কমলিনী গৃহত্যাগ করেছে। প্রথম স্ত্রীর খল চাতুরীতে বিশ্বেশ্বর দ্বিতীয় স্ত্রীকে সন্দেহ করেছেন এবং ‘কুলটা’ বলতে দ্বিধা করেননি। সমকালে বিধবা বিবাহের পর পরিবারে নানা সংকট উপস্থিত হত সেই করুণ ছবিই নাট্যকার তুলে ধরেছেন এই অংশে। দৃঢ়তাহীন পুরুষের প্রেম অল্প আঁচেই গলে যায় দৃঢ়তার প্রতিমূর্তি। ভীরা অশান্ত কাপুরুষ ব্যক্তিবর্গের এ হেন আক্ষেপ সমকালের দুর্বল মানসিকতা সম্পন্ন পুরুষতান্ত্রিক সমাজকেই চিনিয়ে দেয়। পুরুষের এহেন আচরণকে সমালোচনা করেছেন নাট্যকার। পুরুষমহলে তৈরি হয়েছে নানা কৌতুহল। প্রলোভনের জাল বিস্তার হয়েছে বহুধায়। মেয়ে মহলে বলতে শোনা গেছে, ‘মিটমিটে ডান’, ‘ছেলে খাবার রান্ধস’ প্রভৃতি অপবাদ। উনিশ শতকে সমাজ অন্তঃপুরে চালু ছিল মেয়েদের বিদ্যাশিক্ষা দিলে, সে মেয়ে অকালে বিধবা হয়, কুলটা হয়, কুপথে পা পাড়ায়। সেই প্রসঙ্গই উত্থাপিত হয়েছে এই অংশে।

নাটকের মধ্যপর্বে দেখা যায়, প্রবল অনাদর সত্ত্বেও জলমগ্ন সিন্ধুবালা ফিরে এসেছে তাঁর স্বামী নবকুমারের কাছে। স্বামী তাঁকে খুন করতে চেয়েছে জেনেও সিন্ধুবালা (সন্তাপিনী) হিন্দু পতিব্রতার সংস্কারে স্বামী সান্নিধ্যে এসেছে। কিন্তু স্বামী নবকুমারকে দ্বিতীয় বিবাহ করতে দেখে প্রতিবাদে গর্জে উঠে সিন্ধুবালা জানিয়েছে,—“আপনি বিবাহ করেছেন, আমাকে যদি শত শত বার সমুদ্রে ফেলিতেন, তাহাও অধিনীর সুখ, কিন্তু একটি বিবাহ অসহ্য, এজন্য পুনর্বীর বনবাসিনী হইলাম।”^{১২৯} বহুবিবাহের বিরুদ্ধে, নাট্যকার নারীর প্রতিবাদকে উচ্চকিত করেছেন সিন্ধুবালার মধ্য দিয়ে।

এরপর দেখা যায় গৃহত্যাগী সিন্ধুবালা ও কমলিনীর সাক্ষাৎ। কমলিনীর দুঃখকথা শুনে সিন্ধুবালা প্রবল আত্মাভিमानে পুরুষজাতির এহেন আচরণে ক্রুদ্ধ হয়ে জানিয়েছে,—“...পুরুষ মানুষ সকল স্থানেই এইরূপ, খল, কপট, দুর্জর্ন। ছল চাতুরি মাখান সকল পুরুষ মানুষ দেখিতে পাই, যে স্ত্রীলোক বড় ভাগ্যবতী সেই স্বামীপুত্র নিয়ে ঘর করিতে পায় সেও দুশোর মধ্যে দশটা।”^{১৩০} সামাজিক অসাম্য পুরুষের তৈরি। পুরুষ নিষ্ঠুর খল চতুর। পুরুষ জাতির প্রতি বিদ্রূপ বিদ্রোষ জানিয়েছে সিন্ধুবালা। সিন্ধুবালার মধ্যস্থতায় বিশ্বেশ্বর নিজের ভুল বুঝতে পারে এবং কমলিনীকে সাদরে গ্রহণ করেন। বিশ্বেশ্বরের স্বগতোক্তিে নাট্যকার সমকালীন সমাজের পুরুষের মানসিকতাকে তুলে ধরেছেন। বিশ্বেশ্বর স্বগতোক্তি করে জানিয়েছে,—“উঃ পুরুষ মানুষ কি নৃশংস...কেবল স্ত্রীলোককে শাসন করতে পারি, সুখী করতে পারিনা।”^{১৩১} এভাবেই নাটকটি মিলনান্তক ভাবে পরিসমাপ্তি ঘটেছে। বস্তুত বিধবা কমলিনীর দুর্দশার কারণ হিসাবে তাঁর স্বামীর চরিত্রের দৃঢ়তার অভাবকে দায়ী করেছেন নাট্যকার।

১৮৭৭ সালে প্রকাশিত হয় নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্যের ‘বিধবা’ নাটক ও রাধারমণ করের ‘সরোজা’ নাটক। এ দুটি নাটকে উঠে এসেছে বিধবার সংকট চিত্র। নাটকদুটি আমাদের সন্মানে আসেনি তাই নাটক দুটির আলোচনা হতে আমরা বিরত থেকেছি।

১৮৭৭ সালে প্রকাশিত হয়, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘এমন কর্ম আর করব না’ নাটক। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন, ফরাসী সাহিত্যের অনুরাগী পাঠক। ফরাসী নাট্যকার মলিয়েরের ‘Le Bourgeois Gentilhomme’ নাটক অনুসরণে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ‘এমন কর্ম আর করব না’ নাটকটি রচনা করেন। নাটক হিসাবে ‘এমন কর্ম আর করব না’ রঙ্গনাট্য বা ‘Comedy of manners’ গোত্রের। ১৮৭৭ সালের জুলাই মাসে ‘এমন কর্ম আর করব না’ নাটকটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। পরে ১৯১০ সালে এ নাটক নাম বদলে ‘অলীকবাবু’ নামে প্রকাশিত হয়।

‘এমন কর্ম আর করব না’ নাটকে ‘অলীকপ্রকাশ’ চরিত্রে উনিশ শতকের সমাজবিন্যাসে ‘সর্ববিদ্যাপারঙ্গম’ এক ভন্ডের ছবি তুলে ধরা হয়েছে। বাড়ি কেনা অলীকপ্রকাশের কাছে কোন সমস্যাই নয়। নিজের দু-তিনখানা বাড়ি আছে—এরূপ বড়াই করতে অলীকপ্রকাশকে শোনা যায়। পাশ্চাত্য সংস্কৃতির বিকৃত অনুকরণ আর চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে হঠাৎ ফুলে ওঠা বাবুদের ভ্রান্তিকে নাট্যকার দেখিয়েছেন অলীকবাবু চরিত্রে। সত্যসিদ্ধ বাবু যখন মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত হতে যাচ্ছেন তখন গদাধর নিজের মুখোশ খুলে ফেলে অলীকপ্রকাশের মিথ্যা সবকিছুকে অকপটে জানিয়েছে এবং স্বীকার করেছে ‘এমন কর্ম আর করব না’।

এ নাটকের কাহিনীতে দেখা যায় কৃষ্ণনগরের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি সত্যসিদ্ধবাবু তাঁর বিবাহযোগ্য কন্যা হেমাজিনীর বিবাহের জন্য পাত্র খুঁজছেন। সত্যসিদ্ধ তাঁর শিক্ষিত, সুন্দরী ও অতি আদর যত্নে বড় করে তোলা একমাত্র কন্যার জন্য সুযোগ্য ও সৎ পাত্র চান। অলীকপ্রকাশ এ নাটকে সেই পাত্র। কিন্তু চরিত্রধর্মে অলীকপ্রকাশ অসৎ, স্বভাবে বাচাল, শঠ, মিথ্যাবাদী ও অশিক্ষিত। মিথ্যে কথার মোড়কে অলীকপ্রকাশ নিজেকে বাবুয়ানায় প্রকাশ করে। অন্যের বাড়িকে নিজের বাড়ি বলে চালানো, মিথ্যে শিক্ষার আড়ম্বর, মিথ্যে কাজকর্মের মধ্য দিয়ে অলীকবাবু সত্যসিদ্ধবাবুকে বশ করার চেষ্টা করে। অন্যদিকে সরল হেমাজিনী অলীকবাবুকে ভালোবেসে ফেলে। হেমাজিনীর সঙ্গে অলীকবাবুর যাতে বিবাহ হয় তার জন্য সাহায্য করেছে হেমাজিনীর দাসী প্রসন্ন ও কলকাতার এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির মোসাহেব গদাধর। প্রসন্ন বিধবা। গদাধর প্রসন্নকে বিবাহ করতে চায়। কারণ ধূর্ত গদাধরের বিধবা বিবাহের অন্যতম উদ্দেশ্য হল, প্রসন্নের টাকা ও বিধবা বিবাহের জন্য প্রদত্ত অর্থ হস্তগত করা।

কিন্তু হেমাজিনীর সঙ্গে অলীকবাবুর বিবাহ পরিণতিই একমাত্র প্রসন্ন ও গদাধরের বিবাহের পথ। ফলে ধূর্ত গদাধর চটুল ও মিথ্যাবাদী অলীকবাবুকে বিভিন্নভাবে সাহায্য করে। ঘটনার অগ্রগতিতে দেখা যায় অলীকবাবু মিথ্যের জাল ক্রমশ ছিঁড়ে যেতে থাকে। ধনাত্ম ও সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক জগদীশ মুখোপাধ্যায়ের মধ্যস্থতায় অলীকবাবুর মুখোশ খুলে যায় সত্যসিদ্ধুর সামনে। অলীকবাবু তাদের কাছে ধরা পড়ে যায়। মিথ্যে ধরা পড়ে যাওয়ায়, অলীকবাবু নিজকৃতকর্মের জন্য ক্ষমা চায়। কিন্তু সরল হেমাজিনী অলীকবাবুর প্রেমে বিহ্বল হয়ে তাকেই স্বামী হিসাবে পেতে চায়। শেষ পর্যন্ত হেমাজিনীর রুদ্র মূর্তিতে ভীত হয়ে অলীকবাবু বিবাহের আশা পরিত্যাগ করে বন্দীদশা থেকে রক্ষা পায়।

‘অলীকবাবু’ নাটকে বিধবার পুনর্বিবাহের প্রসঙ্গ এসেছে হেমাজিনীর বিধবা দাসী প্রসন্নের

অনুসঙ্গে। জগদীশ মুখোপাধ্যায়ের মোসাহেব গদাধর প্রসন্নকে ভালোবাসার কথা বলে, তাকে বিবাহের কথা বলে। প্রসন্ন, গদাধরের সঙ্গে প্রেমের রসিকতায় নিজেকে আড়াল করে। বিধবা প্রসন্ন পুনর্বীর বিবাহ করবার কথা ভাবতেই পারে না। অশিক্ষিত বিধবা রমণীদের ‘বিধবা বিবাহ’ অকল্পনীয়। গদাধর প্রসন্নকে বিয়ে করতে চাইলে বিধবা প্রসন্ন ক্ষুব্ধ হয়ে জানিয়েছে,—“মরণ আর কি! মিনষের কথার ছিরি দেখ না, আমি আবার কেন বে করতে গেলেম—তুই বে কর তোর চোদ্দপুরুষ বে করুক। পোড়ারমুখোর বলবার রকম দেখ না—একবার বে হয়ে গেলে আবার নাকি বে হয়, ওমা কি লজ্জার কথা! কি ঘেন্নার কথা মা! তুমি কি গা পাগল হয়েছ না কি?”^{১৩২} বিধবা হওয়ার পর প্রসন্ন জানে, অবৈধ প্রণয় করা গেলেও পুনর্বীর বিবাহ করা পাপ। পুনর্বিবাহ লজ্জাদায়ক, ঘৃণ্য অপরাধ। কিন্তু গদাধর ও হেমাস্বিনীর মুখে ‘বিধবাবিবাহ’ আইনের কথা শুনে উৎফুল্ল হয়। দ্বিতীয়বার এয়োস্ত্রী হয়ে সুখ স্বাচ্ছন্দ্যে জীবন কাটানোর স্বপ্ন দেখতে শুরু করে প্রসন্ন।

গদাধর ধূর্ত ও ঠগ। সে প্রসন্নকে ভালোবাসে না। বিধবা প্রসন্নকে বিবাহ করলে গদাধর পাঁচ হাজার টাকা বকশিস পাবে এবং প্রসন্নের গয়না ও অর্থ হস্তগত করতে পারবে। এই উদ্দেশ্যে গদাধর প্রসন্নকে বিয়ের প্রস্তাব দেয়। অর্থলাভের আশায় গদাধর তাই মিথ্যেবাদী অলীকবাবুর ভণ্ড কাজকর্মে বিভিন্নভাবে সাহায্য করেছে।

প্রসন্ন বিধবা হবার পর একাদশী ব্রত পালন করে। কিন্তু আমিষের স্বাদ প্রসন্ন ভুলতে পারে না। মাছ, কাঁটাচচ্চড়ির স্বাদ প্রসন্নের মনে পড়ে। অলীকবাবুর বাবুয়ানার মোড়কে বিস্তর মিথ্যে কথার জাল নির্বোধ প্রসন্ন বুঝতে পারে না। তাই অলীকবাবুর মুখে মাছের কথা শুনতেই প্রসন্ন বলে ফেলে,—“ (তাড়াতাড়ি) আমি বাবু একটা মাছ-চচ্চড়ি আর অম্বল পেলেই সব ভাত গুল খেয়ে ফেলতে পারি।”^{১৩৩} পুনর্বীর বিয়ের কথায় প্রসন্নময়ী প্রসন্ন মাছচচ্চড়ির স্বাদ যেন অনেক আগে থেকেই অনুভব করতে পেরেছে। সুপ্ত স্বাদের আস্বাদ পেয়েছে সে। হেমাস্বিনীর বিয়ের পরিণতিই প্রসন্নের পুনর্বীর বিবাহের সুখ এনে দিতে পারে। তাই প্রসন্ন হেমাস্বিনীর বিয়ের জন্য অধিকতর উৎসাহী হয়েছে। বিয়ের আনন্দের আতিশয্যে প্রসন্ন, গদাধরের আসল চেহারার হদিস পায় পায়নি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্রসন্নের পুনর্বিবাহের আশা চরিতার্থ হয় না। মিথ্যেবাদী অলীকবাবুর অলীক কথাবার্তা সকলের সামনে প্রকাশ্যে আসে। গদাধর তার মনিব জগদীশ মুখোপাধ্যায়ের কাছে ধরা পড়ে। অবশেষে প্রসন্ন ও গদাধরের বিবাহ ইচ্ছা অপূর্ণ থেকে যায়।

উনিশ শতকে বহু বিধবা রমণী তার বৈধব্য দশা থেকে মুক্ত হতে চেয়েছেন। কিন্তু

সামাজিক ঘেরাটোপ ও কঠিন নিয়মাচার তাদের মনোবাঞ্ছায় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। গোপনে প্রণয়, যোগ, লালসা ও ভ্রূণহত্যায় বিধবা নারী জীবনের করুণ পরিণতি ঘটেছে। ‘বিধবাবিবাহ’ আইন পাশ হওয়ায় বিধবা রমণীদের জীবনে পুনর্ব্যবস্থার সুখের আশা জন্মে ঠিকই কিন্তু তৎকালীন সমাজব্যবস্থায় দাঁড়িয়ে কিছু লোভী সুযোগ সন্ধানী মসনুষ শুধুমাত্র অর্থের লোভে ও ভোগলালসার লোভে বিধবাবিবাহে রাজী হয়। সেইসব স্বার্থপর মানুষের সমাজ সংস্কার কিংবা বিধবা নারীর পুনর্ব্যবস্থার সুন্দর জীবন পাবার অধিকার নিয়ে কোনো মাথাব্যথা নেই। যার ফলে বহু রমণীকে পুনর্ব্যবস্থার পরও যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়েছে। আলোচ্য নাটকে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ‘অলীকবাবু’র মত কৌতুকপূর্ণ চরিত্র সৃষ্টি করেছেন এবং পাশাপাশি ‘প্রসন্ন’ চরিত্র সৃষ্টির মধ্য দিয়ে ‘বিধবাবিবাহ’ বিষয়ক সমাজ সংস্কারকে খুব সুন্দর ভাবে তুলে ধরেছেন।

জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে একাধিকবার ‘অলীকবাবু’ অভিনীত হয়েছিল। প্রথম অভিনয় হয় ১৮৭৭ সালে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত ঠাকুর বাড়ির ‘ড্রামাটিক ক্লাব’ের উদ্যোগে। স্মৃতির সরণী বেয়ে ইন্দিরাদেবী চৌধুরাণী ‘অলীকবাবু’ নাটকের অভিনয় সম্পর্কে লিখেছেন, —“কালানুক্রমে আমাদের ছেলেবেলার স্মৃতির মধ্যে বোধ হয় জ্যোতিকাকামশায়ের এমন কর্ম আর করব না (প্রথম প্রকাশ ১৮৭৭) এর পরে আসে। নাটকটির নাম পরে বদলে হয় অলীকবাবু। এটিও অনেকবার অভিনীত হয়েছে। কিন্তু হয়তো স্মৃতির জাদুবশত এর যে অভিনয়টি আমাদের সব চেয়ে সেরা মনে হয় তার পাত্রপাত্রী এরকম ছিল—

সত্যসিদ্ধ	জ্যাঠামশায়, দ্বিজেন্দ্রনাথ
অলীকবাবু	রবিকাকা
গদাধর	সেজোপিসেমশায়
জগদীশ	জগদীশদাদা
হেমাজিনী	শরৎকুমারী চৌধুরাণী
পিসনি	বর্ণপিসিমা

কী স্বাভাবিক অভিনয় করতেন বর্ণপিসিমা! এখনো মনে পড়ে, প্রথম দৃশ্যে তিনি দাসীদের মতো মাটিতে বসে হাঁটু তুলে হাতের উপর মাথা রেখে সকালবেলা বসে আছেন আর বাইরে থেকে গদাধর দরজা ঠেলেতেই মাথা তলে বলে উঠলেন, ‘দরজা ঠেলে কে ও? ওমা, গদাধরবাবু যে! বড়োমানুষের মোসাহেব, দশটা বাজতে-না-বাজতেই ঘুম ভাঙল? তার পরের দৃশ্যে অলীকবাবু ও সত্যসিদ্ধ স্টেজে ঢুকছেন। ঢুকতে ঢুকতে অলীকবাবু বলছেন, ‘আজ্ঞে হ্যাঁ মশায়, কামাখ্যাদেশের

রাজকন্যা, আমার সঙ্গে বিয়ে দেবার জন্যে ঝুলোঝুলি।’ সেই ভাব ও কথা এখনো কানে বাজছে। তার পর বন্ধু সেজে অরুণদাদার গান। তারই বা কী কায়দা? আর জ্যোতিকাচার সেই চীনেম্যান সেজে চীনেভাষায় কিচিরমিচির কথা—কাকে ছেড়ে কার কথা বলব! হেমাঙ্গিনী যে হাতে বাঁটি ধরে ‘এই বন্দীই আমার প্রাণেশ্বর’ এইরকম কী একটা খুব নাটকীয় ভাবে বলতেন, সেও একটা মনে রাখবার মতো জিনিস।”^{১৩৪} অলীকবাবুতে রবীন্দ্রনাথ যখন অভিনয় করেন তখন তাঁর বয়স ষোল বছর। ‘অলীকবাবু’ নাটকে ‘অলীকবাবু চরিত্রে’ অভিনয়ের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথের সর্বসমক্ষে মঞ্চে অবতরণ। ‘জীবনস্মৃতিতে’ এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন,—“নাট্যমঞ্চে সাধারণের সমক্ষে প্রকাশ হইবার পূর্বে জ্যোতিদাদার ‘এমন কর্ম আর করব না’ প্রহসনে আমি অলীকবাবু সাজিয়াছিলাম। সেই আমার প্রথম অভিনয়। তখন আমার অল্প বয়স, গান গাহিতে আমার কণ্ঠের ক্লান্তি বা বাধামাত্র ছিল না;... তখন লিখিতেছি, গাহিতেছি, অভিনয় করিতেছি, নিজেকে সকল দিকেই প্রচুরভাবে ঢালিয়া দিতেছি—আমার সেই কুড়ি বছরের বয়সটাতে এমনি করিয়া পদক্ষেপ করিয়াছি। সেদিন এই যে আমার শক্তিকে এমন দুর্দাম উৎসাহে দৌড় করাইয়া ছিলেন, তাহার সারথি ছিলেন জ্যোতিদাদা।”^{১৩৫} ঠাকুরবাড়িতে অভিনীত ‘অলীকবাবু’ নাটকের নির্দেশনার কাজটি সম্পন্ন করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। অবনীন্দ্রনাথের লেখনীর সাক্ষ্য জানতে পারা যায়, রবীন্দ্রনাথ যেমন মূল নাটককে টেলে সাজিয়েছিলেন তেমনি নতুন চরিত্র, নতুন গান সংযোজন করেছিলেন এমনকি মলিয়েরের বিদেশী প্রভাবমুক্ত করে দেশীয় সৌরভে ভরিয়ে তুলেছিলেন।

১৮৮২ সালে প্রকাশিত হয় বিরজামোহন চৌধুরীর ‘বঙ্গবিধবা’ (১৮৮২) নাটক। ‘বঙ্গবিধবা’ রূপক নাটক। এ নাটকের বিজ্ঞাপন অংশে নাট্যকার লিখেছেন,—“এমত অবস্থায় ও অসংলগ্ন অবস্থা, ইহার যা উদ্দেশ্য বোধহয় তাহা সাধন করিতে পারিবে, এক্ষণে অনুগ্রহ পূর্বক সকলে একবার পাঠ করিলে আমার মানস সফল হইবে।”^{১৩৬} বিদ্যাসাগর মনে করেছিলেন পুরুষের উত্তপ্ত কামনা বাসনার হাত থেকে অসহায় বিধবা নারীদের উদ্ধারের একমাত্র পথ বিধবার পুনর্বিবাহ। নাট্যকার বিরজামোহন চৌধুরী রূপকের মধ্য দিয়ে বিধবা বিবাহের যৌক্তিকতা প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন। অধর্ম, শঠতা, স্বার্থপরতা, রতিকাম, বিধাতা ও বিধবা এই কল্পিত চরিত্র সৃষ্টির মধ্য দিয়ে নাট্যকার বিধবার সংকট যন্ত্রণাকে উপস্থাপিত করেছেন। নাটকের কাহিনী শুরু হয়েছে অধর্মের সংলাপ এর মধ্য দিয়ে,—

“অধর্ম। কি ছাড় নাশিতে

বিধবা সতীত্ব দহিতে তাদের প্রাণে
বিষম বৈদগ্ধ্য অগ্নি করি প্রজ্বলিত
যুবক আমার সনে, যে থাকে সে আসি।

.....

রতি ।। শুন রতিকাম তোমাদের শরাঘাতে ঐ কামিনীর হৃদয় জরজর করবে, তা হলে
সে সহজেই আমার বশে আসবে। তোমার ঐ শরের প্রভাবে ত্রিলোক উন্মত্ত হয়, একটা সামান্য
বঙ্গকুমারীকে পরাজিত কর্তে পারবে না?

কাম ।। শুনেছি বঙ্গকামিনীরা বড় সতী। পতির বিয়োগে অন্য পতি গ্রহণ করে না। আজ
তাদের সতীত্বরত্ন হরণ করব।...

প্রাচীন যে শাস্ত্র তাহা করি লণ্ডভণ্ড
সৃজিবে তাহার স্থানে নব নব বিধি
নবমত যাতে বঙ্গ যায় রসাতলে
আর দেখ প্রবেশিবে বঙ্গনারী হৃদে,
প্রতি তস্ত্রে থাকিবে তোমরা। সুকৌশলে যাবে
বিচিত্র মোহিনী জাল বিস্তারিয়া
বধিবে জীবনে।” ১৩৬

এইভাবে অধর্ম, রতিকাম প্রমুখের প্রচেষ্টায় বঙ্গ বিধবার মানসিক দ্বন্দ্ব সংকট সৃষ্টি করেছেন
নাট্যকার। বঙ্গবিধবা ঈশ্বরের কাছে আশ্রয়ের সুরে কৈফিয়ৎ চেয়েছেন। সে কৈফিয়তের সুরে
ধরা পড়েছে বিধবা নারীর মনোকষ্টের নিদারুণ ছবি,—

“বিধবা ।। আবার আমার যে জ্ঞানপ্রদীপ প্রজ্বলিত হচ্ছে। জ্ঞান। তুমি বঙ্গের বিধবা
যেন চিরদিনই উন্মাদিনী থাক।

বিধাতা ।। কেন তুমি ভারতে নারীজাতির সৃষ্টি করেছ? যদি সৃষ্টিই করলে তবে কেন
পুরুষের ন্যায় কঠিন হৃদয় করলে না। তোমার দোষ নাই, আমাদের কর্ম দোষ। যত মহাপাপীদিগকে
ভারতে নারীজাতি করেছ, আমাদের উপযুক্ত শাস্তি দিচ্চ নরকাগ্নিতে দগ্ধ কচ্ছ। স্বার্থপরতা। এ
বঙ্গে এ ভারতে তুমিই আজ রাজা। সকলই তোমার দাস হয়ে রয়েছে। ধন্য তোমায়। ধন্য তোমার
ক্ষমতার, তোমার মহিমায় কেহ পরের দুঃখ দেখতে পায় না, অনুভব কর্তে পারে না, বুঝতেও
পারে না।” ১৩৭

নাটকটির পরিসমাপ্তিতে দেবকন্যাদের উক্তি বঙ্গবিধবাদের দুঃখের প্রতি নাট্যকার সমবেদনা জানিয়েছেন,—

“উঠ রে দুখিনী বিধবাকামিনী

প্রভাত যামিনী।

অবসান দুখ, হল তব ধনী

চিরদিন তরে দেখ, উদে দিনমণি।

ঐ দেখ কত, বঙ্গ কুলনারী

বসনভূষণ অঙ্গে পরিহরি

নাবিক বিহনে, যেন কাষ্ঠতরী

ভীষণ সংসার সুগভীর বারি

দেখিয়ে ভয়েতে, কাঁপে থরথরি

ভাসিছে টলিছে, ডুবিছে সুন্দরী

দুলিছে গলায় সতীত্বের হার।

বঙ্গের বিধবা অবলা কামিনী

হেরিলে তাদের মুখ সরোজিনী

মুহূর্তের তরে গলিবে তখনি

অসুর হৃদয় পাষণ তিনি।”^{১৩৮}

‘বঙ্গবিধবা’ নাটকের বিষয় বস্তব্যে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহ বিষয়ক দ্বিতীয় পুস্তকের যুক্তি শৃঙ্খলা ও বিধবাদের প্রতি সমবেদনা প্রকাশিত হয়েছে। ‘বঙ্গবিধবা’ নাটকের কাহিনী পাঠে জানা যায়, মূলত নাট্যকার প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন, বিধবা বিবাহ অপেক্ষা চিত্তসংযমই শ্রেয়।

১৮৮৭ সালের ১৯শে নভেম্বর ‘এমারেন্ড থিয়েটারে’ অজ্ঞাতনামা রচিত ‘বিধবা সঙ্কট’ নাটকটি মঞ্চস্থ হয়। অভিনয়ের দিন ‘স্টেটসম্যান’ পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনে লেখা হয়,—

“THE EMERALD THEATRE

BEADON STREET

GRAND DRAMATIC NIGHTS

Saturday, the 19th November, at 8.30 p.m

OPERA! OPERA! OPERA!

ANAKANONA OR MONDANBHUSMA

And the Second performance of that successful

New and instructive Society play

BIDHOBASANKOT

A LIVELY PICTURE OF THE PRESENT DAY.

Instruction and Laughter will go hand in hand.

.....

G.C. GHOSH, Director and Manager.”^{১৩৯}

১৮৮৭ সালের ১৯শে নভেম্বর ‘এমারেন্ড থিয়েটারে’ ‘বিধবা সঙ্কট’ নাটকটি অভিনয়ের পর ১৮৯০ সালে গ্রন্থাকারে এ নাটক প্রকাশিত হয়। নাট্যকারের নাম জানা যায় না। নাটকের পরিচয় হিসাবে নামপত্রে লেখা হয়েছে, ‘সমাজনাট্য’। কলিকাতা ১৫১ নং বারানসী ঘোষের স্ট্রীট রিপণ প্রেস এজেন্সী থেকে শ্রীপ্রভাতচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বারা প্রকাশিত হয়। নাট্যকার ‘বিধবাসঙ্কট’ নাটকটিকে উৎসর্গ করেছেন, ধনীশ্রেষ্ঠ শ্রীযুক্ত বাবু গোপাললাল শীলের উদ্দেশ্যে।

নাটকের কাহিনী শুরু ভগীরথ ও তর্কালঙ্কারের কথোপকথন দিয়ে। এ নাটকের কাহিনী আবর্তিত হয়েছে সুশীলা নামক এক বিধবার কাহিনী দিয়ে। সুশীলা ষোল বছর বয়সে বিধবা হয়। সুশীলার স্বামী বিয়োগ ঘটলেও সে পতিব্রতা। সে তার স্বামীকে ভালোবাসে, স্বামীর সুখস্বৃতি অবলম্বন করে বাঁচতে চায় বাকীটা জীবন। সুশীলার দেওর রামচন্দ্র। রামচন্দ্রের বৌ সৌদামিনী। রামচন্দ্র বৌদি সুশীলাকে পুনর্বার বিবাহ করার জন্য অনুরোধ করেছে। কিন্তু সুশীলা অনড়। সুশীলা জানিয়েছে,—“*ষোল বছর বয়সের সময় তিনি আমাকে ফাঁকি দিয়ে গেছেন, সে আজ ৪।৫ বছর হল, তবু যেন আমি তাঁকে চোকের উপর দেখাচ্ছি।*”^{১৪০} রামচন্দ্রের স্ত্রী সৌদামিনীও নিজ বিধবা ভাজের পুনর্বিবাহে অসম্মত।

কাহিনী সূত্রে দেখা যায়, বিধু নামক এক বেশ্যা রমণীর প্রতি রামচন্দ্র আকৃষ্ট। রামচন্দ্র মাইনে করে রেখেছে বিধুকে। বিধুর মন রাখতে, বেনারসি, সোনার চন্দ্রহার, গোলাপপাশ, দুমাসের মাইনে ২০০ টাকাইত্যাди রামচন্দ্র আনে। বিধু খুশী হয়। রামচন্দ্র ও বিধুর অভিনয়ে মোহিত হয়। রামচন্দ্রের পিতা ধনাঢ্য ব্যক্তি ছিলেন। মুখোশধারী রামচন্দ্র সেই সব অর্থের অপব্যয় করে। রামচন্দ্রের মত লোকেরা সমাজের সামনে একরূপ নিয়ে সাধারণ মানুষের মনকে ভোলায়, আবার লুকিয়ে নানান কুকর্ম করে। বাইরে থেকে নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করে রামচন্দ্রের মত লোকেরা ভালোমানুষীর নাটক করে,—“*আমরা তো ইংরাজের অনুকরণই করছি। তাদের সকলেরই দুটো করে জীবন আছে। একটা Public Life একটা Private Life. বাহিরের জীবনে কোন দোষ না থাকলেই হল।...তবে হিন্দুগুলো আজও তত সভ্য হয়নি। এ ব্যাটার চার দিক দেখে...।*”^{১৪১}

রামচন্দ্রের মত আরো অনেকে বেশ্যালয়ে নিজেদের জৈবিক পিপাসা চরিতার্থ করতে চায়। কিন্তু বাহ্যিক সমাজে নিজেদের ধর্মপ্রচারক রূপে পরিচয় করাতেও এদের কুণ্ঠা হয় না। মি. মুখার্জিও রামচন্দ্রের মত একই পন্থার লোক। বিধুর মতো রাঁড়ের বাড়ী এসে মদ খায়, মাংস

থায়, বাইরে নিজেদের মুখে পবিত্রতার মুখোশ পরে থাকে।

রামচন্দ্র, সৌদামিনী ও সুশীলার সঙ্গে হরিপ্রসন্নের সাক্ষাৎ হয়। সৌদামিনী স্বাধীন ভাবে কথা বলতে জানে। রামচন্দ্র সে স্বাধীনতা দিয়েছে তার স্ত্রী সৌদামিনীকে। সুশীলাকে নিয়ে সৌদামিনীর অনর্থক চিন্তা তার গোপন অন্তরের ভালোবাসার স্বার্থে। সম্পর্কে বড় জা সুশীলার সঙ্গে সৌদামিনীর বোনের ন্যায় সম্পর্ক। কিন্তু বিধবা ভাজ সুশীলার পুনর্বিবাহকে সমর্থন করে না সুশীলা। সুশীলার সামনে হরিপ্রসন্নের উপস্থিতিও সৌদামিনী তাই মেনে নিতে পারে না। সুশীলারপক্ষ নিয়ে সৌদামিনীর উক্তি প্রতুক্তির বিনিময়ে হরিপ্রসন্ন জানায়,—“আপনারা স্ত্রীলোক, হাজার বিদ্যবতী হাজার বুদ্ধিমতী হউন, তবু সদসদ বিচারে আজও আপনারা পুরুষের সমকক্ষ নন।”^{৪২} হরিপ্রসন্নের বাক্যে সৌদামিনীর দ্বিগুণ ক্ষোভ জন্মে। সৌদামিনীর বক্তব্য হল, যে সব বিধবা নারীরা পুনর্বীর বিবাহ করতে রাজী নয়, তাদের জোর করে বিবাহ দেওয়া উচিত নয়। কিন্তু হরিপ্রসন্ন বোঝাতে চেয়েছে বিধবা বিবাহের গুরুত্বকে, জোর করে বিবাহ দেওয়াকে নয়, —“আমাদের বিশ্বাস বিধবা বিবাহ প্রচলিত না থাকায় দেশ উৎসন্ন যাচ্ছে। এ বিশ্বাসে বিধবা-বিবাহ প্রচলিত যাহাতে হয়, সে বিষয়ে চেষ্টা করা কি অন্যায্য?”^{৪৩} সৌদামিনীর বাক্যবাণ ক্রমশ কঠিন হওয়ায় হরিপ্রসন্ন বিচলিত বোধ করে। সুশীলার ধারণা পুনর্বীর বিবাহ করলে কুপথে যাওয়া হবে। তাই সে বিধবার পুনর্বিবাহের ঘোরতর বিরোধী।

ঘটনাসূত্রে দেখা যায় গুরুদেব কালীকিঙ্করের দুই মেয়ে বিধবা। মৃত ছেলের বৌকে নিয়ে কালীকিঙ্করের চিন্তার শেষ নেই। বিধবা বৌমা চারুমতী শিক্ষিতা। কালীকিঙ্করের বিধবা বৌমা চারুমতী শিক্ষিতা। সে বাঙলা বই সব পড়েছে। দীনবন্ধুর নাটক এবং বঙ্কিমের নভেল কণ্ঠস্থ করেছে। ধর্মপুস্তকেও চারুমতীর আগ্রহের শেষ নেই। চারুমতীকে পড়াতে দুজন স্ত্রীস্থান শিক্ষয়ত্রী আসেন। বিধবা চারুমতীর স্বামী প্রাপ্ত উপাধির কোন প্রয়োজন নেই। তাই সে তার পরিচয়ে শুধুমাত্র চারুমতী নামটি ব্যবহার করে। চারুমতী সুশীলার বৌদি। সুশীলা চারুমতীকে তার চিঠি দেখাতে বলে। কিন্তু চারুমতী অস্বীকার করে। একের চিঠি অন্যের দেখা উচিত নয়, এমনকি স্বামীর চিঠি স্ত্রীর বা স্ত্রীর চিঠি স্বামীর দেখা ঠিক নয়। এর উত্তরে সুশীলা স্বামী স্ত্রীর গোপন কোনো বিষয় থাকতে পারে না বলে জানায়। যদি থাকে তবে সে স্ত্রী অসতী। শিক্ষিত চারুমতী জানিয়েছে, যে মেয়েটি দশ বছর বয়সে বিধবা হল, সে মেয়েটির ভবিষ্যতে আর কোনো কিছু পাবার আশা নেই। তাকে সংসার সকল সুখে বঞ্চিত করবে। আর পুরুষেরা সাতবার বিবাহ করবে। স্ত্রী মারা গেলেও তার শোক ফুরোতে না ফুরোতেই আরেকটি বিবাহ করবে।

চারুমতীর কথায় সুশীলার মন বিচলিত হয়। সুশীলা বলে যে, হিন্দু কুলের বউদের স্বামীর অনুগামী হতে হয়। খ্রীষ্টানরা এসব বোঝে না। তাই চারুমতী যেন কোনো মতেই খ্রীষ্টান শিক্ষয়িত্রীদের পরামর্শ মত না চলে।

সুশীলার বোন ও চারুমতীর ননদ সরলাও চোদ্দ বছরের বিধবা। সরলা বৈধব্যকে মেনে নিয়ে ধর্মেকর্মে মনোনিবেশ করেছে। সরলার ধারণা এ জন্মে ভালো ধর্মাচারণ করলে পরজন্মে ভালো ফল হবে। পূর্বজন্মে পাপ করেছিল বলেই হয়ত সরলা এজন্মে বিধবা হল। সরলা নিরাভরণ। তার প্রতিটি গহনা গুরুদেবের পায়ে অর্পিত। পুরুষ মানুষ গুরুদেব, এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করেন। ব্রাহ্মণ হওয়ার সুবাদে সরলা গুরুদেবের প্রতিটি বাক্যকে ভগবানের বাক্য বলে মনে করে। গুরুদেব সরলাকে বিধবার আচার ব্যবহার সম্পর্কে জ্ঞান দেয়,—“বিধবার ব্রহ্মচার্য্যই প্রধান ধর্ম, সকল প্রকার বিলাসিতা ও ভোগেচ্ছা ত্যাগ করাই বিধবার ব্রত।”^{১৪৪}

নাট্যকার খুব সচেতনভাবেই গুরুদেবের বক্তব্যের মধ্য দিয়ে বিধবাদের পালনীয় কর্তব্যকে আমাদের সামনে উপস্থিত করেছেন। গুরুদেব বলেছেন যে, জীবশুদ্ধ নিজের কর্মফল ভোগ করে। যে ভালো কর্ম করে সে ভাল ফল পায়। সৎ কার্যের ফল সুখ ও শান্তি। অসৎ কর্মের ফল দুঃখ ও ক্লেশ। সংসারে অ-পুত্রবতী বিধবা দ্বারাই ধর্মকার্য ভাল সাধন হয়। আত্মসংযম, ইন্দ্রিয়দমন, প্রতিপদ ধ্যান, দেব আরাধনা, তীর্থদর্শন ও গুরুজনের সেবাশুশ্রূষা এগুলি বিধবাদের প্রধান কার্য। আর এর নামই ব্রহ্মচার্য্য। কিন্তু চারুমতী এইসব কথায় কান দেয় না। কারণ আধুনিক শিক্ষা ও যুক্তিবোধ তাঁর মধ্যে বাসা বেঁধেছে। সে বুঝতে পারে কোনটা ঠিক এবং কোনটা ভুল। কিন্তু সরলা এবং সুশীলার ধারণা খ্রীষ্টান শিক্ষয়িত্রীরাই চারুমতীর মাথা নষ্ট করেছে। তাই চারুশীলার পড়া বন্ধ করার উদ্দেশ্যে সুশীলা বন্ধপরিচর।

কালীকিঙ্করের বাটীতে দেখা যায়, আহ্লাদির সাহায্যে দুশ্চরিত্র রামচন্দ্র চারুমতীকে নিয়ে পালাতে চায়। ছদ্মবেশে রামচন্দ্র ঘুমের ঔষধ প্রয়োগ করে সুশীলাকে চুরি করার জন্য ছক কষে। কিন্তু আহ্লাদির বিশ্বাসঘাতকতায় কালীকিঙ্করের হাতে রামচন্দ্র ধরা পড়ে। কালীকিঙ্কর রামচন্দ্রকে পুলিশ দিয়ে শায়েস্তা করার কথা ভাবেন। রামচন্দ্র ঘুষ দিয়ে কোনক্রমে পালাবার চেষ্টা করে। কিন্তু চেষ্টা বিফল হয়। অবশেষে রামচন্দ্র ও হরি প্রসন্নকে নাকথৎ দিতে হয়।

নাটকের অন্তিমে দেখা যায়, কালীকিঙ্কর তাঁর মেয়ে সুশীলা ও সরলাকে নিয়ে হরিদ্বার যাওয়ার পরিকল্পনা করেছেন। বিধবা বৌমা চারুমতীকে বাপের বাড়ী পাঠানোর ব্যবস্থা করেছেন। বৌমা চারুমতীকে নিয়ে কালীকিঙ্করের আক্ষেপের শেষ নেই। চারুমতী বিপথগামী হয়েছে তা

জানতে পেরে কালীকিঙ্কর বিধবা নারীর দুঃখজনক জীবনের করুণ দিকটি অনুভব করেছেন। আক্ষেপ করে জানিয়েছেন,—“ঠাকুর! বলতে পারেন, কোন পাপের ফলে কন্যা বিধবা হয়? বিবাহিত পুত্র, পত্নী রাখিয়া অসময়ে মারা যায়? আর কোন পুণ্য ফলেই বা পুনর্জন্মে আর এ বিধবা সঙ্কট না ঘটে?”^{১৪৫} কালীকিঙ্কর তার বৌমা চারুমতীর মুখ দর্শন করতে চায় না। চারুমতী অন্ততপ্ত হয়। সে প্রায়শ্চিত্ত করতে চায়। সে তার দুই ননদ সরলা ও সুশীলার সঙ্গে হরিদ্বার যেতে চায়। কালীকিঙ্কর রাজী হয়। অবশেষে সরলা, সুশীলা, চারুমতী, কালীকিঙ্কর ও গিন্নীসহ প্রত্যেকে হরিদ্বারে চলে যায়। এখানেই নাটকটির কাহিনী শেষ হয়।

নাট্যকার খুব সহজেই সমাজের বাস্তব দিকটি আলোচ্য নাটকটির মধ্য দিয়ে তুলে ধরেছেন। সমাজে বিধবা বিবাহ নিয়ে পক্ষে-বিপক্ষে বহু আন্দোলন চললেও খোদ বিধবাদেরই পুনর্বিবাহে মত ছিল না। কোনো কোনো বিধবা নারী শিক্ষিত হবার তাগিদে নিজেদের মানসিকতার উন্নতি ঘটিয়েছিলেন। সমাজের ভালো-মন্দের দিকটি বুঝতে শিখেছিলেন। পুরুষ শাসিত সমাজের পুরুষ দ্বারা রচিত কিছু নিয়মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করতে শিখেছিলেন এইসব নারীরা। কিন্তু কিছু বিধবা নারী হিন্দু সংস্কারবশতঃ তাদের বৈধব্য জীবনকে স্বীকার করে নিয়ে হিন্দুত্ব ধর্মরক্ষায় নিজেদের জীবনদান করেছিলেন। হিন্দু ধর্মের বিরোধী কাজে তারা নিজেদের অসতী বলে মনে করেছিলেন। বিধবা হয়ে পুণরায় বিবাহ করাকে পাপ কাজ বলে মনে করেছিলেন এবং পুনর্বিবাহ থেকে বিরত থেকেছিলেন।

১৮৯০ সালে প্রকাশিত হয় রসরাজ অমৃতলাল বসু প্রণীত ‘তরুণালা’ নাটক। ‘তরুণালা’ নাটকের উৎসর্গ পত্রে নাট্যকার লিখেছেন,—“মহিষাদল রাজকুলভূষণ মহামহিম শ্রীল শ্রীযুক্ত মহারাজা জ্যোতিপ্রসাদ গর্গ বাহাদুরের শ্রীচরণকমলে গ্রন্থাকার কর্তৃক এই নাটক ভক্তি সহকারে উৎসর্গীকৃত হইল।”^{১৪৬} ‘তরুণালা’ নাটকটিতে নাট্যকার ‘তরুণালা’ নামক এক সতী স্বামীসোহাগ বধিতা নারীর কাহিনী তুলে ধরেছেন। আলোচ্য নাটকে তরুণালার একনিষ্ঠ প্রেম ও স্বামীপরায়ণা মনোভাবের মধ্য দিয়ে নিজ স্বামী সোহাগের অধিকারিণী হয়ে ওঠার কাহিনী বর্ণিত করেছেন নাট্যকার। ‘বিধবা বিবাহে’র আন্দোলনে সামাজিক ভীতি একটা বড় ভূমিকা নিয়েছিল। সমাজ ভয়কে উপেক্ষা করে অনেক পুরুষ ‘বিধবা বিবাহে’ এগিয়ে এলেও বিধবা নারীরা সেভাবে সাড়া দিতে পারেননি। নাট্যকার সেই বাস্তব সত্যকে ‘তরুণালা’ নাটকে উপস্থাপিত করেছেন ‘শান্ত-বেণী’র উপকাহিনীর মধ্য দিয়ে।

তরুণালার ননদ ‘শান্ত’ একজন বিধবা নারী। বিধবা শান্ত তার স্বশুরবাড়ির সম্পত্তিসহ

বাপের বাড়িতে ফিরে এসেছে। শান্তকে তরুণালা নিজ বোনের মত ভালোবাসে। নাটকটিতে তরুণালার পাশাপাশি শান্তর বৈধব্য জীবন ও তার অবিচল মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। নাট্যকার অমৃতলাল বসু শান্তর বৈধব্য জীবনকে ভক্তিমার্গে দৃঢ় করেছেন। ‘বিধবা বিবাহে’ শান্তকে অগ্রসর হতে দেননি। নাটকটিতে একাধারে যেমন, স্বামী সোহাগ বঞ্চিতা একজন নারীর কাহিনী বর্ণিত হয়েছে তেমনি অন্যদিকে একটি বিধবা নারীর সমগ্র জীবনের পরিণতির কথা ধরা পড়েছে।

‘তরুণালা’ নাটকটিতে পাঁচটি অঙ্ক রয়েছে। প্রতিটি অঙ্ক গভীর্ণ বিন্যস্ত হয়েছে। ‘তরুণালা’ নাটকের প্রথম অঙ্কে ‘অখিলের বাটীর দরদালানে অখিল ও প্রসন্নর কথোপকথনের মধ্য দিয়ে ঘটনা শুরু হয়। অখিলের মাতা প্রসন্ন বিধবা। অখিলের স্ত্রী তরুণালাকে প্রসন্ন সম্পন্ন করে ঘরের বৌ করে নিয়ে এসেছিল। কিন্তু অখিল তাঁর স্ত্রী তরুণালাকে যোগ্য মর্যাদা দিতে চায় না। কারণ অখিল প্রণয় লোলুপ। নভেলের নায়িকার মত প্রণয় মাধুর্য অখিল তরুণালার মধ্যে খুঁজে পায়না। তাই তরুণালাকে অখিল স্ত্রীর মর্যাদা দিতে চায় না।

বেণী হোমিওপ্যাথী চিকিৎসক। বেণী কুটিল মনোবৃত্তির একজন মানুষ। বেণী অখিলের সম্পত্তি হস্তগত করতে চায়। বিধবা শান্তকে হাতিয়ার করে সে অখিলের সম্পদ দখল করতে চায়। শান্ত তার স্বামীকে তেমনভাবে জানার আগেই বিধবা হয়। তরুণালার কথায়,—“এই যে শান্ত ঠাকুরঝি সোয়ামী কেমন জানতে না জানতে বিধবা হলো, তা কি করবে, চুপ করে সয়ে যাচ্ছে, ভগবান সহিতে দিয়েছেন সহিছে।”^{১৪৭} শান্তর মত প্রায় প্রত্যেকটি নারীই বৈধব্যকে নিয়তি বলে মনে করে। ভগবান সহ্য করার জন্য নারীদের বিধবা করেন। বিধবাদের অনাড়ম্বর জীবনে। ঠাকুর দেবতার আশ্রয়ই একমাত্র সম্বল। তাই বিধবাদের ভগবান মুখ বুজে সহ্য করার ক্ষমতা দিয়েছেন —এমনটাই তৎকালীন সমাজের ধারণা।

তরুণালার মনোকষ্ট ও দাদা অখিলের বহিমুখি মনোভাবে আমোদিনী ও বোন শান্তর উদ্বিগ্নতা দেখা যায়। কথোপকথনের মধ্য দিয়ে শান্তর স্বামীহারা বেদনার প্রকাশ পেয়েছে। বিধবা শান্ত তাঁর বৌদি তরুণালার সুখ দেখে যেতে চায়। শান্ত কোনদিনই স্বামীসুখ পায়নি,—“আমার বোন ইহকালের সকল সাধই ফুরিয়েছে! দেবতা বামুনের পূজা করি বুড়ো একটু সেবা আর তোমরা দুজনে সুখে থাক তোমাদের ছেলে-পিলে হোক নিয়ে মানুষ করি, এই বই আমার আর কি সুখ আছে বল!”^{১৪৮} বিধবা শান্ত অন্যের সুখের মধ্য দিয়ে শান্তি পেতে চায়। নিজের জীবনের অসহায় পরিণতি দাদার সন্তানকে স্নেহ করে ভুলতে চায়। সুখী হতে চায় দেবতার চরণে নিজেকে

সঁপে দিয়ে। মাতার সেবার মধ্য দিয়ে, জীবনের অনাকাঙ্ক্ষিত পরিণামে থেকেও সুখের ছায়া দেখতে চায়।

কথা প্রসঙ্গে মৃত্যুঞ্জয় শান্তুর পুনর্বিবাহের কথা বলেন তাঁর মা প্রসন্নের কাছে। নাট্যকার অমৃতলাল বসু মৃত্যুঞ্জয়ের সংলাপে বিধবা বিবাহের প্রয়োজনীয়তা আরোপ করেছেন,—“শান্তকে দেখলে আমার এক একবার মনে হয় যে বিদ্যাসাগরের কথা ঠিক, বিধবা হওয়াই উচিত; আহা দুখের বাছা!”^{১৪৯} কিন্তু শান্তুর এতে কোন ভ্রক্ষেপ নেই। সে মনে মনে দেবতাজ্ঞানে স্বামীকেই পূজা করেছে। তাই স্বামী বিয়োগের পর নিজ প্রাণ দেবতার চরণে সমর্পণ করেছে। নিজ বয়ঃসন্ধিকালে ধর্মে মনঃসংযোগ করেছে। শান্তুর কথায়, বিধবা বিবাহ হলেও পরকালে স্বামীর আশ্রয় কোন্টি হবে তা নিয়ে সে সন্দেহান। তাই বিধবাদের বিবাহ না করাই শান্তুর মতো মেয়েদের পক্ষে উচিত কাজ। শুধু শান্ত নয়, উনিশ শতকের সমাজ ব্যবস্থায় শান্তুর মত বহু নারীই মনে করে বিধবা বিবাহ হলে পরকালে শান্তিপ্রাপ্তি হয় না। বিধবাদের পুনর্বিবাহ মহাপাপ। বিবাহ একবারই হয়। যদি সেই স্বামী বেঁচে থাকে সেই নারী ভাগ্যবতী। যদি স্বামী প্রয়াণ ঘটে তবে তা অদৃষ্ট। যার ফলে যৌবন সহ বাকী জীবনের ঠাঁই হয় ঠাকুর দেবতার কর্মে, চরণে ও সেবায়।

শান্ত কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারত পড়ে। বেণী এর কারণ জানতে চাইলে শান্ত খুব সহজেই উত্তর দেয় যে কালী তার ভাসুরের নাম। অর্থাৎ বিধবা হওয়ার পর বাপের বাড়ী চলে আসার পরও শান্ত শুধুমাত্র স্বামী নয় শ্বশুর বাড়ীর সমস্ত নিয়ম মেনে চলে। শান্ত শুধুমাত্র মৃত স্বামীর স্মৃতিকেই আঁকড়ে ধরে জীবন অতিবাহিত করতে চায়। বিধবা হওয়ার আগে শান্ত বঙ্কিমের নভেল ‘বিষবৃক্ষ’ পড়ত। কিন্তু বিধবা হওয়ার পর উপন্যাস পড়ে না, মহাভারত পড়ে। তার কারণ সে জানায় যে, মহাভারতে উপদেশের কথা আছে। যা পড়লে মন শান্ত হয়। ‘বিষবৃক্ষ’ উপন্যাসের প্রতি শান্তুর ক্ষোভ যেন তার জীবনের ভীতি,—“সেইতো যা’তে বিধবা কুন্দর আবার বে হলো? আহা ভারি উপদেশ! আপনিও মলো সূর্যমুখীর সংসারটাও ছারেখারে দিলে!”^{১৫০} শান্ত তাই বিধবা বিবাহকে সমর্থন করতে পারে না। সে মনে করে বিধবাদের পুণরায় বিয়ে হলে তারা শুধু অমঙ্গল করতে পারে, সংসারের ক্ষতি করতে পারে। শান্তুর এ ধারণা বেণীকে আঘাত করে। তাই শান্তুর ভুল ধারণা ভাঙতে চায় বেণী,—

“শান্ত // ...হিন্দুর ঘরে বিধবা বে করাই পাপ।

বেণী // শান্ত, এটি তোমার সম্পূর্ণ ভুল, বিধবাবিবাহ শাস্ত্রসম্মত, বিদ্যাসাগর মহাশয় তার প্রমাণ করেছেন। তুমি তো রামায়ণ পড়েছ, দেখ মন্দোদরী, তারা,

দুজনেই বিবাহ করেছিল।

শান্ত ।। হাঃ হাঃ হাঃ! বেণীদা, খুব দৃষ্টান্তই দিয়েছ, একজন রাক্ষসী একজন বাঁদরী! আমার স্বশুরবাড়ীর দেশেও দেখেছি দুলে কাওয়ার মেয়েরা ছেলে কোলে করে বে করে ভদ্র লোকের ঘরে কি হয়।”^{১৫১} শান্তর ধারণা তার স্বামী মৃত্যুপ্রাপ্ত হয়ে স্বর্গে গিয়ে দেবতা হয়েছেন। আর শান্ত মারা গেলেই স্বর্গে তাদের দেখা হবে। সেখানে তারা অমর। আর তার বিধবা হওয়ার ভয় থাকবে না। সেই সময়কালে পরকালীন সুখের আশায় পৃথিবীর সকল সুখ ভোগ ত্যাগ করে শান্তর মত বিধবা রমণীরা মন অবিচলিত রাখতে ছুটে গেছে ঠাকুরঘরে। পাছে তাদের মন বিচলিত হয়, পাপী হয় এই ভয়ে। বেণী শান্তকে পুণরায় বোঝানোর চেষ্টা করলে শান্ত শুনতে চায় না। কিন্তু বেণী শান্তকে বারবার বোঝানোর চেষ্টা করে। কারণ বেণীর উদ্দেশ্য শান্তকে বিবাহ করা।

বৃদ্ধ মৃত্যুঞ্জয় বিধবা বিবাহের যুক্তিযুক্ততা নিয়ে সন্দিহান। তিনি বিধবাদের পুণরায় বিবাহকে মন থেকে মেনে নিতে পারেন না। কিন্তু নাতনীসম বিধবা শান্তকে দেখলে মৃত্যুঞ্জয়ের মনে হয় পুনর্বিবাহ হওয়া উচিত। আবার শাস্ত্রকারের রক্তচক্ষুকে সঠিক ভাবে চায় বৃদ্ধ মৃত্যুঞ্জয়। কিন্তু মৃত্যুঞ্জয় মনে করেন সংসারে ব্রহ্মচারী একমাত্র বিধবারই আছে। বিধবারাই হিন্দুধর্ম রক্ষা করেছে। মৃত্যুঞ্জয়ের মনে করেন,—হিন্দুর ঘরে বিধবাই জাগ্রত দেবতা!

বিবাহিত বেণী দাম্পত্য জীবনে সুখী নয়। তাই সে আবার বিধবা শান্তকে বিবাহ করতে আগ্রহী। মূলত এ নাটকে বেণী শান্তর প্রতি ভালোবাসায় দুর্বল। কিন্তু শান্তকে বিবাহ করে সে তার সম্পত্তি হস্তগত করার বাসনাও মনে পোষণ করে। একাধিক বিবাহ করা তৎকালীন পুরুষ জাতির অধিকার। একটি রমণীতে সন্তুষ্টি না হলে পুণরায় বিবাহ পিঁড়িতে বসতে এদের দ্বিধা নেই। তাই বহুবিবাহ প্রথারও ইঙ্গিত আছে ‘তরুণালা’ নাটকে। বেণী সহচরীকে দিয়ে শান্তকে, বিবাহে রাজী করানোর কথা বলে। বিধবা শান্তর বৈধব্য আচার পালনের নিষ্ঠা অসীম। স্বামী বিয়োগের পর তেরো বছরের বিধবা শান্ত নিজেকে পুরোটাই মৃত স্বামীর উদ্দেশ্যে সমর্পণ করেছে।

বেণীর বন্ধু হীরালাল অখিলকে কুপথে যাবার জন্য ছলে বলে এক বারান্দার কাছে নিয়ে যায়। বই পড়া প্রেমের ফাঁদে ধরা দেয় অখিল। বারান্দা পারুল নিজ কৌশলে অখিলকে পুরোপুরি প্রেমে বশ করে ফেলে। পারুলের প্রণয়ে অখিল স্বর্গীয় সুখ পায়। পারুল গান গেয়ে অখিলকে প্রেমে মাতাল করে রাখে। সেইসঙ্গে পারুলের মাতা বামা অখিলের কাছ থেকে টাকা

আদায়ের ফন্দী আঁটে। ছলেবলে অখিলের থেকে টাকা নেওয়াই পারুল ও বামার উদ্দেশ্য। বামা ও পারুল নতুন করে টাকা উপার্জনের কথা ভাবে। অখিলের থেকে টাকা নেওয়া ছাড়াও অন্য বাবুদের মজলিস করিয়ে গান গেয়ে টাকা রোজগারের কথা ভাবে। অবশেষে অখিলের কাছে পারুলের মিথ্যাচার ধরা পড়ে যায়। ফলে অখিল পারুলের কাছ থেকে চিরবিদায় নেয়।

অন্যদিকে সহচরী শান্তকে নিয়ে বেলগাছিয়া বাগানে আসে। কৌশলে সহচরী শান্তকে একা রেখে একটু রেখে একটু দূরে চলে যায়। বেণী সন্ন্যাসী ছদ্মবেশে এসে শান্তকে জানায় যে, শান্তর একটি সুন্দর সন্তান হবে। শান্ত জানায় যে, সে বিধবা সুতরাং তার সন্তান হবার উপায় নেই, স্বামী সোহাগ পাবার কোন অবকাশ নেই। শান্ত সন্ন্যাসীর কথায় ভীত হয় ও অন্য কোথাও যাবার জন্য উদ্যোগী হয়। বেণী তখনি তার ছদ্মবেশ ছেড়ে শান্তকে বলে যে, সে শান্তকে ভালোবাসে, বিবাহ করতে চায়। কিন্তু শান্ত অনড়। শান্ত বৈধব্যাচারকে মনেপ্রাণে গ্রহণ করেছে। স্বর্গীয় স্বামী ভিন্ন অন্য কাউকে সে চোখে দেখতেও রাজী নয়। সহমরণ প্রথা থাকলে শান্ত তার স্বামীর চিতায় হাসতে হাসতে উঠতে পারত। শান্ত কোনভাবেই বিবাহ করতে রাজী নয়। তাই বেণীকে সে কঠোর ভাষায় নিষেধ করে।

মৃত্যুঞ্জয় তার স্ত্রী আমোদিনীকে নিয়ে সুখী। আমোদিনী অখিলকে তরুণালার কাছে ফিরিয়ে দেবার ফন্দী আঁটে। আমোদিনী তরুণালাকে অখিলের মনের মতো করে সাজিয়ে রাখে। অখিল আমোদিনীর ঘরে এলে তরুণালা পাগলিনীর বেশে প্রেমের কবিতা বলে। অখিল প্রথমে বুঝতে পারে না এ কবিতা কার? চিনতে পারে না তরুণালাকে। কিন্তু ক্ষণিক পরেই তরুণালার মধ্যে তার প্রেম দেখতে পায়। তরুণালাকে নিজ স্ত্রীর মর্যাদা দেয়। তরুণালাও আমোদিনীর শেখানো কথা ছেড়ে নিজের কথা বলে। আমোদিনীর সহচর্যে তরুণালা অখিলকে ফিরে পায়। অখিল তার ভুল বুঝতে পারে। আমোদিনী ও মৃত্যুঞ্জয় তাদের সমস্ত সম্পত্তি অখিলকে লিখে দেয়। শেষে আমোদিনীর গানের মধ্য দিয়ে নাটকটির যবনিকা পতন ঘটে।

১৮৯০ সালে ২০শে ডিসেম্বর ‘স্টার’ থিয়েটারে সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয় ‘তরুণালা’ নাটকটি। অভিনয়ের দিন ‘ইন্ডিয়ান ডেলি নিউজ’ পত্রিকায় প্রকাশিত ‘তরুণালা’ নাটকের বিজ্ঞাপনে লেখা হয়,— “New Drama ! Season`s Sensation! New Drama !

STAR THATRE
SATURDAY, THE 20TH DECEMBER, AT 9 P.M
Baboo Amrita Lal Bose`s New Society Comedy

“TARUBALA”

Our Domestic Doings Dramatically Described
Tarubala-The Model of a Hindu Wife
Hindu young widow's Devotion for her Departed Lord
NEXT DEY, SUNDAY, AT 6.30 P.M.
Malina Bikash & Bellick Bazar
G.C. GHOSH, Manager.”^{১৫২}

১৮৯১ সালের ২৯শে জুলাই বিদ্যাসাগরের প্রয়াণ ঘটে। ওই বছর প্রকাশিত হয়, অমৃতলাল বসুর ‘বিলাপ! বা বিদ্যাসাগরের স্বর্গে আবাহন’ নাটক। অমৃতলাল বসুর বিশিষ্ট শোকনাটক ‘বিলাপ! বা বিদ্যাসাগরের স্বর্গে আবাহন’। বিদ্যাসাগরকে স্মরণ করে এ নাটক রচিত। নাটকটিতে বিদ্যাসাগরের সামাজিক কাজকর্মের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছেন নাট্যকার। নাটকটি পাঁচটি দৃশ্যে বিন্যস্ত। ছাব্বিশ পৃষ্ঠার এই ছোটো নাটকে অমৃতলাল সাতটি গান ব্যবহার করেছেন।

প্রথম দৃশ্যে সরস্বতীর কমলবন। সেখানে দেবী সরস্বতী ও বঙ্গভাষার কথোপকথনের মধ্য দিয়ে নাট্যদৃশ্য শুরু হয়েছে। শোকে কমল বন মুদিত হয়ে আছে,—

“সরস্বতী // কেন গো সংসার আজি মলিন এমন।
পরেছে প্রকৃতি সতী শোক আবরণ।।
অরুণ কিরণ রেখা, যেন ছায়া ছায়া-মাখা,
বিষাদ মাখিয়ে ব’য় কেনগো পবন।

.....

বঙ্গভাষা // আশায় পড়িল ছাই।
আহা বিদ্যাসাগর নাই, বিদ্যাসাগর নাই!
জীর্ণবাস দূর করে, নব সাজ দিল মোরে,
সেজন নাহিক আর কা’র পানে চাই।”^{১৫৩}

এই অংশে বিপন্ন বঙ্গভাষার আর্তনাদ তাকে সরস্বতীর সান্ত্বনাদানের মধ্য দিয়ে বিদ্যাসাগরের প্রয়াণ ও দেশের সর্বব্যাপী শোকের কথা ব্যক্ত করা হয়েছে।

দ্বিতীয় দৃশ্যে দেখা যায়, নিমতলার ঘাটে বিদ্যাসাগরের চিতার অদূরে পাঁচজন নাগরিক উপনীত হয়েছেন। তাঁদের কথোপকথনে বিদ্যাসাগরের মৃত্যুর প্রতিক্রিয়া ভিন্ন ভিন্ন ভাবে উপস্থাপিত করেছেন নাট্যকার। বিদ্যাসাগরের অকালে প্রয়াণে শোকস্তব্ধ নাগরিকেরা জানিয়েছেন,

—‘বিপদের বন্ধু আর কোথায় পাবো’, ‘বিধবা বিবাহের মতটা প্রচার না কল্লে চন্দ্রে আর কলঙ্ক থকত না’। চতুর্থ নাগরিক জানিয়েছে,—“বিধবা বিবাহের বিরোধী পরিচয়ে হিন্দু নাম ক্রয় করা অপেক্ষা, বিদ্যাসাগরের ন্যায় পবিত্র জীবন যাপন করিয়া ব্রহ্মচার্যপালনাক্ষমা বালিকা বিবাহ দেওয়া সহস্রগুণে শ্রেয়।”^{১৫৪} জনতা দৃশ্যের মধ্য দিয়ে নাট্যকার বিধবা বিবাহের যৌক্তিকতাকে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন।

তৃতীয় দৃশ্যের ঘটনাস্থল, কস্মাঠার সন্নিকটস্থ পার্বত্য প্রদেশ। এক ব্রাহ্মণ ও তাঁর বালক পৌত্রের কথোপকথনের মধ্য দিয়ে বিদ্যাসাগরের সহায়তার প্রশংসা করা হয়েছে। ব্রাহ্মণ তাঁর পৌত্রকে বিদ্যাসাগরের আশ্রয়ে কলকাতায় রেখে আসবেন বলে রওনা দিয়েছিলেন। পথে বিদ্যাসাগরের মৃত্যুসংবাদ পেয়ে তিনি শোকের সাগরে নিমজ্জমান হয়েছেন। এবং পথ হতেই আবার গ্রামে ফিরে গেছেন।

চতুর্থ দৃশ্যের ঘটনাস্থল স্বর্গপথ। ঋষিদের উক্তিতে বিদ্যাসাগরের মাহাত্ম্য বর্ণিত হয়েছে। পয়ার ছন্দে ঋষিদের সংলাপে নাট্যকার লিখেছেন,—

“২য় ঋষি ॥ সাগর সমান জ্ঞান লভিয়া যতনে
কাটাইল নরলীলা বিদ্যা বিতরণে,
দান হেতু উপজিল নহে নিজ তরে
নিজ সুখে দিয়ে ডালি পর দুঃখ তরে।
যে নামে ঈশ্বর পান উচ্চ পরিচয়
সেই দয়াময় নাম সাধুর ধরায়।
বিদ্যার সাগর সেই দয়ার আধার
আসিছেন আমরায় করিতে বিহার।”^{১৫৫}

পঞ্চম দৃশ্যে বৈকুণ্ঠপুরীতে বিদ্যাসাগরের পুণ্যাত্মাকে স্বাগত জানানো হয়েছে। অপস্ফরাগণ বিদ্যাসাগরের পুণ্যাত্মাকে আবাহন করেছেন স্বর্গে,—

“ঈশ্বর চরণে হল ঈশ্বর মিলন ॥
নাহি অস্থি চন্ম মায়া, জ্যোতির্ময় ছায়া কায়া,
দেব মাঝে দেব সাজে দিল দরশন।
বিদ্যার সাগর বলে; খ্যাত ছিল মহীতলে,
দয়ার সাগর বলে স্বর্গে আবাহন ॥”^{১৫৬}

‘বিলাপ! বা বিদ্যাসাগরের স্বর্গে আবাহন’(১৮৯১) নাটকটিকে ‘বিধবা সংকট’ চিত্র উপস্থাপিত না হলেও ‘বিধবার অন্তর্বেদনা’র প্রসঙ্গ এসেছে বিদ্যাসাগরের প্রয়াণ বার্তার সঙ্গে। নাট্যকার বলতে চাইলেন, বিধবার সমব্যথা আর কেউ রইলেন না যিনি বিধবার সপক্ষে কথা বলবেন। বিধবা বেদনা দরদ দিয়ে উপলব্ধি করবেন।

‘স্টার’ থিয়েটারে ১৮৯১ সালের ২২শে আগস্ট অমৃতলাল বসুর ‘বিলাপ! বা বিদ্যাসাগরের স্বর্গে আবাহন’(১৮৯১) নাটকটি প্রথম অভিনয় হয়। অভিনয়ের দিন ‘ইন্ডিয়ান ডেলি নিউজ’ পত্রিকায় প্রকাশিত “বিলাপ! বা বিদ্যাসাগরের স্বর্গে আবাহন” নাটকের বিজ্ঞাপনে লেখা হয়,—

“The Great National Mourning!
STAR THATRE
TO-NIGHT
SATURDAY, 22ND AUGUST, AT 9 P.M
TH DECEMBER, AT 9 P.M
A New Dramatic Representation
BILAP
The Welcome of Vidyasagar in Heaven
TO BE PRECEDED BY
SITA’S EXILE
Next Day, Sunday, at Candle-light
NARAMEDH YAJNA
AND
BILAP
AMRITA LAL BOSE, Manager.”^{১৫৭}

১৮৯৪ সালে প্রকাশিত হয় অমৃতলাল বসুর ‘বাবু’ নাটক। ‘কমেডি অফ ম্যানার্স’ জাতীয় এই নাটকে উনিশ শতকের শেষলগ্নে মধ্যবিত্ত বঙ্গসমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর বাবুদের কার্যকলাপ ও চিন্তাধারার অসঙ্গতি নিয়ে ব্যঙ্গ বিদ্রোপ করা হয়েছে। বৈজ্ঞানিক বাবু, দেশহিতৈষী বাবু, সংস্কারক বাবু, ছোকরাবাবু, ধর্মধ্বজ বাবু—এই নাটকের রঙ্গরসিকতার পরিমণ্ডল তৈরি করেছে। আক্রান্ত হয়েছে ব্রাহ্মসমাজ। হিন্দু সমাজের বহু সনাতনী সংস্কারও হয়ে উঠেছে এ নাটকের বিষয়। দেশহিতৈষীদের ঔদ্ধত্য ব্যঙ্গের বিষয় হয়েছে। অন্যদিকে বিধবা বিবাহ ও স্ত্রীশিক্ষা কৌতুকে পরিণত হয়েছে। বাবু নাটকে নাট্যকার ইংরেজি শিক্ষিত বাবু সম্প্রদায়কে ব্যঙ্গ-বিদ্রোপ করেছেন। কন্দর্পকান্ত পূর্ববঙ্গীয় ব্রাহ্ম সংস্কারক। সে বিধবা বিবাহের প্রচারক। তার বাড়ির সামনে বিধবা রমণীদের গান গাইতে দেখা যায়,—

“পতি ম’লে হাতের বালা খুলব না লো খুলব না।

বিচ্ছেদ আগুন প্রাণে আর ত

জ্বালব না লো জ্বালব না।

আমরা সবাই বিদ্যেবতী

আসলে পরে দোসরা পতি।

টানলে প্রাণ তার পানে সই

কেন ঢলব না লো ঢলব না।”^{১৫৮}

‘বাবু’নাটকে ছোকরাবাবু কন্দর্পকান্ত ও তার মাতামহী আজিমার মধ্য দিয়ে বিধবা প্রসঙ্গটি উপস্থাপিত হয়েছে। কন্দর্পকান্ত পূর্ববঙ্গীয় ভাষায় কথা বলে। ছয়মাস যাবৎ কলকাতায় বাস করে নিজেকে সে অতিবড় সভ্যসমাজের একজন মনে করে। পূর্ববঙ্গীয় বাঙাল ভাষা ও শহুরে ভাষায় মিশ্রণে সৃষ্ট অদ্ভুত ভাষায় সে কথা বলে। কন্দর্পকান্ত ভাবে সে বাঙাল ভাষায় আর কথা বলে না, সভ্য সমাজের অধিকারী হয়ে সে সমাজের মঙ্গল করবে। ‘বিধবা বিবাহ’ দিতে পারলে কন্দর্পকান্ত সমাজে মানী ব্যক্তি হবে। তাই কন্দর্পকান্ত তার বৃদ্ধ মাতামহী বিধবা আজিমাকে পুনর্বিবাহ করাবার জন্য উঠেপড়ে লাগে। আজিমা হতবাক হয়ে যায় বৃদ্ধ বয়সে বিধবা বিবাহের কথা শুনে,—“এ কেমন কথা কোস্ রে কন্দর্পে? তিনকুরি মোয়া তিন গোড়া বয়স অইল আমার; আরাই কুরি বছরের কালে তোর আজা কুঞ্জোও বস্ছে, এখন আমার তুলসী তলায় সোমাজ দিলেই অয়,—গউরচন্দ কবে দয়া কর্বোন-টানি লবোন, আমি বিয়ে কর্বো, এ কেমন কথা কোয়? হিন্দুর গরে রাঁড়ের বিয়ে কি অয়? দন্ম যাবা, দন্ম যাবা।”^{১৫৯} কিন্তু ছোকরা কন্দর্পকান্ত নাছোড়। কন্দর্পকান্ত সংস্কারক বাবু সজনীকান্তর লেকচার শুনে মনে মনে ঠিক করে যে, সে তার মাতামহীকে বিবাহ দিয়ে দেশ উদ্ধার করবে এবং সমাজে নিজের মান রক্ষা করবে।

সমাজে বিধবাবিবাহ আবশ্যিক। বিধবাবিবাহ প্রচলিত হলে সমাজের কলুষতা দূরীভূত হবে। কিন্তু নির্বোধ কন্দর্পকান্ত তার বৃদ্ধ মাতামহীর বয়সজ্ঞান না করে পঁচিশ বছর বয়েসী এক পাত্রের সঙ্গে বিবাহ দিতে চায়। কন্দর্পকান্তি বৃদ্ধ আজিমাকে বলেছেন,—“আজিমা, আরে রোজ রোজ তোমার কতই বিরহ অইচে, বিয়া না অলি তুমি আর বাজবা না।”^{১৬০} কন্দর্পকান্ত বৃদ্ধ আজিমাকে বিয়ে দিয়ে ইলিশ মাছের ঝোল খাওয়াতে চায়, তার বিরহ মোচন করে চায়।

নির্বোধ ছোকরা কন্দর্পকান্ত নিজেকে ভারত সন্তান হিসাবে প্রমাণ করতে চায় তার মাতামহীর বিবাহ দিয়ে। বিধবা বিবাহ দিলেই সভ্য হওয়া যায়, ভদ্র সমাজে স্থান পাওয়া যায়—এই

ধরণের মানসিকতায় বিশ্বাসী ছোকরা কন্দর্পকান্ত বিধবা মাতামহীকে ছাদনাতলায় নিয়ে যাওয়ার কথা ভাবে। নাট্যকার রীতিমত হাস্যকর ভাঁড় জাতীয় চরিত্র হিসাবে কন্দর্পকান্তকে ‘বাবু’ নাটকে তুলে ধরেছেন।

বৃদ্ধা আজিমার পুনর্বিবাহ দিতে ইচ্ছুক কিছু সভ্য মহিলাদের গান ‘বাবু’ নাটকে দেখতে পাওয়া যায়। তারা প্রত্যেকে আজিমাকে বিবাহ দিয়ে উদ্ধার করতে চায়। সত্তর বছর বয়েসী বিধবা আজিমাকে পুণরায় বিবাহ দিতে চেয়ে ‘বিধবা বিবাহ’ নামক সংস্কারমূলক কর্মটি উপহাসিত হয়েছে ‘বাবু’ নাটকে। কৃষ্ণ নামে মুখরিত বৃদ্ধা আজিমা বিধবা বিবাহে রীতিমত বিরক্তবোধ করে। কিন্তু নির্বোধ তথাকথিত মহিলাদের পক্ষে সেটুকুও বোঝা সম্ভব হয়নি। সভ্য মহিলাদের মধ্যে ২য় মহিলা বলে ওঠেন,—“ অয়ি বিরহতাপ তাপতাপিনী আসন্নপ্রায়া বিষন্নবেদনা বিরহিনী বিধবা বালে! অয়ি কন্দর্পকান্তস্য মাতামহী মহীয়সী মহিলে! মা ভৈঃ মা ভৈঃ, আমরা এসেছি, —নবপতিরূপে আমোঘ বিবেক দিয়ে তোমার বহুদিনাবদ্ধ বিরহ কষ্ট শ্রীঘ্নই মোচন করবো।”^{১৬১} তারা একসঙ্গে গান করে,—

“ঠানদি তোমায় সাজাব লো ক’নে।

অতি যতনে, যত এয়োগণে।।

বেণী বাঁধিব ওলে রূপুলি চুলে,

থরে থরে থরে ঘিরে দিব ফুলে,

ধরে কি না ধরে দেখ নূতন বরের মনে,—

পর্যাব আবার কি গুলবাহার,

মাছে ভাতে দিনে রেতে হবে লো আহার,

বিচ্ছেদ বাধাব লো তোর একাদশীর মনে;

মগনা ভগিনী মোরা প্রেম বিতরণে।।”^{১৬২}

কন্দর্পকান্তের মূর্খতায় আজিমা অসন্তুষ্ট হয়ে বাড়ি ছেড়ে চলে যায়। ফলে কন্দর্পকান্ত রেগে গিয়ে তার মাতামহীকে যথেষ্ট গালাগাল করে,—“ হালার বিটী আজিমা আমারে একেবারে ডুবাইল...।”^{১৬৩} বৃদ্ধা মাতামহীর প্রতি সম্মান নয়, ‘বাবুয়ানার’ প্রকাশ ঘটানোই কন্দর্পকান্তের লক্ষ্য। নাট্যকার এই বাবুয়ানিকে ব্যঙ্গ করেছেন। উনিশ শতকে তথাকথিত বাবুদের কার্যপ্রণালীতে বিধবা বিবাহ নিয়ে উদ্বেগ ও মেকি বিধবা বিধবা বিবাহের উদ্যোগকে ‘বাবু’ নাটকে উপহাস করা হয়েছে।

বিদ্যাসাগর, বাল্য বিধবা ও নারীর শারীরিক ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য বিধবা বিবাহের কথা ভেবেছিলেন। তিনি মূলত অক্ষতযোনি বিধবাদের বিয়ের জন্য আন্দোলন করেছিলেন। এবং যুবতী অবস্থায় যারা বিধবা হয়েছেন তাদের পুনর্বিবাহের কথা বলেছিলেন। ‘বাবু’ নাটকে দেখা যায় বিপরীত ছবি। কন্দর্পকান্ত সংস্কারের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে বৃদ্ধ আজিমাকে পুনর্বিবাহ দিতে উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। ফলে, সমকালে প্রচলিত বিধবা বিবাহ আন্দোলনের বিপরীতমুখী উপহাসময় ছবি নাট্যকার ‘বাবু’ নাটকে তুলে ধরেছেন।

উত্তরকালে গিরিশচন্দ্র ঘোষের ‘শাস্তি কি শাস্তি’ (১৯০৮), অমৃতলাল বসু ‘খাসদখল’ (১৯১১), অমরেন্দ্রনাথ দত্তের ‘ভ্রমর’ প্রভৃতি নাটকে বিধবা প্রসঙ্গ উপস্থাপিত হয়েছে। কিন্তু সেখানে বিধবা নারীর ত্যাগ মহিমা ও ব্রহ্মচর্চাপালনের কথাই বড় করে তুলে ধরা হয়েছে।

সূত্রোল্লেখ উৎস ও টীকা :

১. বিবাহ ও সমাজ, গঙ্গেশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, ‘নব্যভারত’ মাসিক পত্র ও সমালোচন, শ্রীদেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী কর্তৃক সম্পাদিত, ২১০/৪ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, নব্যভারত কার্যালয় হইতে প্রকাশিত, ৬/১ নং পার্বতীচরণ ঘোষের লেন, যোড়াসাঁকো কলিকাতা প্রিন্টিং ওয়ার্কস যন্ত্রে শ্রীচণ্ডীচরণ দাস দ্বারা মুদ্রিত। অষ্টম খণ্ড, শ্রাবণ, ১২৯৭ সাল, পৃ ২২১।

২. সমাজচিত্রে উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা প্রহসন, জয়ন্ত গোস্বামী, সাহিত্যশ্রী, ৭৩, মহাত্মা গান্ধী রোড (দ্বিতল) কলিকাতা-৯, মহালয়া ১৩৬৭, পৃ ৪৩৫।

৩. বাংলা প্রহসনের ইতিহাস, অশোককুমার মিশ্র, মডার্ন বুক এজেন্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১০ বক্সিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০৭৩, প্রথম প্রকাশ কোজাগরী পূর্ণিমা কার্তিক ১৩৯৫, ইং ২৪ অক্টোবর ১৯৮৮, পৃ ২৮।

৪. সাহিত্য সাধক চরিতমালা-৫, রামনারায়ণ তর্করত্ন, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ২৪৩।১, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা, পঞ্চম সংস্করণ ভাদ্র ১৩৬৬, পৃ ২৫-২৬।

৫. ঐ, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ ২৫।

৬. বিবিধার্থ-সংগ্রহ অর্থাৎ পুরাবৃত্তেতিহাস-প্রাণিবিদ্যা-শিল্প সাহিত্যাদি-দ্যোতক মাসিক পত্র, ব্যাপ্তিস্ত-মিশন-যন্ত্রে মুদ্রিত, কলিকাতা, ১৭৭৭ শকাব্দ মাঘ, [১৮৫৫], পৃ ২৫৬।

৭. কুলীনকুলসর্বস্ব, রামনারায়ণ তর্করত্ন (শর্মা) শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বসুর বহুবাজারস্থ ১৮৫

নং ইন্সটানহোপ যন্ত্রালায়ে মুদ্রাক্ষিত, সম্বৎ ১৯১১ [১৮৫৪], পৃ ৩।

৮. কুলীনকুলসর্বস্ব, রামনারায়ণ তর্করত্ন (শর্মা), ঐ, পৃ ১০৯।

৯. সংবাদ ভাষ্কর, সম্পাদকীয়, ১৮ সেপ্টেম্বর ১৮৫৬, ৬৯ সংখ্যা, সাময়িক পত্রে সমাজ চিত্র, ৩য় খন্ড, বিনয় ঘোষ সম্পাদিত ও সংকলিত, বীক্ষণ ১২/১ বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায় স্ট্রীট। কলিকাতা ১২, প্রথম প্রকাশ জুলাই ১৯৬০, পৃ ৩২৯-৩৩০।

১০. অনূদিত, বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস ১৭৯৫-১৮৭৬, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ-মন্দির কলিকাতা ১৩৪৬, প্রথম মুদ্রণ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪০, দ্বিতীয় মুদ্রণ আষাঢ় ১৩৪৬, পৃ ৫১।

১১. বিধবা বিবাহ নাটক [১৮৫৬], উমেশচন্দ্র মিত্র, বাংলা নাট্যসংকলন ১ম খণ্ড পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি, সম্পাদনা বিষ্ণু বসু ও নৃপেন্দ্র সাহা, জুন ২০০১, পৃ ১৪৬।

১২. ভারতীয় নাট্যমঞ্চ, ১ম খণ্ড, হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, বঙ্গভাষা সংস্কৃতি সম্মেলন, ১২৪।৫বি, রসা রোড কলিকাতা, ১৯৪৫, পৃ ১৮।

১৩. রঙ্গালয়, বিশ্বকোষ, ১৬ খণ্ড, শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু কর্তৃক সংকলিত ও প্রকাশিত, কলিকাতা ৫ নং রাধারমন মিত্রের লেন, শ্যামপুকুর, বিশ্বকোষ প্রেসে শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাস দ্বারা মুদ্রিত, ১৩১২, পৃ ১৭৭।

১৪. *The Life And Teachings of Keshub Chunder Sen, By P.C Mozoomdar, Calcutta, Printed And Published By J W Thomas, Baptist Mission Press, 1887, page 76-76.*

১৫. বিধবা মনোরঞ্জন [১ম খণ্ড ১৮৫৬, ২য় খণ্ড ১৮৫৭] রাধামাধব মিত্র, শ্রীনবীনচন্দ্র বসু কর্তৃক প্রকাশিত, কলিকাতা গরানহাটা স্ট্রীটে পাঁচু দত্তের গলিতে ৯২ নং ভবনে শ্রীসেখ সেরাজ জমাদেব, ১২৬৩ বঙ্গাব্দ দ্বিতীয় ভাগ, ১৭৭৯ শকাব্দ কলিকাতা।

১৬. বিধবা মনোরঞ্জন, ঐ, ভূমিকা অংশ, পৃ ৩।

১৭. ঐ, পৃ ৩৭।

১৮. ঐ, ৪২।

১৯. ঐ, ৪২।

২০. ঐ, ২৭।

২১. ঐ, ২৮।

২২. কবিতাবলী (পাঁচ খণ্ড), দীননাথ বিশ্বাস কর্তৃক প্রণীত, গিরিশ বিদ্যারত্ন যন্ত্রে মুদ্রিত, ১৮৭৩ জানুয়ারি।

২৩. সম্পাদকীয় সম্বাদ ভাস্কর, ৬৯ সংখ্যা, ১৮ সেপ্টেম্বর ১৮৫৬, সামায়িক পত্রে সমাজ চিত্র, ৩য় খণ্ড, বিনয় ঘোষ সম্পাদিত ও সংকলিত, বীক্ষণ ১২/১ বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায় স্ট্রীট। কলিকাতা ১২, প্রথম প্রকাশ জুলাই ১৯৬০, সম্পাদকীয়, পৃ. ৩০।

২৪. সমাজ সংস্কার আন্দোলন ও বাংলা নাটক ১৮৫৪-১৮৭৬, গোলাম মুরশিদ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রকাশনায় মোহম্মদ ইবরাহিম, মুদ্রণে ওবায়দুল ইসলাম, প্রথম সংস্করণ ফাল্গুন ১৩৯০, ফেব্রুয়ারি ১৯৮৪, পৃ. ৬৮।

২৫. চপলাচিহ্নচাপল্য, যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায়, ভূমিকা, কলিকাতা, ১৯১৪ সংবৎ [১৮৫৭]।

২৬. চপলাচিহ্নচাপল্য, নাটক ঐ, পৃ. ৬।

২৭. চপলাচিহ্নচাপল্য, নাটক ঐ, পৃ. ৬।

২৮. চপলাচিহ্নচাপল্য, নাটক ঐ, পৃ. ১৪।

২৯. বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক, দ্বিতীয় পুস্তক, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, চতুর্থ সংস্করণ কলিকাতা ১৯২৯, পৃ. ২৫।

৩০. বাংলা নাটকের ইতিহাস, অজিতকুমার ঘোষ, জেনারেল প্রিন্টার্স য্যাং পাব্লিশার্স লিমিটেড, ১৩৬২ দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃ. ২৯।

৩১. দৃশ্যকাব্য পরিচয়, সত্যজীবন মুখোপাধ্যায়, বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির, প্রথম সংস্করণ ১৯৫০ পৃ. ৩২।

৩২. বাংলার সামাজিক জীবন ও নাট্যসাহিত্য, (১৮৫০-১৯০৫), প্রদ্যোৎ সেনগুপ্ত সাহিত্যশ্রী, ৭ই অক্টোবর, ১৯৭৬, পৃ. ১০১।

৩৩. রামনবমী, গুণাভিরাম শর্মা, ভূমিকা অংশ, কলিকাতা দাস এণ্ড সন্স যন্ত্রালয়ে মুদ্রিত, নং ৪০ সদন বড়ালের লেন, ওয়েলিংটন স্ট্রীট ১৮৭০ খৃঃ অব্দ।

৩৪. রামনবমী, ঐ, পৃ. ৮।

৩৫. রামনবমী, ঐ, পৃ. ৭৭।

৩৬. রামনবমী, ঐ, পৃ. ৮৪।

৩৭. সপত্নী নাটক (১৮৫৮) (প্রথম ভাগ) তারকচন্দ্র চূড়ামণি, নামপত্র, কলিকাতা ভাস্কর

যন্ত্রে শ্রীগগনচন্দ্র চক্রবর্তী দ্বারা মুদ্রিত, সংবৎ ১৯১৪।

৩৮. সপত্নী নাটক (১৮৫৮) ঐ, ভূমিকা অংশ।

৩৯. সপত্নী নাটক (১৮৫৮) ঐ, পৃ ৪৫-৪৭।

৪০. সংসদ বাঙালি চরিতাভিধান, সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত ও অঞ্জলি বসু, সাহিত্য সংসদ
৫ম সংস্করণ, জুলাই ২০১০, পৃ ১৮৫।

৪১. নীলদর্পণ, কস্ম্যচিং পথিকস্য, (দীনবন্ধু মিত্র) প্রথম অঙ্ক, চতুর্থ গর্ভাঙ্ক, ঢাকা শ্রীরামচন্দ্র
ভৌমিক কর্তৃক, বাঙ্গালাযন্ত্রে মুদ্রিত, ১৭৮২ শকাব্দ। ২ আশ্বিন। ঢাকা, পৃ ১৪।

৪২. বিধবা বিরহ নাটক, শিমুয়েল পিরবক্স, নামপত্র, ব্যপ্টিষ্ট মিশন প্রেস, কলকাতা
১৮৬০।

৪৩. বিধবা বিরহ নাটক, ঐ, পৃ ১২।

৪৪. বিধবা বিরহ নাটক, ঐ, পৃ ১৩।

৪৫. বিধবা বিরহ নাটক, ঐ, পৃ ১৩।

৪৬. বিধবা বিরহ নাটক, ঐ, পৃ ১৪।

৪৭. বিধবা বিরহ নাটক, ঐ, পৃ ৩০।

৪৮. বিধবা বিরহ নাটক, ঐ, পৃ ৩১।

৪৯. বিধবা বিরহ নাটক, ঐ, পৃ ৩৭।

৫০. বিধবা বিরহ নাটক, ঐ, পৃ ৫৬।

৫১. বিধবা বিরহ নাটক, ঐ, পৃ ৬২।

৫২. বিধবা বিরহ নাটক, ঐ, পৃ ৩৫।

৫৩. বিধবা বিরহ নাটক, ঐ, পৃ ৩৫।

৫৪. বাল্যোদ্ধাহ নাটক, শ্রীশ্যামাচরণ শ্রীমানি, কলিকাতা সূর্য্যোদয় যন্ত্রে মুদ্রিত, ১৮৭২
শকাব্দ, নির্বাচিত প্রহসন উনিশ শতক, সম্পাদনা অলোক রায়, বিবেকানন্দ বুক সেন্টার, মে
২০১৩, পৃ ২৬৯।

৫৫. বাল্যোদ্ধাহ নাটক, ঐ, পৃ ২২৭।

৫৬. বাল্যোদ্ধাহ নাটক, ঐ, পৃ ২৭২।

৫৭. বাল্যোদ্ধাহ নাটক, ঐ, পৃ ২৭৯।

৫৮. বাল্যোদ্ধাহ নাটক, ঐ, পৃ ২৯২।

৫৯. বাল্যোদ্ধাহ নাটক, ঐ, পৃ ২৯৫।

৬০. বাল্যোদ্ধাহ নাটক, ঐ, পৃ ৩০৭।

৬১. দলভঞ্জন নাটক (১৮৬১), হারাণচন্দ্র (শর্মা) মুখোপাধ্যায়, নিবোধই, ১লা মাঘ
১২৬৮ বঙ্গাব্দ, পৃ ২।

৬২. দলভঞ্জন নাটক (১৮৬১), ঐ পৃ ৪।

৬৩. দলভঞ্জন নাটক (১৮৬১), ঐ, পৃ ৩৩।

৬৪. ভূমিকা, ম্যাও ধরবে কে? (১৮৬২) হরিশ্চন্দ্র মিত্র, নূতন যন্ত্র, ঢাকা (১২৬৯), পৃ ৩।

৬৫. ম্যাও ধরবে কে? (১৮৬২) ঐ, পৃ ৩৩।

৬৬. ম্যাও ধরবে কে? (১৮৬২) ঐ, পৃ ৩৪

৬৭. ম্যাও ধরবে কে? (১৮৬২) ঐ, পৃ ৩৪।

৬৮. ম্যাও ধরবে কে? (১৮৬২) ঐ, পৃ ৩৪।

৬৯. ম্যাও ধরবে কে? (১৮৬২) ঐ, পৃ ৩৩-৩৪।

৭০. অমৃতলাল বসুর স্মৃতি ও আত্মস্মৃতি, ড. অরুণকুমার মিত্র সম্পাদিত, সাহিত্যলোক,
জানুয়ারি ১৯৮২, পৃ ৩০-৩১।

৭১. আইন সংযুক্ত কাদম্বিনী নাটক (১৮৬২) কুশদেব পাল, ১ম খন্ড ও ২য় খন্ড
কলিকাতা শীলএন্ড ব্রাদার্স যন্ত্রে যন্ত্রিত, ১২৬৯ সাল, পৃ ৫।

৭২. আইন সংযুক্ত কাদম্বিনী নাটক, ঐ, পৃ ৩০।

৭৩. আইন সংযুক্ত কাদম্বিনী নাটক, ঐ, পৃ ৩১।

৭৪. আইন সংযুক্ত কাদম্বিনী নাটক, ঐ, পৃ ৪৫।

৭৫. আইন সংযুক্ত কাদম্বিনী নাটক, ঐ, পৃ ৪৭।

৭৬. আইন সংযুক্ত কাদম্বিনী নাটক, ঐ, পৃ ৫৮।

৭৭. আইন সংযুক্ত কাদম্বিনী নাটক, ঐ, পৃ ৫৮।

৭৮. আইন সংযুক্ত কাদম্বিনী নাটক, ঐ, পৃ ৬৪।

৭৯. আইন সংযুক্ত কাদম্বিনী নাটক, ঐ, পৃ ৮০।

৮০. আইন সংযুক্ত কাদম্বিনী নাটক, ঐ, পৃ ৮০।

৮১. পুনর্বিবাহ নাটক, গুরুপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত, কলিকাতা, গৌড়ীয় যন্ত্রে মুদ্রিত,
সন ১২৬৯ সাল [১৮৬২] পৃষ্ঠা ৪৩।

৮২. বাংলা প্রহসনের ইতিহাস, অশোক কুমার মিশ্র, প্রথম প্রকাশ বৈশাখ ১৩৬৩ দেজ পাবলিশিং, দ্বিতীয় সং ১৩৯৫ কার্তিক, মডার্ন বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, পৃ: ১১৪।

৮৩. ঐ, পৃ: ১১৪,

৮৪. বিধবাবিলাস নাটক, যদুনাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীরামপুর প্রেস ফ্রেন্ড যন্ত্রালায়ে শ্রীযুত বেহারিলাল দত্ত দ্বারা মুদ্রাঙ্কিত, ইংরেজি সন ১৮৬৪। বঙ্গাব্দ ১২৭১। মূল্য দশ আনা, ভূমিকা অংশ, পৃ ৪।

৮৫. বিধবাবিলাস নাটক, ঐ, পৃ ৮।

৮৬. বিধবাবিলাস নাটক, ঐ, পৃ ১৩।

৮৭. বিধবাবিলাস নাটক, ঐ, পৃ ১৫ পৃ।

৮৮. বিধবাবিলাস নাটক, ঐ, পৃ ১৭।

৮৯. বিধবাবিলাস নাটক, ঐ, পৃ ২১।

৯০. বিধবাবিলাস নাটক, ঐ, পৃ ৭৫।

৯১. বিধবাবিলাস নাটক, ঐ, পৃ ৮৩।

৯২. বিধবাবিলাস নাটক, ঐ, পৃ ১৪৩।

৯৩. ভূমিকা অংশ, নবনাটক, রামনারায়ণ তর্করত্ন, ১৭৮৮ শকাব্দে বহুবাজারস্থ ১৭২ সংখ্যক ভবনে স্ট্যানহোপ যন্ত্রে শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোম্পানি কর্তৃক এ নাটক মুদ্রিত। মূল্য ১ টাকা।

৯৪. নবনাটক, ঐ, পৃ ৮৬।

৯৫. নবনাটক, ঐ, পৃ ৮৬।

৯৬. নবনাটক, ঐ, পৃ ৮৬।

৯৭. নবনাটক, ঐ, পৃ ৯৪।

৯৮. নবনাটক, ঐ, পৃ ১০১।

৯৯. নবনাটক, ঐ, পৃ ১০১।

১০০. বসন্ত কুমার চট্টোপাধ্যায় প্রণীত জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবন-স্মৃতি, সম্পাদনা প্রশান্তকুমার পাল, সুবর্ণরেখা, ১লা বৈশাখ ১৪১৯ সংস্করণ, পৃ ১১৩।

১০১. উৎসর্গ পত্র, বিয়ে পাগলা বুড়ো, দীনবন্ধু মিত্র, দীনবন্ধু রচনাবলী, সম্পাদনা অজিত কুমার ঘোষ, হরফ প্রকাশনী, ২০ ডিসেম্বর ১৯৮৩ সংস্করণ।

১০২. বিয়ে পাগলা বুড়ো, ঐ, পৃ ১০৪।
১০৩. বিয়ে পাগলা বুড়ো, ঐ, পৃ ১১১।
১০৪. বিয়ে পাগলা বুড়ো, ঐ, পৃ ১১০।
১০৫. বিয়ে পাগলা বুড়ো, ঐ, পৃ ১১১।
১০৬. মেঘনাদবধ নাটক, ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়, প্রকাশক কালীকুমার চক্রবর্তী, ১৫ নং কলকাতা ঝামাপুকুর, বি.পি.এমস যন্ত্রে ছাপা, ১২৭৪ [১৮৬৭], বঙ্গাব্দের ২৮সে ভাদ্র, মূল্য বারো আনা, পৃ ৩০।
১০৭. মেঘনাদবধ নাটক, ঐ, পৃ ৫১।
১০৮. মেঘনাদবধ নাটক, ঐ, পৃ ৫৬
১০৯. বঙ্গকামিনী নাটক, হারাণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা বি.পি.এমস যন্ত্রে মুদ্রিত শ্রীকালীকুমার চক্রবর্তী দ্বারা মুদ্রিত, ১৫নং ঝামাপুকুর লেন, ১২৭৫ সাল [১৮৬৮] সালে প্রকাশিত, পৃ ৫৮।
১১০. বঙ্গকামিনী নাটক, ঐ, পৃ ৭৩।
১১১. বঙ্গকামিনী নাটক, ঐ, পৃ ৭৪।
১১২. উৎসর্গ পত্র, হিন্দু মহিলা নাটক, বিপিনমোহন সেনগুপ্ত, ১৮৬৮ সালে কলকাতা ‘আমাস্ট্রীট’ হতে প্রকাশিত।
১১৩. হিন্দু মহিলা নাটক, ঐ, পৃ ১।
১১৪. হিন্দু মহিলা নাটক, ঐ, পৃ ৫।
১১৫. হিন্দু মহিলা নাটক, ঐ, পৃ ৮।
১১৬. হিন্দু মহিলা নাটক, ঐ, পৃ ২৩।
১১৭. হিন্দু মহিলা নাটক, ঐ, পৃ ৭১।
১১৮. ভূমিকা অংশ, সাক্ষাৎ-দর্পণ নাটক, অঞ্জলিনামা রচিত, ১২৭৮ [১৮৭১] বঙ্গাব্দে, ২২১ নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট দ্বৈপায়ণ যন্ত্রে শ্রী যদুনাথ রায় কর্তৃক মুদ্রিত।
১১৯. বিধবার দাঁতে মিশি, গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা, সূর্যপাড়া লেন, সিমলা, ১৮৭৪, পৃ ৪৫।
১২০. বিধবার দাঁতে মিশি, ঐ, পৃ ৫২।
১২১. শরৎ সরোজিনী, দুর্গাদাস প্রণীত, দ্বিতীয় সংস্করণ, কলিকাতা, পটলডাঙ্গা,

পটুয়াচোরাবালি, ১১ সংখ্যক ভবনে নূতন ভারতযন্ত্রে শ্রী বামনসিংহ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত,
১২৮৩ [১৮৭৬] সালে, পৃ ৪০।

১২২. শরৎ সরোজিনী, ঐ, পৃ ৫৫।

১২৩. শরৎ সরোজিনী, ঐ, পৃ ১২।

১২৪. বাংলা রঙ্গালয়ের ইতিহাসের উপাদান (১৮৭২-১৯০০), শঙ্কর ভট্টাচার্য্য,
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্যদ, প্রথম সংস্করণ, আগস্ট ১৯৮২, পৃ ১২১-১২২।

১২৫. আত্মচরিত, শিবনাথ শাস্ত্রী, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ কর্তৃক প্রকাশিত, প্রথম প্রকাশ
১৯১৮, পুনর্মুদ্রণ ২০০০, ২১১ বিধান সরণি, কলিকাতা ৭০০ ০০৬, পৃ ৯৯-১০০।

১২৬. বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড, সুকুমার সেন, পঞ্চম সংস্করণ আনন্দ
পাবলিশার্স, পৃ ৩২৫।

১২৭. প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা, সন্তাপিনী নাটক, বামাবোধিনী, বৈশাখ ১২৮৩,
পৃ ২৩।

১২৮. সন্তাপিনী নাটক, জনৈক ভদ্রমহিলা প্রণীত, বাগবাজার স্মিথ এণ্ড কোং, ১২৭৯
বঙ্গাব্দ, [১৮৭২] মূল্য এক টাকা, পৃ ৫২।

১২৯. সন্তাপিনী নাটক, ঐ, পৃ ৫৩।

১৩০. সন্তাপিনী নাটক, ঐ, পৃ ৫৭।

১৩১. সন্তাপিনী নাটক, ঐ, পৃ ৫৯।

১৩২. এমন কর্ম্ম আর করব না, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, কলিকাতা আদিব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে
শ্রীকালীদাস চক্রবর্তী দ্বারা মুদ্রিত, আষাঢ় ১৭৯৯ শক, মূল্য দশ আনা, পৃষ্ঠা ৭।

১৩৩. এমন কর্ম্ম আর করব না, ঐ, পৃ ৫১।

১৩৪. রবীন্দ্রস্মৃতি, ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী, বিশ্বভারতী, ২৫শে বৈশাখ ১৩৬৭, পৃ ৩০।

১৩৫. জীবনস্মৃতি, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী, ভাদ্র ১৪১৭, ৩৫।

১৩৬. ভূমিকা অংশ, বঙ্গবিধবা, বিরজামোহন চৌধুরী, ১৮৮২। (আখ্যাপত্র বিনষ্ট হওয়ায়
প্রকাশকের নাম ও ঠিকানা জানা সম্ভবপর হয়নি।)

১৩৭. বঙ্গবিধবা, ঐ, পৃ ২৫

১৩৮. বঙ্গবিধবা, ঐ, পৃ ৪৬।

১৩৯. বাংলা রঙ্গালয়ের ইতিহাসের উপাদান (১৮৭২-১৯০০), শঙ্কর ভট্টাচার্য্য,

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পৰ্যদ, আগষ্ট ১৯৮২, পৃ ২৩৯।

১৪০. *বিধবা সঙ্কট*, অজ্ঞাতনামা রচিত, কলিকাতা ১৫১ নং বারাণসী ঘোষের স্ট্রীট
রিপণ প্রেস এজেন্সী থেকে শ্রীপ্রভাতচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত, ১৮৯০ সাল, পৃ ১৫।

১৪১. *বিধবা সঙ্কট*, ঐ, পৃ ২২।

১৪২. *বিধবা সঙ্কট*, ঐ, পৃ ৩৭।

১৪৩. *বিধবা সঙ্কট*, ঐ, পৃ ৩৮।

১৪৪. *বিধবা সঙ্কট*, ঐ, পৃ ৪৯।

১৪৫. *বিধবা সঙ্কট*, ঐ, পৃ ৬৬।

১৪৬. *ভূমিকা, তরুণালা, অমৃতলাল বসু*। (আখ্যাপত্র বিনষ্ট হওয়ায় প্রকাশকের নাম
জানা যায়নি।)

১৪৭. *তরুণালা*, ঐ, পৃ ২৯।

১৪৮. *তরুণালা*, ঐ, পৃ ৩২।

১৪৯. *তরুণালা*, ঐ, পৃ ৩৭।

১৫০. *তরুণালা*, ঐ, পৃ ৪১।

১৫১. *তরুণালা*, ঐ, পৃ ৪১।

১৫২. *বাংলা রঙ্গালয়ের ইতিহাসের উপাদান (১৮৭২-১৯০০)*, শঙ্কর ভট্টাচার্য,
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পৰ্যদ, আগষ্ট ১৯৮২, পৃ ৩৫৭।

১৫৩. *‘বিলাপ! বা বিদ্যাসাগরের স্বর্গে আবাহন’*, শ্রী অমৃতলাল বসু প্রণীত ও প্রকাশিত,
কলিকাতা ২নং মল্লিক লেন হইতে প্রকাশিত, কলিকাতা, ৬ নং ভীমঘোষ লেন, গ্রেট ইডেন প্রেস
ইউ.সি. বসু এণ্ড কোম্পানি দ্বারা মুদ্রিত, সন ১২৯৮ সাল। মূল্য ১০ আনা, পৃ ২।

১৫৪. *‘বিলাপ! বা বিদ্যাসাগরের স্বর্গে আবাহন’*, ঐ, পৃ ১১।

১৫৫. *‘বিলাপ! বা বিদ্যাসাগরের স্বর্গে আবাহন’*, ঐ, পৃ ২৫।

১৫৬. *‘বিলাপ! বা বিদ্যাসাগরের স্বর্গে আবাহন’*, ঐ, পৃ ২৬।

১৫৭. *বাংলা রঙ্গালয়ের ইতিহাসের উপাদান (১৮৭২-১৯০০)*, শঙ্কর ভট্টাচার্য,
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পৰ্যদ, আগষ্ট ১৯৮২, পৃ ৩৬৪।

১৫৮. *বাবু, অমৃতলাল বসু, অমৃতলালের শ্রেষ্ঠ প্রহসন*, সম্পাদনা ড. ক্ষেত্র গুপ্ত, শঙ্কুনাথ
গঙ্গোপাধ্যায়, পুঁথি প্রকাশনার পক্ষে অমরনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, পি ৪০, ব্লক বি, বাঙুর এভেনিউ,

কলকাতা ৫৫, অক্ষয় তৃতীয়া ১৩ মে ১৯৯৪, পৃ ১৭০।

১৫৯. বাবু,ঐ, পৃ ১৯৫।

১৬০. বাবু,ঐ, পৃ ১৯৮।

১৬১. বাবু,ঐ, পৃ ১৯৯।

১৬২. বাবু,ঐ, পৃ ১৯৯।

১৬৩. বাবু,ঐ, পৃ ২০১।

— — —

চতুর্থ অধ্যায়

উনিশ শতকের বাংলা নাটকে বিধবা নারীর সংকট

সতীপ্রথা চালু থাকার সময়কালে যুবতী বিধবার সমস্যা বড় হয়ে দেখা দেয়নি। কারণ স্বামীর মরণের সঙ্গে সঙ্গে বিধবা নারীকে চিতার যূপকাষ্ঠে পুড়িয়ে মারা হত। এই ঘৃণ্য প্রথা যখন রাজা রামমোহন রায়ের প্রচেষ্টায় বন্ধ হল তখন সমাজে যুবতী হিন্দু বিধবার সংখ্যা দিন দিন বেড়ে গেল। যুবতী বিধবা রমণী যৌবন ক্ষুধার তাড়নায় ও প্রবল দুর্বীর রিপু বাসনা চরিতার্থ করার জন্য বাধ্য হল গোপনে যৌন মিলনে। সমাজে দেখা দিল ভ্রূণ হত্যার একাধিক অবাস্তব ঘটনা। দেখা দিল, নাবালিকা বিধবার সম্পত্তি হাতিয়ে নেবার নানান ষড়যন্ত্র। বিধবা কিশোরী, উপবাস আর অর্ধাহার, সাদা থান পরিধান করে যৌবনে যোগিনী হতে বাধ্য হল। সমাজে দেখা দিল নানান অপরাধ প্রবণতা।

মহামারীর রূপ নিয়ে সমাজে দেখা দিল ভ্রূণ হত্যা, অবৈধ গর্ভপাত, অবৈধ প্রণয়, বেশ্যাবৃত্তি। গ্রামের বঞ্চিত যুবতী বিধবারা জীবন বাঁচানোর তাগিদে নতুন গড়ে ওঠা শহর কলকাতার রাজপথে দেহব্যবসায়িনী পণ্যজীবী হয়ে দাঁড়াতে বাধ্য হয়েছিল। বাধ্য হয়েছিল, বাবুদের রক্ষিতা হয়ে জীবন কাটাতে। বিধবা নারীর এই সংকটাপন্ন রূপ সেকালের সাহিত্যিকেরা তাঁদের সাহিত্যে তুলে ধরলেন মরমী দৃষ্টিকোণ থেকে। উনিশ শতকের সমকালে বাংলা সামাজিক নাটক রচনা করতে গিয়ে নাট্যকারেরা কাহিনীর পরতে পরতে ‘বিধবা চরিত্র’কে, তাঁদের সংকটকে নাটকে তুলে আনলেন। ভিন্ন বয়সের বিধবা ভিন্ন সমস্যা, ভিন্ন সংকটের টানাপোড়েনে বিপর্যস্ত বিধবা নারী চরিত্রকে, নারীর দুঃখকথাকে নাট্যকারেরা প্রকাশ্যে আনলেন।

উনিশ শতকের বিধবা নারীদের সংকট বহুধায় বিস্তৃত। বিধবা নারীরা কখনো বা গৃহকর্মে আচারনিষ্ঠ ধর্মপরায়ণ ঈশ্বর সেবায় নিয়োজিত প্রাণ, কখনো বা পুনঃ ঘর বাঁধার স্বপ্নে গৃহত্যাগী এবং তার জন্য চৌর্যবৃত্তির আশ্রয়, কখনো বা পরকীয় সুখের অনুসন্ধানী, কখনো বাঁচার তাগিতে বেশ্যা বৃত্তিতে গমন, কখনো বা অবৈধ কর্মে লিপ্ত হয়ে ভ্রূণ হত্যায় পাপ কর্মে নিয়োজিত, কখনো

বা বিধবা বিবাহের জন্য সততঃ উন্মুখ। পিতৃগৃহ ও স্বশ্বশ্বরগৃহে বিধবাদের সংকটের ভিন্ন প্রতিচ্ছবি চোখে পড়ে। এমনকি অর্থনৈতিক ভাবে বলীয়ান ও অর্থনৈতিক ভাবে নিঃস্ব অসহায় বিধবার শ্রেণী চরিত্র ও তাদের মনস্তত্ত্বকে তুলে ধরতে সচেষ্ট হয়েছি। বস্তুত উনিশ শতকের একাধিক নাটকের কাহিনী বৃত্তে আমরা খুঁজে দেখার চেষ্টা করবো বিধবা নারীদের এই শ্রেণী বৈচিত্র্য ও সংকটের ভিন্ন রূপ।

১৮৫৬ সালে বিধবা বিবাহ আইনত স্বীকৃত হবার পূর্বে রামনারায়ণ তর্করত্নের ‘কুলীন কুলসর্বস্ব’ (১৮৫৪) নাটকে বিধবার মর্মযন্ত্রণার কথা উপস্থাপিত হয়। সেকালের ইংরেজি শিক্ষিত আধুনিক মনস্ক বিদ্বৎসমাজের একাংশ সমাজ সংশোধনে অগ্রসর হয়েছিলেন। তেমনই এক বিদ্যোৎসাহী জমিদার কালীচন্দ্র রায়চৌধুরী কৌলীন্য প্রথার কুফল বিষয়ক নাটক রচনার জন্য ১৮৫৩ সালে ‘সম্বাদ ভাস্কর’ পত্রিকায় পুরস্কার ঘোষণা করে একটি বিজ্ঞাপন প্রচার করেন। এই তাগিদ থেকেই নাট্যকার রামনারায়ণ তর্করত্ন রচনা করেন ‘কুলীন কুলসর্বস্ব’ নাটক (১৮৫৪) এবং পুরস্কৃত হন।

‘কুলীন কুলসর্বস্ব’ নাটকে কুলীন কুলপালক বন্দ্যোপাধ্যায়ের চার কন্যার বিবাহকে কেন্দ্র করে মূল কাহিনী আবর্তিত হয়েছে। ঘটক অনিতাচার্য ও শুভাচার্য কুলপালকের চার কন্যার বিবাহের জন্য একটি কুলীন পাত্র ঠিক করেন। পাত্রের পরিচয় দিয়ে অন্তাচার্য জানিয়েছে, —“বরের কিঞ্চিৎ বয়োধিক্য, আর এমন অধিক বয়সই বা কি? সেই ষষ্ঠীর বৎস এই ষষ্ঠিবৎসরে পদার্পণ করিয়াছে। যাহা হউক, তোমার কি অদৃষ্ট, শিবের জামাই শিব ঘটিয়াছে অতএব তুমি সেই সর্বগুণালঙ্কৃত কুলীন মহারথী কুমারে কুমারী প্রদান করিয়া চরিতার্থ হও।” সমাজ অনুশাসনকে মান্যতা দিতেই কুলপালক এমন অশীতিপর বৃদ্ধের সঙ্গে নিজ কন্যাদের বিবাহ দিতে একরকম বাধ্য হয়েছেন। এ বিবাহ আগাম বৈধব্য যাত্রার নামান্তর মাত্র। সেকালে হিন্দু নারীর এমনই অবস্থা ছিল যে, কুমারীত্ব, বিবাহিত ও বৈধব্য জীবনাচরণ সমাজের যুপকাঠে পীড়িত। অন্তাচার্যের বক্তব্যে পুরুষশাসিত সমাজে নারীর অবস্থানগত সংকটটি প্রকাশিত হয়েছে, —“শুনিয়াছি সপ্তশলাকে বিবাহ হইলে স্ত্রী বিধবা হয়, কিন্তু কুলীন কুমারীরা ত সর্বদাই বৈধব্য-বেদনা সহ্য করে, সুতরাং বিধবার আর বৈধব্যের আশঙ্কা কি? অতএব, ইহাকে বাক্‌ছলে প্রতারিত করে স্বকার্য সাধন করি।”

কুলপালক তাঁর চার কন্যাকে বিবাহের কথা জানালে বয়স অনুযায়ী তাঁদের মধ্যে নানা প্রতিক্রিয়া দেখা গেছে। চার কন্যার বয়স যথাক্রমে ৩২, ২৬, ১৫ ও ৮। বিবাহ বিষয়ে কুলপালকের

চার কন্যার মধ্যে চার ধরনের প্রতিক্রিয়া দেখা গেছে। বড় কন্যা জাহ্নবীর মনে আনন্দ নেই। জাহ্নবী জানিয়েছে,—“আমার কি আর ‘বের’ সময় আছে? আমি অন্তদন্ত হীন হয়েছি, এখন ‘তীর্থে’ যাওয়াই উচিত।”^{৩০} মেজ কন্যা শান্তবী বিবাহ সম্পর্কে কিছুটা অনুরাগী। সে জানিয়েছে,—“ক্ষতি কি? হলোই বা।”^{৩১} সেজ কন্যা কামিনী যৌবন জ্বালায় পীড়িত। কিশোরী বালিকাসুলভ চপলতায় জিঞ্জাসুপ্রবণ। কিশোরী আগত বৃদ্ধ বরের বর্ণনায় জানিয়েছে,—

“দেখিলাম বাসায় বসিয়া আছে বর।

প্রবীণ বয়স শীর্ণ জীর্ণ কলেবর।।

.....

সিদ্ধিতে নাই সিদ্ধি আকিঞ্চন গাঁজা।

ঢুলু ঢুলু আঁখি মুখে উঠিতেছে গাঁজা।।

শূল ধরে সে বাতুল কপালে আগুন।

গুণের মধ্যেতে তার আছে তমোগুণ।।

গঙ্গাকে ধরিয়া শাদা হয়েছে কি কেশ।

এ বর দিগম্বর খেপা ব্যোমকেশ।।

তামাক টানিয়া মরে কাশিতে২।।

বোধ হয় গয়া এবার কাশিতে।।

মরণ পৌড়ার মুখো কেনবা এসেছে।

চিত্রগুপ্ত বুঝি খাতা ভুলিয়া বসেছে।”^{৩২}

কুলপালকের জ্যেষ্ঠ কন্যা জাহ্নবী তাঁর বোধবুদ্ধি দিয়ে বুঝেছে এমন বরকে বিবাহ করা মানে বৈধব্যের নামান্তর। আক্ষেপের সঙ্গে জাহ্নবী জানিয়েছে,—“এ বিয়া হইলে মাত্র একাদশী ফল।”^{৩৩} এর পাশাপাশি নাট্যকার, ফুলকুমারী নামক এক কিশোরী নববধূর যন্ত্রণাকে বাঙময় করে তুলেছেন। ফুলকুমারী তাঁর যশোদা ঠাকুমাকে জানিয়েছে,—

“টাকা হাতে করি কাকা গিয়ে তাকে দিল।

এমনি কুলের ধর্ম তবে পা ধুয়িল।।

.....

যামিনীতে একাকিনী শয়ন করিয়া।

পতির ধ্যানেন্তে আছি নয়ন মুদিয়া।।

.....
দেখিয়া নিদ্রিতা মোরে পাষণ্ড পামর।

অনায়াসে ঢাকামেরে জাগায় সত্বর।।

.....
শীঘ্র করি অর্থ মোর হাতে দেও আনি।

নতুবা অনর্থ হবে বুঝ অনুমানি।।

.....
কাটনাকাটা কড়ি যত করিনু বাহির।।

যা ছিল আমার পুঁজি দিলাম সকল।

তথাপি অধিক দেও কহিল পাগল।।

তাতে কহিলাম নাথ তুমি জ্ঞানবান।

কেন কর অধীনীরে এত অপমান।।।

কহ দেখি কোথা আছে বিধান এমন।

পত্নীর নিকটে পতি লইবে বেতন।।

ইহা শুনি গুণমণি ক্রোধেতে মহেশ।

নারী হয়ে মোরে তুমি দেও উপদেশ।।

এত বলি ক্রোধ ভরি উঠিয়া চলিল।...”^৭

ফুলকুমারী চরিত্রটির বাস্তব ভিত্তি আছে। ফুলকুমারীর দাম্পত্য জীবন মর্মস্পর্শী। নাট্যকার রামনারায়ণ তর্করত্ন ব্যক্তিগত জীবনে কামিনী নামক এক কুলীন কন্যার অগ্নিদগ্ধ হওয়ার ঘটনায় বড় ধরনের আঘাত পেয়েছিলেন। সেই কামিনী এ নাটকে ফুলকুমারীর রূপে চিত্রিত হয়েছে। হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত তাঁর ‘বাস্তালা নাটকের ইতিবৃত্ত’ গ্রন্থে লিখেছেন,—“তিনি যখন পূর্ববাস্তালায় এক চতুষ্পাঠীতে অধ্যয়ন করেন, সেই বাটিতে কামিনী নাম্নী একটি রূপবতী কুলীন কন্যা ছিল। তাহার স্বামী অনেকগুলি বিবাহ করে। একদিন শ্বশুর বাড়ী আসিয়া রাত্রিতে স্ত্রীকে শয়ান অবস্থায় দেখিয়া কর্কশস্বরে তাকে বলে “আমায় অর্থদ্বারা পূজা না করিয়া শয়ন করিয়া আছিস? আমি কত বড় কুলীন ছেলে জানিস? আগে আমার মর্যাদার টাকা আন, পরে নিদ্রা যাস।” কামিনী উত্তর করে “আমার তো কিছুই নাই, তুমি আমাকে টাকা না দিলে আমি টাকা কোথায় পাইব?” ইহাতে স্বামী আরও উত্তেজিত হইয়া বলে “কি আবার তর্ক? আমার

যেখানে পূজা নাই, সেখানে আমি একবিন্দু কাল থাকি না” বলিয়া চলিয়া যায়। ইহার পরে সে আর শ্বশুর বাড়ী আসে নাই। ইহার কিছুদিন পরে কামিনী উদ্বন্ধনে নিজের জীবনলীলা সাঙ্গ করে।^{১৮}

সেকালে কুলীন ব্রাহ্মণেরা বিবাহ দ্বারা নিজেদের অর্থলিপ্সাকে চরিতার্থ করত। এছাড়া এই অংশে ধরা পড়েছে সমকালীন কুলীন কন্যার বিবাহিত জীবনের দুর্দশার ছবি। অনতিকাল পরেই ঘটত অকাল বৈধব্যের ঘটনা। ফলত হিন্দুনারীর জীবন অতিবাহিত হত কৃচ্ছসাধনের অসারতার মধ্যে। যশোদা কৌলিন্যপ্রথাকে দোষারোপ করে বলেছে,—“হাঁরে বল্লাল, তুই কাল হয়ে এসেছিলি? কে তোকে কুলের সৃষ্টি কত্যা বলেছিল? কুলতো নয় এ কুলের আঁটি—বড় কঠিন! যার কুল আছে তার কি দয়া নেই? ধন্য নেই?”^{১৯}

দীর্ঘদিন স্বামীর অনুপস্থিতিতে, লোক পরম্পরায় সধবা নারীকে বিধবা নারীর দৃষ্টিতে দেখা হত। উত্তমের মায়ের চরিত্রে এমনই এক নারীর চিত্র তুলে ধরেছেন নাট্যকার। বিবাহবণিকের মৃত্যু সংবাদ পেয়ে উত্তমের মা বৈধব্য বেশ ধারণ করে বৈধব্য জীবন অতিবাহিত করেছে। উত্তম জানতে পেরেছে এ সংবাদ মিথ্যা। তাই সে পিতাকে গৃহে নিয়ে যেতে চায়। উত্তম জানিয়েছে,—“মহাশয়, আজি তিন বৎসর হইল আমরা মহাশয়ের শরীরের অমঙ্গল সংবাদ পেয়েছিলাম, এখন বুঝিলাম সে সম্বাদ মিথ্যা; কিন্তু তাহাতেই আমার মাতৃঠাকুরাণী বিধবা হইয়াছেন। অদ্য আপনকার সহিত আমার সাক্ষাৎ হইল, পরম সৌভাগ্যের বিষয়, আমি এই সম্বাদ বাটীর সকলকে জানাইলে তাঁহারা বিশ্বাস করিবেন না, তাই মহাশয়কে এতো আকিঞ্চন করিয়া লইয়া যাইতেছি;—তাঁহারাও তুষ্ট হইবেন, মাতৃঠাকুরাণীর বৈধব্য দূর হইবে।”^{২০} সেকালে কৌলিন্য প্রথা চালু থাকার ফলে কুলীন ব্রাহ্মণেরা একাধিক বিবাহ করতেন। শ্বশুর যদি দরিদ্র হতেন তাহলে শ্বশুর বাড়ির সঙ্গে জামাইটি তার সব সম্পর্ক ছিন্ন করতেন। দৈবাৎ বিপাকে পড়লে শ্বশুর গৃহের দ্বারস্থ হতেন এইসব কুলীন ব্রাহ্মণেরা। সংকটে পড়ে নিষ্পাপ কিশোরী বিবাহিত রমণীরা দীর্ঘ দিন স্বামী অদর্শনের পর বৈধব্য জীবনকেই আঁকড়ে বেঁচে থাকতে বাধ্য হতেন। বিবাহবণিক তাঁর প্রবল কৌলিন্য জাত্যাভিমানকে সগর্বে ঘোষণা করে স্বগত ভাষণে জানিয়েছে,—“স্বামী স্ত্রীর সকলই দেখিতে পায়, কিন্তু বৈধব্যদশা কদাচ দর্শন করিতে পায় না, দেখ আমি কি ভাগ্যবান্ তাহাও স্বচক্ষে দেখিব,—হা অদৃষ্ট!”^{২১}

এ নাটকে নারীর অসহায়তার বিচিত্র রূপ তুলে ধরেছেন নাট্যকার। কুলপালকের চার কন্যার বিবাহ হয়েছে এক বৃদ্ধ কুলীন ব্রাহ্মণের সঙ্গে। অন্যদিকে চন্দ্রমুখী স্বামীকে টাকা না দিতে

পারার কারণে তাঁর স্বামী উদাসীন থেকেছেন। যমুনা স্বামীসুখ বঞ্চিত হয়ে অবৈধ সম্পর্কে লিপ্ত হবার বাসনায় উন্মুখ থেকেছে, হেমলতা বিষ খেয়ে আত্মহত্যার কথা ভেবেছে। যশোদা জানিয়েছে, সে বিবাহের রাতে পাঁচ ভগিনী মিলে বিধবা হয়েছে। ফুলকুমারী স্বামীর কাছ হতে পেয়েছে শুধুমাত্র অবহেলা ও অনাদর। কৌলীন্য প্রথা চালু থাকার ফলে অনেক সময় দেখা গেছে এক লগ্নে অশীতিপর কুলীন বৃদ্ধের সঙ্গে দুই, তিন, পাঁচ ও তার অধিক কন্যার বিবাহ সম্পন্ন হয়েছে। এবং বিবাহের অল্পকালেই কুলীন বরের পঞ্চত্ব প্রাপ্তি হওয়ার ফলে সকলেই বৈধব্যের দশায় উপনীত হয়েছে। নাট্যকার কৌলিন্য প্রথার দোষ দেখাতে গিয়ে কার্যকারণ সূত্রে বিধবার সংকট চিত্রকেও তুলে ধরেছেন ‘কুলীন কুলসর্বস্ব’ নাটকে।

উমেশচন্দ্র মিত্রের ‘বিধবা বিবাহ নাটকে’র (১৮৫৬) কাহিনী গড়ে উঠেছে সুলোচনা নামক এক কিশোরী বিধবার করুণ কাহিনী অবলম্বনে। পাশাপাশি সমবয়সী দুই বিধবা ও সধবা নারীর চিত্র উপস্থাপনের মধ্য দিয়েও বৈপরীত্য দৃষ্টান্ত স্থাপনের মধ্য দিয়ে বিধবা নারীর সংকট ও মনোযন্ত্রণাকে রূপ দিয়েছেন নাট্যকার। সুখময়ী বিধবা (রাঁঢ়) আর, বিদ্যুল্লতা সধবা মেয়েমানুষ। সুখময়ীর খাওয়া পরার কোনো অভাব নেই। কিন্তু তার জীবনের সবচেয়ে বড় দুঃখ তার স্বামী নেই। সুখময়ীর সবকিছু থাকা সত্ত্বেও সে নিঃস্ব। বসন্ত এলে তার প্রাণে নিঃসঙ্গতা জাগে। সরল বিদ্যুল্লতা তা বুঝতে পারে না। সুখময়ী অক্লেশে জানিয়েছে,—“না, আমরা আর মানুষ নই, যে দিন বিধবা হয়েছি সেই দিন মনুষ্যত্ব গিয়ে দেবত্ব হয়েছে, আর চাটে হাত পা বেরিয়েছে। আমাদের কি কিছু বোধ হয়? একেবারে স্পন্দরহিত হয়েছি।”^{২২} নাট্যকার এই অংশে নারী চরিত্রের শ্রেণী নির্মাণ করেছেন—বিধবা ও সধবা। বিবাহিত নারী বৈধব্যে পরিণত হলে মুহূর্তেই সে সমাজ অনুশাসনে কৃচ্ছ্রসাধনে নিমজ্জিত হয়। নারী অন্তঃপুরে সেকালে এই বিভেদ ছিল, নাট্যকার তা অসামান্য ভাবে তুলে ধরেছেন।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রচেষ্টায় বিধবা বিবাহ আইন পাশ করার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে বিধবাদের যন্ত্রণার অবসান হয় খানিক পরিমাণে। দ্বিধাবিভক্ত সমাজের কিছু কিছু সধবা ও বিধবা মহিলারাও এর প্রতিবাদ করতে শুরু করেন। ‘বিধবা বিবাহ’ শাস্ত্রসম্মত জেনেও কুসংস্কারাচ্ছন্ন মন নিয়ে পাপের অংশীদারিত্বের কথা ভেবে নারী মহল হতে দ্বিতীয় বিবাহে সম্মতি আসেনি। উমেশচন্দ্র মিত্রের ‘বিধবা বিবাহ নাটক’টির মধ্যে সমাজের এই জটিল মানসিকতার ছবি তুলে ধরা হয়েছে। কখন কখন বিধবারাই বিধবা বিবাহের প্রধান প্রতিপক্ষ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিধবা বিবাহ আইন পাশ হওয়ায় সমাজের বিভিন্ন স্তরে শুরু হয় আলোড়ন,

গুঞ্জন। মুখে মুখে ফেরে বিধবার পুনর্বিবাহের প্রসঙ্গ। সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষের মনের মধ্যে শুরু হয় আশা, প্রত্যাশা—নতুন করে বাঁচবার স্বপ্ন। এর পাশাপাশি চলে ধর্মীয় ভীতি প্রদর্শন, ও কঠিন নিন্দা। পদ্মাবতীর কথায় ফুটে উঠেছে সমাজের দুটি দলের অস্তিত্ব। পদ্মাবতীর ধারণা ভাল মানুষের ঘরের মেয়েরা বিধবা হলে তাদের পুনর্বিবাহ হয় না,—“ভাল মানুষের ঘরে কি কখন বিধবার বে হতে পারে, একথা বলতে লজ্জা করে, একি কখন হয়।”^{১০} কিন্তু বিধবা সুলোচনার তাতে কোনো দ্রুক্ষেপ নেই। সুলোচনা প্রতিবাদে সক্ষম। সে মায়ের মুখের ওপর সত্যি কথা বলে ফেলে,—“বাবা যেমন পাঁচটার পর তোকে বে করেছেন, আবার তুই যদি কাল মরিস তবে কাল অমনি আর একটি হবে।”^{১১} সুলোচনা পুরুষতান্ত্রিক সমাজের দিকে কটাক্ষ করে নিজের পিতাকে তিরস্কার করেছে। পুরুষেরা যদি একাধিক বিবাহ করে সংসার করতে পারে, সেক্ষেত্রে নারীরা কেন বঞ্চিত।

অল্প বয়সে সুলোচনার বিয়ে হয়। কিছুকাল পরেই তার স্বামী বিয়োগ ঘটে। সে সময় সুলোচনা ধূলো খেলায় মত্ত তাই পতিবিয়োগ কি জিনিস, সে বোঝেনি। সহবাস কি জিনিস তা জানতে পারেনি। শৈশবসুলভ চপলতায় তার দিন কেটেছে। কিন্তু যখন যৌবনে সে পা দিয়েছে, বৈধব্য জ্বালা তার কাছে অসহনীয় হয়ে উঠেছে। বুঝতে শিখেছে বিরহ জ্বালা। ধর্ম কর্মে তার মন আর থাকতে চাইছে না। অন্তরের জ্বালা মিটতে চাইছে না। একই শয্যায় তাকে রাত-দিন থাকতে হয়। তাই সে বলেছে, যদি ধর্ম নষ্ট হয় তাতে তার আর দোষ কোথায়। বিধবা সুলোচনা রামকান্ত বোসের ছেলে মন্মথের প্রতি প্রথম দর্শনে অনুরাগী হয়েছে। সেকালে, বিধবা মেয়েরা কোন সময়ই কোনো পরপুরুষের সামনে আসত না। বাড়ীর বড়রা পুরুষদের সাক্ষাৎ থেকে দূরে রাখত। কারণ পুরুষের সান্নিধ্যে কিশোরী বিধবাদের চিত্ত চঞ্চল হয়ে উঠতে পারে, পদস্থলন হতে পারে। রামকান্ত বোসের ছেলেকে কাছ থেকে দেখায় সুলোচনার মধ্যে চিত্তচঞ্চলতা তৈরি হয়েছে। নাপেতানী রসবতীর কাছে সুলোচনা তাঁর মনের কথা ব্যক্ত করে জানিয়েছে,—

“মুখ ছাঁদে ফাঁদিয়াছে কি কটাক্ষ ফাঁদ।

দিনরাত্রি হেরিলেও না ফুরায় সাধ।।

থাক মেনে কুলমানে কাজ নাই আর।

মন সাথে শোধি গিয়ে বিরহের ধার।।”^{১২}

মন্মথকে দেখে সুলোচনার বৈধব্য জীবনে নতুন পুলক সঞ্চার হয়েছে। ক্রমশ সুলোচনা পুরুষের সান্নিধ্য কামনায় অধীর হয়ে পড়েছে। স্বপ্নে সহবাস করার চিন্তায় আচ্ছন্ন হয়েছে। সুলোচনার

এই চিন্তাচঞ্চল্য বাস্তবসম্মত। যে নারী কোন দিন স্বামী সুখ পায়নি, যৌবন কালে উপস্থিত হয়ে তার পক্ষে ব্যভিচারিণী হওয়াটা স্বাভাবিক। যৌবন ক্রমশ তাকে পুরুষের প্রতি আসক্ত হতে বাধ্য করেছে। নানান আচার অনুষ্ঠান তার মনের যৌবন যন্ত্রণাকে দমন করতে পারেনি। ক্রমশই স্বামী সুখ বঞ্চিতা বিধবা বালিকা সুলোচনা যৌবনে পদার্পণ করেই স্বামীসুখ পাবার লিপ্সায় চঞ্চল হয়ে উঠেছে। সামাজিক নিয়ম নীতির বেড়াজালে তাই সে পরপুরুষ কাঙ্ক্ষিণী হয়ে উঠেছে। বৈধব্য আচার, নিয়ম সে ভেঙে ফেলেছে। এক মুহূর্ত প্রেমিকের পরশ লাভের জন্য সুলোচনা ব্যাকুল হয়ে পড়েছে।

মন্মথ সুলোচনার প্রণয়ী। মন্মথ শিক্ষিত ও বিধবা নারীদের প্রতি সহানুভূতিশীল। মন্মথ তাঁর সংস্কারমুক্ত মন নিয়ে বুঝতে পারে বিধবা হবার যন্ত্রণা। সে বুঝতে পারে, একজন বালিকাকে যখন যাবজ্জীবনের জন্য অন্য কারোর হাতে তুলে দেওয়া হয় তখন সেই বালিকা বুঝতেই পারে না যে, বিবাহ কি জিনিস এবং স্বামী কাকে বলে। আর যখন বুঝতে পারে তখন সে স্বামীহীনা সমস্ত যৌবনা। বিধবা হবার করুণ সামাজিক পরিকাঠামোর ঘেরাটোপে সে শুধুমাত্র উপোস করে পূজা-অর্চনা করে এবং পারিবারিক সুখ ভোগ ও সমস্ত আড়ম্বর ও জাঁকজমক থেকে দূরে থাকে। পুরুষের সান্নিধ্যের বাইরে রাখার চেষ্টায় থাকেন বিধবা কন্যার পিতা-মাতা। একাদশী, উপোস এবং সাদা থানে তাদের জীবন হয়ে ওঠে গতানুগতিক। মন্মথ বিধবাদের এই দুর্দশা দেখে আক্ষেপের সঙ্গে বলেছে,—“হা! নিষ্ঠুর দেশের কি দুর্নীতি! সৎকালীন বিবাহ হলো—সৎকালীন আপন অদৃষ্টকে যাবজ্জীবন জন্য একজনের হস্তে সমর্পণ করিল, তখন বিবাহ কাকাকে বলে কিছুমাত্র জ্ঞাত ছিল না, বিবাহ হল এইমাত্র জেনে যাবজ্জীবন বৈধব্য যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে। হা! জগদীশ্বর কি ভারতরাজ্যের রমণীদিগের প্রতি এমত দয়াশূন্য হয়েছেন? তাদের যন্ত্রণার কি আর শেষ হবে না?”^{১৬} বস্তুত এ প্রশ্ন শুধু মন্মথের মত প্রগতিশীল যুবকের মুখে নাট্যকার বসাতে পেরেছেন বাস্তব সময়ের নিরিখে; কারণ এ প্রশ্ন প্রথম তোলেন স্বয়ং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়। তাঁর ভাবনাই এ নাটকে রূপায়িত।

কীর্তিরাম ঘোষের বাড়ির বাইরের পাঠশালায় উপস্থিত ছাত্রদের মধ্যে রামকান্ত জানায় তাঁর বিধবা দিদির বিয়ে। কিন্তু তার কথা কেউ বিশ্বাস করতে পারেনি। কারণ বিধবার পুনর্বিবাহকে সবাই সন্দেহের চোখে দেখেছে। গুরুমশাই, যিনি শিক্ষা দাতা তিনিও বিধবা বিবাহের বিষয়টিকে ভালোভাবে গ্রহণ করতে পারেননি। তাই অদ্বৈত দত্তের কন্যার বিবাহের সমস্ত কথা শোনামাত্র গুরুমশায়ের প্রতিক্রিয়া,—[কর্ণে হস্ত প্রদান করিয়া] “রাম রাম! একি! কথায় যা বলে কর্তব্যো

তাই হলো? বাবাজী মেয়েটির বয়স কত?”^{১৭} মেয়েটির বয়স ১৩ বৎসর। চার বছর আগে মেয়েটির বয়স ছিল ৯ বছর। মেয়েটি বুঝতেই পারেনি বিবাহ কি আর বৈধব্যই বা কি জিনিস। এই ১৩ বছরের মেয়েটির দ্বিতীয়বার বিবাহ দিয়ে পিতা অদ্বৈত মেয়েটির জীবনকে সুরক্ষিত করতে চেয়েছেন। কিন্তু সমাজের কিছু শিক্ষিত লোকেরাই এই সুরক্ষিত ব্যবস্থাকে মানতে রাজী হয়নি, পাছে তাদের ধর্ম নষ্ট হয়, শাস্ত্র খর্ব হয় এই ভেবে। এ প্রসঙ্গে রসবতী সুলোচনাকে জানায় যে, দত্ত বাড়ীর প্রসন্ন নামক মেয়েটির বিয়ে। সুলোচনা আশ্চর্য হয়ে বলে, প্রসন্ন তো একবছর আগেই বিধবা হয়েছে। আবার যদি বিয়ে হয় তাহলে তো বিধবা বিবাহের সত্যিই প্রচলন হল। সুলোচনা এতে খুব উৎসাহী হয়ে পড়ে। রসবতী তাচ্ছিল্যের সঙ্গে জানিয়েছে এ কৌতুক রঙ্গের বিয়ে,—“সে বড় কৌতুকের বিয়ে মাঠাকুরণ। মাজের পাড়ায় দত্তদের বাড়ীর প্রসন্নের বিয়ে হবে।...অদ্বৈত দত্তের মেয়ে, তার চারি বৎসর হলো বিয়ে হয়েছিল; পরে সে বৎসর বিধবা হয়েছে। সেই মেয়েটির এই পাঁচিশে বিয়ে হবে। এ বিয়ে রঙ্গের বিয়ে নয়?”^{১৮} এই কৌতুকের বিয়ে প্রবীণা পদ্মাবতী মানতে পারেননি। এয়োস্ত্রী পদ্মাবতীর ধারণা বিধবা বিবাহ আইন পাশ হলেও সমাজে তার প্রচলন হবার নয়। পড়াশুনা শেখা মেয়েরাও এই সাহস দেখাতে পারে না। পদ্মাবতীর কাছে এ বিয়ে দেওয়ার চেয়ে পুরুত মশায়ের কলসী দড়ি নিয়ে মরে যাওয়াই শ্রেয়। পদ্মাবতীর ঘর পুণ্যের ঘর। যে ঘরে বিধবারা আচার নিয়ম নিষ্ঠা পালন করে, সে ঘরে যদি নিষ্ঠা ভঙ্গ হয়—পুনরায় বিবাহের জন্য উন্মুখ হয় তবে তাদের পুণ্য থাকবে না। তাই রসবতীকে পদ্মাবতী বিবাহ সংক্রান্ত আলোচনা করতে বারণ করেছে। সামাজিক নিয়কে ভীত সন্ত্রস্ত পদ্মাবতী তার বিধবা কন্যাদের পড়াশুনাও বন্ধ করবার জন্য উদ্যোগী হয়েছে।

বস্তুত উনিশ শতকের সমাজ ব্যবস্থায় দাঁড়িয়ে বিধবারা পুনরায় নতুন জীবনের খোঁজ করলে তা হয় শাস্ত্র বিরুদ্ধ তথা পাপ কাজ। যাদের বাড়িতে পুনর্বীর বিবাহ হয় তারা অতি পাপী। সামান্য পড়াশুনা শিখেই এইসব দিকে মেয়েরা ঝুঁকেছে বলে বয়স্কা স্থানীয়দের ধারণা। তাই তাঁরা বিধবাদের পুণ্যবলে আটকানোর চেষ্টায় পড়াশুনাও বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নিতেও পিছু পা হন না।

উনিশ শতকের যুগ পরিবেশে বিধবা বিবাহের বিরুদ্ধাচরণ যেমন সমাজের রক্ষণশীলরা করেছিলেন, সেই সঙ্গে সমাজের এক শ্রেণীর সংস্কার অন্ধ গৃহস্থ রমণীরা বিধবা বিবাহের ঘোরতর বিরোধিতা করেছিলেন। বিধবা বিবাহের বিরোধিতা প্রধানত অন্দরমহল হতেই নীরবে গুঞ্জনিত হয়েছিল, আর সেকারণে বিধবা বিবাহে তীব্র অনীহা তৈরি হয়েছিল মহিলা মহলে। বিধবা

বিবাহে মহিলারা সেভাবে এগিয়ে আসেনি, সেকারণে বিদ্যাসাগরের আন্দোলন সমকালে গতি পায়নি। উনিশ শতকের অন্তিমে স্ত্রীশিক্ষার বিকাশের পর এই সমাজ-মানসিকতার পরিবর্তন আসে অন্দরমহলে, নারীর স্বাধীন চিন্তা চেতনায়। বিধবা বিবাহের আইন হয়েছে জানতে পেরে বাড়ির বয়স্ক স্ত্রী সত্যভামা মন্তব্য করে—আইন হলেই কি বিয়ে করতে হবে নাকি।

ভারতবর্ষ যখন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ‘বিধবাবিবাহ আইন’ প্রণয়ন নিয়ে তোলপাড় তখন বাড়ির স্ত্রীলোকেরা বিদ্যাসাগরের এই আইন প্রণয়ন আন্দোলন নিয়ে ক্ষুব্ধ, বিরোধিতায় মুখর। তারা বুঝতেই পারে না, যে বিধবা থাকার চেয়ে বিবাহ হওয়া কতটা সুখকর। তাদের ধারণা বিধবাদের বিবাহ হলে পাপ হবে। ধর্ম নষ্ট হবে। সত্যভামা মেয়েলি ঢঙে কটুক্তি করে জানিয়েছে,—

“উপস্থিত ঘোর কলি দোষ দিব কারে।

ডুবিল ভারত ভূমি পাপের সাগরে।”^{১৯}

অদ্বৈত দত্তের মেয়ের বিয়েতে সমাজের নানাশ্রেণীর লোকের উৎসাহের শেষ নেই। একটি বিধবা বিবাহের ঘটনা সমাজে সাড়া ফেলে দিয়েছে। রামদেব তর্কালঙ্কার বয়সে বৃদ্ধ ও রক্ষণশীল মনোভাবের। তিনি হরিহরের কাছ হতে বিধবা বিবাহের নেমস্তনের কথা শোনা মাত্র মন্তব্য করেছেন,—“রাম! রাম! কি বল্লে, বিধবা কন্যার বিবাহ? ইহাও জীবিত থাকতে থাকতে দেখতে হলো যা শ্রবণ মাত্রেই ঘৃণার উদয় হয় সেই নিমন্ত্রণের কথা বলতেছ।”^{২০}

অদ্বৈত দত্তের অন্তঃপুর। প্রসন্নর বিয়ে হবে। বিধবা সুলোচনা খুব খুশী হয়। কারণ তাদের মত বিধবারা শুধুমাত্র একাদশী আর আতপ চালের ভাত খেয়ে জীবন কাটায়। সেই জীবন থেকে প্রসন্ন মুক্তি পাবে। সুলোচনা মনে মনে তার বৈধব্য জীবন যন্ত্রণা থেকে মুক্তির স্বপ্ন দেখে। কিন্তু বাস্তবে হয়ত তা সম্ভব হবে না জেনে কষ্ট পায়। সুলোচনার কথায় সামাজিক ঘেরাটোপটি সুস্পষ্ট। বিধবা বিবাহ যে বাড়িতে হয়, সমাজ তাদের ‘একঘরে’ করে রাখে। বিবাহ বাড়িতে ভাত খাওয়া হয় না। উনিশ শতকের বিধবা বিবাহকে নিয়ে নানান তর্কবিতর্কের মধ্য দিয়ে সমাজ জীবন ক্রমশ অস্থির হয়ে উঠেছিল। বিধবা বিবাহ যারা দিচ্ছিল, তাদের একঘরে করে দেওয়া, ধোপা-নাপিত বন্ধ করে দেওয়া, স্পর্শচ্যুত করে দেওয়া ছিল এক ধরনের সামাজিক শাস্তি। সেকথাই নাট্যকার এই অংশে রূপ দিয়েছেন। বরযাত্রীদের একঘরে রাখা হয়। কিন্তু কেউ কখনই ভাবে না যে বিধবা মেয়েরা, যাদের জীবন দুঃখে পূর্ণ, তারা সারাটা জীবনে এই কষ্ট নিয়ে বাঁচবে কিভাবে। বিধবার দুঃখ যন্ত্রণা অপেক্ষা সমাজপতিদের কাছে নিয়মতন্ত্র অধিক

গুরুত্বপূর্ণ। বস্তুতঃ বিধবারা সমাজের কাছে পরিত্যক্ত। সামাজিক স্বীকৃতি পুনরায় তারা ফিরে পাবার যোগ্য নয়। বিধবারা সামাজিক লাঞ্ছনার শিকার, তাদের গোপনীয় ভোগ্যবস্তু হতে বাধা নেই। তাদের নিয়ে লুকিয়ে চুরিয়ে ভোগ চলতে পারে কিন্তু পুনর্বাস বিবাহ নয়।

যৌবনের কালপ্রবাহ সুলোচনাকে দখল করে। মন্মথের আগমন বার্তা পেয়ে সে মিলনের জন্য উন্মুখ হয়ে থাকে,—“ছেলে বেলা বিধবা হয়েছি, কখনতো চুলের দিকে চেয়ে দেখিনি, আপনার শরীরের দিকে ফিরে দেখিনি, কেবল পশুর মত খেয়েছি আর ঘم্মিয়েছি, এখন আর্শিতে মুখ দেখে কেমন লজ্জা করছে...”^{২১}

সুলোচনা তার বৈধব্য যন্ত্রণাকে স্বীকার করে বলে,—“এ দেশে বিধবা হওয়া কত পাপের ভোগ। দাসীবৃত্তি করে কাল কাটান, দিনান্তে অর্দ্ধাশন ভাল, ভিক্ষা করে প্রাণ ধারণ করা ভাল, এ দেশে বিধবা হওয়া ভাল নয়। ভেবে দেখ্ দেখি আমাদের বেঁচে থাকার ফল কি? পোড়া দেশের লোক এ দিকে শাস্ত্র দেখায়, যে স্ত্রীলোকের স্বামী আর নাই, কিন্তু যাদের স্বামী নাই তাদের যে কি গতি তা একবারও ভাবে না। কথায় কথায় স্বামী ধর্ম দেখায়, ধর্ম যে কিসে থাকে, তা দেখায় না।”^{২২} সুলোচনা ত্যাগের পথ অতিক্রম করে ভোগের পথে পা বাড়ায়। বৈধব্য যন্ত্রণা ভুলে মিলনের আকাঙ্ক্ষায় অধীর হয়ে ওঠে। মন্মথের সঙ্গে মিলিত হয়।

গোপনে বিধবা মহিলাদের যৌনসঙ্গম ইত্যাদি বিষয়গুলি নাট্যকার তুলে ধরেছেন সুলোচনা মন্মথের প্রণয়ের মধ্য দিয়ে। তৎকালীন সময়ে অধিকাংশ অল্প বয়সী যৌবনবতী বিধবারা ব্যভিচারিণী হত। বিদ্যাসাগর এই সংকটকে বুঝেছিলেন দরদ দিয়ে। বিধবা হলেই, নারীর কোমল মন পাষাণ হয় না, কাম-রিপুর তাড়না থেকেই যায়। কিন্তু কীর্তিরামের মতো মানুষেরা এ কথা স্বীকার করেও কাম-রিপুর সাস্থনার জন্য ধর্মকর্মে মন রাখার পরামর্শ দেন। সম্ভান থাকলে তাদের প্রতিপালনে মনোনিবেশ করার কথা বলেন। তথাপি বিধবা বিবাহের স্পক্ষে কোনো কথা বলেন না। তারা মনে করেন বিধবাদের বিবাহ হওয়া মানে অত্যন্ত গর্হিত কাজ, জাতে নামা ও সমাজ অধঃপতিত হওয়া। এ সমস্ত কার্য যারা করে থাকেন তারা সমাজের নিয়মে ‘একঘরে’।

ক্রমে বিধবা সুলোচনা এর বিন্দুমাত্রও বুঝতে পারে না। গর্ভধারণ সুলোচনার কাছে শারীরিক অস্বস্তি ছাড়া আর কিছু মনে হয় না। ক্রমে সুলোচনার গর্ভবতী হওয়ার খবর ছড়িয়ে পড়লে পরিবারের মধ্যে গুঞ্জরিত হয় নানা আক্ষেপ, নানা শঙ্কা। পদ্মাবতীর চিন্তা-তিনি যখন নিজের কন্যার সম্পর্কে এ কথা শুনবেন তখন ভদ্রলোকের গর্ব থাকবে কিনা। সুলোচনার মা পদ্মাবতী আশঙ্কিত হয়ে জানিয়েছেন,—“...সকলে যে আমার বাড়ী খান্‌কির বাড়ী বলবে তা

আমি শুনতে পারবো না।”^{২৩} পিতা কীর্তিরাম বিধবা কন্যার গর্ভধারণের কথা শোনামাত্র তাঁর বিধবা কন্যার মৃত্যু চেয়েছেন। কীর্তিমান আক্ষেপে জানিয়েছেন,—“বিধবা কন্যা গর্ভবতী! এ লজ্জায় আত্মঘাতী হতে ইচ্ছে করিতেছে।”^{২৪}

সব জল্পনার অবসান ঘটিয়ে গর্ভবতী সুলোচনা বিষপানে আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছে। সুলোচনা তাঁর বিচার বুদ্ধি দিয়ে উপলব্ধি করেছে, উনিশ শতকীয় সমাজ ব্যবস্থায় পদস্থলিত নারীদের গৃহে কোন জায়গা নেই। একে বিধবা তাতে আবার, কলঙ্কিত নারী, যার দাম সমাজের ভোগ্যপণ্যের মত। ফলে সুলোচনা মৃত্যুকেই সুখকর বলে মনে করে। সুলোচনার বিষপান করার সংবাদ সুখময়ী মারফৎ পদ্মাবতী, কীর্তিমান এবং পরিবারের অন্যান্য আত্মীয়ের কর্ণগোচর হয়। তারা একে একে সুলোচনার কাছে এসে দাঁড়ায়। পদ্মাবতী কন্যার মৃত্যুর আসন্ন সংবাদে শোকে বিহ্বল হয়ে পড়েন। পদ্মাবতী তাঁর কন্যাকে বাঁচাতে নানারকম চেষ্টায় উদ্যোগী হন। নাপেতানী রসবতীও সুলোচনার কাছে এসে নিজ কর্মের জন্য কাতর হয়ে পড়ে। সুলোচনাকে বাঁচাতে সে মরিয়া হয়। সুলোচনার প্রাণ ওষ্ঠাগত হওয়ায় তার পিপাসা বাড়ে। সে জল খেতে চায়। পদ্মাবতী নিজ কন্যার প্রাণ রক্ষা করতে চিকিৎসার প্রয়োজন অনুভব করেন। কিন্তু সুলোচনা শুধুমাত্র জলের জন্য কাতর হয়ে পড়ে। সুলোচনার জন্য জল আনা হলে সুলোচনা জলের দিকে হাত বাড়ায়। কিন্তু সুলোচনার বৌদি বিধবা সুখময়ী তাকে জল খেতে দেয় না। কারণ একাদশীর দিন বিধবা মহিলাদের নির্জলা উপোস চলে। মুখে যদি জল দেওয়া হয়, তবে ইহকালের সঙ্গে পরকালটাও লোপ পাবে। পাপের ভাগী হবে সুলোচনা। সুলোচনার কুকর্মে ইহকাল নষ্ট হয়েছে, শেষে একাদশীর নিয়ম ভাঙলে পরকালটাও খোয়াবে সে। তাই তার মুখে নয়, চোখে কানে জল দেওয়া হয়। সুখময়ীর কথায়, তৎকালীন সমাজের রক্তচক্ষু কতটা কষ্টদায়ক তা প্রকাশিত। সুখময়ী তার শাশুড়ী পদ্মাবতীকে কানে কানে বলে,—“ওমা, আজ যে একাদশী, ওকে কেমন করে জল দেবে। অভাগিনীর ইহকালটা গেছে আবার পরকালটাও যাবে। ওতো মরবেই, আর ওকে জল দিলে কি হবে।”^{২৫}

সুখময়ীও বিধবা কিন্তু সে কোনো কুপ্রবৃত্তির শিকার নয়। ধর্মে কর্মে মন তার অবিচল। তাই একাদশীর ব্রত তার কাছে নির্ণায়ক স্বরূপ, ইহকালের পুণ্যপথ। সে সুলোচনাকে পরলোকের ধর্ম বিনষ্ট করতে দিতে পারে না। মর্মান্তিক সামাজিক নিয়মে সুলোচনার মৃত্যুও স্বাভাবিক ভাবে হতে পারে না। সুলোচনার মৃত্যু হবে জেনেও হিন্দু আচার মেনে তাকে জল দেওয়া যাবে না। জীবনের চেয়েও নিয়মের গণ্ডিতে প্রত্যেক বিধবা রমণীরা মৃত্যুসম যন্ত্রণা ভোগ করেছেন।

পাপ, পুণ্য জীবনের চেয়ে বেশী দামী হয়ে উঠেছে। তাই সুলোচনার মৃত্যু মুহূর্তে আক্ষেপ করে জানিয়েছে—“হা বিধাতা! অভাগিনীর মরণটাও একাদশীর দিনে হলো! মরণকালে একটু জল খেতেও পেলাম না! জল জল করে প্রাণ বেরুলো!”^{২৬} মৃত্যু অবধারিত জেনেও সুলোচনার শেষ ইচ্ছাটা পূর্ণ করা যাবে না শুধুমাত্র একাদশীর জন্য। সুখময়ী প্রকাশ ভঙ্গীতে সামাজিক বিধিনিষেধ দারুণভাবে প্রকাশিত,—“মা, তুমি কি পাগল হয়েছ? একাদশীর দিনে রাঁড় মানুষের মুখে জল দেবে? ও পিপাসা আর একটু গৌণে ভাল হবে। বরং চোকে কানে একটু জল দেই!”^{২৭} মৃত্যুপথযাত্রী সুলোচনার জন্য ব্যাকুল মাতা স্বামীকে বিধবা বিবাহের কারণে ভৎসনা করলে কীর্ত্তিরাম বলেন,—অধর্মে পতিতা কন্যার প্রতি কোনরূপ সহানুভূতি কীর্ত্তিরামের ধর্মবহির্ভূত। বিধবা কন্যা ব্যভিচারিণী হয়ে অপরাধ করেছে কিন্তু কীর্ত্তিরাম বিধবা বিবাহের অসম্মতি করে কোনো অপরাধ করেননি। কন্যার মৃত্যুতেও পিতার নিজ কৃতকর্মের জন্য কোনপ্রকার আক্ষেপ নেই। উপর্যুপরি পিতা কীর্ত্তিরামের বক্তব্য,—“পাপীয়সী! এদেশে কি আর বিধবা নাই, তুমিই যাবজ্জীবন ক্লেশ পেয়েছ, আর কি কেহ ক্লেশ পায় নাই? সকলেই কি তোমার মত পাপপঙ্কে নিমগ্ন হয়েছেন?”^{২৮}

বস্তুত সুলোচনার এই প্রশ্ন ও আক্ষেপ, সমগ্র বিধবা নারীদের অন্তর বিদীর্ণ করা আক্ষেপ। সামাজিক নিয়মের জালে প্রত্যেক বিধবা নারীদের জীবন কষ্টময়। কিন্তু পুরুষতান্ত্রিক সমাজ নির্বিকার। সুলোচনা তার মৃত্যুকালীন সময়ে পিতার সামনে পিতার প্রশ্নে উত্তর দিতে দ্বিধাগ্রস্ত হয় না। সে তার পিতাকে নারীদের সহ্য ক্ষমতার ভিন্নতা সম্পর্কে জানায়। যে নারীর ধর্মে মতি হয় না, তাদের সহ্য ক্ষমতা থাকে না। স্বাভাবিক সুপ্রবৃত্তি যাদের থাকে তারা কখনই দুরাচারী হয়ে না। কিন্তু যাদের নেই তারা স্বাভাবিক নিয়মেই কুপ্রবৃত্তির আশ্রয় নেয়। সুলোচনাও কুপ্রবৃত্তির শিকার। তাই তার পক্ষে কলঙ্কভার এসে পড়েছে। কীর্ত্তিরাম কন্যার যন্ত্রণা বুঝতে পেরেছে শেষপর্যন্ত। ‘বিধবা বিবাহ’ নাটকে দুটি বিধবা নারীর সমান্তরাল কাহিনী রয়েছে—একটি সুলোচনার কাহিনী অপরটি প্রসন্নের কাহিনী। প্রসন্ন কায়স্থ সম্প্রদায়ের বাল বিধবা। বিধবা বিবাহের আইনগত সমর্থন নিয়ে তাঁর পিতা পুনর্বিবাহের উদ্যোগ নিয়েছে। তাঁর বিয়েকে কেন্দ্র করে সমাজে নিন্দা ও কানাকানি চলেছে নারী মহলে। এক কুলীন নারী সত্যভামা বিধবা প্রসন্নের পুনর্বিবাহের খবরে হতবাক হয়ে বলেছে,—“ওমা সে কি গো! কোথা যাব মা। রাঁড়ের বে’র ব্যবস্থা বেরিয়েছে বলে কি সত্যি সত্যি বে কত্তে হয়?”^{২৯} যদিও এই ঘটনা নাটকের কাহিনীতে সরাসরি আসেনি। কিন্তু নাট্যকার পরস্পর বৈপরীত্য সৃষ্টির মধ্য দিয়ে সমাজের দুটি ছবি তুলে ধরেছেন। প্রগতিশীল

বনাম রক্ষণশীলতার দ্বন্দ্বকে স্পষ্ট করে তুলেছেন।

উনিশ শতকের সমাজ ব্যবস্থায় বিধবা বিবাহকে কেন্দ্র করে যে বাড় উঠেছিল, তারই প্রামাণ্য দলিল উমেশচন্দ্র মিত্রের ‘বিধবা বিবাহ নাটক’। বিধবা রমণীর মানসিক যন্ত্রণা, বৈধব্য জীবনের অপরিসীম আক্ষেপ, সামাজিক বিধিনিষেধ, বিধবা রমণীর জীবনে প্রেমের সঞ্চার, ফল স্বরূপ গর্ভবতী হওয়া ও শেষে আত্মহননের পথ বেছে নেওয়া—এসবই তৎকালীন সমাজজীবনে ঘটে যাওয়া এক অকৃত্রিম সত্য, যা এ নাটকে ফুটে উঠেছে। বস্তুত বিধবা নারী সুলোচনার বৈধব্য যন্ত্রণা, মানসিক অস্থিরতা, প্রেম ও পদস্থলনের কথা এ নাটকে উঠে এসেছে। বিধবার পুনর্বিবাহকে সমর্থন করা হয়েছে এ নাটকে।

সুলোচনা চরিত্রটির বাস্তব ভিত্তি রয়েছে। সেকালে অনেক বিধবা রমণী সুলোচনার মত বিধবা বিবাহের স্বপ্ন দেখেছিল। ‘সম্বাদ ভাস্কর’ পত্রিকায় শ্রীবিদ্যা নামক জনৈক মহিলার একটি পত্র সূত্রে জানা যায় অল্প বয়সী বিধবার করুণ আর্ত কণ্ঠস্বর। জনৈক মহিলা লিখেছেন, —“আপনাদিগের উদ্যোগে এ দেশের দারুণ কুসংস্কার পরাভূত হইয়া বিধবা বিবাহ চালিত হইবেক বটে, কিন্তু এক্ষণে তাহার অনেক বিলম্ব দেখা যাইতেছে। আমার শরীরে স্বামী সুখের সম্ভাবনা নাই, তথাপি এই সুখ হইল যে মরিবার সময় পরমানন্দে প্রাণত্যাগ করিব। কারণ যদি আমি ঐ সুখ হইতে বঞ্চিত হইলাম তথাপি আমার ন্যায় শতশত স্বামীহীনা কামিনীর যে সুখ হইবে ইহাই স্মরণ করিয়া মরিব।”^{১০} গর্ভবতী সুলোচনা সমাজ কলঙ্কের ভয়ে আত্মহত্যা করেছে। সমাজ ভয় তাকে বাধ্য করেছে আত্মহননের পথ বেছে নিতে। মৃত্যুকালে একফোঁটা জলও মুখে নিতে পারেনি। সেখানে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে হিন্দুর বৈধব্য আচার। ‘একঘরে’ হবার ভয়ে এক গভীর সামাজিক সংকটের মুখে দাঁড়িয়ে অভিভাবকেরাও অসহায় ভাবে নিজ কন্যার সংকট পরিস্থিতিকে মেনে নিতে বাধ্য হয়েছেন এবং বিধবার পুনর্বিবাহের প্রসঙ্গটি নিয়ে ভাবনা চিন্তা করেছেন।

১৮৫৬ সালে প্রকাশিত হয় রাখামাধব মিত্রের ‘বিধবা মনোরঞ্জন’ নাটক। ‘বিধবা মনোরঞ্জন’ নাটকে দেখা যায়, বিধবা কুমুদিনী ঘোষেদের বাড়ী বেড়াতে যেতে চায়। সেকারণে সে মায়ের কাছ থেকে তিরস্কৃত হয়। সমাজনিন্দার কথা স্মরণ করে কুমুদিনীর মা জানিয়েছে, —“একে রাঁড়, তায় সমস্তো বয়েস্ (গালে হাত দিয়া) ছি! ছি! ব্যাড়াতে যেতে লজ্জা করে না, লোকে দেখলে বলবে কি?”^{১১} কুমুদিনীর মা আরো জানিয়েছে, —“কি ভাবে ব্যাড়াতে চাস্, কি ভেবে বাহিরে যাস, বুঝিতে না পারি কিছু, বুঝি শেষে ঢলাবি।”^{১২} বোঝা যায় উনিশ শতকের

যুগ পরিবেশে বিধবা যৌবনবতী মেয়ে সম্পর্কে অন্তঃপুরে মায়েদের চিন্তার শেষ নেই। মেয়ে যদি বিপথে চলে যায়—এই আশঙ্কা প্রকাশিত হয়েছে কুমুদিনীর মায়ের সংলাপে। বিরুদ্ধবাদীরা বিধবার পুনর্বিবাহকে কলিকালের লক্ষণ বলে বিরোধিতা করেছেন এবং আক্ষেপ করে বলেছেন,

— “পাপেতে মজিল ধরা, জীবন না যায় ধরা
মরিলেই বাঁচি মানে মানে।”^{৩৩}

সেকালে বিধবার পুনর্বিবাহকে অনেক বিধবা নারী মন থেকে মেনে নিতে পারেননি। সেকারণে তাঁরা মনে করেছেন, বৈধব্য জীবন নিয়ে দীর্ঘজীবন অতিবাহিত করা অপেক্ষা সত্ত্বর মরণই শ্রেয়।

‘বিধবা মনোরঞ্জন’ নাটকে বিলাসিনী ঘটকী রামনিধি ন্যায়রত্নের স্ত্রীর কাছে সমাজের কদাচার ও পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার রূঢ় মানসিকতাকে প্রকাশ করেছেন,—“মেয়ে সস্তা হোয়েছে, বর মাগি, যার মেয়ে আছে তার সর্বনাশ, আর যার বেটা আছে তার পৌষ মাস। এখন তো অর কুলীন মৌলিকের বিবেচনা নেই, যার টাকা আছে সেই কুলীন, যার টাকা নেই মা সেই মৌলিক। বেটার বে দিলে জিনিষ পত্রে ঘরকন্না পুরে যায়, আর মেয়ের বে দিতে গেলে ফকীর হোতে হয়।”^{৩৪} সমাজে নারী পুরুষের ভেদাভেদকে নাট্যকার অসামান্য ভাবে ঘটকীর সংলাপে প্রকাশ করেছেন। বিধবা বিবাহের পাশাপাশি নাট্যকার পণপ্রথার নিষ্ঠুরতাকেও তুলে ধরেছেন। ঘটকী আরো জানিয়েছে বিদ্বান না হলে কেউ বিধবা বিবাহ করতে চায় না। উপযুক্ত পাত্রপাত্রীর বিবাহে উভয়পক্ষ হতে উপটোকন পাওয়া উচিত। কিন্তু সমাজে অসাম্য চালু রয়েছে। তাই বিবাহ হতে বিবাহ সম্পর্ক বন্ধন সর্বত্রই অসাম্য বিরাজমান।

এ প্রসঙ্গে আমাদের স্মরণে আসে সমকালে বঙ্কিমচন্দ্রের ‘সাম্য’ প্রবন্ধের কথা। ‘সাম্য’ (১৮৭৯) প্রবন্ধ গ্রন্থে স্ত্রী ও পুরুষের অধিকার প্রশ্নে বঙ্কিমচন্দ্র খুব জোরের সঙ্গেই বিধবা-বিবাহকে সমর্থন করেছেন। ‘সাম্য’ প্রবন্ধের পঞ্চম পরিচ্ছেদে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন,—“মনুষ্যে মনুষ্যে সমানাধিকার বিশিষ্ট—ইহাই সাম্যনীতি। ...যে যে কার্যে পুরুষের অধিকার আছে, স্ত্রীগণের সেই সেই কার্যে অধিকার থাকা ন্যায়সঙ্গত। ...অসম্মদেশে স্ত্রী পুরুষে যে ভয়ঙ্কর বৈষম্য, তাহা এক্ষণে আমাদের দেশীয়গণের কিছু কিছু হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে... অনেকে মনে করেন যে, চিরবৈধব্য বন্ধনে, হিন্দু মহিলাদিগের পাতিব্রত্য এরূপ দৃঢ়বদ্ধ যে, তাহার অন্যথা কামনা করা বিধেয় নহে।...কথাটি সত্য বলিয়াই না হয় স্বীকার করিলাম। যদি তাই হয়, তবে নিয়মটি একতরফা রাখ কেন? বিধবার চিরবৈধব্য যদি সমাজের মঙ্গলকর হয়, তবে মৃতভার্য্য পুরুষের চিরপত্নীহীনতা

বিধান কর না কেন? তুমি মরিলে, তোমার স্ত্রীর আর গতি নাই, এজন্য তোমার স্ত্রী অধিকতর প্রেমশালিনী; সেইরূপ তোমার স্ত্রী মরিলে, তোমারও আর গতি হইবে না, যদি এমন নিয়ম হয়, তবে তুমিও অধিকতর প্রেমশালী হইবে। এবং দাম্পত্য সুখ, গার্হস্থ্য সুখ দ্বিগুণ বৃদ্ধি হইবে। কিন্তু তোমার বেলা সে নিয়ম খাটে না কেন? কেবল অবলা স্ত্রীর বেলা সে নিয়ম কেন?”^{৩৫} বস্তুত বঙ্কিমচন্দ্র সমাজনিয়ন্ত্রক পুরুষশক্তিকে বিদ্রুপ করেছেন। ‘বিধবা মনোরঞ্জন’ নাটকে ঘটকী নাপেতানীর বক্তব্যে,— অনুরূপ সমাজ অসাম্যের কথা উঠে এসেছে।

অজ্ঞাতনামা রচিত ‘বিধবা বিষম বিপদ’ (১৮৫৬) নাটকে নাট্যকার বাঙালি গৃহস্থ পরিবারে বিধবা রমণী থাকার সমস্যাকে তুলে ধরেছেন। কুলীন মুখোপাধ্যায়ের বিধবা কন্যা যৌবন-জ্বালায় অস্থির হয়ে, পাড়ার নিম্ন জাতির চৌকিদারের সঙ্গে প্রণয়ে লিপ্ত হয় এবং গর্ভবতী হয়। অবশেষে কন্যার গর্ভপাত ঘটাতে বাধ্য হন মুখোপাধ্যায়। একথা লোক জানাজানি হলে, সমাজের মুখ বন্ধ করতে মুখোপাধ্যায়কে মহাভোজের আয়োজন করতে হয়; ঘুষ প্রদানের ঘৃণ্য কৌশল অবলম্বন করতে হয়। আর এসবের জন্য নিজ বসত বাড়ী বন্ধক দিয়ে অর্থের সংস্থান করতে হয়। মুখোপাধ্যায় বিধবা বিবাহের সমর্থন করে নাটকের অন্তিমে জানিয়েছে,—“চাডুয্যে বিধবা মেয়ের বিয়ে দেবে বল্লে। এ অপেক্ষা সে সংকর্ম, তার আর সন্দেহ নাই। বামন পণ্ডিত বেটারা যে মরতেছে। বেটারা কি টের পায় না, আপনাদের ঘরেই দেখতে পায় না, বিধবা কন্যার জন্যে যবনান্ত পর্যন্ত হতে হচ্ছে। এর চেয়ে কি বিয়ে দেওয়া ভাল নয়।”^{৩৬} অর্থাৎ নাট্যকার সমাজ সংকট হিসাবে উচ্চবর্ণের হিন্দুর জাত খোয়ানোর প্রসঙ্গকে বড় করে দেখিয়েছেন। সেই সঙ্গে ভ্রূণ হত্যার সংকটকে উপস্থাপিত করেছেন। বিধবা কন্যার গর্ভপাত ঘটানোর পর মুখোপাধ্যায় গৃহিণী জানিয়েছেন,—“পোড়ালোকের ভয়ে জাতির ভয়ে কি দুষ্কর্মই না করতে হলো। হায় হায়! শুনেছি শাস্ত্রে বলে বিধবা মেয়ের আবার বিয়ে হতে পারে, পোড়াদেশের লোকে যদি শাস্ত্রের মতে চলে, তা হলে আর এ নিষ্ঠুর কর্ম, এ পাপ কর্ম করতে হয় না। কি করবো, লোক লজ্জায়, জেতের ভয়ে, এমন কর্মও করতে হলো।”^{৩৭} বস্তুত ঘরে বিধবা কন্যা থাকা মানে, সামাজিক কলঙ্কের আশঙ্কা অমূলক নয়। বিধবার প্রণয়, বিধবা গর্ভ সঞ্চারণ, ভ্রূণ হত্যা সেকালে ছিল স্বাভাবিক ঘটনা। একারণেই নাট্যকারেরা বিধবার পুনর্বিবাহের পক্ষে সওয়াল করে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করেছেন।

যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায়ের ‘চপলাচিন্তাপল্য’ (১৮৫৭) নাটকে বৈধব্য জীবনের দুঃখ অপেক্ষা, বিধবা চপলার অনুরাগ বর্ণিত হয়েছে কাব্যিক ভঙ্গিমায়। এ নাটকে উঠে এসেছে

বৈধব্যের সংকট চিত্র। বাল বিধবা চপলা যেভাবে বৈধব্য আচার পালন করেছে তাতে পাড়ার বিধবারা সমালোচনা করেছে। একাদশীর দিনকে তারা বিবাহের দিন বলে ঠাট্টা করেছে। এই অংশে ধরা পড়েছে, অন্তঃপুরে ধনী গৃহের বিধবা ও দরিদ্র ঘরের বিধবার আচার পালনের তারতম্য। মোক্ষদাকে বিনোদা জানিয়েছে,—“...তা ওমা সে পোনের বছরের মেয়ে, সে দুদগঙ্গাজল খেয়ে একাদশী করেছে। ... কেন বোন্, সে বড়মানসের মেয়ে, সে সব কত্তে পারে, তাতে আর পাপ নেই। বোন্ সাথে বামন পন্ডিতের প্রতি অশ্রদ্ধা হয়।”^{৭৮} বিনোদা তার স্মৃতিকাতরতায় জানায়, সে ন’বছর বয়সে বিধবা হয়েছিল। প্রথমবার একাদশীর দিন ভুল করে সে ভাত খেয়ে ফেলেছিল বলে সবাই তার বাবাকে ‘একঘরে’ করতে চেয়েছিল। পরের একাদশীতে কেউ তাকে কিছু খেতে দেয়নি—‘নিরসু উপবাস’। মোক্ষদা জানিয়েছে,—“আষাঢ়ান্ত বেলা, তাতে ন বছর বয়েস তেপ্তায় ছাতি ফেটে যেতে লাগলো, শেষে বেলাস্তে কেমন হয়ে একেবারে ঘুরে পড়লেম। তখন মা করেন কি, গঙ্গাজল মুখে এনে দেন তবে রক্ষা পাই।”^{৭৯}

নাট্যকার যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায় দুই শ্রেণীর বিধবাকে তাঁর নাটকে উপস্থাপিত করেছেন। অপেক্ষাকৃত ধনী ও শিক্ষিত পরিবারের বালবিধবারা বিধবা বিবাহে অগ্রসর হয়েছিলেন এবং দরিদ্র পরিবারের বিধবারা আচারের যূপকাষ্ঠে বলি হতে বাধ্য হয়েছিল। দরিদ্র পরিবারের বিধবা বিনোদা ভবিষ্যবাণী করে জানিয়েছে,—“এই বিধবার বে চলিত হলে, চপলারই কোন্‌দিন বে হয় দেখ। পরে আর যার হোক।”^{৮০} বিনোদা ও মোক্ষদা নিজেদের বৈধব্য সংস্কার ও বৈধব্য আচার পালনের মহিমা জাহির করলেও মনের গোপন সত্যিকথাটা প্রকাশ করে ফেলেছে নিজেদের অজান্তে। বিনোদা জানিয়েছে,—“আমি ভাই পূজো করি বটে, কিন্তু মন্তুর-টন্তুর সকল সময় মনে থাকে না। ফুলচন্ননই জলে ভাসাই।”^{৮১} মোক্ষদা, বিনোদার কথার জবাবে জানিয়েছে,—“তুমি ভাই মনের কথা বল্লে, ভাই আমিও বলি, আমিওত, একদিন সব মন্তুর পড়ি না, হোলো ধ্যান কল্লেম তো জপ সমাপন কল্লেম না, এমনি তো প্রায়ই হয়।”^{৮২}

বিধবার বৈধব্য আচার ও ব্রহ্মচর্য পালনের যে শাস্ত্রীয় নির্দেশ তা ভিত্তিহীন। এই শাস্ত্রীয় নির্দেশ পালনে অল্পবয়সী বিধবার কোনো আন্তরিক প্রেরণা থাকে না। বিধবা বিনোদার কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে অশ্রদ্ধার কথা,—“সত্তি বলতে কি, এখন আমাদের পূজো করবার বয়েস হয় নি, মনই স্থির থাকে না, কতদিকে যায়। তবে না কল্লে লোকে নিন্দে করবে, আর গুরুপুরুত দেখা হলেই, আশীর্বাদ করেন। “ধর্ম্মে মতি হোক” তাই বোন্ ধর্ম্ম করি।”^{৮৩} বোঝা যায় অকাল বৈধব্য ও তার ধর্ম্মাচরণ কি প্রকার অন্তঃসারশূন্য। সমকালে বিধবা বিবাহকে অনেকেই সুনজরে

দেখেননি। মালিনী গর্ভপাত করানোর ঔষধ বিক্রি করে দুপয়সা কামায়। মালিনী ভেবেছে বিধবা বিবাহ চালু হলে তার ব্যবসা মার খাবে। গভীর আশঙ্কায় সে জানিয়েছে,—“ভাই এখন যাহোক অপ্পবইসি বিধবা ছুঁড়িগুলোর মন যুগিয়ে চলতে পাল্লে যখন যা ধরি, তা তারা দেয় থোয়, আর বেঁধে গেলে কেউ পাঁচসিকে ছাড়ায় না, ত এমন ত মাসের মধ্যে হচ্ছেই। তা যদি বিধবার বে চলিত হয়, তবে লুকিয়ে আর একস্মকবেঁ কেন, পেট বাঁধলে ওষুধ খাবেই বা কেন। তা যদি না হয় আমার পক্ষেই ভাল।”^{৪৪}

বালবিধবা চপলাকে পিতা বাসব নিয়ম নিষ্ঠায় বৈধব্য আচার পালন করিয়ে এসেছে। চপলা চপলমতি, অস্থির বালিকা। কৃষ্ণকথা পাঠে তার মন বসে না। সখী কামিনীর কাছে চপলা জানিয়েছে,—“আমার ত কথা শুনতে গেলে কান্না পায়। কেষ্ট গোপিনীগণের বস্ত্রহরণ কোরে, কদমগাছে উঠলেন, রাধিকার মানভঞ্জন কল্লেন, নিকুঞ্জে বেহারে গেলেন, এসব রসের কথা কি আর ভাল লাগে? বিকেলবেলা কথা শুনে সমস্ত রাত অসুখে যায়।”^{৪৫} অত্যন্ত মনস্তাত্ত্বিক ভাবে নাট্যকার নারী মনের যৌবন অন্তর্দাহকে প্রস্ফুটিত করেছেন চপলার এই উক্তির মধ্য দিয়ে। নাট্যকার যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায়, এ নাটকে বর্ণকৌলিন্য ও অর্থকৌলিন্যের সমান্তরাল ছবি নির্মাণ করেছেন। অর্থকৌলিন্যে গরীয়ান ঘরের বিধবার জন্য একাদশীর উপবাস অনেক শিথিল। অন্যদিকে দরিদ্র ঘরের বিধবার বৈধব্য আচার কঠোর ও হৃদয়হীন। এ নাটকে দেখা যায়, জমিদার কন্যা চপলা বিধবা হয়েও রাঙাপাড় শাড়ী পরেছে, গয়না পরেছে অর্থকৌলিন্যের গরবে গরবিনী হয়ে। অন্যদিকে চপলার সমবয়সী অন্য ঘরের বিধবারা সাধারণ বৈধব্য সংস্কারের ব্রত যত্নে ও আচার সর্বস্বতায় দগ্ধে মরেছে।

উমেশচন্দ্র মিত্রের ‘বিধবা বিবাহ নাটক’-এ ঘোষ ও দত্ত পরিবারের বিধবা বিবাহ প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়েছে। অজ্ঞাতনামা রচিত ‘বিধবা বিষম বিপদ’ নাটকে—মুখোপাধ্যায় ও চট্টোপাধ্যায় পরিবারের বিধবা বিবাহ সংঘটিত হয়েছে। আর, ‘বিধবা মনোরঞ্জন’ নাটকে, একই সঙ্গে ন্যায়রত্ন, ঘোষ ও দত্ত পরিবারের ‘বিধবা বিবাহ’ প্রসঙ্গ স্থান পেয়েছে। এদিক থেকে বলা যায় নাট্যকারেরা বিধবা বিবাহের পাশাপাশি অসবর্ণ বিবাহের মত নতুন চেতনার বিষয়কে উপস্থাপনার মধ্য দিয়ে প্রগতিশীল মনের পরিচয় দিয়েছেন। সমালোচক প্রদ্যোৎ সেনগুপ্ত জানিয়েছেন, নাট্যকার বিহারীলাল নন্দী ‘বিধবা পরিণয়োৎসব’^{৪৬} নামে একটি নাটক রচনা করেন। নাটকের নাম শুনে বোঝা যায়, বিধবা নারীর পুনর্বিবাহ পরবর্তীকালীন উৎসবমুখর সুখচ্ছবির ইঙ্গিত আছে। অনেক অনুসন্ধান করেও এ নাটকটি আমাদের হাতে আসেনি।

অসমীয়া নাট্যকার গুণাভিৰাম শৰ্মা ১৮৫৭ সালে লেখেন ‘ৰামনবমী’ নাটক। নাটকটি সমকালে বাংলা ভাষায় ‘অৰুণোদয়’ পত্ৰিকায় প্রকাশিত হয়। এ নাটকে নাট্যকার ‘নবমী’ নামক এক বাল বিধবার সংকট চিত্ৰকে বাঙময় করে তুলেছেন। অবৈধ প্রণয়ে লিপ্ত হয়ে নবমী গৰ্ভবতী হয়েছে এবং গৰ্ভস্থ সন্তানের কথা ভেবে, নিজ পাপ কর্মের কথা ভেবে বিচলিত হয়েছে, আশঙ্কিত হয়েছে। বার বার নবমী আক্ষেপ করে করে জানিয়েছে, বিধবা হলেই নারীর কাম রিপু বিলীন হয়ে যায় না। কামভাব বিধবা নারীকে বিপথে চালিত করে। নাট্যকার নবমীর মনের চিত্তসংকটকে রূপ দিয়েছেন এভাবে,—

“বিধবা নারীর পতি সঙ্গ, ঈশ্বরের ইচ্ছা মোহে যদি

কামভাব তার নাথাকিত অঙ্গ ভরি।।”^{৪৭}

নাট্যকার তারকনাথ চূড়ামণি ‘সপত্নী নাটক’ (১৮৫৮)-এ দেখিয়েছেন, ভূধর-সৌদামিনী ও ব্রজবিলাস-মোহিনীর নিতান্ত বাল্য বয়সে বিবাহ হয়। বাল্যবিবাহের কারণেই তারা অসুখী। স্বামী বিরহিণী তিন যুবতী বোন কাদম্বিনী, নিতম্বিনী ও চঞ্চলা জৈবিক তাড়নায় আত্মসংযমে অক্ষম হয়ে তাদের বাড়িতে আশ্রিত কামদেব নামক এক যুবকের সঙ্গে সন্মিলিত ভাবে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়। এই তিন কন্যার মা হরমোহিনী এবং পিতা রমাকান্ত এই ব্যভিচার সম্পর্কে সব জেনেও বাধা দিতে পারেনি। এসব কুলীন ব্যভিচারিণী স্ত্রীর কোন সন্তান নেই। বোঝা যায়, ভ্রূণহত্যাই ছিল তাদের পথ।

বহুবিবাহের কুফল নিয়ে নাটক রচনা করতে গিয়ে নাট্যকার প্রসঙ্গক্রমে সমকালীন সমাজ আন্দোলন ‘বিধবার পুনর্বিবাহ’ প্রসঙ্গটিকে এড়িয়ে যেতে পারেননি। কৌলিন্য প্রথা ও বহুবিবাহের ফলেই সমাজে দেখা দিয়েছিল বিধবার সংকট ও সমস্যা। আর সেকারণেই নাট্যকার বহুবিবাহের কুফল নিয়ে বলতে গিয়ে বিধবা সংকট ও বিদ্যাসাগরের সমাজ আন্দোলনকে নাট্যদৃশ্যে তুলে ধরেছেন। ‘সপত্নী নাটকে’ (১৮৫৮) এর দ্বিতীয় অঙ্কে সূর্যকান্ত ও রামগতির তর্কাতর্কি সংলাপে উঠে এসেছে ১৮৫৬ পরবর্তীকালীন সময়ের বিধবা বিবাহ আইন পাস হওয়ার প্রসঙ্গ ও বিধবা নারীর পুনর্বিবাহের বিষয়। সমকালীন সমাজ ইতিহাসের ছবিও তুলে ধরেছেন নাট্যকার,—“সূর্যকান্ত (সদভে)।। আবার জিজ্ঞেস করিতেছ হে? রাঁড়ের বিবাহ হইতে চলিল?

যাহা কর্ণেও শুনি নাই। বেদে নেই; পুরাণে নেই; কোরাণেও খুঁজিয়া

পাওয়া যায় কি না? আরও কি দেশে মানুষ আছে বল?

রামগতি।। কেন মহাশয়! এই যে বিদ্যাসাগর মহা--।

সূর্য্যকান্ত । (রামগতির কথা শেষ না হইতে হইতেই সক্রোধে) আঃ যাও যাও !
ওটার আর নাম করিও না । শুনিলে রাগ জন্মে ।

রামগতি ।। সে কি মহাশয় । এ কি বলেন ? বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রাচ্যস্মরণীয় লোক,
তাঁহার নাম শুনিলে আবার আপনকার রাগ হয় ? সর্ব্বাঙ্গ পুলকিত হয়
না ? আর দেশে লোক নাই বলেন কি ? তিনি যখন বিধবা বিবাহ বিষয়ে
প্রথম ব্যবস্থা বাহির করেন, তখন নবদ্বীপ প্রভৃতি যাবতীয় সমাজের
ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মহাশয়েরা তাঁহার বিপক্ষ হইয়া ছিলেন এবং কত শত
আপত্তি উপস্থিত করিয়াছিলেন একথা সত্য কি না ?’^{৯৮}

বস্তুত নাট্যকার সমকালীন সমাজ মানসিকতায় বিধবার সংকট চিত্রকে এ নাটকে তুলে ধরেছেন ।
এছাড়া নাট্যকার আরো দেখিয়েছেন, বহুবিবাহ হোক আর বিধবা বিবাহ হোক—পুনর্বিবাহের
অনুষ্ঠানে থাকতো কামিনী বিলাস ও অশ্লীলতার ছড়াছড়ি । বিবাহ অনুষ্ঠানে কুল কামিনীদিগের
মনের অবস্থা বর্ণনা করে নাট্যকার পদ্য সংলাপে লিখেছেন,—

“কি আনন্দ নিশিযোগে সুযোগ সময় ।
সয়িতে যাইব জল কোলাহলময় ।।
কে কার লইবে তত্ত্ব কোথা রবে কেবা ।
আনন্দে করিব আজি বাসনার সেবা ।।
পিঞ্জরে থাকিয়া বদ্ধ যত কষ্ট পাই ।
যোগে যাগে ঘুরে যাবে সে সব বালাই ।।
সাজিব সুসাজে আজি যাব বেশ্যা বেশে ।
বলাবলী গলাগলী ঢলাঢলী শেষে ।।
বাসর আসরে বটে মজা আছে কিছু ।

.....
ভাগ্যবলে আলো যদি নেবে একবার ।
ভাগাড়ের মধ্যে শত শকনী সঞ্চার ।।
এ নয় সেরূপ শুধু রমণী বাজার ।
পুরুষ পরেশ আছে হাজার হাজার ।।
বিশেষ যাহার সঙ্গে আছে যার মন ।

সে কি কভু ছেড়েদেয় সুযোগ এমন?

এ বাড়ী ওবাড়ী যাব পরিয়া ঢাকাই।

ঢাকাই কেবল মাত্র কিছু না ঢাকাই।।

মারো মারো রং মশাল জ্বলিবে যখন।

দেখিব দেখাব রং রসাল তখন।।

ধন্য রে হিন্দুর ধর্ম ধন্য আচরণ।

নাহি হেরি কোন দেশে আনন্দ এমন।।

বলিহারি দণ্ডবৎ বাঙ্গালির দেশে।।^{১৯৯}

বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ ও পুনর্বিবাহ অনুষ্ঠানের সামাজিক কদাচারকে এভাবেই নাট্যকার তুলে ধরেছেন তাঁর ‘সপত্নী’ নাটকে।

দীনবন্ধু মিত্রের ‘নীলদর্পণ’ (১৮৬০) নাটকে বিধবা চরিত্র হিসাবে আদুরী চিত্রিত হয়েছে। আদুরী বিধবা হয়েও বিধবা বিবাহের বিরোধিতা করেছে। আদুরী প্রগলভা—সংস্কারবদ্ধ মন নিয়ে বিধবা বিবাহকে সে সমর্থন করতে পারেনি। কিন্তু তাঁর স্বামী হারানোর যন্ত্রণা ও স্বামীর সুখস্মৃতি তাকে স্মৃতিকাতর করে তুলেছে। সেই অনুসঙ্গে প্রকাশ পেয়েছে তার অতৃপ্ত যৌবন বাসনা। বৈধব্য সংস্কার ও ভোগবাসনার স্মৃতিকাতরতায় সে বিচলিত হয়েছে এবং অন্তরে অন্তরে অনুভব করেছে বিধবা বিবাহের প্রয়োজনীয়তা।

শ্রীশিমূয়েল পিরবক্স রচিত ‘বিধবাবিরহ নাটক’ স্ত্রী চরিত্র নির্ভর নাটক। এ নাটকে মনোমোহিনী, তাঁর মাতা, চাঁপা দাসী, পদি, মনোমোহিনীর দাসী, সুখদা, মনোহারী, বামা, নঙ্গরা প্রভৃতি চরিত্র বিন্যাসের মধ্য দিয়ে নাট্যকার কাহিনী নির্মাণ করেছেন। শিমূয়েল পিরবক্স রচিত ‘বিধবা বিরহ নাটক’ (১৮৬০)-এ দেখানো হয়েছে,—ভদ্র ঘরের বিধবা কন্যা, পিতার ব্যভিচারে ক্ষুব্ধ হয়ে, পিতৃগৃহ পরিত্যাগ করেছে। নঙ্গরা নামক এক নীচ দুশ্চরিত্র যুবকের প্রলোভনে ভুলে গহনাপত্র চুরি করে ঘর ছেড়েছে।

মনোমোহিনী ও মনোহারী দুজনেই বিধবা। মনোহারী বৈধব্য জীবনকেই সে ভবিতব্য হিসাবে মেনে নিয়েছে। অন্যদিকে, মনোমোহিনী বৈধব্য জীবনকে ভোগের দৃষ্টিতে দেখেছে। বৈধব্য জীবনের মানসিক কষ্ট প্রকাশ করে মনোমোহিনী জানিয়েছে,—

“কামে কম্পাশ্বিত দেহ করি হয় হয়।

পতির বিচ্ছেদে বুঝি মম প্রাণ যায়।।

বিরহ অনল মম সদা জ্বলে মনে।

বিধবা হইয়া আর বাঁচিবে কেমনে।”^{৫০}

যৌবনকালে উপনীত মনোমোহিনীর দেহ কামে জর্জরিত হয়েছে। বিধবা মনোমোহিনী তনুমন শান্ত করার উপায় খুঁজে পায়নি,—

“তনু মম জীর্ণ হল মদনের বাণে।

নাগর বিহনে ঘরে থাকিব কেমনে।”^{৫১}

মনোমোহিনী দীর্ঘ বারো-চোদ্দ বছর যাবৎ বিধবা। শৈশব কালে পতির বিহনে বুঝতেই পারেনি— পতিসঙ্গ সুখ কি জিনিস। শুধুমাত্র উপবাস, ব্রতপালন, আতপচাল খেয়ে দিন কাটিয়েছে। বিধবা হওয়া অবধি কোনো পুরুষ মানুষের মুখও দেখেনি সে। মনোমোহিনীর পিতা সম্পদশালী। ভালো খাওয়া, পরায় মনোমোহিনী কোনদিনও অভাববোধ করেনি। কিন্তু সে ভালো নেই। মনোমোহিনী কামপীড়ায় দগ্ধ হয়ে কুপথে পা বাড়িয়েছে। মনোমোহিনী বিধবা বিবাহের প্রয়োজনীয়তা বুঝতে পারে। কারণ বিধবাদের বিবাহ না হবার কারণে সমাজে বহু কুৎসা ছড়িয়ে পড়ে।

মনোমোহিনীর পিতা বিধবা বিবাহের সপক্ষে। মনোমোহিনী পিতার গুণপনা সম্পর্কে মনোহরীকে জানিয়েছে,—“বাবার গুণের কথা আর বলে ফুরাইতে পারিনে-বাবার বাহাত্তর বছরের উপর বয়েস হয়েছে বাবার আগেকার স্ত্রীর যে চারিটি ছেলে আছে তারাও প্রায় বুড়ো হলো এসে-মার মুখে শুনেছি বাবার আগেকার স্ত্রীর মরণের পরে ছয়মাস হয় নাই বাবা আবার আমার মাকে বিবাহ কল্লেন, তা কেবল নয় আমাদের চাঁপা দাসীরও পেট করে ফেল্লেন, আর তাতেই যে ক্ষান্ত আছেন তা নয়, মা আর চাঁপা ছাড়া বাবার আর দুটি আছে, মড়ল পুকুরের ধারে যার বাড়ি তার নাম সুন্দরী সে একজন আর ভোজা নাপ্তুর মেয়ে তারা একজন এই দুজনকে বাবা এখন রেখেছেন।”^{৫২}

নাট্যকার বিদ্যাসাগরের সমকালীন এমন এক শ্রেণীর মানুষদের কথা তুলে ধরেছেন, যাঁরা জীবনকে উপভোগের উদ্দেশ্যে বিধবা বিবাহে সমর্থন জানিয়েছে। কিন্তু নিজগৃহে বালবিধবার পুনর্বিবাহ নিয়ে মাথা ঘামায়নি। মনোমোহিনীর পিতা উনিশ শতকের সেই প্রতিনিধি স্থানীয় চরিত্র যাঁরা বিধবার পুনর্বিবাহ আন্দোলনকে কুপথে চালিত করেছিল। মনোমোহিনী জানিয়েছে,—“সে যা হোক দুঃখের বিষয় এই যে বাবা এত বুড় হলেও এতটা কচ্ছেন তবে

আমি যে তাঁর যুব মেয়ে আমারী বা কত দুঃখ হতেছে তাত তিনি ভুলেও স্মরণ করেন না।”^{৫৩}
বিধবা মনোমোহিনী বিরহ জ্বালায় দগ্ধ হয়েছে কিন্তু তাঁর পিতা কন্যার পুনর্বিবাহে কোনো আগ্রহ
দেখাননি। অন্যদিকে মনোহরী বিধবা হয়েও অনেক সংযত। মনোহরী সাত বছর বয়সে (বিধবা)
রাঁড় হয়েছে বাপের বাড়িতে ভালো খেতে পরতে পায় না। তবুও মনোহরীর মনে দুঃখ নেই।
মনোহরী জানিয়েছে,—“...তথাপি দুঃখ করিনে কেননা যখন স্বামী নাই তখন আর কোন সুখের
প্রয়োজন নাই...।”^{৫৪}

দাসী বামার সংলাপে বিধবা নারীর পদস্থলন ও সমাজ মানসিকতার নারকীয়তা তুলে
ধরেছেন নাট্যকার,—“তার বড় মেয়েটি দুবচ্ছর হলো রাড় হয়েছিল কিন্তু কি জানি মা কার
সঙ্গে কি করে ছিল, তাতে তার পেট হয়েছিল; সেই পেট ফেলিয়ে দিয়েছে; যদি দুই এক
মাসের সময় ফেলত তবে কোন বানবাটি হত না কিন্তু যখন ছয় সাত মাস হল আর ছেলেটাও
পরিপাক পেলে তখন ফেলিয়েছে—এত বড় সুন্দর বেটা ছেলে দেখতে যেন কার্তিক! ছেলেটি
বোধ হয় জেস্তু হয়েছিল তার গলায় আবার ছুরি দিয়ে কেটেছে, কি নিষ্ঠুরের কন্ম মা দেখলে গা
থরং করে, সেটাকে মাটিতে পুতে না দিয়া কানি কুড়োর নলবনে ফেলে দিয়েছিল—যখন বিপদ
ঘটে তখন নানা রূপে ঘটে মানুষ একেবারে হতজ্ঞান হয়—সেই মরা ছেলেটাকে কুকুরে কি
শিয়ালে জানি না মা ঈশ্বরই জানেন, টেনে এনে ঘোষেদের দুয়ারে ফেলে ছিল, প্রাতঃকালে
চৌকিদার তাহা দেখে থানায় খবর দেয়াতে থানাদার, দারগা, জমাদার, বরকন্দাজেরা এসে
একিবারে গ্রামে পুরে গেল, পাড়াশুদ্ধ লোককে ধরে টানাটানি, ভয়েতে আমরা সকলে একিবারে
সসব্যস্ত হয়ে গেলুম, ঘোষেদের ধরে টানাটানি, তার পরে কত সন্ধান করতেং জানা গেল যে
চাটুয্যের মেয়ে পেট ফেলিয়েছে তাতে তাদের ঘর থানাদার লোকেরা একিবারে ঘিরে নিলে,
ইদিকে থানাদারেরা ও অন্যান্য লোকেরা গোলমাল করছে উদিকে চাটুয্যে লজ্জা প্রযুক্ত উপর
তালাতে গিয়ে গলায় দিয়ে মরে রয়েছেন।”^{৫৫} প্রবন্ধধর্মী এই দীর্ঘ সংলাপে উনিশ শতকের
দ্বিতীয়ার্ধের সমাজজীবনে যৌবনবতী হিন্দু বিধবা নারীদের সমাজ কলঙ্ক ও পদস্থলনকেই নাট্যকার
তুলে ধরেছেন মর্মস্পর্শী ভঙ্গিতে।

‘বিধবা বিরহ নাটকে’ নাট্যকার সংকট চিত্র হিসাবে দেখিয়েছেন, প্রায় প্রত্যেক বাড়ীতেই
বিধবারা পদস্থলিত। অল্প বয়সে বিধবা হয়ে নারীরা যৌবনে উত্তীর্ণ হয়ে নানা প্রলোভনের
শিকার হয়ে সতীত্ব হারিয়েছে, কেউ বা আবার গর্ভবতী হয়ে পড়েছে। সমাজের কাছে লজ্জা
নিবারণের স্বার্থে গোপনে ঞ্ণহত্যা করেছে। সম্মানহানি হবার ভয়ে, লোকসমক্ষে নিজেদের

ছোট হবার ভয়ে অনেক অল্পবয়সী বিধবা নারী আত্মহত্যার পথ বেছে নিতে বাধ্য হয়েছে।

বিধবা মনোমোহিনী ও নঙ্গরা যৌবন প্রেমে ডুব দেয়। কিছুদিন পর মনোমোহিনীর গর্ভাবস্থার লক্ষণ দেখা যায়। মনোমোহিনীকে জিজ্ঞাসা করলে সে অস্বীকার করে। বিধবা মনোমোহিনী দেহসুখের উন্মাদনায় সমাজভয়কে উপেক্ষা করে নঙ্গরার সঙ্গে গৃহত্যাগ করে। বিধবা কন্যার গৃহত্যাগে, সমাজ কলঙ্ক ভয়ে কুলীন বাড়ুয়্যে মহাশয় স্ত্রীপুত্রসহ দেশত্যাগী হয়। দেশত্যাগী হওয়ার সময় তিনি অনুভব করেন বিধবা বিবাহের প্রয়োজনীয়তা। বিধবাদের পুনর্বিবাহ না হলে ঘরে ঘরে এমনই বিপর্যয় নেমে আসতে বাধ্য। শিমুয়েল পিরবক্স্ এর ‘বিধবা বিরহ’ নাটকে স্ত্রীপক্ষীয় সমস্যার ইঙ্গিত রয়েছে। বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহ আন্দোলন অনেক বিধবার সুপ্ত যৌন বুভুক্ষাকে জাগিয়ে তুলেছিল। বৈধব্য সংস্কার ও প্রবৃত্তির দ্বন্দ্বে ক্ষত-বিক্ষত অনেক বালবিধবা জ্বালা ভোগ করেছেন। বস্তুত বিধবা বিবাহ আন্দোলন সমস্যা সমাধান করেছে না ক্ষতি করেছে, সেই প্রশ্নই উত্থাপিত হয়েছে।

শ্রীশ্যামাচরণ শ্রীমানি রচিত ‘বাল্যোদ্বাহ নাটক’ (১৮৬০) বাল্য বিবাহের কুফল দেখিয়ে রচিত। ‘বাল্যোদ্বাহ নাটক’-এর প্রস্তাবনায় নাট্যকার নট-নটীর মধ্য দিয়ে বাল্যবিবাহের করুণ পরিণতির কথা বলেছেন। উনিশ শতকের যুগ পরিবেশে বাল্যবিবাহ, অসম বিবাহ সংকট-এর পথ দিয়ে সমাজে বৈধব্য সংকট জটিল আকার ধারণ করেছিল। বাল্যবিবাহের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে ছিল, বৈধব্য সংকটের ঘটনা। নাট্যকার শ্যামাচরণ শ্রীমানি বাল্যবিবাহের সংকট চিত্র উপস্থাপন করতে গিয়ে নাট্যকাহিনীতে অকাল বৈধব্যের সংকট চিত্রকে তুলে ধরেছেন।

‘বাল্যোদ্বাহ নাটকে’ মায়াবতী ও বলহীন নামক ধনাঢ্য ব্যক্তির গোপাল নামক পুত্রের বাল্য বিবাহকে কেন্দ্র করে বৈধব্য সংকট চিত্র উপস্থাপিত হয়েছে। এ নাটকে দেখা যায়, ভট্টাচার্য মহাশয় শাস্ত্রের দোহাই জানিয়েছেন,— রজঃস্বলা কন্যা কোনভাবেই অবিবাহিতা থাকবে না। যদি থাকে তবে সে বংশ নরকগামী হবে,—“দশ বৎসরের উর্দ্ধ হোলেই কন্যাকে রজঃস্বলা বলে আর কন্যা রজঃস্বলা হোলে কি মহাপাতক হয় জানিস?...তোর মতে রজঃস্বলা কন্যাকে অবিবাহিতা রেখে বংশকে নরকগামী কর্যো?”^{৫৬} বাধ্য হয়ে কন্যার পিতা নিজ কন্যার বিবাহ দিতে উৎসাহী হয়েছেন। অবশেষে বলহীন মৃত্যুপথযাত্রী যক্ষ্মা রোগী নবমবর্ষীয় গোপালকে বিবাহ দিয়েছেন। স্বাভাবিকভাবে বিবাহের অল্পদিন পরেই, যক্ষ্মা রোগে গোপালের মৃত্যু হয়েছে। মায়াবতী, অম্বিকা, বলহীন, বুদ্ধিহীনের বিলাপে, অশ্রুজলে সন্তান হারানোর যন্ত্রণা প্রকাশিত হলেও গোপালের বিধবা স্ত্রী অবলার কোন প্রতিক্রিয়া নেই। কারণ নাবালিকা বিধবা অবলা

জানতেই পারে না যে, তার জীবনের কি পরিণতি হল। সে বুঝতেই পারে না যে তার ভবিষ্যত জীবন কতটা কঠিনতর হতে চলেছে। গোপালের মৃত্যুতে শোকগ্রস্ত বলহীন কোনভাবেই তার বৌমা অবলাকে তিরস্কার করতে ছাড়েনি,—“উঃ কি অলক্ষণযুক্ত কন্যাটিকেই ঘরে এনেছিলাম যে দুমাস কালও গেলনা, আসিবা মাঃ্রেই অমনি সংসার তিলক স্নেহাস্পদ পুত্রটিকে গ্রাস কোল্যে; ঘটক বেটা কি দুর্দান্ত রাক্ষসীর সহিত আমার প্রিয় বালকের সম্বন্ধ ঘটালে।”^{৫৭}

অসুস্থ বলহীন মৃত্যুপথযাত্রী পুত্রের যক্ষ্মারোগ গোপন রেখে বিয়ে দেয় অবলার সঙ্গে। অপরদিকে অবলার পিতা বুদ্ধিহীন পুণ্যের খাতিরে নিজ কন্যাকে যক্ষ্মারোগীর হাতে তুলে দেয়। গোপালের মৃত্যুতে নিরীহ মেয়েটিকে অযথা রাক্ষসী বলে তিরস্কার করতেও ছাড়েনি। পুত্রবধু শিশুকন্যার প্রতি শ্বশুর বলহীন জানিয়েছে,—“উঃ কি অলক্ষণযুক্ত কন্যাটিকেই ঘরে এনেছিলাম যে দুমাসও গেল না, আসিবা মাঃ্রেই অমনি সংসার তিলক স্নেহাস্পদ পুত্রটিকে গ্রাস কোলে; ঘটক ব্যাটা কি দুর্দান্ত রাক্ষসীর সহিত আমার প্রিয় বালকের সম্বন্ধ ঘটালে।”^{৫৮} প্রতীকে রূপকে নাট্যকার যেন বলতে চান, কৌলিন্য বংশ গৌরব ক্রমশ যেন বলহীন হতে বসেছে। কৌলিন্য গর্বে গর্বিত পিতা বাল্যবিবাহের কুফল না জেনে যদি পুত্রের বিবাহ দেন তাহলে তাঁর পুত্রকে অকালে হারাতে হবে। অন্যদিকে বিদ্যাহীন, পিতা শিশুকন্যাকে বিয়ে দিয়ে বিপদের দিকে কন্যাকে ঠেলে দিলে, কন্যা দারুণ বৈধব্য যন্ত্রণায় দগ্ধ হয়েছে।

‘দলভঞ্জন’ (১৮৬১) নাটকে প্রত্যক্ষ ভাবে বিধবা নারীর সংকট চিত্র উপস্থাপিত না হলেও বিধবা বিবাহকে কেন্দ্র করে সমাজে দুই দল দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যাওয়ার কাহিনী চিত্রিত হয়েছে। এ নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কে দেখা যায়, বকুলতলার পুষ্করিণীতে গৃহস্থ রমণীরা বিধবা নারীর পুনর্বিবাহ নিয়ে তর্ক করেছে। তাঁদের কথায় উঠে এসেছে বিধবা সংকট ও পুনর্বিবাহের প্রসঙ্গ। বিমলা, মালতী, রাধামণি, তারামণি ও ছোটবধু প্রভৃতি মহিলারা বকুলতলায় পুষ্করিণীর সামনে দাঁড়িয়ে বিধবা-বিবাহ নিয়ে তর্কে-বিতর্কে ব্যস্ত থেকেছে।

হরিশচন্দ্র মিত্র বিধবা বিবাহের সমর্থনে ‘শুভ্র শীঘ্রং’ (১৮৬১) ও ‘ম্যাও ধরবে কে’ (১৮৬২) দুটি নাটক রচনা করেন। এই দুটি নাটকে উঠে এসেছে বিধবা বিবাহ প্রসঙ্গ ও বিধবা নারীর সংকট চিত্র। শশাঙ্কমোহন সমাজ অনুশাসনের ভয়ে বিধবা কুমুদিনীকে বিবাহ করতে অসম্মত হয়েছে এবং পালিয়ে গেছে। শশাঙ্কমোহনের পত্রসূত্রে জানা যায়, অভিভাবক, স্বদেশ ও স্বজন ও সমাজের ভয়ে সে বিধবা বিবাহ হতে বিরত থেকেছে। প্রথম অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কে, কমলিনী, কুমুদিনী, সরলা, কামিনী প্রমুখের সংলাপের মধ্য দিয়ে বিধবা বিবাহ প্রসঙ্গে উপস্থাপিত

হয়েছে। দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে, বিধবা কুমুদিনীর পুনর্বিবাহ সম্পর্কিত মনোভাব প্রকাশিত হয়েছে। কুমুদিনীর স্বগত ভাষণে বৈধব্যের অন্তর্জ্বালা প্রকাশ করেছে এভাবে,—“হা অবিবেকি বিধাতঃ! তুমি কি নিদারুণ বৈধব্য যন্ত্রণানলে নিয়ত দগ্ধ করবে বলে এদিকে এরূপ সদৃশ সম্প্রদায় সৃষ্টি করেছিলে?”^{৫৯}

‘ম্যাও ধরবে কে?’ নাটকে বিধবা কামিনী, কমলিনী ও সরলার কথোপকথনে উঠে এসেছে বৈধব্যের সংকট চিত্র,—

“কমলিনী ॥ ভাবনা কি ভাই কিছুদিন সবুর কর, ‘সবুরের গাছে মেওয়া ফলে।’

কামিনী ॥ আর মেওয়া ফলে। কথায় বলে “থাক কুকুর তুই আমার আশে” ভাত দেব তোকে পোষ মাসে খাবি তুই গাসে গাসে” আমাদের ভাই আর কি।

কমলিনী ॥ কতজন বিধবা বিয়ের সাপক্ষে জুটেছে জানত?

কামিনী ॥ জানবো না উকন? ঢাকা প্রকাশকে কদিন ত স্বাক্ষর করে প্রতিজ্ঞা করেছেন, তাঁদের ঘরে কত বিধবা অবিরত চোক্ষের জলে ভেসে যাচ্ছে তবু তাদের বিয়ে দেবার নামটি নাই। তারই আবার এ সভায় ও সভায় বিধবা বিবাহ প্রচলিত করা কর্তব্য বলে গালবাদি-মর কি বলে বক্তৃতা করে ফেরেন। হায়! ঠিক লজ্জাও পায় না।

সরলা ॥ (স্বগত) কামিনী বেশ বলেছে!

কুমুদিনী ॥ অনেক দিন হতে এ দেশে বিধবা বিবাহের রীতি উঠে গিয়েছে; পুনরায় সেই রীতি প্রচলিত করতে হলে অনেক যত্ন সময়ের আবশ্যক করে।

কামিনী ॥ কত সময় চাই? এক যুগ নাকি? তুমিও যেমন বুন, নব্য সম্প্রদায়ের কেবল মুখ সর্বস্ব, ওঁরা মুখেই যত ‘হাতি মারেন ঘোড়া মারেন’ কাজের বেলায় কিছুই না। দেখ ভাই, ওঁরা মুখে যে রূপ বলে ফেরেন, কাজেও যদি সেইরূপ করেন, তাহলে বঙ্গ দেশের দুরবস্থা কদিন থাকে? তার সাক্ষী দেখ কেন্ না বা কি আমার বিয়ে দিতে পারেন না, তিনি সাহস করে তা দেবেন না কেবল স্বাক্ষরকারীর সংখ্যা বাড়াবেন...দূর কর, এসব কথা আর উঠিও না বলতে গেলে অনেক হয়। চুপ করে থাকাই এক প্রকার ভাল। কথায় বলে বোবার শত্রু নাই।”^{৬০}

বিধবা কুমুদিনী, কামিনী, সরলা প্রমুখ বিধবা বিবাহ তথা পুনর্বিবাহ করতে চাইলেও সমাজ তা স্বীকার না করায়, সমাজ ও অদৃষ্টকে তাঁরা দোষারোপ করেছে। বৈধব্য জীবনকে জীবনের ভবিতব্য বলে মেনে নিয়েছে। এ নাটকে ঠানদিদির সংলাপে নাট্যকার বিধবা বিবাহ নিয়ে এই গভীর আক্ষেপ উক্তি করেছেন,—“কতদিনে এদেশে বিধবাবিবাহের চলন হবে?

কতদিনে এ দেশের বিধবারা বৈধব্যযন্ত্রণা হতে নিস্তার পাবে?”^{৬১} নাট্যকার বলতে চেয়েছেন, দেশাচারই বিধবা বিবাহের প্রধান বাধা স্বরূপ ও সমাজ সংকটের মূল।

কুশদেব পালের ‘আইন সংযুক্ত কাদম্বিনী নাটকে’ দেখা গেছে নয় বছরের বিধবা কাদম্বিনী যৌবন তাড়নায় নাপেতানীর সাহায্যে রমণীমোহনের সঙ্গে গৃহত্যাগ করেছে। নাটকের ঘটনাসূত্রে দেখা যায় শুধুমাত্র ভোগলিপ্সায় বিধবা বিবাহের প্রলোভন দেখিয়ে, একরকম রক্ষিতা করে রমণীমোহন কাদম্বিনীকে ভোগ করেছে। কামিনীর স্বপ্নভঙ্গ হয়েছে গৃহত্যাগের অল্পকিছুদিন পরেই। রমণীমোহনের অভিসন্ধি সিদ্ধ না হওয়ায়, কাদম্বিনীকে শুধুমাত্র অনবদ্য দেওয়ার কথা স্বীকার করে সে। মাসিক ৩ টাকা দিয়ে রমণীমোহন কাদম্বিনীর প্রতি দায়িত্ব পালন করবে বলে জানায়। কাদম্বিনী কুলমান খুইয়ে রমণীমোহনের হাত ধরে বাইরে বেরিয়ে এসেছে। সেই রমণীমোহনই যখন কাদম্বিনীর থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে তখন কাদম্বিনীর দুঃখ অপরিসীম হয়ে দাঁড়িয়েছে। কাদম্বিনীর ভাগ্য বিড়ম্বনা কাদম্বিনীকে নিস্তার দেয়নি। সে না পেয়েছে স্বশুর ঘর, না পেয়েছে বাপের ঘর। কাদম্বিনী জানিয়েছে, —“(রোদন করিতে ২) মাসি গো আমার দুঃখের কথা কি বল্‌ব, বিয়ে হতে না হতে স্বশুরের কুল খেয়েছি, জ্ঞান হতে না হতে বাপের কুল খেয়েছি, যদি বা এককুল ধরে পার করেছিলাম তাও খেলেম গা,...।”^{৬২} প্রতিবেশী জগদম্বার পরামর্শে ভাগ্যবিড়ম্বিত কাদম্বিনী উকিলের দ্বারস্থ হয়। উকিলের পরামর্শমত কাদম্বিনী দেওয়ানীতে নালিশ করে। দেওয়ানীতে নালিশের আরজীর মুসাবিদা অনুযায়ী কাদম্বিনী রমণীমোহনের কাছে প্রতিমাসে দশ টাকা করে মাসিক খরচের দাবী করে। কিন্তু তাতেও কোন সুরাহা হয়নি। নাট্যকার কুশদেব পাল, কাদম্বিনীর সংকটময় অবস্থার বর্ণনায় লিখেছেন,—

“হল ক্লেশ তনু শেষ, তবু তায় ধায় রে।

ক্ষান্ত নাহি হয় মন, হায় হায় হায় রে।।”^{৬৩}

বিধবা হয়ে পরকীয়ায় সর্বস্ব হারানো কাদম্বিনীর পরিণাম অত্যন্ত দুঃখজনক। নাট্যকার কুশদেব পাল, বিধবা কাদম্বিনীর পরিণতির মধ্য দিয়ে তৎকালীন সমাজের ভয়ঙ্কর সংকটটি তুলে ধরেছেন।

গুরুপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘পুনর্বিবাহ’ (১৮৬২) নাটকে দেখা যায় নারীর ঋতুমতী হওয়ার পর স্বামী দ্বারা পুনঃগ্রহণের উৎসব। এই অনুষ্ঠানকে ঘিরে পাড়া-পড়শির, বিবাহিত-অবিবাহিত মহিলাদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ। বঞ্চিত হত শুধুমাত্র বিধবা নারীরা। কারণ বিধবাদের অমঙ্গলের দ্যোতক হিসাবে দেখা হত। দূর থেকে বিধবা রমণীরা এধরণের অনুষ্ঠান দেখতেন এবং মনে মনে আক্ষেপ করতেন। এ নাটকে দেখা গেছে আর এক সংকট চিত্র, বিধবা

নারী বিলাসবতী স্বামীর অবর্তমানে একাদশী পালনে অরুচি প্রকাশ করেছে। কারণ জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হবার পূর্বেই সে তার স্বামীকে হারিয়েছে। স্বামী তাঁর কাছে এক শৈশবের বাপসা স্মৃতি। তার মনে প্রশ্ন জাগে, স্বামী মানেই যদি একাদশীর নির্জলা উপবাস, বিবর্ণ সাদা কাপড়, তেলহীন শুষ্ক চুল, মাস্টলিক অনুষ্ঠানে প্রবেশের বাধানিষেধ তাহলে সে স্বামীকে কেন স্মরণ। বিলাসবতী জানিয়েছে,—“এই যে আমার ভাতার বের হল্‌দে কাপড় না ঘুচতে ঘুচতেই পটল তুললো, তা কি করবো বল? এ বলে কি দিবারাত্রি কেঁদে কেঁদে শরীর খোয়াব।”^{৬৪}

যদুনাথ চট্টোপাধ্যায়ের ‘বিধবাবিলাস’ নাটকে, সুমতি, সুনীতি, সাবিত্রী, সুশীলা, সতী, পতিব্রতা প্রমুখ একাধিক বিধবার সংকটের কথা উঠে এসেছে। আবার, এ নাটকে বিলাসিনী, রঙ্গিনী, কাঞ্চনী, রসবতী প্রমুখ পদস্থলিত গর্ভবতী বিধবাদের সংকটের কথা বলা হয়েছে। এরা প্রত্যেকেই অল্পবয়সী বিধবা। একাদশীর নির্মমতায় এরা পীড়িত, জর্জরিত। সুমতি ও সুনীতি কুলপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ি এলে তাঁর স্ত্রী নিজ কন্যাদের দুরবস্থা ব্যক্ত করে। সুনীতি ও সুমতি তাদের নিজ জীবনের বৈধব্য যন্ত্রণার কথা প্রকাশ করে। বিধবাদের ক্ষুধার কণ্ঠ বন্দ্যোপাধ্যায় গৃহিণীর কাছে দুঃসহ লাগে,—

“দয়াহীন বিধাতার কপালে আগুণ।

আহামরি ক্ষুধায় হতেছে সবে খুন।।

ইচ্ছা করে প্রাণ ভরে আহা করাই।

কি করিব হয়? উপায় যে নাই।।

আমার চারিটি মেয়ে যেন স্বর্ণলতা।

সাবিত্রী সুশীলা সতী আর পতিব্রতা।।

একেবারে চারিটির পুড়েছে কপাল।

গতমাসে জামায়ের হইয়াছে কাল।

শেষে পুত্রবধূ দেখে ছিল যেই সুখ।

বিধাতা তহাতে পুনঃ করেছে বিমুখ।।”^{৬৫}

কুলীন ব্রাহ্মণদের হাতে কন্যা সমর্পণ করতে পারলেই যেন সমস্ত পুণ্যপ্রাপ্তি হয়। যার ফলে একজন কুলীন ব্রাহ্মণ বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত বিবাহের পাত্র হিসাবে সমাজে গণ্য। এমনকি মৃত্যু পথযাত্রী কুলীন ব্রাহ্মণও পাত্র হবার যোগ্য। পুণ্য অর্জনকারী কন্যার পিতা একবার ভেবেও দেখেন না যে তাঁর বিধবা কন্যার ভবিষ্যৎ কি হবে। বালিকা অবস্থায় যার বিবাহ এবং বিবাহের কিছুকাল পরেই

বৈধব্য যন্ত্রনার নরকবাস। যে বয়সে একটি বালিকার খেলার সঙ্গী পুতুল, তার অজান্তেই সমাজ তার কপালে সঙ্গী হিসাবে জুড়ে দেয় বৃদ্ধ বর। নবজীবনের বিবাহের পরবর্তী অধ্যায় সঙ্গী হয় কঠোর একদশী ব্রত। অর্থাৎ বৃদ্ধ বরটির আয়ু পৃথিবী আর বহন করতে না পারায় বালিকাটি সাদা থান পরিহিত হয়ে, নিরামিষ আহারে একদশীর ব্রত পালনে, পুজোর ঘরে ঠাকুর সেবায় জীবন অতিবাহিত করে। বিধবা কন্যাটির সধবা মায়ের প্রাণে মৃত্যু যন্ত্রণা অনুভূত হয়, নিজ প্রাণপ্রিয় কন্যার শুষ্ক মুখ দর্শনে। ‘বিধবাবিলাস’ নাটকে দেখা যায়, যৌবনতৃষ্ণায় কুলবালা ক্ষণে ক্ষণে চমকিত হয়েছে। ষোল বছর বয়সে সাবিত্রীর এক কুলীন ব্রাহ্মণের সঙ্গে বিয়ে হয়। সর্প দংশনে এক বৃদ্ধের আয়ুক্ষয় ঘটে। কুলপ্রদীপ মুখোপাধ্যায় পুণ্য অর্জনের স্বার্থে ব্যস্ত হয়ে তাঁর অপর তিনটি কন্যাকে সেই মৃত্যু পথযাত্রী বৃদ্ধের সঙ্গে বিবাহ দেন। ফলস্বরূপ তাঁর চারকন্যা অল্পদিনেই বিধবা হয়। পাঁচ বছর বয়সী কনিষ্ঠা কন্যার পতিব্রতার বৈধব্য দশা নিতান্তই অসহ্যকর হয়ে ওঠে।

অন্যদিকে দেখা যায়, কামের দহন বিধবা রমণীদের অভিশাপ স্বরূপ। কামানলে দগ্ধ জীবন যাতে অতিবাহিত করতে না হয় তাই তাঁরা বিদ্যাসাগরের কাছে এর বিহিত চেয়ে পত্র পাঠিয়েছেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় উকিল হয়ে বিধবাদের মনের কথা অনুভব করতে পারেন। এই বিশ্বাসে বিধবারা জানিয়েছে,—

“আমরা বালিকা সতী, মিনতি প্রণতি স্তুতি,

করিতেছি পতির কারণে।।

শুন শুন মহীপতি, বিধবার দিয়া পতি,

কর কর দেশ উপকার।

থাকিবে তোমার নাম, আমাদের মনস্কাম

পূর্ণ করি লও নমস্কার।।”^{১৬}

বিধবা নারী একটি মৃত স্বামীর কারণে সারাজীবন কষ্ট করে। আশা আকাঙ্ক্ষা লোভ শখ সবকিছু বিসর্জন দিয়ে শুধুমাত্র ঈশ্বরের চরণে নিজেকে সঁপে দেয়। আজীবন অপুষ্ট একাদশী পালনে দেহ জীর্ণ হয় ঠিকই কিন্তু বয়োসচিত যৌবন ধরা দেয় ওই অসহায় স্বামীহারা রমণীদের। পুরুষসঙ্গ লোভে অচিরেই তারা ব্যভিচারিণী, কুলত্যাগী, দ্রুণ হত্যাকারিণী, পাতকিনী ও বেশ্যাজীবী বলে সমাজে পরিচিতি লাভ করে। রাজার হৃদয় এইসকল বিষয় অবলোকন করে ব্যথিত হয়েছে। কিন্তু মন্ত্রীর বক্তব্য অনুসারে বিধবাদের সর্বসুখে বঞ্চিত করাই উৎকৃষ্ট ধর্ম। তাই তাদের দুঃখে

কাতর হওয়া উচিত কাজ নয়। বিধবাদের অধিকতর কষ্ট প্রদান উচিত। তাদের দুঃখ প্রদানে অধর্ম নেই।

সুমতি, সুনীতি, সাবিত্রী, কুলবালা, সতী, সরলতা, সুশীলা প্রত্যেকেই রাজসভায় নিমন্ত্রণ পেয়ে রাজসভায় উপনীত হয়েছে। রাজসভায় তারা উপস্থিত হয়ে তারা তাদের সারাজীবনের দুঃখ কষ্ট যন্ত্রণার কথা জানিয়েছে। তারা মনে করেছেন, বিধবা হয়ে সারাজীবন জ্বলে পুড়ে মরার চেয়ে মৃত স্বামীর সঙ্গে সতী হওয়া অনেক শান্তির,—

“পূর্বেতে বিধবাদলে, অস্বামিক বস্তু বলে,

পোড়াইত জ্বলন্ত আগুনে।

সে পোড়া যে ছিল ভাল, পুড়িতেছি চিরকাল,

—আগুণে শতগুণে।”^{৬৭}

বিধবা রঙ্গিনী ও বিলাসিনী গর্ভবতী। যৌবনের অদম্য টানে তারা কুপথে পা বাড়িয়ে পদস্থলিত। রঙ্গিনী আক্ষেপ করে জানিয়েছে,—“...দিন কতক আগে যদি বাবা আমার বিয়ে দিত তাহলে কি এমন হয়। এখন ভেবে ভেবে অস্থিচর্ম সার হল।”^{৬৮} গর্ভবতী বিধবাদের দাবী হল বিধবা বিবাহ দেবার আগে তাদের গর্ভজাত সন্তানদের রক্ষা করতে হবে। বিধবা রমণীদের যৌবন তাড়িত জীবনে গর্ভবতী হওয়া ও আত্মসম্মান রক্ষার্থে ভ্রূণ হত্যা—এসবই সহায় সম্বলহীন বিধবা রমণীদের ললাট লিখন। তাই গর্ভবতী রমণীদের গর্ভস্থ সন্তান যাতে রক্ষা পায়, নিরাপদ থাকে সেই আর্জি ও প্রার্থনা নিয়ে রাজার কাছে তারা এসেছে। বিধবাদের বিবাহ দিতে উদ্যোগী রাজার কাছে প্রার্থনা নিয়ে এসেছে যাতে তারা ভ্রূণ রক্ষা করতে পারে,—“মহারাজ! আমাদের প্রার্থনা বিবাহ দেবার পূর্বে সন্তান রক্ষার উপায় হয়।”^{৬৯} স্বামীহীন সন্তান ধারণের ফলে বিধবা রমণীদের উপহাসের পাত্রী হতে হয় মন্ত্রীরা কাছে। শুধু মন্ত্রী নয়, সমাজে নানান লোকের হাসির খোরাকে পরিণত হয় তারা।

‘বিধবাবিলাস’ নাটকে দেখা যায় শ্রীবিলাসী যে লিখিত আবেদন পেশ করেছে, সেখানে দেখা যায় শ্রীবিলাসী বিধবার পুনর্বিবাহে রাজী নয়। সে শুধুমাত্র যৌবন দহে দন্ধ হয়ে নারীরা যে পাপকার্যে লিপ্ত হচ্ছে সেটা যাতে আর বৃদ্ধি না হয় সে ব্যাপারে রাজামহাশয়কে অবগত থাকতে বলেছেন। গর্ভজাত সন্তান যাতে পৃথিবীর আলো দেখতে পায় অকালে যাতে চলে যেতে না হয়, রাজামহাশয় এ বিষয়টিকে যেন হুকুম তামিল করেন। গর্ভবতী রঙ্গিনী শুধুমাত্র তার গর্ভস্থ সন্তানের সুরক্ষা চেয়েছে,—

“সন্তানের প্রাণ কর অগ্রে দান, পশ্চাতে দিও হে পতি।”^{৭০}

বিধবা কাঞ্চনীর বিধবা বিবাহে প্রবল আপত্তি। আটমাসের গর্ভবতী কাঞ্চনী জানায় যে, যদি সে গর্ভপাত না করে তাহলে গৃহচ্যুত হবে এবং গর্ভপাত করলে ইংরেজ আইন অনুসারে সাত বৎসর জেলে যেতে হবে। তাই যাতে সন্তান রক্ষার আইন প্রণয়ন হয় তার দিকে সর্বপ্রথম দৃষ্টিপাত করা প্রয়োজন। গর্ভস্থ ভ্রূণ রক্ষার্থে নতুন আইন প্রণয়ন করার পর বিধবা বিবাহের ব্যবস্থা করবার আর্জি জানিয়েছে। রসবতী তার আবেদনপত্রে জানিয়েছে, বিধবা বিবাহ প্রচলিত হলে যেন তার মধ্যে ‘নিকা’ নামক মুসলিম বিবাহ রীতিটি থাকে। কারণ কুলতিলক মুখোপাধ্যায়ের ব্রাহ্মণ কন্যা রসবতী তাদের বাড়ির মাইনদার করিম শেখকে উপপতি রেখেছে। রসবতী তার প্রতি প্রণয় আসক্ত ও অনুরক্ত। দুর্ভাগা বিধবারা যৌবনাবস্থায় ধর্মপথে লৌকিক ও পারলৌকিক সুখে বঞ্চিত হয়ে যেভাবে কালযাপন করে তা অবর্ণনীয়। বিধবা রমণীরা আজীবন কষ্ট সহ্যের মধ্য দিয়ে কালাতিপাত করে জীবনের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বিসর্জন দেয়। পরলোকের চিন্তায় ব্রহ্মচর্য পালনে দেহও মন অবিচার করলেও সমাজনিয়ম মান্য করতে তারা বাধ্য হয়েছে।

রামনারায়ণ তর্করত্নের সমাজ সমস্যামূলক নাটক ‘নব-নাটকে’ (১৮৬৬) উঠে এসেছে বিধবা নারীর সংকট চিত্র। ‘নব-নাটকে’ চপলার উক্তিতে বিধবাদের দুর্দশার ছবি পাওয়া যায়,

—

“দন্তহীন মুখ সম নারী পতিহীনা।

অন্যে অধিকার নাই শুধু জল বিনা।”^{৭১}

‘বিধবা বিবাহ’ সমাজে চালু না হলে, বিধবা নারীর জন্য পূর্বের ‘সহমরণ’ প্রথাই সুখকর এমনটা মনে হয়েছে অনেক বিধবা নারীর। ‘নবনাটকে’ সুধীর মনে করেছেন,—বৈধব্য দাবানলে নিশিদিন দন্ধ হবার চেয়ে বিধবা মেয়েদের পক্ষে পূর্বের (র) সহগমন প্রথাই মঙ্গলকর ছিল। সুধীরের সংলাপে নাট্যকার বিধবা নারীর সংকটের চিত্র তুলে ধরেছেন নাট্যকার,—“ঐ একটি স্বামীর মৃত্যু হলে ঐ ৫০।৬০ টী স্ত্রী সকলেই বিধবা হলো, বৈধব্যবেদনা তো সহজ নয়, পূর্বের সহগমন প্রথা ছিল এক্ষণে তা নাই, বিধবা বিবাহও সাধারণে চলিত হয়ে আজও ওঠে নাই; ঐ ৫০।৬০ টী স্ত্রীর দেহ বৈধব্য দাবানলে যে দিবানিশি দন্ধ হতে লাগলো।”^{৭২}

কেউ কেউ বা শ্বশুরবাড়ীতে অবহেলায় পড়ে থাকত। দুবেলা পেট ভরে খাবারও জুটতো না। আর কেউ বা শ্বশুরবাড়ীতে সতীনের জ্বালায় অতিষ্ঠ। তবুও নারীর পতিই হয় গতি। স্বামীই যেন একটি নারীর কাছে পরম আপনজন। একজন স্ত্রীর সমস্ত সুখই যেন তার স্বামী। যে নারী স্বামীহারা তার চেয়ে অভাগিনী এই ত্রিসংসারে নেই।

‘নবনাটক’ এ রামনারায়ণ তর্করত্ন মূলত দেখাতে চেয়েছেন যে বহুবিবাহের ফলে নারী জাতির যে সংকট উপস্থাপিত হয়েছে তা অত্যন্ত দুঃখজনক। একজন সতীসাপ্রী স্ত্রী জীবনের একপ্রান্তে এসে তার স্বামীকে ভাগ করে নিয়ে যম যন্ত্রণার সম্মুখীন হয়েছে। আবার অন্যদিকে কুড়ি-তিরিশটি বিবাহের ফলে, রমণীরা অকালেই বৈধব্য নিয়মাচারে বদ্ধ হয়েছে। এ নাটকে বিধবা নির্মলার সংকটের মধ্য দিয়ে তার অভিব্যক্তি পাই। ‘নবনাটক’টি বহুবিবাহ কেন্দ্রিক হলেও এ নাটকে বৈধব্য সমস্যা প্রধান বিষয় হিসাবে উঠে এসেছে।

দীনবন্ধু মিত্রের ‘বিয়ে পাগলা বুড়ো’ (১৮৬৬) নাটকে রামমণি ও গৌরমণি এই দুই বিধবা চবিত্রের সংকট উপস্থাপিত হয়েছে। রাজীব মুখোপাধ্যায়ের কন্যা রামমণি ও গৌরমণি দুজনেই বালবিধবা। বার্ককে উপনীত পিতার পুনর্ব্যার বিবাহ করবার ইচ্ছায় বিধবা রামমণি আহত হয়েছে। বৃদ্ধ পিতার পুনর্ব্যাহের ইচ্ছায় রামমণি ও গৌরমণি ভেবেছে, তাদের পিতাকে যে কন্যাই বিবাহ করুক, অকালেই তাকে বৈধব্য জীবনে উপনীত হতে হবে এবং একাদশীর ব্রত পালন করতে হবে। রামমণি আক্ষেপের সঙ্গে জানিয়েছে,—“তার বুঝি মা নেই, তা থাকলে কি এমন বুড়ো বরকে বিয়ে দেয়। একাদশীর জ্বলন্ত আগুনে কাঁচা মেয়ে ফেলে!”^{৯৩} বোঝা যায় সেকালে ক্ষেত্রবিশেষে পারিবারিক নিঃসহায়তা অনেক সময় নারীর সংকটকে অনেক অংশে ত্বরান্বিত করেছিল।

অন্যদিকে বিধবা গৌরমণি বলেছে,—“দিদি! ভাল খেতে ভাল পড়ে, ভাল করে সংসারধর্ম কত্তে কার না সাধ যায়?”^{৯৪} মনের সুপ্ত বাসনার কাছে হার মেনে গৌরমণি পুনর্ব্যার বিবাহ করতে চায়। কিন্তু সমাজের বিধিনিষেধের কাছে মনের ইচ্ছা ব্যক্ত করা অসম্ভব জেনে গৌরমণি বলেছে, বিধবা হবার চেয়ে সহমরণ প্রথা-য় নিজেকে পুড়িয়ে ফেলা অনেক ভালো ছিল। কারণ প্রতিদিন একটু একটু করে মরবার চেয়ে একেবারে মৃত্যু হওয়া শ্রেয়। গৌরমণির দুঃখে কাতর হয়ে বিধবা রামমণি আক্ষেপের সঙ্গে বলেছে,—“আহা! যিনি সহমরণের পদী উঠিয়ে দিলেন, তিনি যদি বিধবা বিয়ে চালিয়ে যেতেন তাহলে বিধবাদের এত যন্ত্রণা হত না।”^{৯৫} রামমণি ও গৌরমণির কথোপকথনে প্রকাশিত হয়েছে বৈধব্যের আর্তি, বেদনা ও যন্ত্রণার আবিলতাময় করুণ দুঃখসার। উভয়ের কথোপকথনে বৈধব্যের আর্তি গভীর মনস্তাত্ত্বিকতায় চিত্রিত করেছেন নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র,—

“গৌরমণি ।। যেদিন পতি মলেন সেদিন মনে করেছিলেম, আমি প্রাণকান্ত বিরহে
একদিনও বাঁচবো না; আর প্রতিজ্ঞা কল্লেম অনাহারেই মরবো—কিন্তু

সময়ে শোকে মাটি পড়ে, এখন আর আমার সে ভাব নাই—আমি কি
নিষ্ঠুর, যে পতি আমাকে প্রাণাপেক্ষাও ভালবাসতেন, আমি সেই পতিকে
একেবারে বিস্মৃত হইচি!

রামমণি ।। অনেক সময় মেয়ে দ্বিতীয় বিয়ে না হতে বিধবা হয়েছে, তারা স্বামী
কখন দেখেনি, তাদের বিয়ে দিলে দোষ কি?

গৌরমণি ।। ছোট মেয়েটিই কি, আর বড় মেয়েটিই কি, বিধবা বিয়েতে দোষ নাই।
বিধবার বয়স চলে গেলে কেউ বিয়ে করবে, কেউ করবে না, এখন
পুরুষদের মধ্যেও তো অমনি আছে, মাগ মলে কেউ বিয়ে করে, কেউ
বিয়ে করে না, কিন্তু তা বলে তো এমন কিছু নিয়ম নাই যে এত বয়সে
দ্বিতীয় পক্ষে বিয়ে হবে এত বয়সে দ্বিতীয় পক্ষে বিয়ে হবে না। সকল
দেশে বিধবা বিয়ের রীতি আছে, সেকালে কত বিধবা বিধবা বিয়ে
হয়েছে—সব লোক মূর্খ, কেবল আমার বাবা আর কলকাতার বলদ
পঞ্চগনন পণ্ডিত!”^{৭৬}

উনিশ শতকের সমাজব্যবস্থায় দাঁড়িয়ে একজন কন্যাদায়গ্রস্থ পিতা বাল্য বয়সেই কন্যার
সম্বন্ধ করে থাকতেন। কন্যার প্রথম বিবাহ হলে তাকে স্বামীর ঘরে পাঠানো হত না। বাল্যবয়সে
বিবাহের পর কন্যাটি তার পিতা মাতার কাছেই বড় হত। বয়সোচিত ধর্মে কন্যাটি রজঃস্বলা
হলে তাকে পুনরায় তার স্বামীর সঙ্গে দ্বিতীয় বিবাহ দিয়ে শ্বশুরবাড়ি পাঠানো হত। কিন্তু
অনেকসময় বাল্যব্যবস্থায় বিবাহের পর বালিকাটি তার স্বামীর বিষয়ে অজ্ঞাত থেকে যেত। কিন্তু
স্বামীর মৃত্যুতে তাকে বিধবার আচার আচরণ পালন করতে হত। যে মেয়েটি বিবাহ শব্দটির
অর্থ বোঝে না, ‘স্বামী’ শব্দটির সঙ্গে পরিচিতি ঘটলো না, স্বামীকে কোনোদিন চোখেও পর্যন্ত
দেখলো না, সেই কন্যাটির বাল্যকাল ও যৌবনকাল ধ্বংস হয়ে যায় বৈধব্যদশার নিয়মনীতির
মধ্য দিয়ে।

ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের ‘মেঘনাদবধ নাটক’ (১৮৬৭) পৌরাণিক কাহিনী নির্ভর
রচনা। এ নাটকে উঠে এসেছে প্রমীলার বৈধব্য সংকটজনিত আশংকার কথা। প্রমীলা তাঁর স্বামী
ইন্দ্রজিৎকে হারিয়ে আশঙ্কিত হয়েছেন। মন্দোদরী বৈধব্য সংকটের বেদনা সম্পর্কে পুত্রবধূকে
সচেতন করিয়ে দিয়ে বলেছেন,—

“অবলার পতি সম নাই অন্য ধন।

না প্রকাশি পতি পাশে কি আছে বেদন ।।

পতির চরণ, করি হৃদয়ে ধারণ,

নাশি দুঃখ অনুক্ষণ ।”^{৭৭}

আবার ‘মেঘনাদবধ নাটকে’ ইন্দ্রজিৎ মারা যাবার পর প্রমীলা বৈধব্যের যন্ত্রণার করুণ অনুভব ব্যক্ত করে শাশুড়ী মন্দোদরী জানিয়েছে,—“আর্য্যে! ভেবে দেখুন বিধবা কন্যা আর বিধবা পুত্রবধূর মরণই ভাল। তাদের দেখলে জামাই ও পুত্রের শোক প্রতিদিন নতুন করে জ্বলতে থাকে। যখন আমি উপবাসে কাতর হয়ে শুষ্ক মুখে আর শুষ্ককণ্ঠে প্রাণ পতির উদ্দেশে রোদন কোরবো তখন তুমি কি তোমার মেঘনাদের জ্বালা ভুলবে।...আর্য্যে! প্রণাম করি, আশীর্ব্বাদ কর যেন জন্মান্তরে বৈধব্য যন্ত্রণা ভোগ না করি।”^{৭৮} এভাবেই পৌরাণিক কাহিনীর অন্তরালে সমকালীন বিধবার সংকট চিত্রের করুণ আর্তি ধরা দিয়েছে।

১৮৬৮ সালে প্রকাশিত হয় হারাণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের ‘বঙ্গকামিনী’ নাটক। এ নাটকে দেখা যায় কামিনীর পিতা গদাধর বিদ্যাবাগীশ চান, যেকোনো পাত্রের সঙ্গে কন্যার বিয়ে দিয়ে মুক্তি পেতে। গদাধর বিদ্যাবাগীশের বন্ধু মুকুন্দরাম তর্কালঙ্কার জানিয়েছে,—“আরে রেখে দ্যাও হে, মনোমত আর অমনোমত! যাতে তাতে ঘর থেকে বার কোত্তে পাল্লেই হোলো। ওগুলো জন্মে কেবল চিরকালটা বাপ মাকে জ্বলিয়ে পুড়িয়ে মারে বইত নয়।”^{৭৯} ‘বঙ্গকামিনী’ নাটকে দুজন বিধবা চরিত্র রয়েছে,—‘রঙ্গিনী’ ও ‘মোহিনী’। বিধবা হবার পর বাপের বাড়িতে এসে রঙ্গিনী দিনের পর দিন ফাই ফরমাস খেটে মরেছে। রঙ্গিনীর কপালে জুটেছে তুচ্ছ তচ্ছিল্য, —“এই ভাই, আমি রাঁড় হোয়েচি, দুব্যালা খাওয়া ঘুচে গেছে; এক সন্ধ্যা পোন কুনকে চাল, তাতেও না বলে এমন বাক্য নেই। আমি ভাই, পরণে কখন ভাল কাপড় পরিনি, ভেয়েদের ছেঁড়া খোঁড়া, যা ফেলে দ্যায়, তাই দুখান চেয়ে পোরি, তাতেও কারও মন যুগিয়ে চোলতে পারিনি।”^{৮০} রঙ্গিনীর মত বিধবা মোহিনীকেও আমরা এ নাটকে দেখতে পাই। রঙ্গিনী ও মোহিনী দুজনেই অনেকদিন হল বিধবা হয়েছে। তাই তাদের বৈধব্য যন্ত্রণা সহ্য করা অভ্যেসে দাঁড়িয়েছে। তারা মনে করে স্বামী যেমনই হোক এয়োস্ত্রী হয়ে মাছভাত খেয়ে বেঁচে থাকলেও জীবনে অনেক সুখী হওয়া যায়। একাদশীর দহন ও বৈধব্যজ্বালায় সারাজীবন দহন হওয়ার চেয়ে স্বামীর লাথি ব্যাটা খেয়ে বেঁচে থাকাও অনেক সুখকর,—“রাঁড় হওয়ার চেয়ে কি যন্ত্রণা আর আছে? আমরা অনেক দিন রাঁড় হোয়েচি—দুঃখু সওয়া আমাদের অভ্যেস হোয়ে গেছে; দুঃখে আর আমাদের দুঃখু বোধ হয় না; কিন্তু তবু একাদশীর দিন মনে করে দ্যাখো দিকি, কেমন পেডার হয়! আহা!

আমার মাস্তুতো বোনটি আর বছর ফাল্গুন মাসে রাঁড় হোয়েছে। যেই সে রাঁড় হোলো, অমনি তার শ্বশুরও তাকে সেখান থেকে তাড়িয়ে দিলে। বাপের বাড়িতে রাঁড় মেয়ের যত সুখ তাতে জানো, এক ব্যালা দুটো ভাত, তাতেও বাপ মায় কত মুখ ঝাঁটকান দেন! আহা ভাই! আমার সে কথা হলো বুক ফেটে যায়! সেই ছেলেমানুষ সবে বার বছরে পোড়েছিল, তখন কি তার একাদশী করবার সময়! (দীঘনিশ্বাস) আহা একাদশীর দিন হলো ছট পট কোল্লে কি হবে! ফের অমন করবি তো ঝাঁটা মেরে তাড়িয়ে দেবো, শ্বশুরবাড়ি গিয়ে দাস্যবিত্তি করো খাবি!...কতক দিন আমি তাদের বাড়িতে ছিলাম, একাদশীর দিন হোলো সর্বদা তাকে তেল মাখাতেম, আর তার মাথায় জল ঢালতেম। কিন্তু তাই, যার অন্তরে আগুন জ্বোল্চে, তার বাইরে জল ঢাল্লে কি হবে?... তাই আমি বোল্চি, রাঁড় হওয়ার চেয়ে যন্ত্রণা আর নেই।^{১৮১} অর্থাৎ বোঝা যায়, সেকালে অর্থনৈতিক নিরাপত্তাহীন অসহায় মহিলারা দুবেলা দুমুঠো ভালোমন্দ খেয়ে পরে বেঁচে থাকার জন্য স্বামী সঙ্গকে কাঙ্ক্ষিত মনে করেছেন।

১৮৬৮ সালে প্রকাশিত হয় বিপিনমোহন সেনগুপ্তের ‘হিন্দু মহিলা নাটক’। এ নাটকে দেখা যায়, নটবর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সপ্তমবর্ষীয়া কন্যা মনোরমার বিবাহ উপলক্ষে বিধবা গোলাপীর প্রস্তাব,—“হ্যাঁগা মনোরমার বিয়ে, মনোরমার বয়েস কি, যে বিয়ে দেবে।”^{১৮২} বিধবা গোলাপীর মন বাল্যবিবাহের বিপক্ষে। কিন্তু গোলাপীর বিধবা বোন সুমতি সাত বছরের মেয়ের বিয়েতে আশ্চর্য নয়। সে অনায়াসে বলে, তিন চার বছর বয়সের মেয়েদের ও বিবাহ খুব একটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। সাত বছরের মেয়ের বিয়ে দিয়ে নটবর বন্দ্যোপাধ্যায় তিনশ টাকা পণ নেবে। কারণ বিধবা গোলাপীর বিবাহের পরিবর্তে কুপারাম আড়াইশ টাকা পণ নিয়েছিল।

বিধবা সুমতি মেয়েদের লেখাপড়া শেখাকে একেবারে মেনে নিতে পারেনি। অন্যদিকে সুমতির বোন বিধবা গোলাপী পড়াশুনা করতে চেয়েছিল। কিন্তু অকালে বিধবা হওয়াকে গোলাপীর মা কমল মনে করেন বিদ্যাশিক্ষাই এই অকাল বৈধব্যের মূল কারণ। কমল বলেছে,—“ছিরকাল জানি মেয়ে মানুষ লেখাপড়া শিক্লে বিদবা হয়ে থাকে, আমার গোলাপ ছেলেবেলা থেকে পুখী পাঁচালী পড়তে শিকেচে বলে কতই মনে মনে অসন্তুষ্ট হই, বলি পোড়া লেখাপড়া শেখার জন্যেই বুঝি তার অদেষ্ট এমন হলো।”^{১৮৩} অর্থাৎ উনিশ শতকের সমাজের অন্দরমহলে বদ্ধমূল ধারণা যে, পড়াশুনাই বিধবা বিবাহের কারণ। আর তাই জগৎমোহিনীর বক্তব্য মেয়েমানুষ লেখাপড়া শিখে কি করবে। কোন দরকার ছাড়া লেখাপড়ায় মেয়ে মানুষের কোন কাজ নেই।

একাদশীর মতো কঠিন ব্রত পালনের মতো নিজ জীবনের প্রতি বিধবা গোলাপীর ঘৃণা

ধরে যায়। গোলাপী মনে মনে ভাবে,—“(স্বগত) হয় কবে আমি কামিনীর মত গৃহের বাহির হইয়া মনোমত প্রাণবল্লভের হস্তে প্রাণ সমর্পণ করিয়া সুখে কালযাপন করিব। কামিনী বাড়ীতে থাকিয়া যেমন কষ্টে দিন যামিনী অতিবাহন করেছিল, কলিকাতায় অবস্থিতি করিয়া সে তেমনি সুখ সন্তোষের মুখাবলোকন করিতেছে। হা বিধবা দশা! কবে তোরে আমি বিসর্জন দিয়া প্রকৃত প্রস্তাবে সুখী? একাদশি, তুই যত পারিস্ অদ্য মাত্র কষ্ট দে যদি বিধাতা অনুকূল হন, তবে অচিরাৎ তোর হস্তে মুক্তে, মনের সাথে কালযাপন করিব।”^{৮৪}

গোলাপী মনে মনে স্থির করে নেয় যে, বিধবাদশার নির্মম পরিহাস থেকে মুক্ত হয়ে সে কামিনীর মত বেশ্যাবৃত্তি গ্রহণ করবে। গোলাপীর কাছে সারাজীবন আড়ম্বরহীন, দুঃখ কষ্টের জীবনযাপন করবার চেয়ে বেশ্যাবৃত্তি গ্রহণ করা শ্রেয়। কিন্তু বিধবা সুমতির বৈধব্যজীবন নিয়ে নিয়মনিষ্ঠা পালনে কোন আক্ষেপ নেই। সে তার বোন গোলাপীর মতো ভাবতে পারে না। কিন্তু একাদশীর কঠিন ব্রতে তার জীবন ওষ্ঠাগত,—“...কাল একাদশী গিয়েছে, তা যে তাত পড়েছে, কাল রেতে ভাবলেম্, বুঝি আর থাকতে পারিনে, এমনি জল তেষ্ঠা; পোড়া দশা বিদবা দশা, কত করে থাকলেম্;...।”^{৮৫} সুমতির জলতেষ্ঠাও মেটে না একাদশীর নিয়মে। উনিশ শতকের বিধবা নারীদের একাদশী পালন এতটাই কঠিন যে, একাদশীর দিনে প্রাণবায়ু নিঃশেষ হয়ে গেলেও একফোঁটা জল খাওয়া যাবে না। নাট্যকার সুমতি ও গোলাপী— দুই বিধবার দুরকম মানসিকতা প্রকাশের মধ্য দিয়ে বৈধব্য সংকটের এক করুণ চিত্রকে উপস্থাপিত করেছেন।

১৮৭১ সালে প্রকাশিত হয় ‘সাক্ষাৎ-দর্পণ’ নাটক। ‘সাক্ষাৎ-দর্পণ’ নাটকে বিধবা চরিত্র হিসাবে নাট্যকার তুলে এনেছেন, রামনারায়ণ ভট্টাচার্যের কন্যা বামাসুন্দরীকে। এ নাটকের তৃতীয় অঙ্কে বিধবা বামাসুন্দরীর বৈধব্য জীবনের পরিচয় দিয়েছেন নাট্যকার। বামাসুন্দরীর অপূর্ণ জীবনে বারে বারে মৃত স্বামীর স্মৃতি ঘুরে ফিরে এসেছে। বিধবা হবার পর, বাপের বাড়িতে চলে আসে বামাসুন্দরী। স্বামীর কথা মনে পড়লে যন্ত্রণায় তার বুক ফেটে যায়। মনের কথা বলবার বা শোনার কেউ নেই তার। উনিশ শতকের যুগ পরিবেশে বিবাহের পর একজন নারীর কাছে স্বামীই সব। যখন সেই স্বামীকেই কোন নারীর অকালে হারাতে হয় তখন সেই নারীর জীবনে নেমে আসে বিপর্যয়। বামাসুন্দরীর স্বীকারোক্তিতেই উঠে আসে তাঁর বৈধব্য সংকট ও যন্ত্রণার ছবি,—“আমাদের যে কত কষ্ট সে ভগবানই জানেন। আমাদের দুঃখু দেখেও কেউ দেখে না, গুনেও কেউ শোনে না। আগে আমাদের সকলে কত যত্ন করত, স্নেহ মমতা করত, এখন আমাদের দাসীর মত ব্যবহার করে।”^{৮৬}

বিধবা নারীর শ্বশুর বাড়িতে ঠাই হয় না। বাধ্য হয়ে আশ্রয় নিতে হয় বাপের বাড়িতে। কিন্তু বাপের বাড়িতে আসবার পর জোটে অবজ্ঞা, লাঞ্ছনা ও মাত্রাতিরিক্ত পরিশ্রম। স্বামীর ছায়ায় বেঁচে থাকা রমণীর জীবন স্বর্গসুখে ভাসে। শ্বশুরবাড়ি অথবা বাপের বাড়িতেও সেই সধবা রমণীর কদর থাকে। কিন্তু বিধবা হবার পর আশ্রয়হীন হয়ে সেই রমণীর পুনরায় বাপের বাড়ির দ্বারস্থ হতে হয়। সেখানে জোটে অবহেলা, অবমাননা এবং লাঞ্ছনা। খাওয়া-দাওয়া, সাজ-পোষাক সবকিছু বর্জন করার পরেও বিধবা রমণীরা পায় লাঞ্ছনা, গঞ্জনা ও অপমান। বিধবা বামাসুন্দরী বিধবা নারীর দুদর্শাচিত্রকে নাট্যকার বর্ণনা করেছেন এইভাবে,—“যার সোয়ামী নেই তার কে আছে বল দিকি? কোথায় গেলেই বা সে সুখ পায়? মা, বাপ, ভাই বোন কেউ কারো নয়। যার সোয়ামী নেই তার কেউ নেই। যদি কেউ একটা অপমানের কথা বলে, তাহলে অমনি মনে হয় আমার সোয়ামী নেই বোলে তাই আমাকে সকলে তাচ্ছলি করচে। কিন্তু সোয়ামী থাকলে কেউ কত্তে পারত না।”^{১৭} বৈধব্য জ্বালা, জৈবিক তাড়না অসহ্যকর। একাদশীর ফাঁদে অসহায় বিধবা নারীদের জীবন প্রতিমুহূর্তে ছটফট করে। আড়ম্বরহীন সাদা থানে যৌবনের জ্বালা লুকানোর চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে বিধবা রমণীদের কুলত্যাগী হতে হয়। দ্রুণহত্যার মত মারাত্মক অপরাধে সামিল হতে হয় তাদের।

গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের ‘বিধবার দাঁতে মিশি’ নাটকে সৌদামিনী নামক এক বিধবাকে কেন্দ্র করে কাহিনী আবর্তিত হয়েছে। প্রভূত বিষয় সম্পত্তির অধিকারী বিধবা সৌদামিনীর কাছে অর্থই সংকটের মূল কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। লম্পট মদ্যপ গোরাচাঁদ বিধবা সৌদামিনীকে ছলে বলে করায়ত্ত করতে চেয়েছে। মাতাল চরিত্রহীন গোরাচাঁদের লোভী দৃষ্টিভঙ্গি অশ্লীলতার মাত্রা অতিক্রম করে,—“এখন বাকী কেবল সৌদামিনী। আঃ—ছুঁড়ীর নাম কোল্লেই মুখ দে নাল পড়ে। ছুঁড়ীর কি রূপ! কি ভঙ্গিমা! কি নয়ন! কি বচন! আঃ লেডী মেরি আপ! উরুতে করাঘাত! কিন্তু, ছুঁড়ী বড় নাছোড়বান্দা। কতকগুলো ইংরিজি, বাঙ্গালা বৈ পড়ে, ছুঁড়ী বড় চালাক হয়েছে। এই কমাস ধোরে আমার বুদ্ধির হাড়িকাটে ফেলবার জন্য এত চেষ্টা কচ্চি, ছুঁড়ী কিছুতেই ঘাড় নোয়াতে চায় না। এত পত্র লিখচি—এত সাধ্য সাধনা কচ্চি—কিছুতেই বশে আসচেনা। [মদ্যপান] ছুঁড়ী এমনি ছেনাল যে, কথাই কয় না। রূপের গৌরকেই হক—আর বিদ্যের গৌরকেই হোক—হিমালয়ের মত উঁচু হয়ে আছেই আছে। এক একবার ছুঁড়ীর ব্যাভার দেখে, রেগে মেগে উঠি, কিন্তু যাই তার মনোমোহিনী মূর্তীটা হৃদয়ে উদয় হয়, আর অমনি জল—মদ আর মেয়েমানুষের কি মাহাত্ম্য!...ভীম যেমন দুঃশাসনের রক্তপান কোর্ভে প্রতীজ্ঞা কোরে, শেষে যে

প্রতীজ্ঞা কোরে, শেষে যে প্রতীজ্ঞা সফল কোরেছিলেন, আমিও তেমনি প্রতীজ্ঞা কোচ্ছি যে, সৌদামিনীর যৌবনকমলের মধুপান কোব্বই কোব্বই।”^{৮৮}

সুন্দরী ও উচ্চবংশজাত সৌদামিনী বাল্য জীবনে সুখী ছিল। বিবাহিত জীবনও ছিল সুখকর। কিন্তু সে সর্বগুণাশ্রিত পতিরত্ন পেয়েও হারিয়েছে। দীর্ঘদিন স্বামী না থাকার কারণে সমাজ তাকে বৈধব্য জীবনাচরণ করতে বাধ্য করেছে। তাই সৌদামিনী নিজেকে পাপী মনে করেছে। ক্ষণে ক্ষণে সৌদামিনী নিজের মৃত্যু কামনা করেছে। রুচিশীল ও শিক্ষিতা হবার সুবাদে আত্মহত্যার পথ সে বেছে নিতে পারেনি। প্রতিটি ক্ষণে দুঃখ তাকে হাতছানি দিয়েছে। গোরাচাঁদের নোংরা প্রস্তাব সৌদামিনীর কাছে কণ্টকের মত বিঁধেছে। আত্মসম্মত বাঁচাতে সে গৃহত্যাগের সংকল্প গ্রহণ করেছে। সৌদামিনী বাপের বাড়ী যাওয়ার সাহস পায়নি, লোকনিন্দার ভয়ে। ফলে সে কাশীতে মাতুলালয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। লোলুপ গোরাচাঁদের অভব্য ব্যবহার সৌদামিনীকে সহ্য করতে হয়,—“দেখি শালী! তোর মুখখানা কেমন দেখি।”^{৮৯} অদৃষ্টের কৃপায় সৌদামিনী রক্ষা পেয়েছে। হারানো স্বামীকে ফিরে পাওয়ায় তার বৈধব্য সংকট হতে মুক্তি ঘটেছে।

উনিশ শতকের সমকালে সম্পত্তি ও সম্ভোগের লোভে অনেকেই নিজ পত্নীকে অবহেলা করে বিধবা বিবাহে রাজী হয়েছিলেন। এই নাটকে সৌদামিনী তাঁর বৈধব্য জীবনের গ্লানি সম্পর্কে জানিয়েছে,—“বিধির বিধানে আমি বিধবা—নবীন জীবনে বিধবা—পাপিনী—অভাগিনী। আমার এ পাপজীবন ধারণে কি প্রয়োজন? ধরাধামে আমার আর কি সুখ আছে? আমি অনাথিনী-বঙ্গ রমণী - বঙ্গ রমণীর এক পতির চরণ কমলই সম্বল, পতিই সুখদাতা - পতিই গতি-পতিই সর্বস্ব ধন। সেই হৃদয়-রাজ -জীবন-রাজ পতি বিহনে আমার আর জীবন ধারণে কি প্রয়োজন?-কি সুখ?”^{৯০} বস্তুত বৈধব্যকে নারীরা বিধির বিধান হিসাবে যেমন মেনে নিয়েছেন, তেমনি সংস্কার বশত ‘এক পতির চরণই সম্বল’ করে গ্লানিময় জীবনকে সহ্য করে গিয়েছেন।

সধবা রমণীর আদর, সামাজিক স্বীকৃতি সম্মান প্রাপ্য তৎকালীন উনিশ শতকীয় সমাজ ব্যবস্থায়। বিপরীতে, একজন বিধবা রমণী সমাজ দ্বারা অবহেলিত বঞ্চিত স্বশ্রুতবাড়ি থেকে পরিত্যক্ত। পরপুরুষ দ্বারা প্রলোভিত হওয়া বিধবা রমণীদের নিয়তি। জৈবিক চাহিদার কাছে হার মেনে বিধবা রমণীদের ভাগ্যে জুটতো ব্যভিচারিণীর তক্মা। তাদেরকে ভোগ করাই ছিল একশ্রেণীর পুরুষের উদ্দেশ্য। বেরঙিন জীবনে বিধবাদের উপরি পাওনা ছিল অপুষ্টি। আলোচালের ভাত ও একাদশীর মাহাত্ম্যে তাদের জীবনের পরিণতি কষ্টকর। অন্যদিকে সুযোগ পেলে সমাজ রক্ষক শিক্ষিত পুরুষেরাও বিধবা রমণীদের ব্যবহার করতে ছাড়েনি। বহুক্ষেত্রে, যুবতী বিধবাদের

যৌবনের তাড়না তাদের গর্ভবতী করে তুলেছে। যার ফলে দ্রুতহত্যা অথবা বাড়ী ছেড়ে পালাবার মত অসামাজিক কাজকর্মে লিপ্ত হতে হয়েছে।

১৮৭৪ সালে প্রকাশিত হয় উপেন্দ্রনাথ দাসের ‘শরৎ সরোজিনী’ নাটক। স্বদেশপ্রেমী সৎ আদর্শবান দয়ালু জমিদার শরৎকুমার দত্ত ও তাঁর বাড়িতে পালিত কন্যা সরোজিনীর কাহিনী অবলম্বনে ‘শরৎ সরোজিনী’ নাটকটি রচিত। ‘শরৎ-সরোজিনী’ নাটকের বিধবা চরিত্র ভুবনমোহিনী। মতিলালের বিধবা ভাতৃবধূ ভুবনমোহিনী সুন্দরী যৌবনবতী। ভুবনমোহিনীর স্বামী থাকাকালীন সময় থেকেই মতিলাল তাঁকে উত্থাপিত করতেন। কিন্তু কোনোভাবেই ভুবনমোহিনীকে বাগে আনতে পারেননি মতিলাল। যার ফলে, লম্পট মতিলাল তার লাঠিয়ালকে দিয়ে ভুবনমোহিনীর স্বামী তথা নিজের ভ্রাতাকে খুন করায়। মতিলাল তার মৃত ভ্রাতার সমস্ত সম্পত্তি জাল করে নিজের করে নেয়। বিধবা নিঃস্ব ভুবনমোহিনীর মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে। নিজেকে রক্ষা করতে চেয়েও নিরুপায় ভুবনমোহিনী মতিলালের চক্রান্তে ধরা দিতে বাধ্য হয়, —“কিছুদিন যায়, আমি একদিন একাদশী করে শুয়ে আছি, এমন সময়ে হঠাৎ আমার ঘরে গিয়ে উপস্থিত। আমার দাসী টাসীদের টাকা দিয়ে বশ করেছিল, অনেক ডাকাডাকিতেও কারও সাড়া পেলেম না। একে আমি মেয়েমানুষ, তাতে সেদিন উপবাস করে শরীর কাহিল হয়ে পড়েছে, আমার—(ক্রোধে অধৈর্য্য হইয়া কম্পন)। গলায় দড়ী দিতে গেলেম, দিতে দিলে না—হাত পা বেঁধে রাখলে। মনে কল্লেম, না খেয়ে মরব—তাও হয়ে উঠল না, খাবার সময় চামচ জোর করে দুধ খাইয়ে দিতে লাগল। কিছু বললে, হেঁসে উড়িয়ে দিত। কেবল বলত “সুন্দরি, তোমাকে বড় ভালবাসি। এই রকম দিন পনের গেল। তখন “ভাবলেম, মিছে আর কেন নিজে মরবার চেষ্টা করি, ধর্ম্ম ত নষ্ট হয়েইছে। স্ত্রীলোকের সতীত্ব কাঁচের মত, একবার ভাঙ্গলে আর যোড়া দেওয়া যায় না।”^{১১}

বিধবা ভুবনমোহিনীর অসহায়তার সুযোগ নিয়ে জমিদার মতিলাল তাঁর বিকৃত কামনা বাসনা চরিতার্থ করেছে। কিন্তু সমাজে ভুবনমোহিনীকে অসতী রূপে পরিচিত হয়। অসতীর তকমা নিয়ে একটি অসহায় বিধবা নারীর বাকী জীবনটা কাটানো চরম বেদনাদায়ক। উনিশ শতকের সমাজ ব্যবস্থায়, বিধবা নারীদের জীবনের সংকট বহু। ভুবনমোহিনীর সংকটাপন্ন জীবনে স্বামীর প্রয়োজনীয়তা প্রবল। কারণ একজন নারীর স্বামী বেঁচে থাকাকালীন সামাজিক লালসা তাকে সহজে গ্রাস করতে পারে না। বিধবা ভুবনমোহিনী জানিয়েছে,—“স্বামী বেঁচে থাকতে স্ত্রীলোক প্রায় কুপথে যায় না, বিশেষ তিনি আমাকে বড় ভালবাসতেন।”^{১২} কিন্তু বিধবাবস্থায়

একটি নারীর পক্ষে সতীত্ব রক্ষা করা কঠিন। একাদশীর মারণ নিয়ম, যৌবনজ্বালা, পুরুষ সঙ্গ, বাহ্যিক লোভ-লালসা একটি বিধবা নারীর সতীত্ব হরণে যথেষ্ট ভূমিকা পালন করে,—সে সংকট কথাই নাট্যকার বলতে চেয়েছেন।

সমাজের চোখে ভুবনমোহিনী অসতী। ভুবনমোহিনী তাঁর অবস্থান সম্পর্কে জানিয়েছে,—“আমি অসতী বলে আমাকে সকলেই ঘৃণা করে।”^{৯৩} মতিলালের লোলুপ দৃষ্টিতে ভুবনমোহিনী অসতী হয়। কিন্তু সমাজের চোখে মতিলাল নির্দোষ, ভুবনমোহিনী দোষী। বিনয়ের কথায় সমাজের এই দৃষ্টিভঙ্গি ধরা পড়ে। বিনয় জানিয়েছে,—“লোকের কাছে মুখ দেখায় কেমন করে? মতিলালবাবু সম্পর্কে দেবর, তারই—। যাবকি?”^{৯৪} বিনয় ভুবনমোহিনীর কাছে যেতেও ঘৃণা বোধ করে। সমাজ ভুবনমোহিনীকে মতিলালের ‘রক্ষিতা’ বলে আখ্যা দিয়েছেন। শরৎকুমারের কথায়,—“আমি একদিন জিজ্ঞাসা করলেম, “তুমি ঐ বেশ্যাটার কাছে রোজ রোজ যাও কেন?”^{৯৫} অসহায় বিধবা ভুবনমোহিনী লোকসমাজে বেশ্যায় পরিণত হয়। ফলে ভুবনমোহিনীর সঙ্গে যারা দেখা করতে যায় তারাও অসতী ও ভ্রষ্টা রূপেই আখ্যা পায়। বাপের বাড়ি ও শ্বশুরবাড়ি কোথাও তার ঠাঁই হয়নি। কিন্তু ভুবনমোহিনী নিজেকে বাঁচিয়ে রাখে। বিকৃতমনস্ক লম্পট মতিলালের মত মানুষেরা বিধবা নারীদের ভোগের সামগ্রী হিসাবে দেখে। বিধবা নারীদের হস্তগত করে, ফুসলিয়ে ভ্রষ্ট করার মধ্য দিয়ে আনন্দ লাভ করে। বিধবা ভুবনমোহিনী, মতিলালের সর্বনাশের পথ খোঁজে। ভুবনমোহিনী কিরীচ দিয়ে আঘাত করে হত্যা করে প্রতিশোধ নেয়। শেষে নিজেও কিরীচ দিয়ে নিজ বুকে আঘাত করে মৃত্যুশয্যায় শায়িত হয়।

সমাজ প্রতিকূলতা বিধবা নারীকে বিপথে-কুপথে চালিত করে। কেউ বা স্বেচ্ছায় পদস্থলিত হয়, আবার কেউ বা পরিস্থিতির চাপে বাধ্য হয় কুপথে পা বাড়ায়। কারুর কাছে একাদশীর ব্রতপালন মৃত্যু স্বরূপ। কেউ যৌবন তাড়নায়, ভ্রণহত্যার মত পাপকাজে নিজেকে নিয়োজিত করে। বেশ্যাবৃত্তিকে গ্রহণ করার মধ্য দিয়ে কেউ বা দৈহিক চাহিদার নিরসন ঘটায়। আবার কেউ বা পরিস্থিতির চাপে বেশ্যাবৃত্তি গ্রহণ করে নিজের কাছে নিজে ক্রমাগত ছোট হয়ে যায়। বস্তুত উনিশ শতকের সমাজ ব্যবস্থায় বিধবা রমণীদের পরিণতি ভয়াবহ। ভুবনমোহিনীর মত বহু নারীর অসহায়তার সুযোগ নিয়ে লোভী মানুষেরা নিজ যৌনতৃষ্ণা নিবৃত্ত করলেও সমাজ সেই অসহায় বিধবা নারীকে ত্যাগ্য করে, কুলটা আখ্যা দেয়। নাট্যকার উপেন্দ্রনাথ দাস তাঁর ‘শরৎ সরোজিনী’ নাটকে ভুবনমোহিনী চরিত্র সৃষ্টির মধ্য দিয়ে বিধবা নারীর সংকটকে তুলে ধরেছেন।

১৮৭৬ সালে প্রকাশিত হয় জনৈক ভদ্রমহিলা প্রণীত ‘সন্তাপিনী নাটক’। ‘সন্তাপিনী নাটক’ বিধবা বিবাহের পক্ষে রচিত। পুনর্বিবাহিতা নারীর সামাজিক স্বীকৃতি এবং তাঁদের সন্তান ধারণের ছবিকে বাঙময় করে তুলেছেন নাট্যকার। এ নাটকের মূল কাহিনী আবর্তিত হয়েছে জমিদার পুত্র নবকুমার ও সিদ্ধুবালার (সন্তাপিনী) বিবাহ, বিচ্ছেদ ও সিদ্ধুবালা কর্তৃক নবকুমারের নৈতিক উপদেশ প্রদান প্রভৃতি বর্ণনার মধ্য দিয়ে। এ নাটকের দ্বিতীয় আখ্যানে বর্ণিত হয়েছে বাল বিধবা কমলিনীর বিধবা বিবাহ উত্তর জীবনের সংকট চিত্র। এই অংশে দেখা যায় বিশ্বেশ্বর তাঁর প্রথমা পত্নী বিরাজমোহিনীর অত্যাচার হতে মুক্ত হবার জন্য পাটনা হতে পত্নীর আত্মীয়্যর এক বালবিধবা কমলিনীকে বিয়ে করে ঘরে আনেন (নাটক রচয়িতার মতে আঁতুড় ঘরের বিধবা)। ধনী পিতার কন্যা কমলিনী শৈশবে বিধবা হলেও বাল্যকাল হতে বাবা-মায়ের যত্নে লালিত পালিত হয়েছে। একাদশীর নির্মমতা কিংবা অর্থকষ্টের নিদারুণ দারিদ্রে তাঁর জীবন পীড়িত হয়নি। বিধবা কমলিনী শিক্ষিতা। কমলিনীর শিক্ষাগত যোগ্যতা বিশ্বেশ্বরকে আকর্ষণ করেছে। বিশ্বেশ্বর কমলিনীর বিয়ে হিন্দু বা ব্রাহ্ম কোন মতেই হয়নি। তাদের বিয়ে হয়েছে গান্ধর্ব মতে। পাটনা থেকে বিধবা কমলিনীকে বিবাহ করে এনে তাকে পাটরাণী করে তুলেছেন বিশ্বেশ্বর। কমলিনী স্বামীর প্রিয়। রূপে গুণে, বিদ্যায় সতীত্বে, পবিত্রতায়, ভক্তিতে সে সকলের মন জয় করে নিয়েছে। নাট্যকার বিধবা বিবাহের সুফল দেখিয়েছেন, কমলিনী ও বিশ্বেশ্বরের কথোপকথনের মধ্য দিয়ে। গান্ধর্ব মতে বিবাহিতা বিধবা কমলিনী দ্বিতীয় স্বামীর ঔরসে গর্ভধারণ করেছে। বিধবা বিবাহ করার কারণে বিশ্বেশ্বরকে সমাজের কাছে বন্ধু-বান্ধবের কাছে নিগ্রহ সহ্য করতে হয়েছে। পুনর্ভূ কমলিনী স্বামীর গরবে গরবিনী হয়েছেন। যদিও কমলিনীকে শুনতে হয়েছে নানান কটুকথা,—‘পতিহীনা নারী দ্বিচারিণী’। মেয়েমহলে শুনতে হয়েছে নানান কানাকানি। বিশ্বেশ্বরের প্রথম পত্নী বারবার চক্রান্ত করেছে বিশ্বেশ্বরের সতীন কমলিনীর বিরুদ্ধে। কারণ স্বামীর সব স্নেহ ভালোবাসা দ্বিতীয় স্ত্রীর পতি। এ সহ্য হয়নি প্রথম পত্নী বিরাজমোহিনীর। সে বারবার চক্রান্ত করেছে কমলিনীকে স্বামীর কাছে চক্ষুশূল করে তুলতে। বিরাজমোহিনী প্রবল আক্ষেপে জানিয়েছে,—“কি করব ভাতার বেশ্যা রেখেছে তার পায় না ধল্যে জন্মই বৃথা।”^{৯৬}

এরপর দেখা যায়, বিশ্বেশ্বরের প্রথম স্ত্রীর প্ররোচনায় কমলিনী গৃহত্যাগ করেছে। কমলিনী গৃহত্যাগ করলে অন্তঃপুরে মেয়েমহলে বলতে শোনা গেছে,—“...একজনের সঙ্গে নষ্ট হয়েছে, তা আর একজনের সঙ্গে হতে পারে না?...ব্রাহ্মণের ঘরের বিধবা তার আবার এত সুখ কেন?... রাঁড় মানুষ আর ময়লা ফ্যালা গাড়ী সমান...”^{৯৭} প্রথম স্ত্রীর প্ররোচনায় বিশ্বেশ্বর দ্বিতীয় স্ত্রীকে

সন্দেহ করেছেন এবং ‘কুলটা’ বলতে দ্বিধা করেননি। বিশ্বেশ্বর জানিয়েছে,—“(স্বগতঃ) উঃ মনের ভিতর যেন পুড়ে যাচ্ছে, মায়াবিনী দ্বিচারিনী রূপট প্রণয় কেমন করে শিখেছিল, কি ভয়ঙ্করী নারী! (প্রকাশ্যে) ‘নববাবু, পাপিয়সী কুলকলঙ্কিনী কালামুখীর জন্যে লোকালয় ছেড়ে গলায় দড়ি দিতে ইচ্ছা কচ্ছে।’”^{৯৮} সমকালে বিধবা বিবাহের পর পরিবারে নানা সংকট উপস্থিত হত— সেই করুণ ছবিই নাট্যকার তুলে ধরেছেন এই অংশে।

পুরুষমহলে তৈরি হয়েছে নানা কৌতূহল। প্রলোভনের জাল বিস্তার হয়েছে বহুধায়। মেয়ে মহলে বলতে শোনা গেছে, ‘মিটমিটে ডান’, ‘ছেলে খাবার রান্ধস’ প্রভৃতি অপবাদ। মণিমোহনের স্ত্রী জয়াবতীকে বলেছেন,—“...একটা আঁতুড়ে রাঁড়ীকে স্ত্রী বলে পরিচয় দেওয়া, সেটা কি ভাল? সে যে লেখাপড়া জানে, পুরুষের চোদ্দপুরুষ,...লজ্জা ঘৃণা কি, ভয়ই বাকি!”^{৯৯} উনিশ শতকে সমাজ অন্তঃপুরে চালু ছিল মেয়েদের বিদ্যাশিক্ষা দিলে, সে মেয়ে অকালে বিধবা হয়, কুলটা হয়, কুপথে বাড়ায়। সেই প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়েছে এই অংশে। সামাজিক অসাম্য পুরুষের তৈরি। পুরুষ নিষ্ঠুর খল চতুর। পুরুষ জাতির প্রতি বিদ্ৰোহ বিদ্বেষ জানিয়ে সিন্ধুবালা (সন্তাপিনী) জানিয়েছে,—

“যদি কুলনারী হয় লজ্জাবতী।

অমনি পুরুষ বলে জানি, বড় সতী।।

যদি নারী মুখ তুলে কথা নাহি কয়।

বলে, অহঙ্কারী নারী জেনেছি নিশ্চয়।।

যদি ভাল কথা কয় না জানে মঞ্জাল।

বলে বেশ্যা ও কামিনী, বড়ই বাচাল।।”^{১০০}

সিন্ধুবালার মধ্যস্থতায় বিশ্বেশ্বর নিজের ভুল বুঝতে পারেন এবং কমলিনীকে সাদরে গ্রহণ করেন।

এই নাটকের কাহিনীতে দুজন পুরুষ চরিত্র প্রাধান্য লক্ষ করা যায়—নবকুমার ও বিশ্বেশ্বর। দুজনেই প্রথম স্ত্রীকে ত্যাগ করে দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ করেছেন। নবকুমার পিতার ক্রোধের কথা ভেবে সিন্ধুবালাকে ধাক্কা দিয়ে সমুদ্রের জলে ঠেলে ফেলে দিয়েছে। হিন্দু সমাজে নারীর পতি বিনা গতি নেই তাই সিন্ধুবালা ফিরে এসেছে পুনরায় স্বামীর কাছে। স্বামীই তার আরাধ্য। স্বামীর দ্বিতীয় বিবাহ তার কাছে ‘বিবাহ অসহ্য’। তাই সে আবার ঘর ছেড়েছে। অন্যদিকে বিশ্বেশ্বরের প্রথম স্ত্রী তার ভাগ্যকে মেনে নিতে পারেনি। একটি বিধবা মেয়েকে বিয়ে করে স্বামীর ঘরে আনাকে সে মেনে নিতে পারেনি। সতীন নিয়ে ঘর করতে সে রাজী হয়নি। তাই সে মনস্তাত্ত্বিক

ভাবে হিংস্র হয়ে উঠেছে। সিন্ধুবালা দ্বিতীয় অঙ্কে জানিয়েছে,—

“বিবাহ বিষের বাতি নারীর কারণ।

পুরুষের নিকটেতে অধিক যতন।”^{১০১}

স্বামীহীনা নারী পরিবারে সমাজে অযত্নই পেয়ে থাকে। স্বামী থাকলেই নারীর যত্ন ও সুখ বিরাজমান থাকে। বস্তুত এ নাটকে বিধবা কমলিনীর সংকট ও দুর্দশার কারণ হিসাবে তাঁর স্বামীর চরিত্রের দৃঢ়তার অভাবকে দায়ী করেছেন নাট্যকার।

১৮৭৭ সালের জুলাই মাসে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘এমন কর্ম আর করব না’ নাটকটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। পরে ১৯১০ সালে এ নাটক নাম বদলে ‘অলীকবাবু’ নামে প্রকাশিত হয়। এ নাটকের আলোচনায় আমরা দেখেছি মিথ্যুক ভণ্ড অলীকবাবু অভিজাত ঘরের কন্যা হেমাস্থিনীকে বিয়ে করার জন্য মিথ্যার জাল বয়ন করে এবং বিবাহের যোগাযোগের জন্য এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি মোসাহেব গদাধরকে কাজে লাগায়। অন্যদিকে অলীকবাবুর যাতে বিবাহ হয় তার জন্য সাহায্য করেছে হেমাস্থিনীর দাসী প্রসন্ন। প্রসন্ন বিধবা। দাসী প্রসন্নকে গদাধর বিবাহ করতে চায়। কারণ ধূর্ত গদাধরের বিধবা বিবাহের অন্যতম উদ্দেশ্য হল, প্রসন্নের টাকা ও বিধবা বিবাহের জন্য প্রদত্ত অর্থ হস্তগত করা।

‘অলীকবাবু’ নাটকে বিধবার পুনর্বিবাহের প্রসঙ্গ এসেছে হেমাস্থিনীর বিধবা দাসী প্রসন্নের অনুষঙ্গে। জগদীশ মুখোপাধ্যায়ের মোসাহেব গদাধর প্রসন্নকে ভালোবাসার কথা বলে, তাকে বিবাহের কথা বলে। প্রসন্ন গদাধরের সঙ্গে প্রেমের রসিকতায় নিজেকে আড়াল করে। বিধবা প্রসন্ন পুনর্বাহ বিবাহ করবার কথা ভাবতেই পারে না। অশিক্ষিত বিধবা রমণীদের ‘বিধবা বিবাহ’ অকল্পনীয়। প্রসন্ন জানে বিধবা হওয়ার পর, অবৈধ প্রণয় করা গেলেও পুনর্বাহ বিবাহ করা পাপ। পুনর্বিবাহ লজ্জাদায়ক, ঘৃণ্য অপরাধ। কিন্তু গদাধর ও হেমাস্থিনীর মুখে সে ‘বিধবাবিবাহের’ আইনের কথা শুনে উৎফুল্ল হয়। দ্বিতীয়বার এয়োস্ত্রী হয়ে সুখ স্বাচ্ছন্দ্যে জীবন কাটানোর স্বপ্ন দেখতে শুরু করে প্রসন্ন। বিধবা বিবাহের আনন্দে উল্লসিত হয়ে প্রসন্ন চমৎকৃত হয়ে বলেছে,—“যে পণ্ডিত এ কথা বলেছে তার মুখে ফুল চন্দন পড়ুক।”^{১০২} গদাধরের সঙ্গে পুনর্বিবাহের কথা ভেবে প্রসন্ন নবজীবনের স্বপ্ন দেখে।

ধূর্ত ও ঠগ গদাধর প্রসন্নকে ভালোবাসে না। বিধবা প্রসন্নকে বিবাহ করলে গদাধর পাঁচ হাজার টাকা বকশিস পাবে এবং প্রসন্নের গয়না ও অর্থ হস্তগত করতে পারবে। এই উদ্দেশ্যে গদাধর প্রসন্নকে বিয়ের প্রস্তাব দেয়। প্রসন্ন স্বগত সংলাপে জানায়,—“ (স্বগত) ভাল একটা

কথা মনে পড়ল। আমাদের জগদীশ বাবু আমাকে বলেছিলেন যে যদি আমি বিধবা বে কত্তে পারি, তা হলে তিনি আমাকে পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার দেবেন। তিনি বলেন যে বিধবা বে চলতি না হলে দেশের ভাল হবে না। আর এই জন্য তিনি বিস্তর টাকা খরচ কচ্চেন। এতে দেশের ভালই হোক আর মন্দই হোক, তাতে আমার কিছু এসে যায় না—আমার কিছু লাভ হলেই হল।...মাগিকে যদি রাজি কত্তে পারি, তাহলে ওর হাজার টাকাটা গাঁড়া দেওয়া যাবে, আবার আমাদের বাবুর কাছ থেকে পাঁচ হাজার টাকা হাতানো যাবে।”^{১০০} ফলে নিজের বিয়ের আশায় ধূর্ত গদাধরের সঙ্গে ফন্দি করে। মিথ্যেবাদী অলীকবাবুর ভণ্ড কাজকর্মে সাহায্য করেছে।

উনিশ শতকের সত্তরের দশকে বিধবা বিবাহ আন্দোলন অনেকটা স্থিমিত হয়ে এসেছিল। সেই সময়কালে বিধবা বিবাহকে অবলম্বন করে এক ধরনের তথ্যকতা সমাজে চালু হয়েছিল। বিধবা রমণীকে ফুসলিয়ে কিংবা বিধবা বিবাহের নামে পয়সা রোজগারের নতুন পন্থা হিসাবে বিধবা বিবাহ সমাজ সংস্কারে নেমে পড়েছিলেন একধরনের প্রবঞ্চক, ঠক শ্রেণীর মানুষ। ১৮৭৭ সময়কালে, এই শ্রেণীর বিধবার পাণিগ্রহণকারী ঠক প্রবঞ্চক ধূর্ত মানুষকে অনাবৃত করেছেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর গদাধর চরিত্রের মধ্য দিয়ে। সেকালে গদাধরের মত বহু প্রবঞ্চক বিধবা রমণীদের বিবাহ করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন শুধু অর্থের লোভে। সমাজের ভালোমন্দ কিংবা বিধবা রমণীটির পুনর্বাহ বিবাহের যে আনন্দ, সেই বিষয়ে গদাধরের মত মানুষেরা চিন্তাশীল থাকেনি। আখের গোছানোই এদের কাজ। পুনর্বিবাহ পরবর্তী জীবনে রমণীটির জীবনযাত্রার সঙ্গী হয়ে কাটানো এদের উদ্দেশ্য নয়। ফলে বহু রমণীর পুনর্বিবাহের পর অসহায় ও অনাথ হয়ে অন্য বিপদের সম্মুখীন হয়েছিলেন। প্রসঙ্গের এই সংকটের মধ্য দিয়ে উঠে এসেছে তৎকালীন সমাজের কুটিল মানসিকতা সম্পন্ন মানুষের অবয়ব চিত্র।

১৮৮২ সালে প্রকাশিত হয় বিরজামোহন চৌধুরীর ‘বঙ্গবিধবা’ (১৮৮২) নাটক। ‘বঙ্গবিধবা’ রূপক নাটক। নাট্যকার বিরজামোহন চৌধুরী রূপকের মধ্য দিয়ে বিধবা বিবাহের যৌক্তিকতা প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন। অধর্ম, শঠতা, স্বার্থপরতা, রতিকাম, বিধাতা ও বিধবা এই কল্পিত চরিত্র সৃষ্টির মধ্য দিয়ে নাট্যকার বিধবার সংকট যন্ত্রণাকে উপস্থাপিত করেছেন।

বঙ্গবিধবা ঈশ্বরের কাছে আশ্রয়ের সুরে কৈফিয়ৎ চেয়েছেন। সে কৈফিয়তের সুরে ধরা পড়েছে বিধবা নারীর মনোকষ্টের নিদারুণ ছবি,—

“বিধবা ।। আবার আমার যে জ্ঞানপ্রদীপ প্রজ্বলিত হচ্ছে। জ্ঞান। তুমি বঙ্গের বিধবা যেন চিরদিনই উন্মাদিনী থাক।

বিধাতা।। কেন তুমি ভারতে নারীজাতির সৃষ্টি করেছ? যদি সৃষ্টিই করলে তবে কেন পুরুষের ন্যায় কঠিন হৃদয় করলে না। তোমার দোষ নাই, আমাদের কর্ম দোষ। যত মহাপাপীদিগকে ভারতে নারীজাতি করেছ, আমাদের উপযুক্ত শাস্তি দিচ্ছ নরকাগ্নিতে দগ্ধ কচ্ছ। স্বার্থপরতা। এ বঙ্গে এ ভারতে তুমিই আজ রাজা। সকলই তোমার দাস হয়ে রয়েছে। ধন্য তোমায়। ধন্য তোমার ক্ষমতার, তোমার মহিমায় কেহ পরের দুঃখ দেখতে পায় না, অনুভব কর্তে পারে না, বুঝতেও পারে না।”^{১০৬} এ নাটকে বৈধব্যের যন্ত্রণা ছাড়া অন্য কোন সংকটের ছবিকে নাট্যকার তুলে ধরেননি। রূপকের মধ্য দিয়ে বিধবা নারীর মনোকষ্টকে রূপ দিয়েছেন মাত্র। বিধবা নারীরা তাদের কর্মদোষকে বড় করে দেখেছেন আর বিধাতার কাছে আক্ষেপ করেছেন। ‘বঙ্গবিধবা’ নাটকের বিষয় বস্তব্যে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহ বিষয়ক দ্বিতীয় পুস্তকের যুক্তি শৃঙ্খলা ও বিধবাদের প্রতি সমবেদনা প্রকাশিত হয়েছে।

১৮৮৭ সালের ১৯শে নভেম্বর ‘এমারেণ্ড থিয়েটারে’ অঙ্কতনামা রচিত ‘বিধবা সঙ্কট’ নাটকটি অভিনয়ের পর ১৮৯০ সালে গ্রন্থাকারে এ নাটক প্রকাশিত হয়। এ নাটকের কাহিনী আবর্তিত হয়েছে সুশীলা নামক এক বিধবার কাহিনী দিয়ে। সুশীলা ষোল বছর বয়সে বিধবা হয়। সুশীলার স্বামী বিয়োগ ঘটলেও সে পতিব্রতা। সে তার স্বামীকে ভালোবাসে, স্বামীর সুখস্বৃতি অবলম্বন করে বাঁচতে চায় বাকি জীবন। সুশীলার দেওর রামচন্দ্র। বৌ সৌদামিনী। রামচন্দ্র বৌদি সুশীলাকে পুনর্বার বিবাহ করার জন্য অনুরোধ করেছে। কিন্তু সুশীলা অনড়। রামচন্দ্র ঘরে স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও সে বিধু নামে এক রক্ষিতা রেখেছে।

রামচন্দ্রের স্ত্রী সৌদামিনীর সঙ্গে, সৌদামিনী ও সুশীলার সঙ্গে সম্পর্ক বোনের ন্যায় সম্পর্ক। কিন্তু বিধবা ভাজ সুশীলার পুনর্বিবাহকে সমর্থন করে না সুশীলা। সুশীলার বোন ও চারুমতীর ননদ সরলাও চোদ্দ বছরের বিধবা। সরলা বৈধব্যকে মেনে নিয়ে ধর্মকর্ম মনোনিবেশ করেছে। সরলার ধারণা এ জন্মে ভালো ধর্মাচরণ করলে পরজন্মে ভালো হবে। পূর্বজন্মে পাপ করেছিল বলেই সরলা এজন্মে বিধবা হয়েছে।

অন্যদিকে গুরুদেব কালীকিঙ্করের বিধবা বৌমা শিক্ষিতা চারুমতীর ধর্মপুস্তকে আগ্রহ নেই। আর তাই বৌমা চারুমতীকে নিয়ে কালীকিঙ্করের আক্ষেপের শেষ নেই। চারুমতী বিপথগামী হয়েছে তা জানতে পেরে কালীকিঙ্কর বিধবা নারীর দুঃখজনক জীবনের করুণ দিকটি অনুভব করেছেন। আক্ষেপ করে জানিয়েছে,—“ঠাকুর! বলতে পারেন, কোন পাপের ফলে কন্যা বিধবা হয়? বিবাহিত পুত্র, পত্নী রাখিয়া অসময়ে মারা যায়? আর কোন পুণ্য ফলেই বা

পুনর্জন্মে আর এ বিধবা সঙ্কট না ঘটে?”^{১০৬} কালীকিঙ্কর তার বৌমা চারুমতীর মুখ দর্শন করতে চায় না। চারুমতী অনুতপ্ত হয়। সে প্রায়শ্চিত্ত করতে চায়। সে তার দুই ননদ সরলা ও সুশীলার সঙ্গে হরিদ্বারে চলে যেতে চায়।

নাট্যকার খুব সহজেই সমাজের বাস্তব দিকটি আলোচ্য নাটকটির মধ্য দিয়ে তুলে ধরেছেন। বস্তুত ‘বিধবা সঙ্কট’ নাটকটিতে নাট্যকার বিধবা চরিত্রের বিবাহ দিতে সক্ষম হননি। ‘বিধবাবিবাহ’ আইন পাশ হওয়া সত্ত্বেও সমাজে বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া ততটা সহজ ছিল না। স্বয়ং বিধবা রমণীগণ এতে রাজী ছিল না। আবার কিছু সংখক বিধবা রমণীদের ইচ্ছে থাকলেও উপায় হয়নি। ফলে শিক্ষিতা চারুমতীও গণ্ডীর বাইরে যেতে পারেনি। বিধবা হয়ে কষ্টকর জীবনযাত্রা মেনে নিতে পারেনি। নতুন স্বপ্ন দেখার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু সমাজের রক্তচক্ষুর সামনে তাকে শিথিল হতে হয়েছে। চারুমতী শেষ পর্যন্ত নিজেকে অসতী বলেছে, পাপিষ্ঠা বলেছে। চারুমতী ভগবানের পায়ে সমস্ত কিছু নিবেদন করতে বাধ্য হয়েছে। নিজের দুই বাল্য বিধবা ননদ সরলা ও সুশীলার মত জীবন সে বেছে নিয়েছে। চারুমতী ব্যভিচারিণী নয়। শুধুমাত্র মনের ইচ্ছার সম্মান করতে চেয়েছিল সে। শিক্ষার মান রক্ষা করতে চেয়েছিল। কিন্তু পারেনি। সমাজের অন্যান্য নিয়ম কানূনের বেড়াজালে সে আটকে যায়।

নাট্যকার ‘বিধবাসঙ্কট’ নাটকটিতে বিধবাদের নানান সঙ্কটের কথা তুলে ধরতে চেয়েছেন। বিধবাদের শিক্ষাদানের বিষয়ে তিনি উৎসাহী। কিন্তু সেই শিক্ষা যাতে বিপথগামী না হয়, সেইদিকেই মূলত দৃষ্টিপাত করতে চেয়েছেন নাট্যকার। কালীকিঙ্করের মধ্য দিয়ে নাট্যকার তুলে ধরেছেন সামাজিক সমস্যাটিকে,—“প্রভু! আপনি আমার হয়ে বঙ্গবাসীকে বলবেন, যেন তাঁরা এ সঙ্কটকে আর উপেক্ষা না করেন। আমার ন্যায় অনেকেই এইরূপ বা অন্যরূপ বিধবা সঙ্কটে পড়েছেন, অনেকেই হয় তো এখনও পতিত, অনেকেরই ভবিষ্যতে পড়বার সম্ভাবনা। কিন্তু সাবধান! স্ত্রীলোকের সুশিক্ষা হয়, সে মন্দ নয়, কিন্তু কুশিক্ষার বড় বিষ ফল ফলে। বিশেষ বিধবাদের হাতে যেন যুবতী বিধবাদের শিক্ষার ভার দিয়া তাঁহারা নিশ্চিত না থাকেন।”^{১০৭}

কালীকিঙ্করের মধ্য দিয়ে নাট্যকার সামাজিক সমস্যাটিকে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছেন। যুবতী বিধবাদের বিধর্মী হওয়াটাও এক শ্রেণীর মানুষ উপভোগ করত। যুবতী বিধবাদের বিপথগামী করে তাদের ভোগ করাই ছিল এই শ্রেণীর মানুষের উদ্দেশ্য। যারা বিধবাদের বিবাহ দেবার নাম করে ভোগ করার পরিকল্পনা করত। যারা সমাজে ধর্মধারীর মুখোশ পরে বাড়ীতে নানান কুকাজে লিপ্ত থাকত। নাট্যকার বিধবা ‘নারীদের সঙ্কট’ তুলে ধরতে গিয়ে সমাজের

মুখোশখারী মানুষদের তুলে ধরেছেন। যারা শুধুমাত্র লোভ লালসায় লিপ্ত থাকে। মঙ্গল সাধনায় নয়। অজ্ঞাতনামা নাট্যকার ‘বিধবা-সঙ্কট’ নাটকের মধ্য দিয়ে বিধবাদের সঙ্কটকে অসামান্য ভাবে তুলে ধরেছেন।

১৮৯০ সালে প্রকাশিত হয় রসরাজ অমৃতলাল বসু প্রণীত ‘তরুণালা’ নাটক। ‘তরুণালা’ নাটকের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়, অখিলচন্দ্র ও বিধবা তরুণালার দাম্পত্য প্রণয় সংকট। এ নাটকে বিধবা তরুণালা-অখিলচন্দ্রের মূল কাহিনীর সমান্তরালে দুটি উপকাহিনী স্থাপন করেছেন নাট্যকার। বেণী ও শান্তর উপকাহিনী এবং মৃত্যুঞ্জয়-আমোদিনীর কাহিনী। বেণী ও শান্তর উপকাহিনীতে ‘বিধবা বিবাহে’র বিরুদ্ধে নাট্যকার সওয়াল করেছেন।

‘তরুণালা’ নাটকটিতে নাট্যকার তরুণালা নামক এক সতীসাধি স্বামীসোহাগ বঞ্চিতা নারীর কাহিনী। আলোচ্য নাটকে তরুণালার একনিষ্ঠ প্রেম ও স্বামীপরায়ণা মনোভাবের মধ্য দিয়ে নিজ স্বামী সোহাগের অধিকারিণী হয়ে ওঠার কাহিনী বর্ণিত করেছেন নাট্যকার। ‘বিধবা বিবাহে’র আন্দোলনে সমাজ ভয় বড় ভূমিকা নিয়েছিল। সমাজ ভয়কে উপেক্ষা করে অনেক পুরুষ ‘বিধবা বিবাহে’ এগিয়ে এলেও বিধবা নারীরা সেভাবে সাড়া দেয়নি। নাট্যকার সেই বাস্তব সত্যকে ‘তরুণালা’ নাটকে উপস্থাপিত করেছেন ‘শান্ত-বেণী’র উপকাহিনীর মধ্য দিয়ে।

তরুণালার নন্দ ‘শান্ত’ একজন বিধবা নারী। বিধবা শান্ত তার স্বশুরবাড়ির সম্পত্তিসহ বাপের বাড়িতে ফিরে এসেছে। বিধবা শান্তকে তার স্বশুরবাড়ির লোকেরা ভূ-সম-পত্তি থেকে বঞ্চিত করেননি। নাট্যকার শান্ত চরিত্রের মধ্য দিয়ে সমাজের অন্য একটি মানবিক দিকের ছবি তুলে ধরেছেন। নাট্যকার অমৃতলাল বসু শান্তর বৈধব্য জীবনকে ভক্তিমার্গে দৃঢ় করেছেন। বিধবা বিবাহে শান্তকে অগ্রসর হতে দেননি। নাটকটিতে একাধারে যেমন, স্বামী সোহাগ বঞ্চিতা একজন নারীর কাহিনী তেমনি অন্যদিকে একটি বিধবা নারীর সমগ্র জীবনের পরিণতির কথা ধরা পড়েছে।

শান্ত বিধবা। বিধবা শান্তর মন ভক্তি ভাবুকতায় নিমজ্জিত থাকে। বিধবা শান্তকে হাতিয়ার করে সে অখিলের সম্পদ দখল করতে চায়। বেণী জানিয়েছে,—“...আর অখিলের মজা দেখ, পায়ের উপর পা দিয়ে বসে আছে; বাপের বিষয় তো ভোগ করছিলই, জলেই জল বাধে, কোথেকে দেখনা বোনটা বিধবা হয়ে স্বশুর বাড়ীর বিষয় বার করে নিয়ে বাড়ীতে এসে ঢুকলো মজা করে এখন তাও ভোগ করছে। শান্তকে কোন রকম করে হাত করতে পারি, কুভাবের কথা ওর সঙ্গে চলবে না, বুঝিয়ে সুঝিয়ে ওকে আবার বে করতে রাজী করাতে পারি, তা হলে

বিষয়টাও হাতে আসে, স্ত্রীর মতন স্ত্রীও হয়!”^{১০৮} এই অংশে নাট্যকার,—বিধবা হওয়ার পর স্বামীর সম্পত্তি অধিকারের প্রসঙ্গ যেমন উত্থাপন করেছেন তেমনি, অর্থলোভে বিধবার সম্পত্তি ভোগের অভিসন্ধিতে সেকালে অনেকে বিধবা বিবাহে আগ্রহ দেখিয়েছিলেন, সে প্রসঙ্গের অবতারণা করেছেন। নাট্যকার বিধবা বিবাহের নামে একশ্রেণীর মানুষের অর্থলোভী ঘৃণ্য মানসিকতাকে প্রকাশ করেছেন।

ভগবান সহ্য করার জন্য নারীদের বিধবা করেন। বিধবাদের অনাড়ম্বর জীবনে ঠাকুর দেবতার আশ্রয়ই একমাত্র সম্বল। তাই বিধবাদের ভগবান মুখ বুজে সহ্য করার ক্ষমতা দিয়েছেন বলে এমনটাই তৎকালীন সমাজের ধারণা। তরুণালা, শান্ত ও আমোদিনীর কথা প্রসঙ্গে বিধবা শান্তর স্বামীর প্রসঙ্গে নিষ্ঠা ও ভক্তি চোখে পড়বার মত,—“না না বৌ কেনেদিদি ভাল কথাই বলছে, একটু সাধলে অপমান সহিলে যদি সোয়ামী আপনার হয় তা কি ছাড়তে আছে? আমার দুখানা হাত কেটে দিলেও যদি সে ফিরে আসে, ফিরে এসে যদি চিরজীবন আমায় পায়ে দলতে থাকে তা হলেও আমি মনে করি যে আমার মত ভাগ্যবতী আর কেউ নাই!”^{১০৯} উনিশ শতকের সমাজ ব্যবস্থায় শান্তর মত বহু রমণীর স্বামী বিয়োগের আক্ষেপ তাদের প্রতিটি ইচ্ছার সমাধি স্থাপন করে। স্বামী বেঁচে না থাকায় শান্ত জীবনের প্রয়োজনীয়তাটুকু প্রায় হারিয়েছে। স্বামী খারাপ হোক, অন্যায আচরণ করুক, চিরকাল দাসী বানিয়ে রাখুক—তাতেও যেন নারীর আনন্দ। কিন্তু স্বামী বিয়োগের ফল—বৈধব্য জীবনের করুণ পরিণতি যা শান্তর কথায় স্পষ্ট।

শান্ত মনে মনে দেবতাজ্ঞানে স্বামীকেই পূজা করেছে। তাই স্বামী বিয়োগের পর নিজ প্রাণ দেবতার চরণে সমর্পণ করেছে। নিজ বয়ঃসন্ধিকালে ধর্মে মনঃসংযোগ করেছে। শান্তর কথায় বিধবা বিবাহ হলেও পরকালে স্বামীর আশ্রয় কোন্টি হবে তা সে জানে না। তাই বিধবাদের বিবাহ না হওয়াই শান্তর মতো মেয়েদের মনোভাব। শুধু শান্ত নয়, উনিশ শতকের সমাজ ব্যবস্থায় শান্তর মত বহু নারীই মনে করে বিধবা বিবাহ হলে পরকালে শান্তিপ্রাপ্তি হয় না। বিধবাদের পুনর্বিবাহ মহাপাপ। বিবাহ একবারই হয়। যদি সেই স্বামী বেঁচে থাকে সেই নারী ভাগ্যবতী। যদি স্বামী প্রয়াণ ঘটে তবে তা অদৃষ্ট। যার ফলে যৌবন সহ বাকী জীবনের ঠাই হয় ঠাকুর দেবতার কর্মে চরণে-সেবায়। শান্ত কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারত পড়ে। বিধবা হওয়ার পর বাপের বাড়ী চলে আসার পরও শান্ত শুধুমাত্র স্বামী নয় স্বশুর বাড়ীর সমস্ত নিয়ম মেনে চলে। শান্ত বিধবা বিবাহকে সমর্থন করতে পারে না। সে মনে করে বিধবাদের পুনরায় বিয়ে হলে তারা শুধু অমঙ্গল করতে পারে, সংসারের ক্ষতি করতে পারে।

শান্তর ধারণা ভদ্র ঘরে বিধবারা পুনরায় বিবাহ করে না, নীচু জাতের মধ্যে বিধবা বিবাহ চালু আছে। বেণী শান্তর দুঃখের কথা জানতে চায়। উত্তরে শান্তর নিজস্ব যুক্তি রয়েছে। শান্তর ধারণা তার স্বামী মৃত্যুপ্রাপ্ত হয়ে স্বর্গে গিয়ে দেবতা হয়েছেন। আর শান্ত মারা গেলেই স্বর্গে তাদের দেখা হবে। সেখানে তারা অমর আর তার বিধবা হওয়ার ভয় থাকবে না,—“কি দুঃখের কথা বলছো? ভাল কাপড় পরতে পাইনে গহনা পরতে পাইনে? সাজাগোজা তো স্বামীর চক্ষে ভাল দেখবার জন্য, একাদশী করা? হিন্দুর মেয়ে, পাঁচ বৎসর বয়স থেকে ব্রত করতে শিখেছি, একটু একটু করে উপোষ অভ্যাস হয়েছে;...মলেই তো আবার সেই স্বামীকে পা’ব তখন তো আর বিধবা হবার ভয় থাকবে না। আমার সোয়ামী স্বর্গে গিয়েছেন দেবতা হয়েছেন; এখন যে আমি দেবতার স্ত্রী!”^{১০}

পরকালীন সুখের আশায় পৃথিবীর সকল সুখ ভোগ ত্যাগ করে শান্তর মত বিধবা রমণীরা মন অবিচলিত রাখতে তারা ছুটে গেছে ঠাকুরঘরে। পাছে তাদের মন বিচলিত হয়, পাপী হয় এই ভয়ে। শান্তর কথায়,—“মন আমি এক রকম ঠিক করেছি, এসব কথা তোলাপাড়া করলে আবার শরীরে ভাবনা আসতে পারে মনও খারাপ হতে পারে, আমায় আর ওসব কথা কিছু বলোনা। যাই ঠাকুর ঘরে যাই আবার পূজোর উদ্যোগ করতে হবে।”^{১১}

বিবাহিত বেণী দাম্পত্য জীবনে সুখী নয়। তাই সে আবার বিধবা শান্তকে বিবাহ করতে আগ্রহী। কিন্তু শান্তকে বিবাহ করে সে তার সম্পত্তি হস্তগত করার বাসনা মনে পোষণ করে। উনিশ শতকের সমাজ ব্যবস্থায় বাল বিধবা রমণীদের পুনরায় স্বাভাবিক সুন্দর জীবন উপহার দেওয়ার উদ্দেশ্যে বিদ্যাসাগর মহাশয় বিধবাদের পুনরায় বিবাহ দেওয়ার আইন করলেন ঠিকই কিন্তু এই আইনের অপব্যবহার করে অনেকেই বিধবা রমণীদের বিবাহ করে সম্পত্তি হস্তগত করার স্বপ্ন দেখে। ফাঁদে ফেলে তাদের ভোগ করে, কুদৃষ্টি আরোপ করে। বেণীও বিধবা শান্তকে বিবাহ করতে চায় মূলত সম্পত্তির লোভে।

বেণী সহচরীকে দিয়ে শান্তকে, বিবাহে রাজী করানোর কথা বলে। বিধবা শান্তর বৈধব্য আচার পালনের নিষ্ঠা অসীম। স্বামী বিয়োগের পর তেরো বছরের বিধবা শান্ত নিজেকে পুরোটাই মৃত স্বামীর উদ্দেশ্যে সমর্পণ করেছে। জীবনের সমস্ত সুখ বিসর্জন দিয়ে শান্ত কঠিন বৈধব্যচারে মন নিবেশ করেছে। সহচরী জানিয়েছে,—“তের বছরের মেয়ে বিধবা হলো, গিল্লি হাতের বালা রাখবার জন্য কত বুঝিয়ে ছিলেন, তা বললে ‘না মা আর কেন’, কখনও একখানা ভাল শাদা ধুতি পরলে না, নিরিমিষ তরকারি টরকারি খেতে তো দোষ নাই, তা ঐ হবিষ্যি, দশমীর দিন বই

একটু দুধ খায় না, শ্বশুরের অত টাকা হাতে পেলে, তা একটু বাবুয়ানা আছে? দাসীদের সঙ্গে মিলে কাজ করে।”^{১২} কিন্তু বেণী শান্তকে ভালোবেসে বিবাহ করতে চায়। সহচরীও বিধবা শান্তর যত্নগণকে সহ্য করতে না পেরে সম্মতি জানায়। মূলত নাট্যকার এ নাটকে বিধবা শান্তর সংকটপূর্ণ দিকটি উন্মোচিত করেছেন সমাজনীতির আড়ালে।

স্বামীর প্রতি শান্তর অবিচল ভক্তি তৎকালীন সমাজের বিধবা রমণীদের মানসিকতাকেই প্রস্ফুটিত করে,—“আমি হিন্দুর ঘরের বিধবা, এ দেহখানা যে কি তুচ্ছ তা আমি বেশ বুঝতে পারে; সহমরণ প্রথা নাই নইলে যে দিন পতি মলো সেইদিন হাসতে হাসতে চিতায় গে উঠতে পারতুম; এখনও প্রাণ সেই পতির পায়, শূন্য দেহখানা লয়ে আছি, এর কোন সুখের চিন্তা নাই।”^{১৩} শান্ত বিধবা রমণীদের পুনরায় বিবাহ হওয়াকে বিশ্বাস করেনা। বিশ্বাস করে যে শ্বশুরবাড়ীর ভাত যে খেয়েছে সেই শ্বশুর বাড়ী কি বদলানো যায় না। শান্তর বিশ্বাস স্বামীর মৃত্যুর পর স্বামী পরলোকে যায় তখন অন্য আরেক বিবাহ করার পর বিধবা হলে পরলোকে কটা স্বামীর সেবা যে করবে? সাহেবদের মতো গোত্র পরিবর্তন করা হিন্দুর ঘরের মেয়েদের শোভা পায় না,—“...প্রথম স্বামী স্ত্রীর ইহ জন্মের সুবাদ নয়, আমি মহাভারতে পড়েছি পরকালেও সেই সুবাদ থাকে। দুদিন বাদে তো মরবো তখন কটা স্বামীর সেবা করবো? তারপর আমি এক সংসার থেকে আর এক সংসারে এসেছি, এক গোত্র থেকে আর এক গোত্রে এসেছি, সাহেবদের মতন আমাদের মাগটী ভাতারটী নয়, শ্বশুরশাশুড়ী ভাশুর দেওর জা ননদ, আমিও তাদের মাঝে একজন বৌ বে দিয়ে এনে হাতের ভাত খেয়ে জাতে নিয়েছে সে ঘর কবার বদলাব?”^{১৪} শান্ত কোনভাবেই বিবাহ করতে রাজী নয়।

অদ্ভুত এক বিশ্বাস। হিন্দু রমণী তার সারাটা জীবন ধরে কঠিন ব্রত পালনে সম্মত, সমস্ত শখ আহ্লাদ বিসর্জন দিতে সম্মত কিন্তু পুনরায় বিবাহ করতে সক্ষম নয়। তৎকালীন সমাজ বিধবা রমণীদের যৌবন জীবন নিয়ন্ত্রণ করার জন্য নানানভাবে তাদের মনকে অবদমিত করেছে। স্বামী দেবতা হয়েছেন—এই ধরনের অনিত্য সত্যকে বিশ্বাস করিয়েছে তৎকালীন সমাজ। শান্তর মত

বহু বিধবা রমণীদের মনের ভিতর দেবতার স্ত্রী রূপী অনিত্য সত্য ঠাঁই নিয়েছে। কৌশলে তাদের সাধ আকাঙ্ক্ষা ইচ্ছা-অনিচ্ছাকে নিয়ন্ত্রণ করেছে সমাজ। ঠাকুব সেবার কাজে ব্যস্ত করে বাকী জীবনের অনাড়ম্বর করুণ পরিণতির দিকে ঠেলে দিয়েছে তৎকালীন সমাজ।

অমৃতলাল বসুর বিশিষ্ট শোকনাটক ‘বিলাপ! বা বিদ্যাসাগরের স্বর্গে আবাহন’। বিদ্যাসাগরকে স্মরণ করে এনাটক রচিত। ১৮৯১ সালের ২৯শে জুলাই বিদ্যাসাগরের প্রয়াণ ঘটে। ওই বছর প্রকাশিত হয়, অমৃতলাল বসুর ‘বিলাপ! বা বিদ্যাসাগরের স্বর্গে আবাহন’ নাটক। নাটকটিতে বিদ্যাসাগরের সামাজিক কাজকর্মের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছেন নাট্যকার। ছাব্বিশ পৃষ্ঠার এই ছোটো নাটকে দেখা যায় নিমতলার ঘাটে বিদ্যাসাগরের চিতার অদূরে পাঁচজন নাগরিক উপনীত হয়েছেন। তাঁদের কথোপকথনে বিধবা নারীর সংকটচিত্র উত্থাপিত হয়েছে। চতুর্থ নাগরিক জানিয়েছে,—“বিদ্যাসাগর হিন্দু-শাস্ত্র সাগর মস্থন করিয়াই বিধবা বিবাহের ব্যবস্থা স্থির করিয়াছিলেন; যে শাস্ত্রকারের মত তিনি অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহা সর্ববাদীসম্মত নহে;...কিন্তু একথা বোধ হয় যে তাঁহার শত্রুরা ও বলিবে না, যে বিদ্যাসাগর মহাশয় করুণার বশে দৃঢ় বিশ্বাসে ঋষি বাক্যে নির্ভর না করিয়া পাশ্চাত্য প্রথার দৃষ্টান্তে আধুনিক উৎকট সমাজসংস্কারকদের প্রবৃত্তির বশীভূত হইয়া বিধবার বিবাহে উদ্যোগী হইয়াছিলেন। ...সপাদুকা দেবগৃহে উপবেশন করতঃ যবন-জন-প্রিয়-পক্ষী-মাংস সংযোগে স্লেচ্ছান্ন ভোজন করিয়া বিধবা বিবাহের বিরোধী পরিচয়ে হিন্দু নাম ক্রয় করা অপেক্ষা, বিদ্যাসাগরের ন্যায় পবিত্র জীবন যাপন করিয়া ব্রহ্মচার্য্যপালনাক্ষমা বালিকা বিবাহ দেওয়া সহস্রগুণে শ্রেয়।”^{১৫}

সমকালে বিধবার সংকট নিয়ে নাগরিক সমাজ যে ভাববনা পোষণ করতেন তাকেই নাট্যকার অনাবৃত করেছেন এই অংশে। নাটকটিকে বিধবা সংকট চিত্র উপস্থাপিত না হলেও বিধবা অন্তর্বেদনার প্রসঙ্গ এসেছে বিদ্যাসাগরের প্রয়াণ বার্তার সঙ্গে। নাট্যকার বলতে চাইলেন বিধবার সমব্যাথী আর কেউ রইলেন যে বিধবার স্বপক্ষে কথা বলবেন। বিদ্যাসাগরের মত বিধবার বেদনা দরদ দিয়ে আর কেউ উপলব্ধি করবেন।

১৮৯৪ সালে প্রকাশিত হয় অমৃতলাল বসুর ‘বাবু’ নাটক। বাবু নাটকে নাট্যকার ইংরেজি শিক্ষিত বাবু সম্প্রদায়কে ব্যঙ্গ-বিদ্রোপ করেছেন নাট্যকার। ‘বাবু’ নাটকে ছোকরাবাবু কন্দর্পকান্ত ও তার মাতামহী আজিমার মধ্য দিয়ে বিধবা সংকট প্রসঙ্গটি উপস্থাপিত হয়েছে। নির্বোধ কন্দর্পকান্ত তার বৃদ্ধ মাতামহীর বয়সজ্ঞান না করে পাঁচিশ বছর বয়েসী এক পাত্রের সঙ্গে বিবাহ দিতে চায়। আজিমা হতবাক হয়ে যায় বৃদ্ধ বয়সে বিধবা বিবাহের কথা শুনে,—“এ কেমন কথা

কোস্ রে কন্দর্পে? তিনকুরি মোয়া তিন গোন্ডা বয়স অইল আমার; আরাই কুরি বছরের কালে
তোর আজা কুঞ্জেও বস্ছে, এখন আমার তুলসী তলায় সোমাজ দিলেই অয়,—গউরচন্দ কবে
দয়া করবোন-টানি লবোন, আমি বিয়ে করবো, এ কেমন কথা কোয়? হিন্দুর গরে রাঁড়ের বিয়ে
কি অয়? দর্শ যা বা, দর্শ যা বা।”^{১১৬}

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বাল বিধবা নারীর শারীরিক ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য বিধবা বিবাহের
কথা ভেবেছিলেন। তিনি মূলত অক্ষতযোনি বিধবাদের বিয়ের জন্য আন্দোলন করেছিলেন।
এবং যাঁরা যুবতী অবস্থায় বিধবা হয়েছেন তাদের পুনর্বিবাহের কথা বলেছিলেন। ‘বাবু’ নাটকে
দেখা যায় বিপরীত ছবি। কন্দর্পকান্তি সংস্কারের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে বৃদ্ধ আজিমাকে পুনর্বিবাহ
দিতে উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। ফলে, সমকালে প্রচলিত বিধবা বিবাহ আন্দোলনের বিপরীতমুখী
উপহাসময় বিধবা সংকটের ছবি নাট্যকার ‘বাবু’ নাটকে তুলে ধরেছেন।

বস্তুত উনিশ শতকের আলোচ্য নাটকগুলির কেন্দ্রভূমিতে উপস্থাপিত হয়েছে বিধবা
নারীর অস্তিত্বের সংকটময় নিদারুণ চিত্র। বৈধব্য কখনো বিধাতার অভিশাপ, কখনো বা সমাজের
নিয়ম নিষ্ঠাচারের যূপকাষ্ঠের বলি হয়ে দেখা দিয়েছে বিধবা রমণীর জীবনে। পারিবারিক
অশিক্ষা, সমাজ ভয় এই সংকটকে বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। ঈশ্বরসেবার নামে বাল্য বিধবাদের
আচারের গণ্ডীতে বেঁধে ফেলার সচেতন প্রয়াস লক্ষ্য করা গেছে। কিন্তু নারীর স্বাভাবিক
যৌনকামনা ধর্মীয় আচারে অপরূদ্ধ থাকেনি। ফলে লুকিয়ে চুরিয়ে প্রণয়, গর্ভপাত ঘটানো,
গৃহত্যাগ ও বেশ্যাবৃত্তি গমনের সামাজিক অবক্ষয়কে ত্বরান্বিত করেছে। সমাজ উচ্ছল্নে যাবার
দেহাই দিয়ে সমাজপতির প্রমাদ গুণেছেন। ভেঙে গেছে সমাজের আচার সর্বস্বতার কঠোরতা।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহ আইন প্রচলনের পর কতিপয় বিধবা বিবাহ সংঘটিত
হলেও সেভাবে ‘বিধবা বিবাহ’ আন্দোলনের চেহারা নিতে পারেনি,—কি সেকালে, কি একালে।
বিধবা বিবাহ আন্দোলন কখনোই সার্বিক সাফল্য পায়নি। কারণ এর মূলে কাজ করেছে হিন্দু
সমাজের ধর্মীয় মূল্যবোধ, নীতিবোধ, শূচিবায়ুগ্রস্ততা, উদার মানসিকতার অভাব ও পারিবারিক
মনোবল যোগানোর শক্তির অভাব। পারিবারিক শিক্ষা, সংস্কার, মন কখনোই বিধবা বিবাহের
মত প্রগলিতশীল বিষয়কে আমাদের মনোরাজ্যে অধিষ্ঠিত করে তুলতে পারেনি। ভারতীয় মন
প্রকাশ ভীরু। বাঙালিও সেই ভীরুতা বশতঃ নিজ ইচ্ছাকে কখনো মর্যাদা দেয়নি। ‘বিধবা বিবাহ
আন্দোলন দু-তিন দশকের মধ্যেই বিপথে চালিত হয়েছিল। একদল মানুষ অর্থ রোজগারের
পথ হিসাবে দেখেছিলেন কিংবা নারীকে ভোগ করবার এক ভিন্ন পন্থা হিসাবে বিধবা বিবাহে

অগ্রসর হয়েছিলেন। যে বিধবাদের জন্য বিধবা বিবাহ আইন প্রবর্তিত হয়েছিল সে বিধবারাই তাঁরের পারিবারিক ও ধর্মীয় বিশ্বাস ও সংস্কারের গণ্ডী থেকে বেরিয়ে আসতে পারেননি। ফলে বিধবার সংকট যে তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই রয়ে গিয়েছিল।

উনিশ শতকের নাট্যকারের তাঁদের কাহিনীতে বিধবাদের সংকট চিত্র উপস্থাপন অপেক্ষা নারীর অর্থনৈতিক স্বীকৃতি কিংবা শিক্ষাগত বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে যদি উদ্যোগী হতেন তাহলে বোধ হয় বিধবা বিবাহ আন্দোলন সফলতা লাভ করত বলে আমাদের বিশ্বাস। উনিশ শতকের আলোচ্য নাটকগুলির মধ্য দিয়ে আমরা জানতে পারি অন্তঃপুর বিধবা নারীদের অসহায়তার বিচিত্র কাহিনী। বুঝতে পারি, সামাজিক সমস্যার কি নিদারুণ অবস্থা ছিল আজ থেকে শতাব্দীকাল পূর্বে। সমাজ ইতিহাসের এই নিদারুণ সত্য অবলোকনের জন্য নাটকগুলির বিষয় ভাব ও কাহিনী আমাদের কাছে পরম আদরের সামগ্রী হয়ে উঠেছে।

সূত্রোল্লেখ উৎস ও টীকা :

১. কুলীনকুলসর্বস্ব, রামনারায়ণ তর্করত্ন (শর্মা) শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বসুর বহুবাজারস্থ ১৮৫ নং ইষ্টানহোপ যন্ত্রালয়ে মুদ্রাক্ষিত, সম্বৎ ১৯১১ [১৮৫৪], পৃ ২৩।

২. কুলীনকুলসর্বস্ব, ঐ, পৃ. ২৬।

৩. কুলীনকুলসর্বস্ব, ঐ, পৃ. ১০৬।

৪. কুলীনকুলসর্বস্ব, ঐ, পৃ. ১০৬।

৫. কুলীনকুলসর্বস্ব, ঐ, পৃ. ১০৮।

৬. কুলীনকুলসর্বস্ব, ঐ, পৃ. ১০৯।

৭. কুলীনকুলসর্বস্ব, ঐ, পৃ. ৫৬-৫৭।

৮. বাঙ্গালা নাটকের ইতিবৃত্ত, হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, নিউ মদন প্রেস, ৯৫ বেচু চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা, ২০৪ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, দোলপূর্ণিমা, ১৩৫৪, পৃ ১৫।

৯. কুলীনকুলসর্বস্ব, ঐ, পৃ. ৫৮।

১০. কুলীনকুলসর্বস্ব, ঐ, পৃ. ৭৪।

১১. কুলীনকুলসর্বস্ব, ঐ, পৃ. ৭৪।

১২. বিধবা বিবাহ নাটক [১৮৫৬], উমেশচন্দ্র মিত্র, বাংলা নাট্যসংকলন ১মখণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি, সম্পাদনা বিষ্ণু বসু ও নৃপেন্দ্র সাহা, জুন ২০০১, পৃ ১৩৩।

১৩. বিধবা বিবাহ নাটক, ঐ পৃ ১৩৪।
১৪. বিধবা বিবাহ নাটক, ঐ পৃ ১৩৪।
১৫. বিধবা বিবাহ নাটক, ঐ পৃ ১৩৮।
১৬. বিধবা বিবাহ নাটক, ঐ পৃ ১৪৫।
১৭. বিধবা বিবাহ নাটক, ঐ পৃ ১৪৭।
১৮. বিধবা বিবাহ নাটক, ঐ পৃ ১৪৮।
১৯. বিধবা বিবাহ নাটক, ঐ পৃ ১৫০।
২০. বিধবা বিবাহ নাটক, ঐ পৃ ১৫১।
২১. বিধবা বিবাহ নাটক, ঐ পৃ ১৬০।
২২. বিধবা বিবাহ নাটক, ঐ পৃ ১৬১।
২৩. বিধবা বিবাহ নাটক, ঐ পৃ ১৬৮।
২৪. বিধবা বিবাহ নাটক, ঐ পৃ ১৬৯।
২৫. বিধবা বিবাহ নাটক, ঐ পৃ ১৭১।
২৬. বিধবা বিবাহ নাটক, ঐ পৃ ১৭২।
২৭. বিধবা বিবাহ নাটক, ঐ পৃ ১৭২।
২৮. বিধবা বিবাহ নাটক, ঐ পৃ ১৭৩।
২৯. বিধবা বিবাহ নাটক, ঐ পৃ ১৫৬।

৩০. সম্বাদ ভাস্কর, ২১ আগস্ট ১৮৫৬, সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজচিত্র (১৮৪০-১৯০৫) বিনয় ঘোষ সম্পাদিত ও সংকলিত তৃতীয় খণ্ড, বীক্ষণ, ১২/১ বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায় স্ট্রীট, কলিকাতা ১২, প্রথম প্রকাশ : জুলাই ১৯৬০, পৃ ১১০।

৩১. বিধবা মনোরঞ্জন, মিত্র রাধামাধব মিত্র, প্রথম ভাগ, ১২৬৩ বঙ্গাব্দ, দ্বিতীয় ভাগ ১৭৭৯ শকাব্দ কলিকাতা। শ্রীনবীনচন্দ্র বসু কর্তৃক প্রকাশিত, কলিকাতা গরানহাটা স্ট্রীটে পাঁচু দত্তের গলিতে ৯২ নং ভবনে শ্রীসেখ সেরাজ জমাদেবের গৃহে প্রাপ্য, পৃ ৫।

৩২. বিধবা মনোরঞ্জন, ঐ পৃ ৫।

৩৩. বিধবা মনোরঞ্জন, ঐ পৃ ৪৩।

৩৪. বিধবা মনোরঞ্জন, ঐ পৃ ২৫।

৩৫. সাম্য (১৮৭৯), বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিম রচনাবলী, ২য় খণ্ড, রিফ্লেক্ট

পাবলিকেশন, সম্পাদনা কাঞ্চন বসু, জানুয়ারি ১৯৯৯, পৃ ৩৫০।

৩৬. ‘বিধবা বিষম বিপদ’ (১৮৫৬), অজ্ঞাতনামা রচিত, পৃ ৯। সমাজ সংস্কার আন্দোলন ও বাংলা নাটক, গোলাম মুরশিদ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৪, পৃ ৬৮।

৩৭. বিধবা বিষম বিপদ, ঐ পৃ ১৭। সমাজ সংস্কার আন্দোলন ও বাংলা নাটক, ঐ পৃ ৬৮।

৩৮. চপলাচিন্তাপল্য (১৮৫৭), যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায়, কলিকাতা, পৃ ৯। (আখ্যাপত্র বিনষ্ট)

৩৯. চপলাচিন্তাপল্য, ঐ পৃ ১০।

৪০. চপলাচিন্তাপল্য, ঐ পৃ ১১।

৪১. চপলাচিন্তাপল্য, ঐ পৃ ১২।

৪২. চপলাচিন্তাপল্য, ঐ পৃ ১২।

৪৩. চপলাচিন্তাপল্য, ঐ পৃ ১৪।

৪৪. চপলাচিন্তাপল্য, ঐ পৃ ১৬।

৪৫. চপলাচিন্তাপল্য, ঐ পৃ ৪৪।

৪৬. বাংলার সামাজিক জীবন ও নাট্যসাহিত্য (১৮৫০-১৯০০) প্রদ্যোৎ সেনগুপ্ত, সাহিত্যশ্রী, প্রথম সংস্করণ, ৭ই অক্টোবর, ১৯৭৬, পৃ ১৪৯।

৪৭. রামনবমী, গুণাভিরাম শর্ম্মা, কলিকাতা দাস এণ্ড সন্স যন্ত্রালায়ে মুদ্রিত, নং ৪০ সদন বড়াল লেন, ওয়েলিংটন স্ট্রীট ১৮৭০ খৃঃ অব্দ, পৃ ৮৪।

৪৮. সপত্নী নাটক (১৮৫৮), (প্রথম ভাগ) তারকচন্দ্র চূড়ামণি, কলিকাতা ভাস্কর যন্ত্রে শ্রীগগনচন্দ্র চক্রবর্তী দ্বারা মুদ্রিত, সংবৎ ১৯১৪, পৃ ৪৫-৪৭।

৪৯. সপত্নী নাটক, ঐ পৃ ৯৮-৯৯।

৫০. বিধবা বিরহ নাটক, শিমুয়েল পিরবক্স, ব্যপ্টিষ্ট মিশন প্রেস, কলিকাতা, ১৮৬০, পৃ ১৩।

৫১. বিধবা বিরহ নাটক, ঐ, পৃ ১৩।

৫২. বিধবা বিরহ নাটক, ঐ, পৃ ১৯।

৫৩. বিধবা বিরহ নাটক, ঐ, পৃ ২০।

৫৪. বিধবা বিরহ নাটক, ঐ, পৃ ১৪।

৫৫. বিধবা বিরহ নাটক, ঐ, পৃ ২৪।

৫৬. বাল্যোদ্ধাহ নাটক, শ্রীশ্যামাচরণ শ্রীমানি, কলিকাতা সূর্য্যোদয় যন্ত্রে মুদ্রিত, ১৮৭২ শকাব্দ, নির্বাচিত প্রহসন উনিশ শতক, সম্পাদনা অলোক রায়, বিবেকানন্দ বুক সেন্টার, মে ২০১৩, পৃ ২৯২।

৫৭. বাল্যোদ্ধাহ নাটক, শ্রীশ্যামাচরণ শ্রীমানি, ঐ, পৃ ৩০৬।

৫৮. বাল্যোদ্ধাহ নাটক, শ্রীশ্যামাচরণ শ্রীমানি, ঐ, পৃ ৩০০।

৫৯. ভূমিকা অংশ, ম্যাও ধরবে কে? (১৮৬২) হরিশ্চন্দ্র মিত্র, নূতন যন্ত্র, ঢাকা (১২৬৯), পৃ ৩।

৬০. ম্যাও ধরবে কে? (১৮৬২) ঐ, পৃ ৭।

৬১. ম্যাও ধরবে কে? (১৮৬২) ঐ, পৃ ৩৩।

৬২. আইন সংযুক্ত কাদম্বিনী নাটক (১৮৬২) কুশদেব পাল, ১ম খন্ড ও ২য় খন্ড কলিকাতা শীলএন্ড ব্রাদার্স যন্ত্রে যন্ত্রিত, ১২৬৯ সাল, পৃ ৮০।

৬৩. আইন সংযুক্ত কাদম্বিনী নাটক, ঐ পৃ ৯১।

৬৪. পুনর্বিববাহ নাটক, গুরুপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত, কলিকাতা, গৌড়ীয় যন্ত্রে মুদ্রিত, সন ১২৬৯ সাল [১৮৬২] পৃষ্ঠা ৪৩।

৬৫. বিধবাবিলাস নাটক, যদুনাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীরামপুর প্রেস ফ্রেণ্ড যন্ত্রালয়ে শ্রীযুত বেহারিলাল দত্ত দ্বারা মুদ্রাঙ্কিত, ইংরেজি সন ১৮৬৪। বঙ্গাব্দ ১২৭১। মূল্য দশ আনা, ভূমিকা অংশ, পৃ ৫।

৬৬. বিধবাবিলাস নাটক, ঐ, পৃ ৮৫।

৬৭. বিধবাবিলাস নাটক, ঐ, পৃ ৮৯।

৬৮. বিধবাবিলাস নাটক, ঐ, পৃ ৬০।

৬৮. বিধবাবিলাস নাটক, ঐ, পৃ ৬১।

৬৯. বিধবাবিলাস নাটক, ঐ, পৃ ৬৩।

৭০. বিধবাবিলাস নাটক, ঐ, পৃ ৬৪।

৭১. নবনাটক, রামনারায়ণ তর্করত্ন, ১৭৮৮ শকাব্দে বহুবাজারস্থ ১৭২ সংখ্যক ভবনে স্ট্যানহোপ যন্ত্রে শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোম্পানি কর্তৃক এ নাটক মুদ্রিত। মূল্য ১ টাকা, পৃ ৭০।

৭২. নবনাটক, ঐ, পৃ ৯১

৭৩. বিয়ে পাগলা বুড়ো, দীনবন্ধু মিত্র, দীনবন্ধু রচনাবলী, সম্পাদনা অজিত কুমার ঘোষ,

হরফ প্রকাশনী, ২০ ডিসেম্বর ১৯৮৩ সংস্করণ, পৃ ১১০।

৭৪. বিয়ে পাগলা বুড়ো, ঐ, পৃ ১১০।

৭৫. বিয়ে পাগলা বুড়ো, ঐ, পৃ ১১১।

৭৬. বিয়ে পাগলা বুড়ো, ঐ, পৃ ১১১।

৭৭. মেঘনাদবধ নাটক, ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়, প্রকাশক কালীকুমার চক্রবর্তী, ১৫ নং কলকাতা বামাপুকুর, বি.পি.এমস যন্ত্রে ছাপা, ১২৭৪ [১৮৬৭], বঙ্গাব্দের ২৮সে ভাদ্র, মূল্য বারো আনা, পৃ ৩০।

৭৮. মেঘনাদবধ নাটক, ঐ পৃ ৫৬।

৭৯. বঙ্গকামিনী নাটক, হারাণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা বি.পি.এমস যন্ত্রে মুদ্রিত শ্রীকালীকুমার চক্রবর্তী দ্বারা মুদ্রিত, ১৫নং বামাপুকুর লেন, ১২৭৫ সাল [১৮৬৮] সালে প্রকাশিত, পৃ পৃ ৫৮।

৮০. বঙ্গকামিনী নাটক, পৃ ৭৬।

৮১. বঙ্গকামিনী নাটক, পৃ ৯৭।

৮২. হিন্দু মহিলা নাটক, বিপিনমোহন সেনগুপ্ত, ১৮৬৮ সালে কলকাতা 'আমাস্ট্রীট' হতে প্রকাশিত, পৃ ৮।

৮৩. হিন্দু মহিলা নাটক, ঐ, পৃ ৩৯।

৮৪. হিন্দু মহিলা নাটক, ঐ, পৃ ৭৭।

৮৫. হিন্দু মহিলা নাটক, ঐ পৃ ৮৫।

৮৬. সাক্ষাৎ-দর্পণ নাটক, অজ্ঞাতনামা রচিত, ১২৭৮ [১৮৭১] বঙ্গাব্দের, ২২১ নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট দ্বৈপায়ণ যন্ত্রে শ্রী যদুনাথ রায় কর্তৃক মুদ্রিত, পৃ ৬৯।

৮৭. সাক্ষাৎ-দর্পণ নাটক, ঐ পৃ ৭০।

৮৮. বিধবার দাঁতে মিশি, গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা, সূর্যপাড়া লেন, সিমলা, ১৮৭৪, পৃ ২৫।

৮৯. বিধবার দাঁতে মিশি, পৃ ৫৬।

৯০. বিধবার দাঁতে মিশি, পৃ ৪৫।

৯১. শরৎ সরোজিনী, দুর্গাদাস প্রণীত, দ্বিতীয় সংস্করণ, কলিকাতা, পটলডাঙ্গা, পটুয়াচোরাবালি, ১১ সংখ্যক ভবনে নূতন ভারতযন্ত্রে শ্রী বামনসিংহ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত, ১২৮৩ [১৮৭৬] সালে, পৃ ৫৫।

৯২. শরৎ সরোজিনী, ঐ, পৃ ৫৪।
৯৩. শরৎ সরোজিনী, ঐ, পৃ ১৪।
৯৪. শরৎ সরোজিনী, ঐ, পৃ ১৫।
৯৫. শরৎ সরোজিনী, ঐ, পৃ ৪০।
৯৬. সস্তাপিনী নাটক, জনৈক ভদ্রমহিলা প্রণীত, বাগবাজার স্মিথ এণ্ড কোং, ১২৭৯ বঙ্গাব্দ, [১৮৭২] মূল্য এক টাকা, পৃ ৫৪।
৯৭. সস্তাপিনী নাটক, ঐ, পৃ ৫২।
৯৮. সস্তাপিনী নাটক, ঐ, পৃ ৫৬।
৯৯. সস্তাপিনী নাটক, ঐ, পৃ ৫৫।
১০০. সস্তাপিনী নাটক, ঐ, পৃ ৫৮।
১০১. সস্তাপিনী নাটক, ঐ, পৃ ৪৮।
১০২. এমন কস্ম আর করব না, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, কলিকাতা আদিব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে শ্রীকালীদাস চক্রবর্তী দ্বারা মুদ্রিত, আষাঢ় ১৭৯৯ শক, মূল্য দশ আনা, পৃষ্ঠা ৭।
১০৩. এমন কস্ম আর করব না, ঐ, পৃ ৬।
১০৪. এমন কস্ম আর করব না, ঐ, পৃ ৫১।
১০৫. বঙ্গবিধবা, বিরজামোহন চৌধুরী, ১৮৮২, পৃ ২৫। (আখ্যাপত্র বিনষ্ট হওয়ায় প্রকাশকের নাম ও ঠিকানা জানা সম্ভবপর হয়নি।)
১০৬. বিধবা সঙ্কট, অজ্ঞাতনামা রচিত, কলিকাতা ১৫১ নং বারাণসী ঘোষের স্ট্রীট রিপণ প্রেস এজেন্সী থেকে শ্রীপ্রভাতচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত, ১৮৯০ সাল, পৃ ৬৬।
১০৭. বিধবা সঙ্কট, ঐ, পৃ ৭০।
১০৮. তরুণা, অমৃতলাল বসু, পৃ ১৪। (আখ্যাপত্র বিনষ্ট হওয়ায় প্রকাশকের নাম জানা যায়নি।)
১০৯. তরুণা, অমৃতলাল বসু, পৃ ৩৫।
১১০. তরুণা, অমৃতলাল বসু, পৃ ৪২।
১১১. তরুণা, অমৃতলাল বসু, পৃ ৪৩।
১১২. তরুণা, অমৃতলাল বসু, পৃ ৭৭।
১১৩. তরুণা, অমৃতলাল বসু, পৃ ১১৫।

১১৪. তরুণালা, অমৃতলাল বসু, পৃ ১১৬।

১১৫. 'বিলাপ! বা বিদ্যাসাগরের স্বর্গে আবাহন', শ্রী অমৃতলাল বসু প্রণীত ও প্রকাশিত, কলিকাতা ২নং মল্লিক লেন হইতে প্রকাশিত, কলিকাতা, ৬ নং ভীমঘোষ লেন, গ্রেট ইডেন প্রেস ইউ.সি. বসু এণ্ড কোম্পানি দ্বারা মুদ্রিত, সন ১২৯৮ সাল। মূল্য ১০ আনা, পৃ ১১।

১১৬. বাবু, অমৃতলাল বসু, অমৃতলালের শ্রেষ্ঠ প্রহসন, সম্পাদনা ড. ক্ষেত্র গুপ্ত, শম্ভুনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, পুঁথি প্রকাশনার পক্ষে অমরনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, পি ৪০, ব্লক বি, বাঙুর এভেনিউ, কলিকাতা ৫৫, অক্ষয় তৃতীয়া ১৩ মে ১৯৯৪, পৃ ১৯৫।

— — —

উপসংহার

উনিশ শতকের শেষপর্বে ‘বিধবা বিবাহ’ আন্দোলন সর্বাপেক্ষা চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিল বাংলার সমাজে। বিদ্যাসাগর যেমন এই আন্দোলনের পক্ষ অবলম্বন করেছিলেন, তেমনি এই আন্দোলনের প্রতিপক্ষ হিসাবে দাঁড়িয়েছিলেন রাধাকান্ত দেব। এই আন্দোলনকে ঘিরে সেকালের বাঙালি সমাজ যেভাবে দ্বিধা বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল—এমনটা আর কোনো সামাজিক আন্দোলনে লক্ষ্য করা যায়নি। আর সেকারণেই তর্ক-বিতর্কমূলক, বাদানুমূলক, উত্তর প্রতিউত্তরমূলক একটা সাহিত্যধারা বিকশিত হয়েছিল। এবং এই সাহিত্যধারা যেমন, বৈচিত্রপূর্ণ তেমনই শক্তিশালী। সমাজের বিশিষ্টজনের দুটি সারণীতে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিলেন।

সমর্থন করেছিলেন—বর্ধমানের মহারাজ মহাতাপট্টাদ, নবদ্বীপের মহারাজ শ্রীশচন্দ্র, শিবানাথ শাস্ত্রী, কেশবচন্দ্র সেন, কালী প্রসন্ন সিংহ, প্রমুখ, সমর্থনে পাঁচিশ হাজার লোক আবেদন পত্র পাঠিয়েছিল। এর বিরোধিতা করে ত্রিশ হাজার লোক, আবেদন পত্র পাঠিয়েছিল। বিরোধী পক্ষ ছিল ভারী। তা সত্ত্বেও ইংরেজ সরকার বুঝেছিলেন সমকালীন এই সমাজ সংকট। জে পি গ্রাণ্টের আগ্রহে ও প্রচেষ্টায় ১৮৫৬ সালের জুলাই মাসে বিধবা বিবাহ আইনই সিদ্ধ হয়।

বিদ্যাসাগর শাস্ত্রীয় যুক্তি দেখিয়ে কলম ধরেন। প্রতিপক্ষ তাঁর মত আক্রমণ করে কলম ধরেন এই সূত্র ধরে লেখা হয় বহু নাটক। নাট্যকারো দেখালেন, বিধবা সমস্যার কারণসমূহ। বাল্যবিবাহ, অসম বিবাহ, বহুবিবাহ এর অন্যতম কারণ। বংশের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য ‘বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্য্যা’র পাণীগ্রহণ বিধবা সমস্যাকে সমাজে বহুগুণ বাড়িয়ে তুলেছিল। কুলীনের বহুবিবাহ প্রথা চালু থাকার কারণে কুলীন স্বামীর মৃত্যুর সঙ্গে বহুপত্নীর বৈধব্যদশা সমাজের সংকট ও সমস্যাকে জটিল করে তুলেছিল। নাট্যকারেরা দেখালেন, বিধবা বিবাহ আইনত স্বীকৃতি পেলেও সাফল্য আসেনি সেভাবে। প্রথমত, স্বয়ং বিধবারাই বিধবা বিবাহে এগিয়ে আসেননি। দ্বিতীয়ত, অভিবাবকেরা বিধবা বিবাহে অনাগ্রহ দেখিয়েছেন। তৃতীয়ত, অর্থলোভে এক শ্রেণীর পুরুষ বিধবা বিবাহে আগ্রহ দেখালেও তা হিতে বিপরীত হয়েছিল। চতুর্থত বিপত্নীকেরাই বিধবা বিবাহে অগ্রসর হয়েছিলেন নিতান্ত দায়ে পড়ে। পঞ্চমত, ধর্মভয় মানুষের মন থেকে দূর হয়নি,

সেকারণে বিধবা বিবাহে সমাজমন তৈরি হয়ে ওঠেনি। বস্তুত, বিদ্যাসাগরের আন্দোলন প্রথম পর্বে উদ্দিপনা পেলেও শেষ পর্বে তা মুখ খুবড়ে পড়ে।

বস্তুত ‘উনিশ শতকের বাংলা নাটক ও বিধবা প্রসঙ্গ’ শিরোনামের গবেষণা কাজে আমরা অনুসন্ধান করতে চেয়েছি নাট্যসংলাপে বিধবাদের হৃদয় যন্ত্রণা, অসহায়তা, পুনর্বিবাহ উত্তর জীবনের সমস্যা সংকট ও মিলনের প্রতিচ্ছবি। প্রতিপক্ষের সমালোচনা, রঙ্গতামাসা, মুখোরোচক গল্প, বিরোধিতা, বৈধব্য আচার ও পরিবার জীবনের সংকট, সমাজ অনুশাসন কীভাবে নাটকের চরিত্রে রূপায়িত হয়েছে সমগ্র উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের নাট্যসাহিত্যে তাঁর অন্বেষণ আমাদের লক্ষ্য। বিধবাদের জীবন রক্ষার তাগিদে কিভাবে বেশ্যাবৃত্তিতে গমন —তার নাট্য কাহিনী সংলাপ পরম্পরায় আমরা তুলে ধরতে চেয়েছি মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে, চরিত্রের স্বগত কথনে। নাটকীয় একোক্তি ও চরিত্রের আক্ষেপ উক্তির মধ্যে বৈধব্যের জ্বালা, আশা-নিরাশা, স্বপ্ন ও স্বপ্ন ভঙ্গের বাস্তব সত্যই শতাব্দীকাল দূরে দাঁড়িয়ে আমরা অনুসন্ধান করতে চেয়েছি সমাজতাত্ত্বিক, ঐতিহাসিক ও মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে। বর্ণহিন্দু সমাজে যুগ যুগ ধরে চলে এসেছে বিধবা নারীকে কেন্দ্র করে নানান অভিযোগ। তৈরি হয়েছে নানা প্রবাদ,—‘বৌ মরে ভাগ্যবানের, বর মরে অলক্ষুণে ডাইনী’র। নারীর নিজের অজ্ঞাতে পরিণত হয় বিধবায়। কখন সে সংসার হতে আখ্যা পায়—নরখাদিকা, রাক্ষসী, ডাইনী, অপয়া, ভাতার খাকী। অকালে স্বামী হারানোর শোক যতটা-না তাকে অস্থির করে তোলে তার চেয়ে, সমাজের সর্বস্তর হতে উঠে আসা অস্বস্তিকর প্রশ্নবাণ তাঁকে বিচলিত করে, পীড়িত করে কণ্টকিত করে। সমগ্র উনিশ শতকে নাটকে, প্রবন্ধে কবিতায় সাহিত্যকারেরা বার বার বলতে চেয়েছেন,—বিধবা হলে নারীর প্রবৃত্তিগুলি মারা যায় না। যৌনক্ষুধা অবদমন করে রাখা যায় না আচারের ফুল-চন্দন দিয়ে। লুকিয়ে চুরিয়ে চলে যৌন মিলন ও ভ্রণহত্যার ব্যভিচার। সতীত্ব, শূচি সব কিছু ছারখার হয়ে যায়, যৌনতৃষ্ণার কাছে। ইন্দ্রিয় রিপু কাতরতা গীতা পাঠ দিয়ে আর একাদশী দিয়ে ঢেকে রাখা যায় না। কারণ কৌলিন্য প্রথার কারণে যেসব বিধবা সমাজে সংকট হিসাবে দেখা দিয়েছিল তার বেশির ভাগই ছিল বাল্য বিধবা, যৌবনের প্রাক্কল্ণে উপনীত বিধবা। বয়ঃসন্ধিকালের কিশোরী বিধবা কিংবা যৌবনাবতী বিধবা। অসমাপ্ত যৌনসুখের উল্লাসে তাঁরা ব্যভিচার লিপ্ত হত গোপনে। স্বামীসুখ বঞ্চিতা নারীর কামনা মিথ্যে নয়। শাস্ত্র বিধান দিয়ে রিপুর তাড়নাকে অবদমন করা যায় না। ফলে খুব জরুরী ছিল বিধবার পুনর্বিবাহ। আর, এই পুনর্বিবাহের কথা নাট্যকারেরা খুব জোরের সঙ্গে বলেছেন তাঁদের নাট্যকাহিনীর মধ্য দিয়ে।

ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧ୍ୟ

গ্রন্থপঞ্জি (Bibliography)

মুখ্য আকর গ্রন্থ :

১. অঙ্কতনামা — বিধবা বিষম নাটক (১৮৫৬)
(আখ্যাপত্র বিনষ্ট হওয়ায়, প্রকাশকের নাম জানা যায়নি।)
২. অঙ্কতনামা — বিধবা সুখের দশা [১৮৬২] প্রথম ভাগ
কলিকাতা, প্রাকৃত যন্ত্রে, তৃতীয়বার মুদ্রিত,
মিরজাপুর, হলওএস লেন ১নং বাড়ি,
শকাব্দ ১৭৮৪, মূল্য পাঁচ পয়সা মাত্র।
৩. অঙ্কতনামা — সাক্ষাৎ-দর্পণ
২২১ নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট দ্বৈপায়ণ যন্ত্রে শ্রী যদুনাথ
রায় কর্তৃক মুদ্রিত, ১২৭৮ [১৮৭১] বঙ্গাব্দে।
৪. অঙ্কতনামা — বিধবা-সঙ্কট (সমাজ-নাট্য) (১৮৯০)
কলিকাতা ১৫১ নং বারানসী ঘোষের স্ট্রীট রিপন প্রেস
এজেন্সী হইতে শ্রীপ্রভাত চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বারা
প্রকাশিত, সন ১২৯৭ সাল, মূল্য ছয় আনা।
৫. কস্যচিৎ পথিকস্য [মিত্র দীনবন্ধু] — নীলদর্পণ [১৮৬০]
ঢাকা, শ্রীরামচন্দ্র ভৌমিক কর্তৃক
বাস্তালাযন্ত্রে মুদ্রিত
১৭৮২ শকাব্দ। ২ আশ্বিন।
৬. ঘোষ গিরিশচন্দ্র — শান্তি কি শান্তি
দ্বিতীয় সংস্করণ, কিশোর ভারতী
কলিকাতা-৯, ১৩৩১।
৭. চট্টোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত উমাচরণ — বিধবোদ্বাহ [১৮৫৬]
কলিকাতা অনুবাদ প্রেসে মুদ্রাঙ্কিত, ১৭৭৮ শকাব্দ,

এই পুস্তক যাহার প্রয়োজন হইবেক, সহর কলিকাতা
যোড়াসাঁকো অনুবাদ যন্ত্রালয়ে অথবা কলুটোলা
সুরতির বাগানে ভবনে, অন্বেষণ করিলে পাইতে
পারিবেন। মূল্য এক তঞ্চা মাত্র।

৮. চট্টোপাধ্যায় যদুগোপাল — চপলাচিন্তাপল্যা (১৮৫৭)
কলিকাতা, (আখ্যাপত্র বিনষ্ট হওয়ায়, প্রকাশকের নাম
জানা যায়নি।)
৯. চুড়ামণি তারকচন্দ্র — সপত্নী নাটক [১৮৫৮] (প্রথম ভাগ)
জমিদার শ্রীযুক্তবাবু জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহোদয়ের
আদেশে, কলিকাতা ভাস্কর যন্ত্রে শ্রীগগনচন্দ্র চক্রবর্তী
দ্বারা মুদ্রিত, সংবৎ ১৯১৪।
১০. চট্টোপাধ্যায় যদুনাথ — বিধবাবিলাস নাটক (১৮৬৪)
শ্রীরামপুর 'টস্ ফ্রেন্ড' যন্ত্রালয়ে শ্রীযুত বেহারিলাল
দত্ত দ্বারা মুদ্রাক্ষিত, ইং সন ১৮৬৪, বঙ্গাব্দ ১২৭১,
মূল্য দশ আনা।
১১. চৌধুরী বিরজামোহন — বঙ্গবিধবা (১৮৭৫)
(আখ্যাপত্র বিনষ্ট হওয়ায় প্রকাশকের নাম ও ঠিকানা
জানা সম্ভবপর হয়নি।)
১২. জনৈক ভদ্রমহিলা — সন্তাপিনী নাটক (১৮৭৬)
বাগবাজার স্মিথ এণ্ড কোং, ১২৭৯ বঙ্গাব্দ, [১৮৭২]
মূল্য এক টাকা।
১৩. ঠাকুর জ্যোতিরিন্দ্রনাথ — এমন কর্ম্ম আর করব না (১৮৭৭)
কলিকাতা আদিব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে শ্রীকালীদাস চক্রবর্তী
দ্বারা মুদ্রিত, আষাঢ় ১৭৯৯ শক, মূল্য দশ আনা।
১৪. তর্করত্ন (শর্মা) রামনারায়ণ — কুলীনকুলসর্বস্ব [১৮৫৪]
শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বসুর বহুবাজারস্থ ১৮৫ নং ইষ্টানহোপ
যন্ত্রালয়ে মুদ্রাক্ষিত, সম্বৎ ১৯১১।

১৫. তর্করত্ন রামনারায়ণ — নবনাটক (১৮৬৬)
বহুবাজারস্থ ১৭২ সংখ্যক ভবনে ইষ্টানহোপ যন্ত্রে
শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোম্পানি কর্তৃক মুদ্রিত,
কলিকাতা, ১৭৮৮ শকাব্দ, মূল্য এক টাকা।
১৬. দুর্গাদাস (দাস উপেন্দ্রনাথ) — শরৎ সরোজিনী (১৮৭৫)
দ্বিতীয় সংস্করণ, কলিকাতা, পটলডাঙ্গা,
পটুয়াচোরাবালি, ১১ সংখ্যক ভবনে নূতন ভারতযন্ত্রে
শ্রী বামনসিংহ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত, ১২৮৩ [১৮৭৬] সালে।
১৭. পিরবক্স শ্রীশিমুয়েল — বিধবা বিরহ নাটক [১৮৬০])
যদি এই গ্রন্থ ক্রয় করিতে কাহার ইচ্ছা হয়, তবে
কলিকাতা মোকামের ইটালী কামার ডাঙ্গায়, ভি ও
আর, চিহ্নিত বাটীতে, লোক পাঠাইলে পাওয়া
যাইবে, Calcutta, Printed at the Baptist Mission
Press, 1860।
১৮. পাল কুশদেব — আইন সংযুক্ত কাদম্বিনী নাটক [১৮৬২]
১ম খণ্ড ও ২য় খণ্ড
কলিকাতা শীল এণ্ড ব্রাদার্স যন্ত্রে যন্ত্রিত, ১২৬৯ সাল।
১৯. বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীগুরুপ্রসন্ন — পুনর্বিবাহ নাটক [১৮৬২]
কলিকাতা, গৌড়ীয় যন্ত্রে মুদ্রিত, সন ১২৬৯,
মূল্য আট আনা।
২০. বসু অমৃতলাল — তরুণা (১৮৯০)
(আখ্যাপত্র বিনষ্ট হওয়ায়, প্রকাশকের নাম জানা
যায়নি।)
২১. বসু অমৃতলাল — বিলাপ! বা বিদ্যাসাগরের স্বর্গে আবাহন (১৮৯১)
কলিকাতা ২নং মল্লিক লেন হইতে প্রকাশিত,
৬ নং ভীমঘোষ লেন, গ্রেট ইডেন প্রেস ইউ.সি. বসু

এণ্ড কোম্পানি দ্বারা মুদ্রিত, সন ১২৯৮ সাল। মূল্য
১০ আনা।

২২. বসু অমৃতলাল — বাবু(১৮৯৪)
অমৃতলালের শ্রেষ্ঠ প্রহসন, সম্পাদনা ড. ক্ষেত্র গুপ্ত,
শম্ভুনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, পুঁথি প্রকাশনার পক্ষে অমরনাথ
গঙ্গোপাধ্যায়, পি ৪০, ব্লক বি, বাঙুর এভেনিউ,
কলিকাতা ৫৫, অক্ষয় তৃতীয়া ১৩ মে ১৯৯৪।
২৩. মিত্র উমেশচন্দ্র — বিধবা বিবাহ নাটক [১৮৫৬]
বাংলা নাট্যসংকলন ১ম খণ্ড
পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি
সম্পাদনা বিষ্ণু বসু ও নৃপেন্দ্র সাহা, জুন ২০০১।
২৪. মিত্র রাখামাধব — বিধবা মনোরঞ্জন [১ম খণ্ড ১৮৫৬, ২য় খণ্ড ১৮৫৭]
প্রথম ভাগ, ১২৬৩ বঙ্গাব্দ, দ্বিতীয় ভাগ ১৭৭৯ শকাব্দ
কলিকাতা। শ্রীনবীনচন্দ্র বসু কর্তৃক প্রকাশিত,
কলিকাতা গরানহাটা স্ট্রীটে পাঁচু দত্তের গলিতে ৯২
নং ভবনে শ্রীসেখ সেরাজ জমাদারের গৃহে প্রাপ্য।
২৫. মিত্র শ্রীহরিশচন্দ্র — ম্যাও ধরবে কে? [১৮৬২]
ঢাকা নূতনযন্ত্রে মুদ্রিত।
২৬. মিত্র দীনবন্ধু — বিয়ে পাগলা বুড়ো (১৮৬৬)
দীনবন্ধু মিত্র রচনাবলী, সম্পাদনা অজিত কুমার ঘোষ,
হরফ প্রকাশনী, ২০ ডিসেম্বর ১৯৮৩ সংস্করণ।
২৭. মুখোপাধ্যায় শ্রীহারাণচন্দ্র (শর্ম্মা) — দলভঞ্জন নাটক [১৮৬১]
নিবোধই
১লা মাঘ ১২৬৮।
২৮. মুখোপাধ্যায় হারাণচন্দ্র — বঙ্গকামিনী নাটক (১৮৬৮)
কলিকাতা বি.পি.এমস যন্ত্রে মুদ্রিত শ্রীকালীকুমার
চক্রবর্তী দ্বারা মুদ্রিত, ১৫নং বামাপুকুর লেন, ১২৭৫

[১৮৬৮] সালে প্রকাশিত।

২৯. মুখোপাধ্যায় ত্রৈলোক্যনাথ — মেঘনাদবধ নাটক (১৮৬৭)
প্রকাশক কালীকুমার চক্রবর্তী, ১৫ নং কলিকাতা
ঝামাপুকুর, বি.পি.এমস যন্ত্রে ছাপা, ১২৭৪
[১৮৬৭], বঙ্গাব্দের ২৮সে ভাদ্র, মূল্য বারো আনা।
৩০. মুখোপাধ্যায় গোপালচন্দ্র — বিধবার দাঁতে মিশি (দৃশ্যকাব্য) (১৮৭৪)
Calcutta, Printed by G.C Parial at the Local Press,
No 38 Sooryparah Lane, Simlah. 1874.
৩১. শর্ম্মা গুণাভিরাম — রামনবমী (১৮৫৭)
কলিকাতা দাস এণ্ড সন্স যন্ত্রালয়ে মুদ্রিত, নং ৪০ সদন
বড়াল লেন, ওয়েলিংটন স্ট্রীট ১৮৫৭ খৃঃ অব্দ।
৩২. শ্রীমানি শ্রীশ্যামাচরণ — বাল্যোদ্ধাহ নাটক [১৮৬০]
কলিকাতা সূর্য্যোদয় যন্ত্রে মুদ্রিত, ১৮৭২ শকাব্দ,
মূল্য ছয় আনা, নির্বাচিত প্রহসন উনিশ শতক, সম্পাদনা
অলোক রায়, বিবেকানন্দ বুক সেন্টার, মে ২০১৩।
৩৩. সেনগুপ্ত বিপিনমোহন — হিন্দু মহিলা নাটক (১৮৬৮)
Printed by J.G. Chatterjee & Co`s Press, No. 22,
Amherst Street, 1862। সোমড়া বাটী হতে প্রকাশিত
শক ১৭৯০।

গৌণ আকর গ্রন্থ :

১. অঙ্কাতনামা — বিধবাবধর্ম্মরক্ষা
(প্রকাশকাল পরিচয় পৃষ্ঠা অবলুপ্ত।)
২. চক্রবর্তী নরেন্দ্রনাথ — বিধবা বিবাহ (প্রবন্ধ গ্রন্থ: বিধবা আইন ও ধারা)
সারস্বতকুঞ্জ
প্রথম সংস্করণ ১লা বৈশাখ, ১৩৩৫, ১৯২৮।
৩. জলসঞ্চরী সফরঃ শ্রীগভুয — বিধবা বিবাহ বিধায়ক প্রবন্ধ সকলের সমালোচনা
শান্তিপুর হিতকরী যন্ত্রে, প্রোপাইটর শ্রীভুবনমোহন

৪. তর্কচূড়ামণি শ্রীযোগীন্দ্রনাথ — চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত, ১২৯২ সাল।
বিধবাবিবাহ প্রতিবাদ
অ্যাংলো সংস্কৃত প্রেস
কলিকাতা, ১৮৮৯।
৫. দাস শ্রীরাধারমণ — ভারত-বিধবা
গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত
ফরিদপুর, ১৩২১।
৬. বিদ্যাসাগর ঈশ্বরচন্দ্র — বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা
এতদ্ বিষয়ক প্রস্তাব (১ম ও ২য়)
চতুর্থ সংস্করণ কলিকাতা ১৯২৯।
৭. বিদ্যাবাচস্পতি শ্রীশিবনাথ — বিধবা বিবাহ খণ্ডনং
শান্তিপুর হিতকরী যন্ত্রে, প্রোপাইটার শ্রীযুক্ত
ভুবনমোহন চট্টোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত, ১২৯২ সাল।
৮. বিশ্বাস শ্রীব্রজনাথ — বিধবা
চারুযন্ত্রে শ্রীতমিজউদ্দিন আহাম্মদ
সহর সেরপুর, ১২৮৯ সাল।
৯. ভট্টাচার্য শ্রীমন্মথনাথ স্মৃতিরত্ন — উত্থানের পথ (বিধবা-বিবাহাদির মিমাংসা)
প্রথম খন্ড, ১৩৪৯
চিৎপুর কলিকাতা।
১০. মজুমদার নীলকণ্ঠ — বিবাহ ও নারীধর্ম
শ্রীকেদারনাথ বসু বি.এ কর্তৃক প্রকাশিত
কলিকাতা, ১৩৩০।
১১. রায় শ্রীযোগেন্দ্রনারায়ণ — বঙ্গ-মহিলা
গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত
১৮৮৪।
১২. রায়চৌধুরী শ্রীদেবীপ্রসন্ন — বিবাহসংস্কার (সামাজিক প্রবন্ধ)
কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট আনন্দাশ্রম হইতে

- গ্রন্থাকারে প্রকাশিত, ফাল্গুন ১২৯৫।
১৩. শর্মা গোবিন্দচন্দ্র — বিধবা বিবাহ নিষেধ বিষয়কব্যবস্থা
শকাব্দ ১৭৬৭ (১৮৪৫)
১৪. শর্মা শ্রীপ্রসন্নকুমার — বিধবাবিবাহ শাস্ত্র-বিরুদ্ধ
শ্রীবিধুভূষণ মিত্র কর্তৃক মুদ্রিত
ময়মনসিংহ, ১২৯৩।
১৫. সেন বিনয়কৃষ্ণ (সঙ্কলিত ও প্রকাশিত) — বিধবা বিবাহ (মহাত্মা গান্ধী লিখিত)
তৃতীয় সংস্করণ, জৈষ্ঠ ১৩৩৪।
১৯, শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলিকাতা।
১৬. সরকার বিদ্যারত্ন শ্রীগণপতি — বিধবা-বিবাহ ও হিন্দুধর্ম
বেলেঘাটা, কলিকাতা
১৯২১।

সহায়ক গ্রন্থ :

১. কবিরাজ নরহরি — উনিশ শতক : তর্ক-বিতর্ক
(সম্পাদিত) কে পি বাগচী এ্যান্ড কোম্পানী,
কালান্তর প্রেস, কলকাতা, ১৯৬১।
২. গঙ্গোপাধ্যায় শ্রীপ্রভাতচন্দ্র — বাংলার নারী জাগরণ
সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ
প্রথম সংস্করণ, চৈত্র ১৩৫২।
৩. গোস্বামী জয়ন্ত — সমাজ চিত্রে উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা প্রহসন
সাহিত্যশ্রী, ৭৩, মহাত্মা গান্ধী রোড (দ্বিতল)
কলিকাতা-৯, ১৩৮১।
৪. গুপ্ত সুশীলকুমার — উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলার নবজাগরণ
এ.মুখার্জী অ্যান্ড কোং (প্রাইভেট) লিমিটেড
আশ্বিন, ১৩৬৬ সাল (১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দ)
৫. মুখোপাধ্যায় হরিমোহন — দাশুরায়ের পাঁচালী,
(সংকলিত ও সম্পাদিত) কলিকাতা, ১৯১০।

৬. মিত্র দীনবন্ধু — দীনবন্ধু মিত্র রচনাবলী
(সম্পাদনা) — অজিত কুমার ঘোষ,
হরফ প্রকাশনী, ২০ ডিসেম্বর ১৯৮৩ সংস্করণ।
৭. গুপ্ত ক্ষেত্র ও গঙ্গোপাধ্যায় শম্ভুনাথ — অমৃতলাল বসুর শ্রেষ্ঠ প্রহসন
(সম্পাদনা) — পরিবেশক, সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার
১৩ মে ১৯৯৪।
৮. ঘোষ অজিতকুমার — বাংলা নাটকের ইতিহাস
জেনারেল
জুন ১৯৯৯।
৯. ঘোষ বিনয় — বিদ্যাসাগর ও বাঙালি সমাজ
ওরিয়েন্ট লংম্যান
ভাদ্র ১৩৩৬।
১০. ঘোষ বিনয় (সম্পাদিত ও সংকলিত)— সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজচিত্র (১৮৪০-১৯০৫)
প্রথম খণ্ড, 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকার রচনা-সংকলন,
বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড,
কলিকাতা ১২, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ১৯৬০।
১১. ঘোষ বিনয় (সম্পাদিত ও সংকলিত)— সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজচিত্র (১৮৪০-১৯০৫)
দ্বিতীয় খণ্ড, 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকার রচনা-সংকলন,
বীক্ষণ গ্রন্থন ভবন। কলিকাতা ৩২, পরিবেশক বেঙ্গল
পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড।
কলিকাতা ১২, প্রথম প্রকাশ আগস্ট ১৯৬০।
১২. ঘোষ বিনয় (সম্পাদিত ও সংকলিত)— সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজচিত্র (১৮৪০-১৯০৫)
তৃতীয় খণ্ড, 'বেঙ্গল স্পেক্টেটর', সম্বাদ ভাস্কর,
বিদ্যাদর্শন ও সর্বশুভকরী পত্রিকার রচনা সংকলন,
পত্রিকার রচনা-সংকলন, বীক্ষণ, ১২/১ বঙ্কিম
চট্টোপাধ্যায় স্ট্রীট, কলিকাতা ১২,
প্রথম প্রকাশ : জুলাই ১৯৬০।

১৩. ঘোষ বিনয় (সম্পাদিত ও সংকলিত)— সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজচিত্র (১৮৪০-১৯০৫)
চতুর্থ খণ্ড, ‘সোমপ্রকাশ’ পত্রিকার রচনা-সংকলন,
পাঠভবন, ১২/১ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা ১২,
প্রথম প্রকাশ : জুলাই ১৯৬০।
১৫. ঘোষ বিনয় (সম্পাদিত ও সংকলিত)— বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা (১৮০০-১৯০০)
‘সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র’ গ্রন্থমালার শেষ
(পঞ্চম) খণ্ড, পরিবেশক পাঠভবন কলিকাতা-১২,
প্রথম প্রকাশ : নভেম্বর ১৯৬০।
১৬. ঘোষ বিনয় — কলকাতা শহরের ইতিবৃত্ত (প্রথম খন্ড)
বাক্ সাহিত্য (প্রা:) লিমিটেড
প্রথম সংস্করণ আশ্বিন ১৩৮২।
১৭. ঘোষ বিনয় — কলকাতা শহরের ইতিবৃত্ত (দ্বিতীয় খন্ড)
প্রকাশ ভবন
প্রথম সংস্করণ, অক্টোবর ১৯৭৫।
১৮. ঘোষ বারিদবরণ (সম্পাদিত) — গিরিন্দ্রমোহিনী দাসীর শ্রেষ্ঠ কবিতা
ভারবি,
সেপ্টেম্বর ২০০১।
১৯. ঘোষ জগন্নাথ — গিরিশ যুগের বিস্মৃত নাট্যকার
করুণা প্রকাশনী
বইমেলা, ২০০৪।
২০. চক্রবর্তী শিবদাস — বাংলা সাহিত্যে শোককাব্য
বাঙুর এভিনিউ, ১৯৯৭।
২১. চট্টোপাধ্যায় শ্রীসতীন্দ্রমোহন— বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ভূমিকা
(১১০০-১৯০০ খ্রীঃ), সাহিত্য সংসদ
এপ্রিল ১৩৬৬।
২২. চট্টোপাধ্যায় অরুণকুমার — ঊনবিংশ শতাব্দীর সভাসমিতি ও বাংলা সাহিত্য
পরিবেশক, দে বুক স্টোর

	—	চৈত্র ১৩৬৬।
২৩. চক্রবর্তী নরেন্দ্রনাথ	—	বিধবা বিবাহ (বিধবা আইন ও ধারা) সারস্বতকুঞ্জ প্রথম সংস্করণ ১লা বৈশাখ, ১৩৩৫, ১৯২৮।
২৪. চট্টোপাধ্যায়পার্থ	—	বাংলা সংবাদ পত্র ও বাঙালির নবজাগরণ (১৮১৮-১৮৭৮) দেজ ২০০৩।
২৫. চট্টোপাধ্যায় বঙ্কিমচন্দ্র	—	বঙ্কিম রচনাসংগ্রহ (উপন্যাস খণ্ড) সভাপতি শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ সেন, প্রধান সম্পাদক শ্রীগোপাল হালদার, সাক্ষরতা প্রকাশন, পশ্চিমবঙ্গ নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতি, প্রথম প্রকাশ, ১লা জানুয়ারি ১৯৭৪।
২৬. চট্টোপাধ্যায় বঙ্কিমচন্দ্র (সম্পাদনা)	—	বঙ্কিম রচনাবলী (২য় খন্ড/প্রবন্ধ খণ্ড) রিফ্লেক্ট পাবলিকেশন কাঞ্চন বসু, জানুয়ারি ১৯৯৯।
২৭. চট্টোপাধ্যায় বঙ্কিমচন্দ্র	—	ঈশ্বরগুপ্তের জীবনচরিত ও কবিত্ব বিষয়ক প্রবন্ধ প্রকাশক, শ্রীগোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কলিকাতা, ১৫ই আশ্বিন, ১২৯২ সাল।
২৮. ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ	—	গল্পগুচ্ছ (তিন খণ্ড) বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ ১৩১০ বঙ্গাব্দ, অষ্টাদশ সংস্করণ।
২৯. দত্ত রমেশচন্দ্র	—	সংসার (১৮৭৫) বসুমতী সাহিত্যমন্দির, চৈত্র সংক্রান্তি, ১২৮২ বঙ্গাব্দ,
৩০. দত্ত রমেশচন্দ্র	—	সমাজ (১৮৯৩) বসুমতী সাহিত্যমন্দির।

- চৈত্র সংক্রান্তি, ১৩০০ বঙ্গাব্দ।
৩১. দাস অলোক — উনিশ শতকের নির্বাচিত প্রহসন
(সম্পাদনা) বিবেকানন্দ বুক সেন্টার
মে ২০১৩।
৩২. দাশ মিহিরকুমার — দীনবন্ধু মিত্র কবি ও নাট্যকার
বুকল্যান্ড প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা:এলাহাবাদ:পাটনা, জুলাই ১৯৬৮।
৩৩. দাশগুপ্ত শান্তিকুমার ও মুখাটি হরিবন্ধু — ঈশ্বরগুপ্ত রচনাবলী (১ম খন্ড, ২য় খন্ড)
(সম্পাদনা) দত্তচৌধুরী অ্যান্ড সন্স
১৩৬১ বঙ্গাব্দ।
৩৪. দাশগুপ্ত হেমেন্দ্রনাথ — বাংলা নাটকের ইতিবৃত্ত
প্রকাশক শ্রীমণীন্দ্র কুমার দাশগুপ্ত, ১২৪/৫ বিরসা
রোড, কলিকাতা, মুদ্রাকর শ্রীকার্ত্তিক চন্দ্র দে, নিউ
মদন প্রেস, ৯৫ বেচু চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা,
প্রাপ্তিস্থান শ্রীগুরু লাইব্রেরি, ২০৪ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট,
বিরসা রোড, কালীঘাট, দোলপূর্ণিমা, ১৩৫৪।
৩৫. দাশগুপ্ত হেমেন্দ্রনাথ — ভারতীয় নাট্যমঞ্চ
(১ম খন্ড ১৯৪৫) বঙ্গভাষা সংস্কৃতি সম্মেলন
(২য় খন্ড ১৯৪৭), কলিকাতা।
৩৬. দেবী শ্রীপ্রভাময়ী — বাংলা আখ্যায়িকা-কাব্য (১৮৫০-১৯০০)
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
১৯৫৮।
৩৭. দেবী অনুরূপা — ভূদেব চরিত
(সম্পাদিত) ভূদেব পাবলিশিং হাউস, ১ম ভাগ ১৩২৪,
২য় ভাগ ১৩৩০, ৩য় ভাগ, ১৩৩৪।
৩৮. নাগ শ্রীকালিদাস — অক্ষয় সাহিত্যসম্ভার
ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোম্পানী।

৩৯. পত্নী পূর্ণেন্দু	—	বঙ্কিম যুগ(প্রথম খন্ড ১৮৩৮-১৮৫৮) দেজ পাবলিশিং প্রথম প্রকাশ, ডিসেম্বর ১৯৯৬।
৪০. বন্দ্যোপাধ্যায় অসিত	—	উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংলা সাহিত্য বুকল্যান্ড প্রাইভেট লিমিটেড প্রথম সংস্করণ ১৯৫৯।
৪১. বন্দ্যোপাধ্যায় অসিত	—	বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (৭ম ও ৮ম খন্ড) মডার্ন বুক এজেন্সী ২০০২।
৪২. বন্দ্যোপাধ্যায় ব্রজেন্দ্রনাথ	—	বাংলা সাময়িক-পত্র (১৮৬৮-১৯০০) প্রথম খন্ড, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ মাঘ ১৪১০।
৪৩. বন্দ্যোপাধ্যায় ইন্দুপ্রকাশ	—	কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের জীবন-চরিত বিজ্ঞানাচার্য্য শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় কর্তৃক লিখিত ভূমিকা সম্বলিত, বেঙ্গল ন্যাশানাল কলেজ।
৪৪. বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীচন্দ্রীচরণ	—	বিদ্যাসাগর দে বুক স্টোর প্রথম সংস্করণ, রথযাত্রা ১৩৯৪।
৪৫. বন্দ্যোপাধ্যায় রণজিৎ	—	উনিশ শতকের নারীমুক্তি আন্দোলন ও বাংলা সাহিত্য (১৮৫০-১৯০০) পুস্তক বিপণী, প্রথম প্রকাশ জুলাই ১৯৯৯।
৪৬. বন্দ্যোপাধ্যায় হেমচন্দ্র	—	কবিতাবলী (১৮৭০) হেমচন্দ্র গ্রন্থাবলী, প্রথম খণ্ড, সম্পাদক সজনীকান্ত দাস, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, জ্যৈষ্ঠ, প্রথম সংস্করণ, ১৩৬১।
৪৭. বসু দেবকুমার	—	বাংলা নাটক (১৮৫২—১৯৫৭) কলিকাতা ডিসেম্বর ১৯৫৭।

৪৮. বসু সঞ্জীবকুমার — ঈশ্বর গুপ্ত ও বাংলা সাহিত্য
সংস্কৃতি প্রকাশন
আগস্ট ১৯৫৯।
৪৯. বসু শিশির — একশ বছরের বাংলা থিয়েটার (১৮৭২-১৯৭২)
নাভানা
১৪ এপ্রিল ১৯৭৩।
৫০. বসু শ্রীনগেন্দ্রনাথ — বিশ্বকোষ (১৬ খণ্ড)
(সংকলিত ও প্রকাশিত) কলিকাতা ৫ নং রামধন মিত্রের লেন, শ্যামপুকুর,
বিশ্বকোষ প্রেসে শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাস দ্বারা মুদ্রিত, ১৩১২।
৫১. বসু রাজনারায়ণ — রাজনারায়ণ বসুর আত্মচরিত
কুন্তলীন প্রেস
১৯০৯, কলিকাতা ১৩১৫।
৫২. বসু স্বপন — বাংলায় নবচেতনার ইতিহাস (১৮২৬-১৮৫৬)
পুস্তক বিপণি
বুদ্ধ পূর্ণিমা, ১৩৫১।
৫৩. বসু স্বপন — সংবাদ সাময়িক পত্রে উনিশ শতকের বাঙালি সমাজ
(সংকলিত ও সম্পাদিত) দ্বিতীয় খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি
অক্টোবর ২০০৩।
৫৪. বসু স্বপন ও চৌধুরী ইন্দ্রজিৎ — উনিশ শতকের বাঙালি জীবন ও সংস্কৃতি
(সম্পাদনা) পুস্তক বিপণী
প্রথম প্রকাশ, ২৯শে নভেম্বর ২০০৩।
৫৫. বাগচি মণি — বিদ্যাসাগর
প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরি
কলিকাতা, সেপ্টেম্বর ১৯৫৭।
৫৬. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় — রামনারায়ণ তর্করত্ন (১৮২২-১৮৮৬)
সাহিত্য সাধক চরিতমালা-৫
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা -৬

		পঞ্চম সংস্করণ, ভাদ্র ১৩৬৬।
৫৭. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	—	বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গ গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স কলিকাতা, ১৩৩৮।
৫৮. বিশী প্রমথনাথ	—	বাংলার লেখক বিশ্বভারতী জন্মাষ্টমী ১৩৫৭।
৫৯. বিশ্বাস অদ্রীশ সম্পাদিত	—	বটতলার বই ১ম ও ২য় খণ্ড গাঙচিল জানুয়ারি ২০০০।
৬০. বিশ্বাস প্রতিভা	—	হুজুর দর্পণ ফার্ম কে এল প্রাইভেট লিমিটেড ১৯৬০।
৬১. বিদ্যারত্ন শ্রীকালীপ্রসন্ন (সম্পাদিত)	—	ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গ্রন্থাবলী বসুমতী কার্যালয় হইতে প্রকাশিত, শ্রীপূর্ণচন্দ্র দ্বারা মুখোপাধ্যায় মুদ্রিত, ১৩১৭।
৬২. বিদ্যারত্ন শ্রীশম্ভুচন্দ্র	—	ভ্রমনিরাস অর্থাৎ শ্রীযুক্ত চন্দ্রীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ‘বিদ্যাসাগর’ নামক নূতন জীবনচরিতের ভ্রমনিরাকরণ কলিকাতা, সন ১৩০২।
৬৩. বিট শম্ভুনাথ	—	উনিশ শতকের সমাজ আন্দোলন ও বাংলা নাটকের আদি পর্ব আনুড় হুগলী, ৮ই মার্চ, ১৯৮৪।
৬৪. ভট্টাচার্য আশুতোষ	—	বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস (১ম খন্ড) (১৭৯৫-১৯০০) এ, মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রাঃ লিঃ তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৬৮।
৬৫. ভট্টাচার্য আশুতোষ	—	বাংলা সামাজিক নাটকের বিবর্তন

- জাতীয় সাহিত্য পরিষদ
প্রথম প্রকাশ ২৫শে বৈশাখ, ১৩৭১।
৬৬. ভট্টাচার্য শঙ্কর — বাংলা রঙ্গালয়ের ইতিহাসের উপাদান
(১৮৭২-১৯০০) পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ
আগস্ট ১৯৮২।
৬৭. মুখোপাধ্যায় সত্যজীবন — দৃশ্যকাব্য-পরিচয়
বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির
প্রথম সংস্করণ ১৯৫০।
৬৮. মুখোপাধ্যায় প্রসূন — বাঙালী মধ্যবিত্তের থিয়েটার (প্রথম খণ্ড)
প্রজ্ঞা প্রকাশন
বইমেলা ১৯৯২।
৬৯. মুখোপাধ্যায় প্রভাতকুমার — রামমোহন ও তৎকালীন সমাজ ও সাহিত্য
বিশ্বভারতীগ্রন্থন বিভাগ
জৈষ্ঠ ১৩৭৯ : ১৮৯৪ শক।
৭০. মুখোপাধ্যায় শ্রীধর — কলকাতা : উনিশ শতক ঘটনাক্রম
মহাদিগন্ত
জানুয়ারি, ২০০৮।
৭১. মুখোপাধ্যায় হরিমোহন — বঙ্গভাষার লেখক, বঙ্গবাসীর সহকারী সম্পাদক,
হরিমোহন মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা, ভবানীচরণ
দত্তের স্ট্রীট, বঙ্গবাসী ইলেক্ট্রো মেসিন্ যন্ত্রে, শ্রীযুক্ত
নুটবিহারী দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
৭২. মুখোপাধ্যায় অমিতাভ — উনিশ শতকের সমাজ ও সংস্কৃতি (প্রবন্ধ সংগ্রহ)
বাংলা একাডেমী, ঢাকা
প্রথম সংস্করণ, সেপ্টেম্বর ১৯৭১।
৭৩. মুখোপাধ্যায় বৈদ্যনাথ — নবজাগরণ ও মানবিকতাবাদের ভূমিকায় দীনবন্ধুর
নাটক
বর্ণালী, মার্চ, ১৯৭৬।

৭৪. মুরশিদ গোলাম	—	সমাজ সংস্কার আন্দোলন ও বাংলা নাটক বাংলা একাডেমী ঢাকা ১৯৮৪।
৭৫. মিত্র অরুণকুমার	—	অমৃতলাল বসুর জীবনী ও সাহিত্য নাভানা জানুয়ারি ১৯৭০।
৭৬. মিশ্র অশোককুমার	—	বিধবা বিবাহ ও বাংলা কবিতা সেন্ট্রাল বুক পাবলিশার্স, কলকাতা ১৯৯০।
৭৭. মিত্র রাধারমণ	—	কলিকাতা দর্পণ (প্রথম পর্ব) সুবর্ণরেখা পঞ্চম মুদ্রণ, ২০০৮।
৭৮. মিশ্র অশোককুমার	—	বাংলা প্রহসনের ইতিহাস মডার্ন বুক এজেন্সী ১৯৮৮।
৭৯. মৈত্র জ্ঞানেশ	—	নারী জাগৃতি ও বাংলা সাহিত্য ন্যাশনাল পাবলিশার্স এপ্রিল ১৯৮৭।
৮০. রায় শ্রীকার্ত্তিকেয়চন্দ্র	—	ক্ষিতীশ-বংশাবলী-চরিতার্থাৎ নবদ্বীপের রাজবংশের বিবরণ কলিকাতা, নূতন সংস্কৃত যন্ত্র, সংবৎ ১৯৩২।
৮১. রায় অলোক	—	উনিশ শতক প্রমা জানুয়ারি ২০০২।
৮২. রায় সুশীল	—	জ্যোতিরিন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা বৈশাখ ১৩৭০।

৮৩. রাহা কিরণময় (অনু: কুমার রায়)	—	বাংলা থিয়েটার ন্যাশানাল বুক ট্রাস্ট, ইন্ডিয়া, নয়াদিল্লি ১৯৮৫।
৮৪. লাহিড়ী শিপ্রা	—	ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও বাংলা সাহিত্য কবি ও কবিতা প্রকাশন ৩০ শে শ্রাবণ, ১৩৬৩।
৮৫. শর্মা চিরঞ্জীব	—	কেশব-চরিত তৃতীয় সংস্করণ, ভট্টাচার্য্য এন্ড সন্স, কলিকাতা, ঢাকা ও ময়মনসিংহ, শ্রাবণ ১৩৩৮।
৮৬. শর্মা নারায়ণচন্দ্র সম্পাদিত	—	বিদ্যাসাগরের গ্রন্থাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, কলিকাতা, সংস্কৃত যন্ত্র, কলিকাতা লাইব্রেরি হইতে প্রকাশিত, ২৫ নং সুকিয়াস স্ট্রীট, ২রা আশ্বিন ১৩০২ [১৮৯৫]।।
৮৭. শাস্ত্রী শিবনাথ	—	আত্মচরিত সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ প্রথম প্রকাশ ১৯৮২, ২০০০ সংস্করণ।
৮৮. শাস্ত্রী শিবনাথ	—	রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ সম্পাদনা বারিদবরণ ঘোষ নিউ এজ, ২০০৯।
৮৯. শীল বৈদ্যনাথ	—	বাংলা সাহিত্যে লঘু নাট্যের ধারা ইউ. এন. ধর অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিঃ অক্ষয় তৃতীয়া, ১৩৬৬।
৯০. সরকার বিহারীলাল	—	বিদ্যাসাগর। সমালোচনা-সংবলিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জীবনী। শ্রীহরিপদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত চতুর্থ সংস্করণ, ১৩২৯ সাল, কলিকাতা।
৯১. সেন সুকুমার	—	বটতলার ছাপা ও ছবি আনন্দ পাবলিশার্স

- প্রথম সংস্করণ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৪।
৯২. সেন সুকুমার — বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস
(৩য় ও ৫ম খন্ড)
আনন্দ পাবলিশার্স।
৯৩. সেন ত্রিপুরাশঙ্কর — উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্য
পপুলার লাইব্রেরী
বৈশাখ, ১৩৬৫।
৯৪. সেনশাস্ত্রী ত্রিপুরাশঙ্কর — শিবচন্দ্র দেব ও বাংলার ঊনবিংশ শতাব্দী
সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ,
মাঘোৎসব, ১৩৬৭।
৯৫. সেনগুপ্ত প্রদ্যোৎ — বাংলার সামাজিক জীবন ও নাট্যসাহিত্য (১৮৫০-১৯০৫)
সাহিত্যশ্রী
৭ই অক্টোবর, ১৯৭৬।
৯৬. সিংহ রায় গোরী — দেবেন্দ্রনাথ সেনের শ্রেষ্ঠ কবিতা
(সম্পাদিত)
ভারবি,
জানুয়ারি ২০০২।

ইংরেজি গ্রন্থ :

১. Mozoomdar Pratap Chandra - *The Life And Teachings of Keshub Chunder Sen,*
Calcutta, 1887. 1st Edition.
২. Mitra Trailokyanath - *The Law Relating to Thacker The Hindu Widow,*
Splnk And Co
Calcutta, 1881.
৩. Mukherjee Sushil Kumar - *The Story of Calcutta Theatre (1753-1980)*
K P Bagchi & Company
Calcutta : New Delhi
৪. Mitra Trailokyanath - *The Law Relating to The Hindu Widow*

Thacker, Spink, And Co.
1861

৫. Vidyasagar Iswarchandra - *Marriage of Hindu Widows*
Calcutta, The Sanskrit Press,
Second Edition, 1864.

৬. James W Furrell - *The Tagore Family*
Kegan Paul, Trench & Co. S,
London, 1882,

বাংলা সাময়িক পত্র :

১. *আর্যদর্শন* (১২৮১-১২৯১) — সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস, পুরাবৃত্ত, বার্তাশাস্ত্র, জীবনবৃত্ত, শব্দশাস্ত্র ও সঙ্গীতাদি-বিষয়ক মাসিকপত্র ও সমালোচন, শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যাভূষণ এম্ এ সম্পাদিত, কলিকাতা, ৪৩ নং মলঙ্গা লেন বহুবাজার, নূতন ভারতযন্ত্রে শ্রীরামনৃসিংহ বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত, মূল্য ৩ টাকা, ডাকমাশুল সমেত ৪ টাকা।
২. *জন্মভূমি* (১২৯৭-১৩০৪) — মাসিক পত্র, কলিকাতা ৩৪।১ কলুটোলা স্ট্রীট, বঙ্গবাসী-স্টীম-মেসিন প্রেসে শ্রীকেবলরাম চট্টোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত, সন ১২৯৮ সাল।
৩. *তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা* (১৭৭১-১৭৯৩ শকাব্দ) — সম্পাদক অক্ষয় কুমার দত্ত।
৪. *নবজীবন* (১২৯১-১২৯৬) — শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র সরকার কর্তৃক সম্পাদিত, ৫১ নং মৃজাপুর স্ট্রীট, সাধারণী প্রেসে শ্রীউমাচরণ চক্রবর্তী দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত, মূল্য তিন টাকা।
৫. *নব্যভারত* (১২৯৭-১৩২৩) — মাসিক পত্র ও সমালোচন, সম্পাদক শ্রীদেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী ২১০/৪

- কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, নব্যভারত কার্যালয় হইতে
প্রকাশিত, ৬/১ নং পার্শ্বতীচরণ ঘোষের
লেন, যোড়াসাঁকো কলিকাতা প্রিন্টিং ওয়ার্কস
যন্ত্রে শ্রীচণ্ডীচরণ দাস দ্বারা মুদ্রিত।
৬. পরিচারিকা(১২৮৫-১৩০৮) — মাসিক পত্রিকা, কলিকাতা ৭৮ নং অপার
সারকিউলার রোড, আর্যনারীসমাজ কর্তৃক
সম্পাদিত এবং বিধান যন্ত্রে শ্রীরামসর্বস্ব
ভট্টাচার্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত, অগ্রিম
বার্ষিক মূল্য ২ টাকা।
৭. প্রদীপ(১৩০৪-১৩১২) — সচিত্র মাসিক পত্রিকা, শ্রীরামানন্দ
চট্টোপাধ্যায় এম.এ সম্পাদিত, ২১।১ সুকীয়া
স্ট্রীট “প্রদীপ” কার্যালয় হইতে শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ
দাস কর্তৃক প্রকাশিত, অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২
টাকা।
৮. প্রবাসী(১৩০৮-১৩১২) — সচিত্র মাসিক পত্র, সম্পাদক শ্রীরামানন্দ
চট্টোপাধ্যায়, এম.এ, এলাহাবাদ, অগ্রিম
বার্ষিক মূল্য তিন টাকা।
৯. বঙ্গদর্শন(১২৮০-১২৯৭) — মাসিক পত্র ও সমালোচন, শ্রী বঙ্কিমচন্দ্র
চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক সম্পাদিত, কাঁঠালপাড়া,
বঙ্গদর্শন যন্ত্রে শ্রীহারাগচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত, মূল্য ৩ টাকা,
ডাকমাশুল সমেত ৪ টাকা।
১০. বঙ্গমহিলা(১২৮১-১২৮৩) — মাসিক পত্রিকা ও সমালোচন, চোরবাগান-
বালিকা-বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষসভা সম্পাদক
শ্রীভুবনমোহন সরকার কর্তৃক সম্পাদিত ও
প্রকাশিত, কলিকাতা, শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বসু
কোম্পানির বহুবাজারস্থ ২৪৯ সংখ্যক ভবনে

- ষ্ট্যানহোপ যন্ত্রে মুদ্রিত, মূল্য ১ টাকা,
ডাকমাশুল সমেত ২ টাকা।
১১. বান্ধব(১২৮১-১৩১১) — মাসিক প্রবন্ধ ও সমালোচনা, শ্রীকালীপ্রসন্ন
ঘোষ কর্তৃক সম্পাদিত, ঢাকা-গিরিশযন্ত্র, মুন্সি
মওলাবক্স প্রিন্টার কর্তৃক প্রকাশিত, মূল্য তিন
টাকা।
১২. বামাবোধিনী পত্রিকা(১২৮৩-১৩১৩) — ‘কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত
শিক্ষা দিবেক’, সম্পাদক উমেশচন্দ্র দত্ত, ১৭
নং রঘুনাথ চাটুর্ঘ্যের স্ট্রীট ব্রান্সমিসন্ প্রেসে
শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত দ্বারা মুদ্রিতও
শ্রীআশুতোষ ঘোষ কর্তৃক আন্টনিবাগান লেন
৯নং ভবন, বামাবোধিনী কার্যালয় হইতে
প্রকাশিত, মূল্য চারি আনা।
১৩. বিবিধার্থ সংগ্রহ(১৭৭৬-১৭৭৭ শকাব্দ)—অর্থাৎ পুরাবৃত্তেতিহাস-প্রাণিবিদ্যা-শিল্প
সাহিত্যাদি-দ্যোতক মাসিক পত্র, সম্পাদক
রাজেন্দ্রলাল মিত্র, কলিকাতা,
ব্যাপ্তিস্ত-মিশন-যন্ত্রে মুদ্রিত।
১৪. ভারতী(১২৮৪-১৩০৯) — মাসিক সমালোচনী পত্রিকা, শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ
ঠাকুর কর্তৃক সম্পাদিত, কলিকাতা আদি
ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে শ্রীকালিদাস চক্রবর্তী কর্তৃক
মুদ্রিত ও প্রকাশিত, মূল্য ৩টাকা, মাশুল
সমেত ৪ টাকা।
১৫. মধ্যস্থ(১২৮০-১২৮২) — মাসিক পত্র, কলিকাতা-৩০ নং করন্‌ওয়ালিস
স্ট্রীট, মধ্যস্থ যন্ত্রালয়ে মুদ্রিত, অগ্রিম বার্ষিক
মূল্য তিন টাকা।
১৬. মহিলা(১৩০৩-১৩১৬) — মাসিক পত্রিকা, পত্রাদি কার্য্যাদ্যক্ষ শ্রীযুক্ত
কান্তিচন্দ্র মিত্র, ৩নং রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট,

- কলিকাতা, ডাকমাশুলসহ বার্ষিক মূল্য
২টাকা।
১৭. *রহস্য সন্দর্ভ* (সংবৎ ১৯২০-১৯২৯) — নাম, পদার্থ-সমালোচক মাসিক পত্র,
সম্পাদক রাজেন্দ্রলাল মিত্র, ব্যাপ্তিস্ত মিশন
যন্ত্রে মুদ্রিত, কলিকাতা।
১৮. *সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়* (১৮৭০-১৮৭২) — প্রাত্যহিক পত্র, সম্পাদক শ্রীহরচন্দ্র
বন্দ্যোপাধ্যায়, রেজিস্ট্র নং ৫৪, মাসিক
১টাকা, অগ্রিম ৮ টাকা।
১৯. *সংবাদ প্রভাকর* (১৮৫৩-১৮৬৪) — প্রাত্যহিক পত্র, সম্পাদক ঈশ্বর গুপ্ত,
পাথুরিয়াঘাটা, মাসিক মূল্য ১ তঞ্চা।
২০. *সচিত্র শিশির* (১৩৩১-১৩৩৪) — সম্পাদক শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার, প্রকাশক
শিশির পাবলিশিং হাউস, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট,
কলিকাতা।
২১. *সংবাদ ভাস্কর* (১২৫১-১২৬১) — সম্পাদক শ্রীনাথ রায়, কলিকাতা সিমলা, মূল্য
মাসে ১ টাকা, আগামি ৮ টাকা।
২২. *সাধনা* (১২৯৯-১৩০২) — মাসিক পত্রিকা, শ্রীসুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর
সম্পাদিত, কলিকাতা, আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে,
শ্রীকালিদাস চক্রবর্তী দ্বারা মুদ্রিত ও
প্রকাশিত, ৫৫ নং অপার চিৎপুর রোড।
২৩. *সাহিত্য* (১২৯৭-১৩১০) — মাসিক পত্র ও সমালোচনা, সম্পাদক
সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, কলিকাতা ৩নং বিডন
স্কোয়ার, নূতন কলিকাতা যন্ত্রে,
শ্রীউপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত
ও শ্রীবিহারীলাল দাস কর্তৃক মুদ্রিত।
২৪. *সোমপ্রকাশ* (১২৬৮-১২৮৬) — সাপ্তাহিক পত্রিকা, সম্পাদক দ্বারকানাথ
বিদ্যাভূষণ, মাসিক মূল্য ১ টাকা, বার্ষিক
অগ্রিম ১০ টাকা।

সাহিত্য-পত্রিকা :

১. প্রসূন ধর সম্পাদিত — ‘সংবর্তক’ প্যারীচাঁদ মিত্র বিশেষ সংখ্যা
একাদশ বর্ষ : প্রথম সংখ্যা
জানুয়ারি ২০১৬।
২. শিবপ্রসাদ চক্রবর্তী সম্পাদিত— ‘চতুষ্কোণ’ বিশেষ নাটক সংখ্যা
ষোড়শ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা
বৈশাখ ১৩৮৩।
৩. তারাপদ রায় সম্পাদিত — পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যাসাগর সংখ্যা
তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ
বসুমতী কর্পোরেশন লিমিটেড
১৬, ২৩, ৩০ সেপ্টেম্বর ও ৭ অক্টোবর, ১৯৯৪।

পরিশিষ্ট

বিধবোদ্ধাহ নাটক।

শ্রীযুক্ত উমাচরণ চট্টোপাধ্যায় ।

কর্তৃক

বিরচিত ।

কলিকাতা ।

অনুবাদ প্রেসে মুদ্রাস্থিত হইল।

শকাব্দ ১৭৭৮ ।

উ পুস্তক যাহান প্রয়োজন হইবেক সহর কলিকাতা বোডা-
র অনুবাদ বন্দালয়ে অথবা কলু টোলা মুরতির বাগানে
এনে, অধেষণ করিলে পাঠিতে পাবিবেন ।

মূল্য ১ তহা মাত্র ।

শ্রীউমাচরণ চট্টোপাধ্যায়ের 'বিধবোদ্ধাহ' (১৮৫৬) নাটকের
নাম পৃষ্ঠার প্রতিকল্প ।

বিধবানমোরঞ্জন
নাটক।

প্রথমভাগ।

শ্রীরাধামাধব মিত্র প্রণীত।

শ্রীনবীনচন্দ্র বসু কর্তৃক
প্রকাশিত।

কলিকাতা।

গরানখাটা ট্রীটে পাঁচু দস্তের গলিতে ৯২ নং ভবনে
গ্রীসেখ সেরাজ জমাদারের

শ্রীরাধামাধব মিত্র প্রণীত 'বিধবা মনোরঞ্জন' (১৮৫৬) নাটকের
নাম পৃষ্ঠার প্রতিক্রম।

বিধবা বিষম বিপদ।

—••—

মুখোপাধ্যায়ের রক্তডুমি প্রবেশ।

মুখো—(দোহা কাঁধে, রক্তের চারি পাশে ভ্রমণ করিয়া
উল্লসিত) কোথা গো চাডুঘো বাড়ী আছে?

চট্টোপাধ্যায়ের প্রবেশ

চট্টো—(সজল নয়ন) আস্তে আজ্ঞা হউক, আহুন।

মুখো—বাড়ীর ভিতর কি করতেন? বাঁদেছ, কেন?

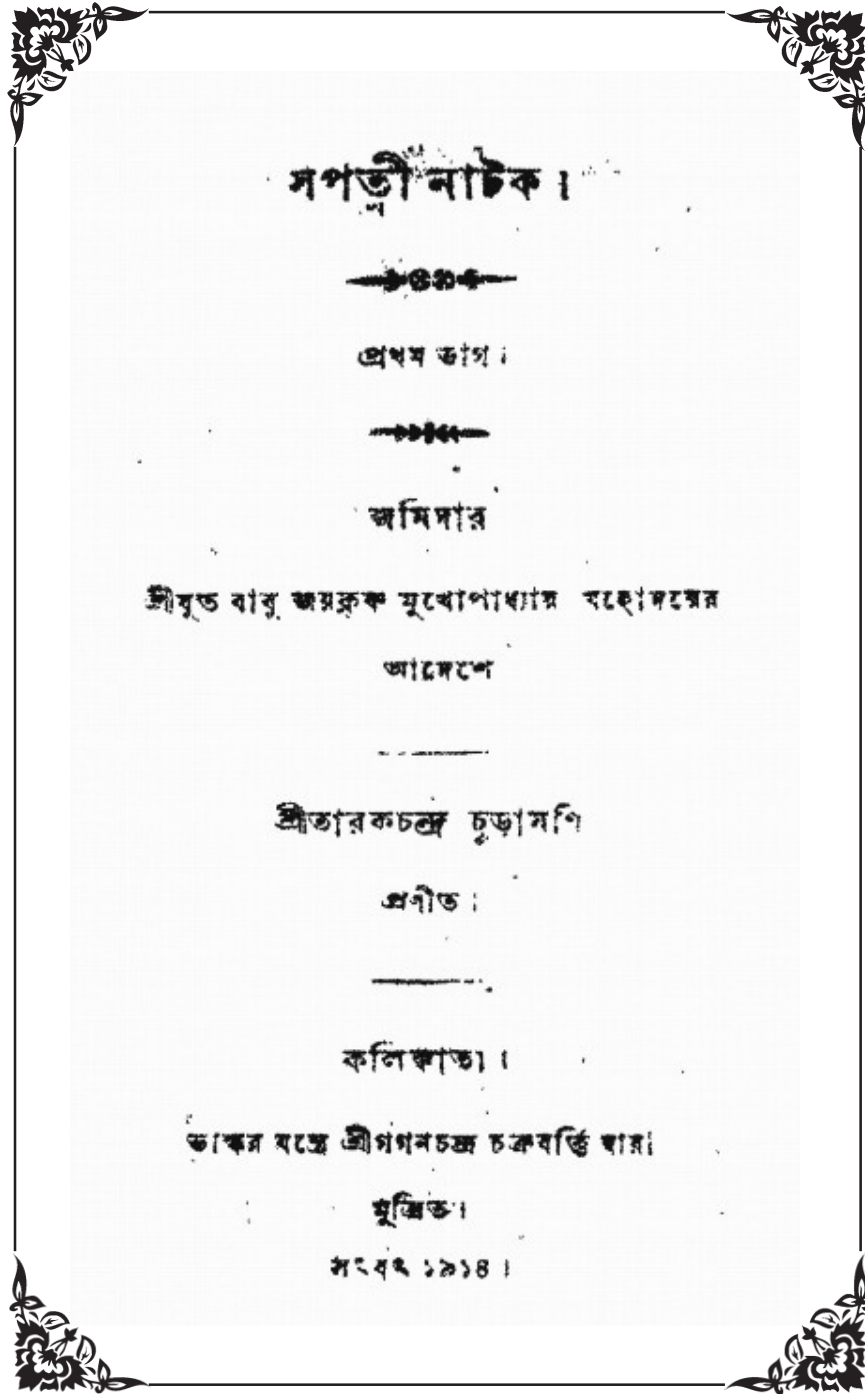
চট্টো—(করুণ বচন) মুখুয্যে মহাশয় গো! কারার কথা
বলেন কেন? কন্যা সন্তান, বড়ই যন্ত্রণা। বছর
খানেক হলো, একটি কুলীনের ছেলে ডেকে তিনটে
মেয়েই সম্প্রদান করিয়াছিলাম। বিস্তর খরচপত্র
হয়েছিল। আমাইটি দেখতে গুণ্ডে দিব্যী ছিল।
কালি খবর পেয়েছি, সেটি গভ হয়েচে।

(সজল নয়ন, গরম বচন)

মহাশয় গো! কি দুঃখ! একেবারে তিনটে মেয়েই
বিধবা! আঁহা! মেয়ে গুলি যেমন দুঃখী, তেমন
দুঃখীল। কালি ভাষাদের পতি বিকোণ গুলিয়া
যেহেতু ক্রমশ ও কাভবানি 'দরিদ্রতা' 'দুঃখ' '...

অঞ্জনা নামা রচিত 'বিধবা বিষম বিপদ' (১৮৫৬)

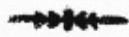
নাটকের একটি পৃষ্ঠার প্রতিকৃতি।



সপত্নী নাটক ।



প্রথম ভাগ ।



অমিদার

শ্রীযুত বাবু জয়রূপ যুগোপাধ্যায় বহোদয়ের

আদেশে



শ্রীতারকচন্দ্র চূড়ামণি

প্রণীত ।

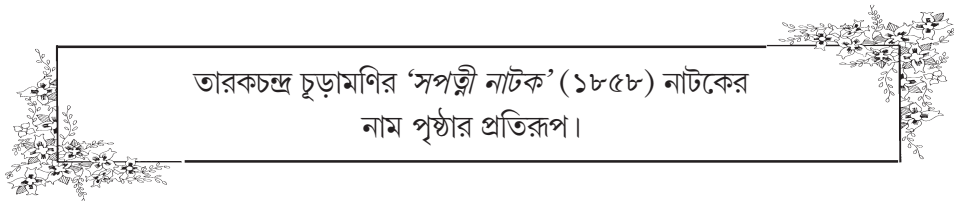


কলিকাতা ।

ভাস্কর যন্ত্রে শ্রীগগনচন্দ্র চক্রবর্ত্তি দ্বারা

মুদ্রিত ।

সংবৎ ১৯১৪ ।



তারকচন্দ্র চূড়ামণির 'সপত্নী নাটক' (১৮৫৮) নাটকের
নাম পৃষ্ঠার প্রতিক্রিয়া ।

বিধবা বিরহ নাটক



শ্রীশিমূয়েল পিরবক্স প্রণীত।



যদি এই গ্ৰন্থ ক্রয় করিতে কাহারি ইচ্ছা হয়, তবে
কলিকাতা মোকামের ইটালী কামার ডাঙ্গায়, ভি ও আর,
চিহ্নিত বাতিতে, লোক পাঠাইলে পাওয়া যাইবে।

CALCUTTA:

PRINTED AT THE BAPTIST MISSION PRESS.

1860.

শ্রী শিমূয়েল পিরবক্স প্রণীত 'বিধবা বিরহ নাটক' (১৮৬০)

এর নাম পৃষ্ঠার প্রতিরূপ।

শ্রী শ্রী জগদীশ্বরায় নমঃ ।

বাল্যোদ্ধাহ নাটক ।



শ্রী শ্যামাচরণ শ্রীমানি

কর্তৃক

প্রণীত ।

কলিকাতা ।

স্বর্ঘ্যাদয় যন্ত্রে মুদ্রিত হইল ।

শকাব্দ ১৭৮২

মূল্য ১০ ছয় আনা মাত্র ।

শ্রী শ্যামাচরণ শ্রীমানি প্রণীত 'বাল্যোদ্ধাহ নাটক' (১৮৬০) নাটকের
নাম পৃষ্ঠার প্রতিক্রম ।

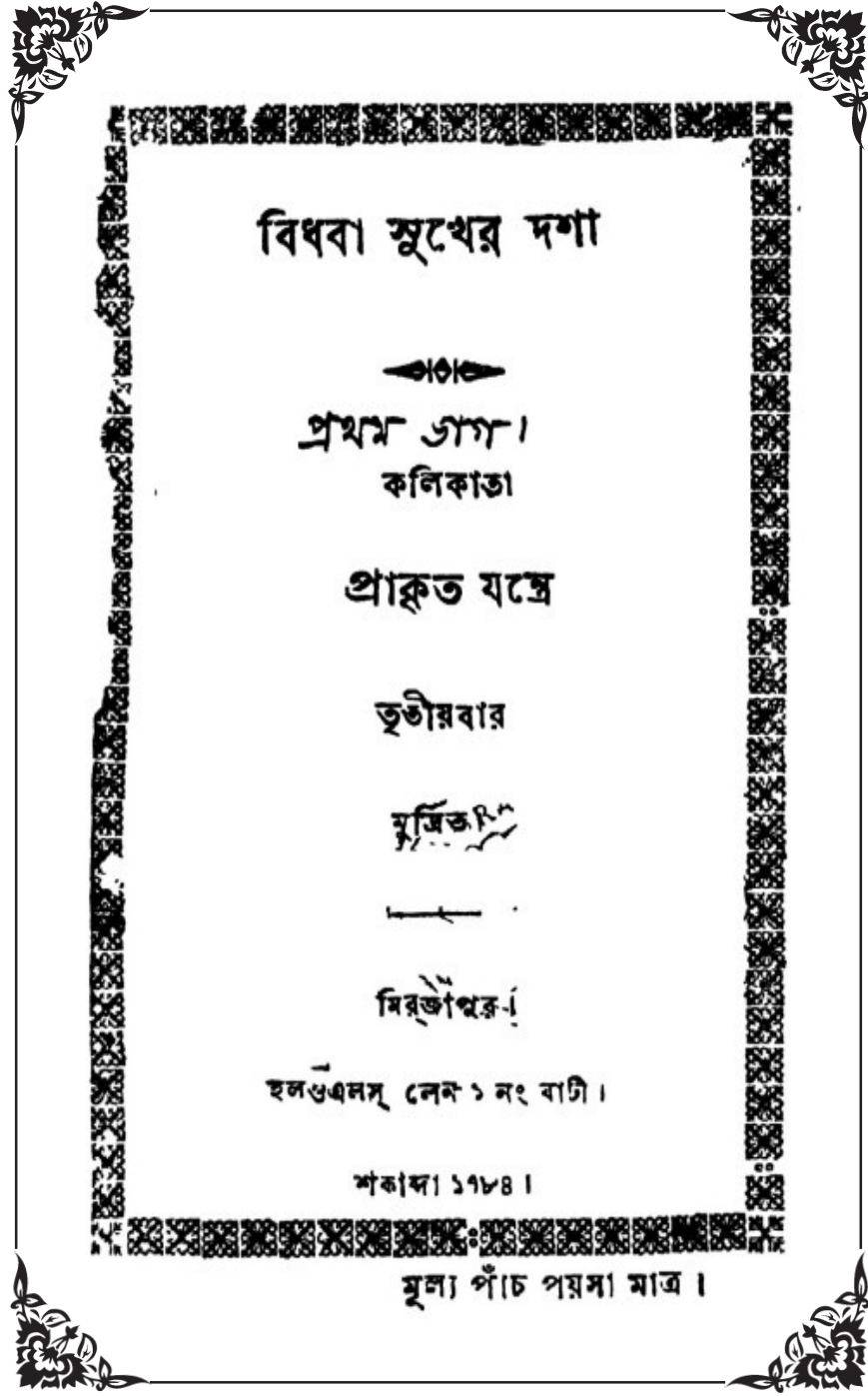
দলভঞ্জন নাটক।

প্রথম অঙ্ক।

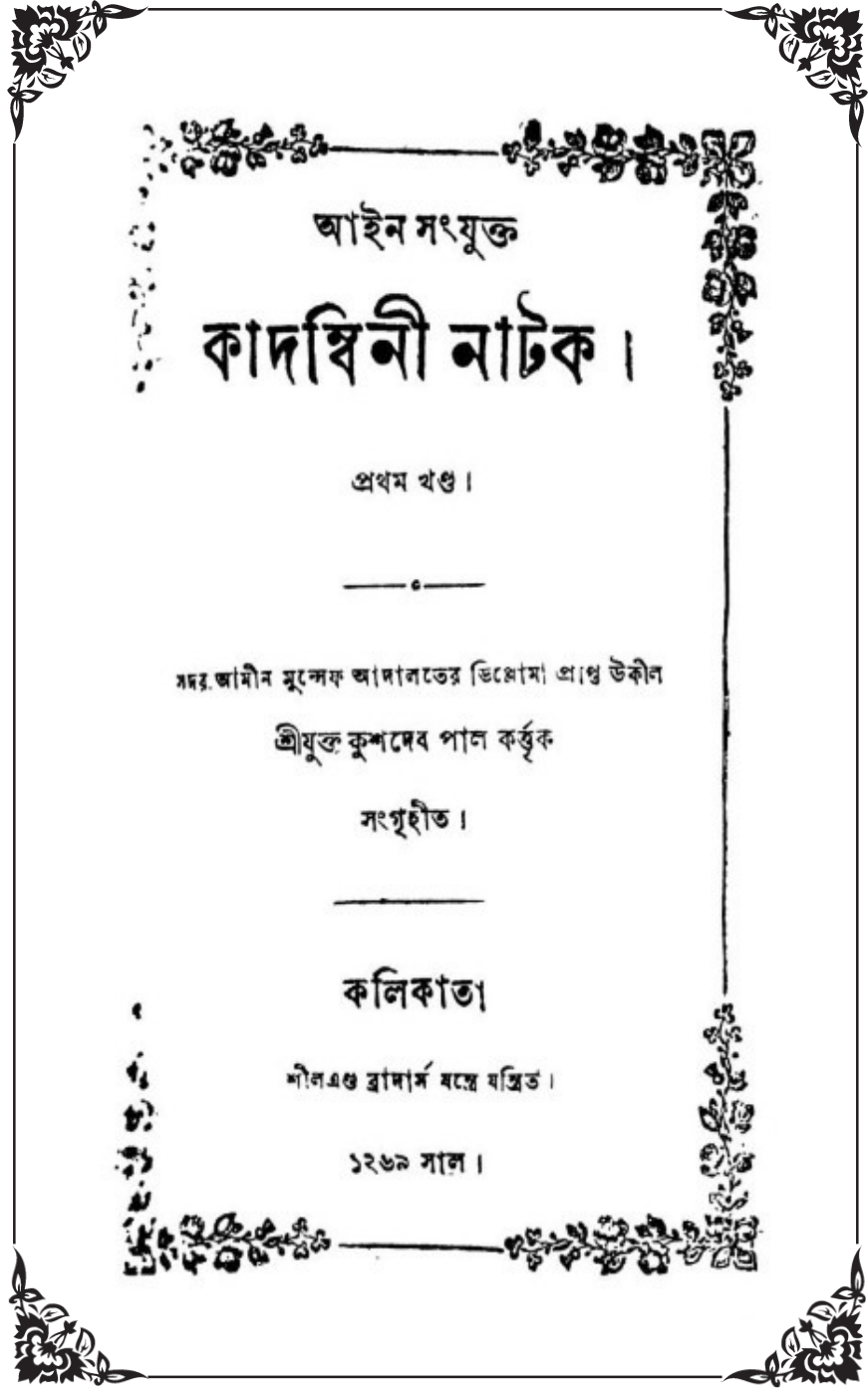
[মুখোপাধ্যায়ের দোতালার উপস্থিতি।]

মধু। (সগত।) হায় হায় হলো কি! শালার দেশে আগুন লেগেছে! তখন তখন পালমশাগের শীষের মত পয়নার এক এক মাটি রাজা মিলতো: চাউ পয়নার আকিম কিনলে কাটা পাকা হরেক রকম করে খাওয়া যেতো, চরসও এত মাগি ছিল না। এ যে কথায় বলে “নড়ো চড়ো বুড়ীর—হাত” তা বেটারা চাল, কাট, পাট, নীল ছেড়ো কেবল উঠে পড়ো আবগারীর সঙ্গে লেগেছে। কলো পাঁচি, আবার নাকি শুকুর উপর লাগে লাগে হয়েছে। নীলকরেরা যেমন চামার উপর লেগেছে, এ বেটারাও তেমনি আমাদের উপর উঠে পড়ো দেগেছে। সে যা হোক, আস হাতে একটা পয়সা নেই, ঘরে একটু মাগও নেই, বেলাটা অধিক হয়েছে, ঘন ঘন হাই উঠে, গাটা মাটি মাটি কচে। (কিকিৎসাবিহ্ন।) হাই দেখি এক বার কান্ডে বেটারা কান্ডে, যদি এ বেলাটার কোন রকম জেগে উঠে পারে। আর দেখি দেখি যদি

হারাণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের ‘দলভঞ্জন নাটক’ (১৮৬১) নাটকের
একটি পৃষ্ঠার প্রতিক্রম।



অজ্ঞাতনামা রচিত 'বিধবা সূখের দশা' (১৮৬২) নাটকের
নাম পৃষ্ঠার প্রতিকৃতি।



কুশদেব পাল রচিত 'আইন সংযুক্ত কাদম্বিনী নাটক' (১ম খণ্ড, ১৮৬২)
নাটকের নাম পৃষ্ঠার প্রতিরূপ।

আইন সংযুক্ত
কাদম্বিনী নাটক।

দ্বিতীয় খণ্ড।

— ০০ —

সদন আইন মন্ডল অধিবেশনের ভিত্তিতে প্রাপ্ত উক্তি।

শ্রীযুক্ত কুশদেব পাল কর্তৃক
সংগৃহীত।

কলিকাতা।

শীল ৬৬ ব্রাদার্স বক্সে মুদ্রিত।

১২৬৯ সাল।

কুশদেব পাল রচিত 'আইন সংযুক্ত কাদম্বিনী নাটক' (২য় খণ্ড, ১৮৬২)
নাটকের নাম পৃষ্ঠার প্রতিক্রম।

ম্যাও ধরবে কে ?

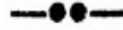


শ্রী-বিশ্বচন্দ্র মিত্র প্রণীত ।

“অক্সোরাপি গুণাবল্যা দোষাবল্যা গুরোরাপি ।

.....”

বিরচিত পঙ্ক ।



বরেন্দ্র সিংহ মিউজিয়াম

গো ই ব্রু রী

সন ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দ

ঢাকা হৃদনবস্ত্রে মুদ্রিত ।

শ্রীহরিশচন্দ্র মিত্র প্রণীত ‘ম্যাও ধরবে কে ’ (১৮৬২) নাটকের
নাম পৃষ্ঠার প্রতিরূপ ।

পুনর্বিবাহ নাটক

শ্রী গুরুপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রণীত ।

কলিকাতা

গৌড়ীয় বজ্রে

মুদ্রিত ।

সন ১২৩২ শাব্দ ।

মূল্য ৥০ আনা মাত্র ।

গুরুপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘পুনর্বিবাহ’ (১৮৬২)

নাটকের নাম পৃষ্ঠার প্রতিকৃতি ।

CONSOLATION TO THE HEART

BY

JODOO NATH CHATTERJEE

বিধবাবিলাস

নাটক।

অর্থাৎ

বিধবা বিধবা লক্ষ্মীনাথের বিবাহ প্রাপ্ত প্রত্যাহিত
কিন্তু একান্তে এতদেশে যে সময় হইতে
যেহেতু তাহার মুক্তিসময় নানান
প্রদর্শনপুর্কক
গোপনীয় সংবাদ সহ
এতৎ প্রস্তাব
ঐ যদুনাথ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক
বিরচিত হইয়া

কলিকাতার "ইন্ডিয়ান প্রেস" দ্বারা
প্রথম বেরাফিলিস সত্তদাতা মুদ্রিত হইল।

ইং সন ১৮৬৪।

বঙ্গাব্দ ১২৭১।
মূল্য দশ আনা মাত্র।

যদুনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত 'বিধবা বিলাস নাটক' (১৮৬৪) এর
নাম পৃষ্ঠার প্রতিক্রিয়া।

বিধবার দাঁতে মিশি ।

(দৃশ্য কাব্য)

শ্রীগোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

প্রণীত ।

BIDHOBAR DANTE MISEE.

BY

GOPAL CHUNDRA MUKHOPADHYAYA.

CALCUTTA:

Printed by G. C. Parial, at the Local Press,

No 38 Sooryparah Lane, Simlah.

ALL RIGHTS RESERVED.

1874.

শ্রীগোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'বিধবার দাঁতে মিশি' (১৮৭৪)

নাটকের নাম পৃষ্ঠার প্রতিকল্প ।

বিধবা-সঙ্কট ।

(সমাজ-নাট্য ।)

এমারেল্ড থিয়েটারে অভিনীত ।

কলিকাতা ১৫১ নং বারানসীঘোষের ষ্ট্রীট
রিপণ প্রেস এজেন্সী হইতে

ঐপ্রভাত চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বারা

প্রকাশিত ।

মূল ১২৯৭ পাল ।

All rights reserved.

মূল্য ৭০ ছয় আনা ।

জামিন্দারগণের নিকট

অজ্ঞাতনামা রচিত 'বিধবা-সঙ্কট' (১৮৯০) নাটকের
নাম পৃষ্ঠার প্রতিরূপ ।

বিলাপ !

বা

বিদ্যাসাগরের স্বর্গে আবাহন ।

ক্টার থিয়েটারে অভিনীত ।

(৬ই ভাদ্র সন ১২৯৮ সাল)

"As Vidyasagara died, Charity shrieked."

Indian Nation.

কলিকাতা ২ নং মল্লিক লেন হইতে

শ্রীঅমৃতলাল বসু প্রণীত ও প্রকাশিত ।

কলিকাতা ;

৬ নং ভীমঘোষের লেন, গ্রেট ইডেন প্রেস

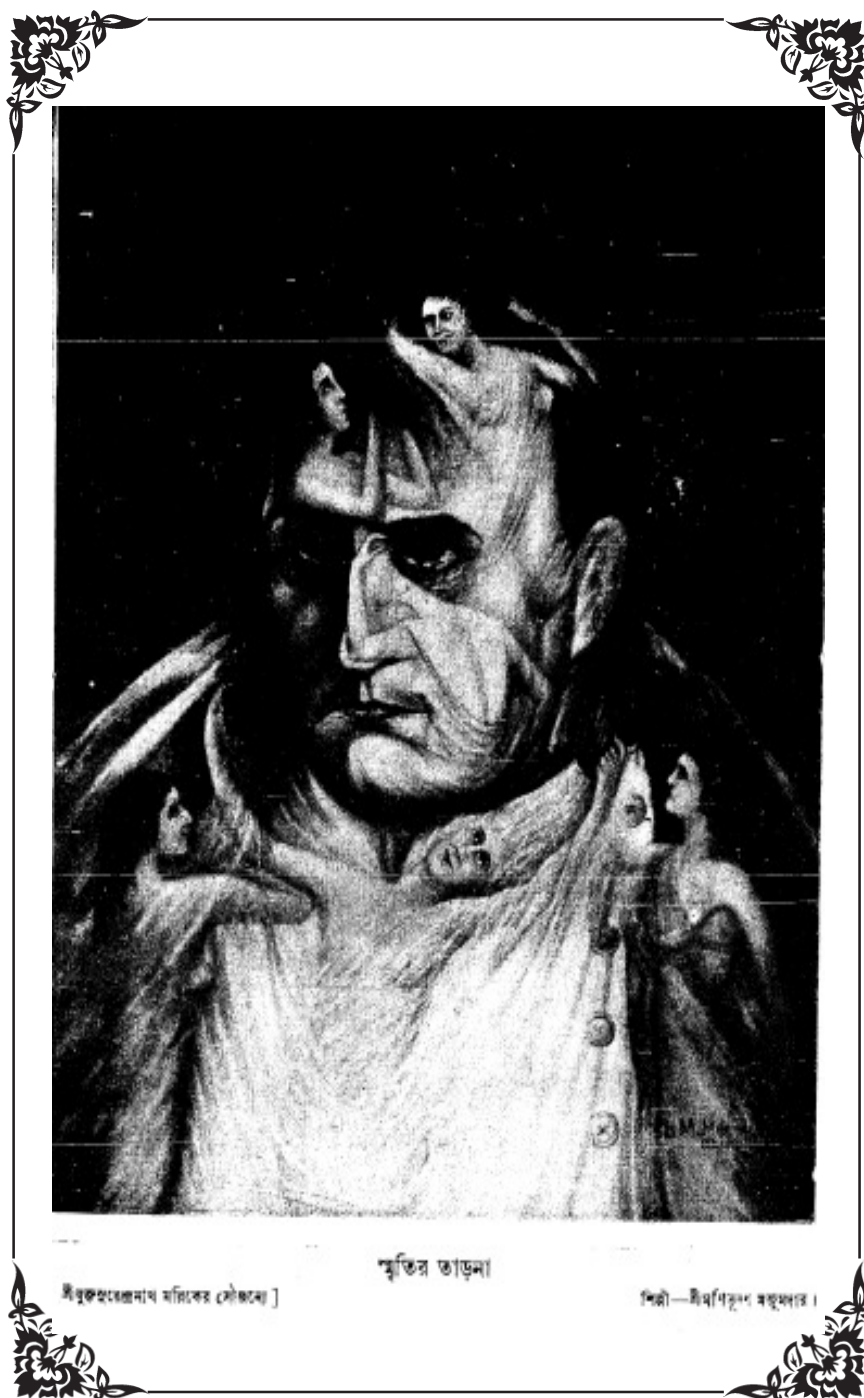
ইউ, সি, বসু এণ্ড কোম্পানি দ্বারা মুদ্রিত ।

সন ১২৯৮ সাল ।

মূল্য ৮০ আনা ।

অমৃতলাল বসুর 'বিলাপ ! বা বিদ্যাসাগরের স্বর্গে আবাহন' (১৮৯১)

নাটকের নাম পৃষ্ঠার প্রতিক্রিয়া ।



বিজয়রত্ন মজুমদার সম্পাদিত 'সচিত্র শিশির' পত্রিকার ফাল্গুন ১৩৩২,
সংখ্যায় প্রকাশিত বিদ্যাসাগরের একটি চিত্রলিপি।

নির্ঘণ্ট

নির্ঘণ্ট

অজ্ঞাতনামা	৬১, ৬৪, ৬৫, ১৩২, ১৪৮, ১৮৬, ২১৭
অমৃতলাল বসু	১৫২, ১৫৭, ২২৩
অক্ষয়কুমার দত্ত	৪
অশোকগুচ্ছ	৫২, ৫৮
অশ্রুংকণা	৫২, ৫৮
অশুভ পরিহারক	৫৬, ৬৪, ১১০
আইন সংযুক্ত কাদম্বিনী নাটক	৫৬, ৬৪, ১০৪-১০৯, ১৯৮, ২৬৬, ২৬৭
আত্মচরিত	১৭, ১৩৮
আত্মীয়সভা	১৩
অ্যাকাডেমি অ্যাসোসিয়েশন	৭
ইন্দিরাদেবী চৌধুরাণী	১৪৫
ইন্দুমতী দাসী	৪৮
ইয়ংবেঙ্গল গোষ্ঠী	১৩
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর	৪, ৫, ১১, ২৫, ৩২, ৪১, ৬৯, ৮৫, ১৩৯
ঈশ্বর গুপ্ত	৮, ১৪, ৩৩, ৩৪
উপেন্দ্রনাথ দাস	২৬, ১৩৬, ১৩৮, ২১০
উমেশচন্দ্র মিত্র	৬৮, ৬৯, ৭৩, ১৭৭, ১৮৪
এমন কর্ম আর করব না (অলীকবাবু)	৬৫, ১৪২, ১৪৩-১৪৬, ২১৪-২১৬
কপালকুণ্ডলা	১৪০
করুণা	৫৭
কুশদেব পাল	৫৬, ২৬৬
কালীপ্রসন্ন সিংহ	১০, ১৬
কুলীন কুল সর্বস্ব	৬৪, ৬৫, ৬৬, ১৭২-১৭৬
কৃষ্ণকান্তের উইল	৬১, ৬২
কেশবচন্দ্র সেন	৪, ১৮, ৭৩, ৭৪
গঙ্গেশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়	৬২
গিরিশচন্দ্র ঘোষ	১৬২
গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন	৮৯
গিরিন্দ্রমোহিনী দাসী	৪৬-৪৮
গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	১০৪, ২০৮
গোবিন্দচন্দ্র শর্ম্মা	২৭
গোবিন্দচন্দ্র চক্রবর্তী	১১০
গৌরমোহন বসাক	১১০
গুরুপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়	১০৯, ১৯৮
গুণাভিরাম শর্ম্মা	৮৫, ১৮৯
চপলাচিন্তাপল্য	৫৫, ৬৪, ৮১-৮৫, ১৮৭

চির সন্ধ্যাসিনী নাটক	১৩৯
জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়	৮৬, ৮৭
জনৈক ভদ্রমহিলা	১৩৯, ১৪০
জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর	৬৫, ১১২, ২১৪
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	১৭, ২৮, ৭৬
তরুণালা	৬৫, ১৫২-১৫৭, ২১৯-২২৩
তারকচন্দ্র চূড়ামণি	৮৭, ১৯০
ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়	১২৬, ২০৪
দলভঞ্জন নাটক	৫৬, ৬৪, ১০১, ১০২, ১৯৬, ২৬৪
দামোদর মুখোপাধ্যায়	৫১, ৫২
দাশুরথি রায়	৩৫, ৩৬
দীনবন্ধু মিত্র	৮৯, ১২২, ১৯২, ২০৩
দুঃখমালা	৪৮
দুর্গাদাস	১০৬
দেবেন্দ্রনাথ সেন	৪৫
নবনাটক	৫৭, ৬৪, ৬৬, ১০২, ১১৯-১২২
নব্যভারত পত্রিকা	৬২
নবীনচন্দ্র সেন	৪০-৪২
নারায়ণচন্দ্র	২১, ২২
নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য	১৪২
নীলদর্পণ	৫৬, ৬৪, ৮৯, ১৯২
নগেন্দ্রনাথ বসু	৭৩
পরশর সংহিতা	৯, ২৫, ৯৪
পুনর্বিবাহ নাটক	৫৬, ১৯০-১৯৮, ২৬৯
পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	৫০
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	৪, ৩০, ৪৯, ১৮৬
বসন্তরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়	১২২
বঙ্গবিধবা (নাটক)	১৪৬-১৪৮
বঙ্গকামিনী নাটক	৬৪, ১২৬-১২৮, ২০৫
বাবু (নাটক)	৬৫, ১৫৯-১৬২, ২২৩
বামাবোধিনী পত্রিকা	১৩৯
বিধবা কামিনী (কবিতা)	৪০
বিধবা (নাটক)	১৪২
বিধবা রমণী (কবিতা)	৩৯
বিধবা কলেজ	৬৫
বিধবা বিবাহ আইন (কবিতা)	১৪, ৩৪
বিধবা বিবাহ (কবিতা)	৩৯
বিধবা বিবাহ (পাঁচালী)	৪৫, ৪৬
বিধবা বিবাহ নিষেধ বিষয়ক ব্যবস্থা	৮
বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব	১০-১২, ২২-২৭, ৩২, ৮৩, ৯৪

বাল্যোদ্ধাহ নাটক	৫৬, ৬৪, ৯৭-১০০, ১৯৫, ১৯৬, ২৬৩
বিধবা বিবাহ নাটক	৫৫, ৬৪, ৬৮-৭৫, ৮১, ১৭৬-১৮৫
বিধবা বিবাহ বিষম দায়	৫৫, ৬৪, ৮৯
বিধবা বিষম বিপদ	৫৫, ৬৪, ৮০, ৮১, ১৮৬, ১৮৭, ২৬০
বিধবা বিরহ নাটক	৫৬, ৬৪, ৯০-৯৬, ১৯২-১৯৫, ২৬২
বিধবা বিলাস নাটক	৫৭, ৬৪, ১১১-১১৮, ১৯৯-২০২, ২৭০
বিধবা সঙ্কট নাটক	৬৫, ১৪৮, ২১৭, ২১৮, ২৭২
বিধবা সুখের দশা	৬৪, ২৬৫
বিধবা পরিণয়োৎসব	৫৫, ৬৪
বিধবা মনোরঞ্জন	৫৫, ৬৪, ৭৫-৮০, ১৮৫, ২৫৯
বিধবার দাঁতে মিশি	৬৪, ১৩৪-১৩৬, ২০৮, ২৭১
বিধবার ছেলে	৫২
বিধবা বঙ্গাঙ্গনা	৪৩-৪৬
বিধবোদ্ধাহ	৫৫, ৬৪, ৬৭, ৬৮, ২৫৮
বিষবৃক্ষ	৪৯, ৫০, ১৫৪
বিয়ে পাগলা বুড়ো	৫৭, ৬৪, ১২২-১২৫, ২০৩, ২০৪
বিলাপ বা বিদ্যাসাগরের স্বর্গে আবাহন	৬৫, ১৫৭-১৫৯, ২২৩, ২৭৩
ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন	৮
বিরজামোহন চৌধুরী	১৪৬, ২১৬
বিপিনমোহন সেনগুপ্ত	১২৮, ২০৬
বিহারীলাল সরকার	১৭, ২৬
বিবিধার্থ সংগ্রহ	৬৬
বীরঙ্গনা	৩৮
বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় (কবি ধীরাজ)	৩৮
ভ্রমর	১৬২
ভূদেব মুখোপাধ্যায়	৪, ১৮
মধুমতী	৫৩
মেঘনাদবধ নাটক	৬৪, ১২৬, ২০৪, ২০৫
মাইকেল মধুসূদন দত্ত	৩৮
মেট্রোপলিটান থিয়েটার	৭২
ম্যাও ধরবে কে?	৫৬, ৬৪, ১০২, ১৯৭, ২৬৮
মৃণালিনী	৫০
যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায়	৮১, ১৮৭, ১৮৮
যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর	৪, ৮৬
যদুনাথ চট্টোপাধ্যায়	১১১, ১৯৯
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	৫৩
রমেশচন্দ্র দত্ত	৫২
রামমোহন রায়	৪, ৫, ৯
রাজনারায়ণ বসু	৪, ১৮, ১৯, ২৭
রাধামাধব মিত্র	১৮৫

রাধামাধব কর	১৪২
রাজেন্দ্রলাল মিত্র	৬৬
রামনারায়ণ তর্করত্ন	৬৫, ৬৭, ১১৯, ১৭৩
রামনবমী	৮৫, ৮৬, ৮৭, ১৮৯
রাড়ের বিয়ে ডিসমিস	৫৪
লক্ষ্মীমণি দেবী	১৭
লক্ষ্মণের প্রতি শূর্ণগথা	৩৮
শঙ্কুচন্দ্র বিদ্যারত্ন	৮, ২১, ৩৩
শরৎ সরোজিনী	৬৪, ১৩৬-১৩৯, ২১০-২১২
শান্তি কি শান্তি	১৬২
শুভস্র শীঘ্রং	৫৬, ৬৪, ১০২, ১০৩, ১০৪, ১৯৬
শিমূয়েল পিরবক্স	৯০, ৯৬, ১৯২
শিবনাথ শাস্ত্রী	১৬, ১৭, ১৯, ২০, ৫২, ১৩৮, ১৩৯
শিবনাথ রায়	২৮
শ্যামাচরণ শ্রীমানি	৯৭, ১৯৫
শ্রীজগচ্চন্দ্র গুহ	৫৪
শ্রীনাথ দাস	১৩৯
সম্বাদ ভাস্কর	১৭৩
সপত্নী নাটক	৫৫, ৬৪, ৮৭-৮৯, ১৯০-১৯২, ২৬১
সন্তাপিনী নাটক	৬৫, ১৩৯, ১৪০, ২১২-২১৪
সত্যজীবন মুখোপাধ্যায়	৮৪
সরোজা	৬৫, ১৪২
সাক্ষাৎ-দর্পণ	৬৪, ১৩২, ১৩৩, ২০৭, ২০৮
সাম্য	৩০, ৩১, ১৮৬
সংবাদ প্রভাকর	৮, ১৪, ৭৬
সুরেন্দ্র বিনোদিনী	১৩৮
হরিশ্চন্দ্র মিত্র	৪২, ৪৩, ৪৪, ১০১, ১০২, ১৯৬
হারাগচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	১০১, ১২৬, ২০৫
হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	৩৯, ৪০
হিন্দু মহিলা নাটক	৬৪, ১২৮, ১৩২, ২০৬

শ্রুতি

সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ক গবেষণামূলক পত্রিকা
পঞ্চম বর্ষ : ডিসেম্বর : ২০১৮

ষাণ্মাসিক
ISSN : 2394-7225

সম্পাদক
তাপস অধিকারী

সহ-সম্পাদক
নির্মল দাস
গুরুদাস চন্দ্র মাহাতো

শ্রুতি গবেষণা পরিষদ

S H R U T I

SAHITYA-SANSKRITI BISHAYAK GABESHANAMULAK PATRIKA

A PEER REVIEW REFEREED JOURNAL

Published by Shruti Gabeshana Parishad

ISSN : 2394-7225

পঞ্চম বর্ষ : ডিসেম্বর সংখ্যা : ২০১৮

প্রকাশক

শ্রুতি গবেষণা পরিষদ

গ্রাম : নাকড়াকুড়ি, পো : তেলিঘাটা, তপন, দক্ষিণ দিনাজপুর

মোবাইল : ৯৪৭৪৬৭৩৮৮৬, e-mail : editorshruti@gmail.com

সম্পাদনা পরিষদ (Referees)

প্রফেসর মঞ্জুলা বেরা, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

প্রফেসর নন্দিতা বসু, দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়

প্রফেসর বিকাশ রায়, গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

প্রফেসর আদিত্যকুমার লালা, গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

প্রফেসর অমিত ভট্টাচার্য, গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

প্রফেসর নন্দিনী ব্যানার্জী, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

শ্রীঋষিকুমার শর্মা, বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়

ড. গৌর চন্দ্র ঘোষ, ইসলামপুর কলেজ

সম্পাদক

তাপস অধিকারী

সহ-সম্পাদক

নির্মল দাস ও গুরুদাস চন্দ্র মাহাতো

প্রচ্ছদ ও অক্ষরবিন্যাস

তাপস অধিকারী

প্রাপ্তিস্থান

সম্পাদক ও সহ-সম্পাদক (ফোন বা মেল-এ যোগাযোগ বাঞ্ছনীয়)

সূচি

মধ্যযুগের কবিদের আত্মকাহিনি অংশে নিজেদের ঘরোয়া ও অন্তঃরঙ্গ জীবনের পরিচয়	: আদিত্যকুমার লাল	৭
মানব সম্পর্কের স্মিত বিস্ময়ের রূপ-উন্মোচনে অনিতা অগ্নিহোত্রীর ছোটগল্প : শর্মিষ্ঠা পাল		১৭
প্রতিভা বসু : বিস্মরণের বীণাখানি বাজে মোহন মূর্ছনায়	: প্রবীর সরকার	২৪
শেখ ফজলুল করিমের জীবন ও সাহিত্যে সুফিবাদের প্রভাব	: মো. আবু শাহাদত	২৯
আকরিক : শোষিত মানুষের সংগ্রাম	: গোষ্ঠ বর্মণ	৩৯
অমিয়ভূষণ মজুমদারের উপন্যাসে রাভা সমাজ ও সংস্কৃতি	: রমাতোষ সরকার	৪৩
বিধবা বিবাহ আন্দোলন ও উনিশ শতকের বাংলা নাটক	: দেবশ্রী সাহা	৪৯
বাংলা সাহিত্যে শিবভাবনা	: অর্জুন মণ্ডল	৫৫
কবি ঘনরাম চক্রবর্তীর ‘ধর্মমঙ্গল’ কাব্যের ভাষাশৈলী	: বাপী সরকার	৬৪
নারীবাদী ভাবনার আলোকে ‘মেঘনাদবধ কাব্য’	: বিশ্বনাথ কুইরী	৭৩
বিদ্যাসাগর ও মধুসূদন : পরস্পরের দৃষ্টিতে	: তাপস অধিকারী	৮০

বিধবা বিবাহ আন্দোলন ও উনিশ শতকের বাংলা নাটক

দেবশ্রী সাহা

রামমোহন রায়ের প্রচেষ্টায় ১৮২৯ সালে বিধবা নারীর সহমর্ম যাত্রা তথা 'সতীদাহ প্রথা' বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর কার্যকারণ সূত্রে অবশ্যবাহী হয়ে পড়ে হিন্দু বিধবার পুনর্বিবাহের প্রসঙ্গটি। উনিশ শতকে বাল্যবিবাহ, অসম বিবাহ ও বহুবিবাহের কারণে আমাদের সমাজে বিধবার সংখ্যাধিক্য প্রভূত পরিমাণে বেড়ে যায়। 'সতীপ্রথা' রদ হবার কয়েক বছরের মধ্যেই সমাজে দ্রুত সংখ্যায় বেড়ে যায় বাল বিধবার সংখ্যা। কুলীন ব্রাহ্মণের একাধিক বিধবা স্ত্রীর 'সহমরণ' না হওয়ার কারণে সমাজে নতুন বিপত্তি দেখা দেয়। অল্পবয়স্কা কিংবা নাবালিকা বিধবার উত্তরাধিকার নিয়ে দেখা দেয় নানা গোলোযোগ। অসহায় বিধবাদের না ঠাই হয় শ্বশুর বাড়িতে, না ঠাই হয় বাপের বাড়িতে। ফলত তাঁদের ব্যক্তিজীবন হয়ে ওঠে নিরুপায় ও আশ্রয়হীন। এই বিধবাদের একটা বড় অংশ সমাজ কলঙ্কে জড়িয়ে পড়ে। কেউ কেউ জীবন বাঁচানোর তাগিদে কলকাতার নব্যাবাদীদের বাগানবাড়িতে রক্ষিত হয়ে জীবন কাটাতে বাধ্য হয়। গ্রামের বন্চিত যুবতী বিধবারা জীবন বাঁচানোর তাগিদে নতুন গড়ে ওঠা শহর কলকাতার রাজপথে দাঁড়াতে বাধ্য হয়। কেউ কেউ বাধ্য হয় নতুন নগর কলকাতার কালীঘাট সংলগ্ন পতিতালয়ে আশ্রয় নিতে। সমাজে দেখা দেয় নারীর প্রণয় ঘটিত নানা ব্যভিচার। হিন্দু সমাজ কলুষতার তীব্রতায় পৌঁছে যায়। সমাজে ঘটতে থাকে অবৈধ প্রণয়, অবৈধ গর্ভপাতের ঘটনা, ভ্রূণ হত্যা, বেশ্যা বৃত্তি। নবীন বিধবাদের পরিচয় হয় 'রাঁড়'। এভাবেই কলুষতায় মখিত হয়ে ওঠে ১৮২৯ পরবর্তী কলকাতার তিন দশক। সমাজে নানান গোলোযোগ ও সংকট তৈরি হয়। এই সমাজ সংকটে খুব জরুরী হয়ে পড়ে বিধবার পুনর্বিবাহের প্রসঙ্গ।

সারা ভারতবর্ষে বিধবা বিবাহ আইন নিয়ে তীব্র বাগবিতণ্ডা শুরু হয়। সমকালীন এই আন্দোলন বিদ্যাসাগরের প্রচেষ্টায় ও ইংরেজ সরকারকে চিঠি-পত্র প্রদান, তৎকালীন বাল বিধবার পুনর্বিবাহের বিষয়টি 'ল কমিশন'কে ভাবতে বাধ্য করে। দীর্ঘ সামাজিক টানা পোড়েনের পর নানা বাধা বিপত্তি কাটিয়ে বিদ্যাসাগরের প্রচেষ্টায় 'বিধবা বিবাহ' শেষ পর্যন্ত আইনে পরিণত হয় ১৮৫৬ সালের ২৬শে জুলাই। বিধবা বিবাহের বাদানুবাদ সংকটকালে বিদ্যাসাগরই একমাত্র ব্যক্তি যিনি দৃঢ় চিন্তে বিশৃঙ্খল সমাজ আন্দোলনকে সুনির্দিষ্ট পথে চালিত করেন। তাঁর পাণ্ডিত্য প্রখর যুক্তিবোধ, অধ্যাবসায়, নিষ্ঠা চিন্তা, চারিত্রিক দৃঢ়তা, অনমনীয় মনোভাব, সমবেদনাময় মন বিধবা বিবাহ আন্দোলনকে সম্পূর্ণতা দিতে সক্ষম হয়।

উনিশ শতকের যুগ পরিবেশে হিন্দু বিধবারা আচার সর্বস্বতার যুগকাণ্ডে বলি হতে, কুপথে পা বাড়াতে একরকম প্রায় বাধ্য হয়েছিল। তার উপর বিধবার সম্পত্তি দখল, জীবনাচারের হাজার বিধিনিষেধের বেডাজালে জীবন-যৌবন, রূপ-রস গন্ধহীন হয়ে উঠেছিল। নারীর বৈধব্য আচার পালনের এই কঠোরতা বিপত্তীক পুরুষের ক্ষেত্রে নেই। স্বাভাবিক ভাবে প্রশ্ন ওঠে, পুরুষ যদি মরনোত্তর পুনর্বিবাহ করতে পারে, তবে স্ত্রীলোক কেন স্বামীর মৃত্যুর পর পুনর্বিবাহ করতে পারবেন না? 'নব্যভারত' পত্রিকায় গঙ্গেশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় 'বিধবা ও সমাজ' প্রবন্ধে লিখেছেন,—“বিধবাদিগের বিবাহ যেমন শাস্ত্র

নিষিদ্ধ বিপত্নীক পুরুষদিগের পুনর্বিবাহের সেইরূপ নিষেধ করিলে নীতিগত সামালাভ হয়, সে বিষয়ে সন্দেহ করি না, বরং তাহা হইলে, পুরুষদিগের কতকটা প্রায়শ্চিত্ত হয়”

বিধবা বিবাহ আমাদের সমাজে অসঙ্গত আচরণ বলে গৃহিত হয়েছে। বিধবা বিবাহকে কেন্দ্র করে তৈরি হয়েছে প্রবাদ,—

“রাঁড়ী বেটীর বিয়ের সখ

উনায় রসের কত ঠমক।”

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর হিন্দু বিধবা নারীর অসহায়তাকে দরদ দিয়ে উপলব্ধি করলেন এবং এর মুক্তির উপায় খোঁজার চেষ্টা করলেন। বর্ণ হিন্দু সমাজে যুগ যুগ ধরে চলে এসেছে বিধবা নারীকে কেন্দ্র করে নানান অভিযোগ। তৈরি হয়েছে নানা প্রবাদ,—‘বৌ মরে ভাগ্যবানের, বর মরে অলুক্ষণে ডাইনীর। নারীর নিজের অজ্ঞাতে পরিণত হয় বিধবায়। কখন সে সংসার হতে আখ্যা পায়—নরখাদিকা, রাক্ষসী, ডাইনী, অপয়া, ভাতার খাকী। অকালে স্বামী হারানোর শোক যতটা না তাকে অস্থির করে তোলে তার চেয়ে, সমাজের সর্বস্তর হতে উঠে আসা অস্বস্তিকর প্রশ্নবাণ তাকে বিচলিত করে, পীড়িত করে কন্টকিত করে।

উনিশ শতকে অভিজাত ভদ্র গৃহে বিধবা নারীর ক্রণ হত্যার ঘটনা ছিল নিত্য নৈমিত্তিক। কালীপ্রসন্ন সিংহের ‘হুতোম প্যাঁচার নক্সা’ সূত্রে জানা যায়,— ‘আমরা বেস জানি অনেক বড় মানসের বাড়ি, মাসে একটি করে ক্রণহত্যা হয় ও রক্ত কম্বলের শিকড়, চিতের ডাল ও করবীর ছালের (গর্ভপাতের দেশী ঔষধ) নুন তেলের মত উঠনো বরাদ্দ আছে। যেখানে হিন্দুধর্মের অধিক অধিক ভড়ং, যেখানে দলাদলির অধিক ঘোঁট ও ভদ্রলোকের অধিক কুৎসা প্রায় সেখানেই ভেতর বাগে উদ্যম এলে কিন্তু পাদে গেরো!’”

সমাজে বিধবা সংকটের মূলে ছিল, বাল্যবিবাহ, অসম বিবাহ ও বহুবিবাহের কুপ্রথা। বংশ মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য তরুণী কিশোরীর পিতা মাতা কুলীন বৃদ্ধ পাত্রের সঙ্গে বিয়ে দিতে বাধ্য হতেন। ‘বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্য্যা’। সমাজে বহুবিবাহ প্রথা চালু থাকার কারণ, কুলীন স্বামীর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে বহু পত্নীর বৈধব্য দশা সমাজের সংকট ও সমস্যাকে জটিল করে তুলেছিল।

বিধবা বিবাহ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে সমাজের বিশিষ্টজনেরা দুটি সারণীতে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিলেন। একালে বিধবা বিবাহকে সমর্থন করেছিলেন, বর্ধমানের মহারাজা মহতাব চন্দ্র, নবদ্বীপের মহারাজা শ্রীশচন্দ্র, কালীপ্রসন্ন সিংহ, কেশবচন্দ্র সেন, শিবনাথ শাস্ত্রী প্রমুখ। (বিদ্যাসাগরের নেতৃত্বে বিধবা বিবাহের সমর্থনে ইংরেজের কাছে প্রেরিত আবেদন পত্রে, পঁচিশ হাজার ব্যক্তি স্বাক্ষর করেছিলেন।) বিধবা বিবাহের বিরোধিতা করেছিলেন, রাধাকান্ত দেব, ঈশ্বর গুপ্ত প্রমুখ। (রাধাকান্ত দেবের নেতৃত্বে বিধবা বিবাহের বিরোধিতা করে ইংরেজের কাছে প্রেরিত আবেদন পত্রে, তিরিশ হাজার ব্যক্তি স্বাক্ষর করেছিলেন।) বিরোধী পক্ষ ছিল ভারী। তা সত্ত্বেও ইংরেজ সরকার বুঝেছিলেন সমকালীন এই সংকট। জে পি গ্রাণ্টের আগ্রহ ও প্রচেষ্টায় ১৮৫৬ সালের জুলাই মাসে বিধবা বিবাহ আইনত সিদ্ধ হয়।

বিধবা বিবাহ আইনত স্বীকৃত হওয়ার পরও হিন্দু বিধবারা পুনর্বিবাহে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে এগিয়ে আসেননি। বিধবা নারীর অভিবারকদের হিন্দু নারীর পুনর্বিবাহে তীব্র অনীহা লক্ষ করা গেছে। ধর্মভয় মানুষের মন থেকে দূর হয়নি, সেকারণে হিন্দু বিধবা নারীরা পুনর্বিবাহে অগ্রসর হননি। নিতান্ত দায়ে পড়ে প্রয়োজনের তাগিদে, দোজ বর তথা বিপত্নীকেরাই বিধবা বিবাহে অগ্রসর হয়েছিলেন। অর্থলোভে এক শ্রেণীর পুরুষের মধ্যে বিধবা বিবাহে আগ্রহ দেখা দিলেও, সেখানে প্রধান লক্ষ হয়ে দাঁড়িয়েছিল সম্ভোগ ও প্রবঞ্চনা বৃত্তি। প্রবঞ্চনা রুখতে বিদ্যাসাগর বিবাহের পাত্রকে দিয়ে এক টাকার স্ট্যাম্প পেপারে মুচলেকা লিখিয়ে নিতেন। বস্তুত এসব কারণে বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহ আন্দোলন ১৮৫৬ পরবর্তী প্রথম দশকে উদ্ভিষ্টতা লাভ করলেও উনিশ শতকের শেষ পর্বে মুখ খুঁবড়ে পড়ে।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বিধবা বিবাহ আন্দোলন সর্বাপেক্ষা চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিল আমাদের সমাজে। এই আন্দোলনকে ঘিরে সেকালের বাঙালি সমাজ যেভাবে দ্বিধা বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল এমনটা আর কোনো সামাজিক আন্দোলনে লক্ষ করা যায়নি। আর সেকারণেই তর্ক-বিতর্কমূলক, বাদানুমূলক, উত্তর-প্রতিউত্তরমূলক একটা সাহিত্যধারাবিকশিত হয়েছিল এই সময়পর্বে। এই সাহিত্যধারা যেমন বৈচিত্র্যপূর্ণ তেমনি শক্তিশালী। ১৮৫৬ সালে বিধবা বিবাহ আইনত স্বীকৃতি পাওয়ার পর, পক্ষে-বিপক্ষে লেখা হয় একাধিক বাংলা নাটক। বদলে যায় বাংলা সামাজিক নাটকের চেহারা। সমালোচক অশোককুমার মিশ্র লিখেছেন,—“বিধবা বিষয়ক বাদ-প্রতিবাদের সুর সবচেয়ে উচ্চকিত হয়েছিল বাংলা নাট্য শ্রেণীতে।”^{১৪} ১৮৫৬ সাল পরবর্তী সময়কালের বাংলা নাটক রচনার ইতিহাস লক্ষ করলে দেখা যাবে, বাংলা সামাজিক নাটকের কাহিনীবৃত্তে বিষয় হিসাবে ঘুরে ফিরে এসেছে বিধবার পুনর্বিবাহের প্রসঙ্গ। কখন সহানুভূতিতে, কখন উপহাসে-বিদ্রোপে, কখন মুখোরোচক ব্যঙ্গের ঝলকানিতে। নাটক যেহেতু মিশ্র শিল্প, তাই এখানে যেমন চরিত্রের সংলাপ আছে তেমনি রয়েছে সংগীত। নাটক যখন নাটো উপনীত হল তখন যুক্ত হল শারীরিক ও বাচিক অভিনয়। ফলে বাংলা নাটকের সলাপ নির্ভরতায় নাট্যকারেরা সরাসরি উক্তি-প্রত্যুক্তির মধ্য দিয়ে, কখন সংগীতের মধ্য দিয়ে বিধবা বিবাহের সমর্থনে, কিংবা বিরোধিতায় মনোরঞ্জন রঙ্গ-তামাশা করেছেন।

আমাদের অনুসন্ধান লক্ষ করেছে উনিশ শতকে রচিত প্রায় চল্লিশটির বেশি নাটকে বিধবা বিবাহ প্রসঙ্গ ও বিধবা নারীর জীবনাচারের চিত্র উপস্থাপিত হয়েছে। বাংলা নাটকে বিধবা বিবাহ প্রসঙ্গ ও বিদ্যাসাগরকে কৌতুকের সঙ্গে উপস্থিত করা হয়েছে। ‘সাগর’ ও ‘রাড়ের বে’ এই জাতীয় শব্দবন্ধ সহযোগে বিধবা বিবাহের মত সিরিয়াস বিষয়কে হাস্যরসের খোরাক করে তোলা হয়েছে।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ‘বিধবা বিবাহ’ প্রসঙ্গ নিয়ে পক্ষে-বিপক্ষে, আক্রমণ-প্রতি আক্রমণ করে লেখা হয় বহু নাটক। সমালোচক আশুতোষ ভট্টাচার্য লিখেছেন,—“যতদিন পর্যন্ত বিধবা-বিবাহ বিধিবদ্ধ হয় নাই, ততদিন পর্যন্ত এই বিষয়ে একখানি নাটকও রচিত হয় নাই। কারণ, তখন পর্যন্ত সমাজ বিশ্বাস করিতে পারে নাই যে, এমন যুগান্তকারী কোনো আইন সমাজে প্রবর্তিত হইতে পারে। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রাণান্তকর চেষ্টার ফলে যখন ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে বিধবা-বিবাহ আইন বিধিবদ্ধ হইল, তখন হইতেই এই সম্পর্কে নাটক রচিত হইতে আরম্ভ করিয়াছিল।”^{১৫} যদিও সমালোচক কথিত

এই মন্তব্য আংশিক সত্য বলে আমাদের ধারণা। ১৮৫৪ সালে প্রকাশিত রামনারায়ণ তর্করত্নের 'কুলীন কুলসর্বস্ব' নাটকে বিধবার সংকট প্রসঙ্গ উপস্থাপিত হয়েছে।

প্রসঙ্গত, বিধবা বিবাহ আন্দোলনের সপক্ষে ও বিপক্ষে লেখা বাংলা নাটকের একটি তালিকা প্রদান করা যেতে পারে,—^৬

কুলীন কুলসর্বস্ব (১৮৫৪)	:	রামনারায়ণ তর্করত্ন।
বিধবা বিবাহ নাটক (১৮৫৬)	:	উমেশচন্দ্র মিত্র।
বিধবাবাহ (১৮৫৬)	:	উমাচরণ চট্টোপাধ্যায়।
বিধবা মনোরঞ্জন (১৮৫৬)	:	রাধামাধব মিত্র।
বিধবা বিষম বিপদ (১৮৫৬)	:	অজ্ঞাতনামা।
চপলাচিন্তাচাপল্য (১৮৫৭)	:	যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায়।
বিধবা পরিণয়োৎসব (১৮৫৭)	:	বিহারীলাল নন্দী।
রামনবমী (১৮৫৭)	:	গুণাভিরাম শর্মা।
সপত্নী নাটক (১৮৫৮)	:	তারকচন্দ্র চূড়ামণি।
বিধবা বিবাহ বিষম দায় (১৮৫৮)	:	গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন।
নীলদর্পণ (১৮৬০)	:	দীনবন্ধু মিত্র।
বিধবা বিরহ নাটক (১৮৬০)	:	শিমুয়েল পিরবকস।
বাল্যোদ্ধাহ নাটক (১৮৬০)	:	শ্যামাচরণ শ্রীমানি।
দলভঞ্জন নাটক (১৮৬১)	:	হারাগচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।
শুভ্র শীঘ্রং (১৮৬২)	:	হরিশ্চন্দ্র মিত্র।
ম্যাও ধরবে কে? (১৮৬২)	:	হরিশ্চন্দ্র মিত্র।
বিধবা সুখের দশা (১৮৬২)	:	অজ্ঞাতনামা।
অশুভ পরিহারক (১৮৬২)	:	গৌরমোহন বসাক।
আইন সংযুক্ত		
কাদম্বিনী নাটক (১৮৬২)	:	কুশদেব পাল। (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড)
পুনর্বিবাহ নাটক (১৮৬২)	:	গুরুপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়।
অশুভসংকালহরণ (১৮৬৩)	:	গোবিন্দচন্দ্র চক্রবর্তী।
বিধবা বিলাস নাটক (১৮৬৪)	:	যদুনাথ চট্টোপাধ্যায়।
নবনাটক (১৮৬৬)	:	রামনারায়ণ তর্করত্ন।
বিয়ে পাগলা বুড়ো (১৮৬৬)	:	দীনবন্ধু মিত্র।
মেঘনাদবধ নাটক (১৮৬৭)	:	ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়।
স্বপ্ন সমাধি নাটক (১৮৬৭)	:	অজ্ঞাতনামা।
বঙ্গকামিনী নাটক (১৮৬৮)	:	হারাগচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।
হিন্দু মহিলা নাটক (১৮৬৯)	:	বটুবেহারি বন্দ্যোপাধ্যায়।

সাক্ষাৎ দর্পণ (1871)	:	অজ্ঞাতনামা।
জামাই বারিক (1872)	:	দীনবন্ধু মিত্র।
বিধবার দাঁতে মিশি (1874)	:	গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।
কুলীনকন্যা (1874)	:	লক্ষ্মীনারায়ণ চক্রবর্তী।
বিধবা বঙ্গবালা (1875)	:	অজ্ঞাতনামা।
বঙ্গবিধবা (1875)	:	বিরজামোহন চৌধুরী।
শরৎ সরোজিনী (1875)	:	উপেন্দ্রনাথ দাস।
সন্তাপিনী নাটক (1876)	:	জনৈক ভদ্রমহিলা।
বিধবা (1877)?	:	নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য।
সরোজা (1877)?	:	রাধারমণ কর।
এমন কর্ম আর করব না(1877):	:	জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।
ষষ্ঠিবাঁটা প্রহসণ (1887)	:	প্রফুল্লনলিনী দাসী।
বিধবা সঙ্কট নাটক (1890)	:	অজ্ঞাতনামা।
আনন্দময় নাটক (1890)	:	মনমোহন বসু।
তরুবালা (1890)	:	অমৃতলাল বসু।
বিলাপ বা বিদ্যাসাগরের	:	
স্বর্গে আবাহন (1891)	:	অমৃতলাল বসু।
বিধবা কলেজ (1892)	:	অমৃতলাল বসু।
বাবু (1894)	:	অমৃতলাল বসু।

1856 সালে প্রকাশিত হয় উমেশচন্দ্র মিত্রের 'বিধবা বিবাহ নাটক'। এ নাটকের পরিণতি বিয়োগান্তক। অবৈধ প্রণয় লিপ্ত হয়ে বিধবা সুলোচনা গর্ভবতী হয়ে পড়ে। লোকলজ্জার ভয়ে সুলোচনা বিষপানে মৃত্যুকে বরণ করে নেয়। বিধবা বিবাহকে অবলম্বন করে রচিত উমেশচন্দ্র মিত্রের 'বিধবা বিবাহ নাটক' বাংলা সাহিত্যের প্রথম ট্রাজিডি নাটক। শিমুয়েল পিরবকস এর 'বিধবা বিরহ' নাটকে দেখানো হয়েছে, বিধবা নারী অবৈধ প্রণয়ে গর্ভবতী হয়ে বাড়ি হতে গহনাপত্র চুরি করে গৃহত্যাগী হয়েছে। যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায়ের 'চপলাচিন্তাপল্য' নাটকে দেখানো হয়েছে, নায়িকা চপলার বিবাহ ও সুখময় মিলন। কুশদেব পালের 'আইন সংযুক্ত কাদম্বিনী নাটক' এর মধ্যে দেখানো হয়েছে গর্ভবতী অবস্থায় বিধবার রমণীর গৃহত্যাগ। হরিশ্চন্দ্র মিত্রের 'ম্যাও ধরবে কে?' নাটকে দেখানো হয়েছে নায়ক বিধবা বিবাহের সম্মতি প্রদান করে বিধবা রমণীকে সম্বোগ করেছে এবং শেষ পর্যন্ত বিধবা বিবাহ করতে অসম্মত হয়েছে। যদুনাথ চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'বিধবা বিলাস' নাটকে বিধবা নারীর পুনর্বিবাহ প্রদান করে বিধবা বিবাহ আন্দোলনকে সমর্থন করেছেন। সমকালে বিধবা বিবাহকে কেন্দ্র করে লেখা হয় একাধিক প্রহসন। এমনকি পৌরানিক রামকথার কাহিনীবৃত্তেও উঠে আসে বিধবার পুনর্বিবাহের প্রসঙ্গ।

প্রবন্ধে, কবিতায়, নাটকে সাহিত্যকারেরা বার বার বলতে চেয়েছেন, বিধবা হলেই নারীর প্রবৃত্তিগুলি মারা যায় না। বৈধব্য আচারের ফুল চন্দন দিয়ে যৌন প্রবৃত্তি অবদমন করে রাখা যায় না। লুকিয়ে চুরিয়ে চলে যৌন মিলন ও ভ্রূণ হত্যার ব্যভিচার। সতীত্ব, শুচিতা সব কিছু ছারখার হয়ে যায়, যৌনতৃষ্ণার কাছে। ইন্দ্রিয় রিপু কাতরতা গীতা পাঠ দিয়ে আর একাদশীর ব্রত দিয়ে ঢেকে রাখা যায় না। কৌলিন্য প্রথার কারণে যেসব বিধবা সংকট সমাজে দেখা দিয়েছিল, তার বেশির ভাগই ছিল বাল বিধবা। যৌবনের প্রাকলগ্নে উপনীত বয়ঃসন্ধিকালের কিশোরী বিধবা অসমাণ্ড যৌনসুখের উল্লাসে তাঁরা ব্যভিচারে লিপ্ত হতেন গোপনে। স্বামীসুখ বন্দিতা নারীর কামনা মিথো নয়। শাস্ত্রীয় বিধান দিয়ে রিপুর তাড়নাকে অবদমন করা যায় না। ফলে খুব জরুরী ছিল বিধবার পুনর্বিবাহ। আর এই পুনর্বিবাহের কথা নাট্যকারেরা খুব জোরের সঙ্গে বলেছেন তাঁদের নাট্যকাহিনীর মধ্য দিয়ে।

বিশ শতকের নাটকের কাহিনীবৃত্তে ঘুরে ফিরে এসেছে বিধবা বিবাহের প্রসঙ্গ। যেমন, অমরেন্দ্রনাথ দত্তের 'ভ্রমর', গিরিশচন্দ্র ঘোষের 'শান্তি কী শান্তি', অমৃতলাল বসু প্রমুখের নাটকে। উনিশ শতকের সিংহভাগ নাটকে বিধবাদের হৃদয় যত্ননা, অসহায়তা, পুনর্বিবাহ উত্তর জীবনের সমস্যা সংকট ও মিলনের প্রতিচ্ছবি ধরা পড়েছে। প্রতিপক্ষের সমালোচনা, রক্ততামাশা, মুখোরোচক গল্প, বিরোধিতা, বৈধব্য আচার ও পরিবার জীবনের সংকট, সমাজ অনুশাসন সমগ্র উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের নাট্যসাহিত্যে লক্ষ করা গেছে। বিধবারা জীবন রক্ষার তাগিদে বাধ্য হয়েছে বেশ্যা বৃত্তিতে গমন করতে। নাটকীয় একোক্তি ও চরিত্রের আক্ষেপ উক্তির মধ্যে বৈধব্যের জ্বালা, আশা-নিরাশা, স্বপ্ন ও স্বপ্ন ভঙ্গের বাস্তব সতাই সত্য আমরা শতাব্দীকাল দূরে দাঁড়িয়ে আমরা উপলব্ধি করতে পারি।

তথ্যসূত্র :

- ১)বিবাহ ও সমাজ, গঙ্গেশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রাবণ, ১২২৭ বঙ্গাব্দ।
- ২)সমাজচিত্রে উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা গ্রন্থসন, জয়ন্ত গোস্বামী, সাহিত্যশ্রী।
- ৩)হুতোম পাটার নক্সা, কালীপ্রসন্ন সিংহ, অরুণ নাগ সম্পাদিত, পৃ.২০১।
- ৪)বাংলা গ্রন্থসনের ইতিহাস, অশোককুমার মিশ্র, মডার্ন বুক এজেন্সী, ১৯৪৪।
- ৫)বেঙ্গল লাইব্রেরি, চৈতন্য লাইব্রেরি, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ লাইব্রেরি ক্যাটালগও সুকুমার সেনের বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস গ্রন্থ অবলম্বনে এই তালিকা নির্মিত।
- ৬)বাংলা সামাজিক নাটকের বিবর্তন, আনতোষ ভট্টাচার্য, জাতীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৯৪৬।

প্রাবন্ধিক : গবেষক, বাংলা বিভাগ, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়।